রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর

(বীরভূমিতে প্রাপ্ত তথ্যালোকে)

ডঃ অমলেন্দু মিত্র

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
৬/১এ, ধীরেন ধর সরণি, কলিকাতা-১২

নিবেদন

ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করে গবেষণায় প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এ-পথে অনেক বাধা। প্রথমতঃ আমি মফঃস্বলে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নই। যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রিসার্চ স্কলারদের থাকে তা আমার ছিল না। গ্রামাঞ্চলে পর্যটন করারও অসুবিধা নানাদিক থেকে। দেশপ্রেমী বড় মানুষদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আমার মেলেনি। তাছাড়া নিজের চাকুরী ও পারিবারিক ঝঞ্ঝাট আছে। ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করেছি বহুকাল। অনেক চেষ্টার পর পূজ্যপাদ ডঃ সুকমার সেন মহোদয়, তাঁর অধীনে আমাকে গ্রহণ করেন। আর পিছন থেকে কাজে ঠেলা দিতে থাকেন ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতীর পুঁথিবিভাগের অধ্যক্ষ ও রীডার। প্রকৃত কথা বলতে কি তাঁর আগ্রহ ও প্রচণ্ড ঠেলা না থাকলে আমি এ পথে নামতাম না। খেয়ালখুশি মত গল্প-প্রবন্ধ লিখে কাল কাটাতাম। বিধিবদ্ধ প্রণালীতে ডিগ্রী সার্টিফিকেট অর্জন করার উদ্দেশ্যে পড়া, বা কাজ করায়, আমার চিরকালের বিতৃষ্ণা। শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বভারতীতে আমাকে নেবার চেষ্টা করেন। ওখানকার অধ্যক্ষ মহাশয় বলেছিলেন ; যারা গল্প প্রবন্ধ লেখে, গবেষণার কাজ তার দ্বারা হয় না। এ তাঁর নাকি অনেক দেখা আছে। ডঃ মণ্ডল আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করে থাকেন। তাঁরই ধাক্কায় বার বার চেষ্টা করে ডঃ সেনের অধীনে স্থান পেয়েছিলাম। ডঃ মণ্ডল আমাকে সপ্তাহে দুখানা করে চিঠি লিখে গ্রাম ঘোরার তাগিদ চালাতে লাগলেন। কয়দিন পর পর তাঁর কাছ থেকে বই আনতে গিয়ে তাকে গ্রাম-বিবরণী পড়ে শোনাতে লাগলাম। তিনি গোড়া থেকেই দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগলেন—"আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে এর উপরই তোমাকে ডিগ্রী দিতাম, যা পেয়েছো এর উপর পাঁচখানা থিসিস হতে পারে"···ইত্যাদি। প্রশংসামদে মত্ত হয়ে প্রায় অর্ধোন্মাদের মত ছুটে বেড়াতে লাগলাম। জলের মত পয়সা গেল, শরীর গেল। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে থিসিস দাখিল করলাম। আর তেমনি প্রচণ্ড উৎসাহে অন্যতম পরীক্ষক, পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু (Commissioner, Scheduled Caste & Scheduled Tribes, New Delhi) মহাশয়ের এক রিপোর্টে থিসিসটি খারিজ হয়ে গেল। একেবারে বেকুব হয়ে গেলাম। অসাফল্যের এই দারুণ মুহূর্তে একজন পরম পণ্ডিত তাঁর মাৎসর্য চরিতার্থ করবার আশায় আমাকে প্রচণ্ড গালাগালি করে চিঠি লিখলেন—আমার নাকি যোগ্য পুরস্কার হয়েছে, আমি নিজেকে বড় পণ্ডিত বলে মনে করি ইত্যাদি। নতমস্তকে বসে রইলাম কিছুকাল। আবার বল সংগ্রহ করে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে জিনিষটা বুঝতে

গেলাম। তিনি তো ভৎসনা করতে লাগলেন—নৃতত্ত্বের বিষয় নিয়ে কাজ করতে যাওয়া কেন! এ ধরণের অক্ষম গবেষণা আজকাল অনেকেই করছে কিন্তু কোনো গবেষণা-গ্রন্থই কাজে লাগছে না, প্রভৃতি নানা কথা। তারপর তিনি কাজটা ঠিকমত করবার যে পদ্ধতি বর্ণনা করলেন তা শুনে বাকস্ফূর্তি হল না। আমি সাতবার ফিরে জন্ম নিলেও সে কাজের শতাংশও শেষ করতে পারব না। কিন্তু হাল ছাড়লাম না। আবার থিসিস দিলাম ৬ মাস পর। এবার গৃহীত হল। অপর দু'জন পরীক্ষক, আচার্য সুনীতিকুমার ও ডঃ সুকুমার সেন মহোদয়গণ মৌখিক পরীক্ষা নিলেন।

থিসিস গ্রন্থের নাম ছিল, "ধর্মঠাকুর ও ধর্মসাহিত্যের বিবরণ"। ধর্মঠাকুরই করেছি। সাহিত্যের বিবর্তন অংশে নূতনত্ব নেই বলে বিশেষ জোর দিইনি। ধর্মঠাকুরের তত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ কার্যও অনেক বাকী ছিল তা পরবর্তী কালে করার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। ধর্মঠাকুরকে জানতে গেলে রাঢ় দেশের অন্তঃসলিলা সংস্কৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। যাবতীয় লৌকিক দেবদেবীর পুজানুষ্ঠানও ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে এসে পড়ে। সুতরাং সাধ্যমত সেগুলি সংগ্রহ করে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

অর্ধশতাব্দী ধরে ধর্মঠাকুর নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে তবে সে আলোচনা মুখ্যতঃ ধর্মসাহিত্যকে অবলম্বন করে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ধর্মঠাকুরকে বুঝতে গেলে ধর্মমঙ্গল, ধর্মপুরাণ, ধর্মপুজা-বিধান ইত্যাদি বইগুলিকে একবারে বাদ দেওয়া উচিত। কারণ এগুলি বহু পরবর্তী কালে খেয়ালখুশিমতো মনগড়া লেখা। কোনো ঐতিহাসিকতা ওগুলি থেকে আবিষ্কার করা যায় না। নৃতত্ত্বের আলোকেই ধর্মঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করা দরকার এবং তা করতে গেলে কিভাবে ধর্মঠাকুরের উৎসব পালিত হয়, কারা করে, সেই সকল জাতির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, গ্রামের প্রাচীনত্ব ইত্যাদি নির্ণয় করে তুলনামূলক বিচারে এগানো দরকার। বলা বাহুল্য, কাজটি সোজা নয়। বহুদিন ধরে বহু সন্ধানী একাজে লিপ্ত হলে তবেই সম্পূর্ণরূপে ধর্মঠাকুরের রহস্য উদ্ঘাটন হবে। তাছাড়া ধর্মঠাকুরের পুজানুষ্ঠান কোন্ জায়গা থেকে কোন্ জায়গা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কিভাবে পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে তাও নির্ণয় করা দরকার। রাঢ় অঞ্চলের কাজটুকু শেষ করব মনে করে দেখছি, শুধুমাত্র বীরভূমই আমি শেষ করতে পারলাম না। এ কাজ 'অনন্ত পারং'। শ্রীবিনয় ঘোষের "পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি" (কাল পেঁচার বঙ্গদর্শন) লেখার কালে ১৯৫৩ সালের এ অঞ্চলের ধর্মপূজার বিবরণ তাঁকে সংগ্রহ করে পাঠাই (তাঁর গ্রন্থে একথার স্বীকৃতি নেই)। তখন থেকে আরও তথ্য জড়ো করার ইচ্ছা ছিল। অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে Royal Asiatic Society-র Journal-এ মেদিনীপুরের ধর্মপুজার বিবরণ ও বর্ণনা প্রদান করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত, "পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা" (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত) গ্রন্থেও কিছু ধর্মগাজনের বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে। এসব ছাড়াও হয়ত আরও কেউ কেউ এ কাজ করে থাকতে পারেন, তা বিক্ষিপ্ত ও টুকরা টুকরা কাজের অন্তর্গত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পথ অনুসরণ করে দীনেশচন্দ্র সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং আধুনিককালে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ

পঞ্চানন মণ্ডল, আচার্য সুনীতিকুমার, ধর্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্মঠাকুরের রহস্য ভেদের প্রয়াস পেয়েছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও তাঁর মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ও বাঁকুড়া জেলার গেজেটিয়ারে ধর্মঠাকুর সম্পর্কে, শ্রমসাধ্য আলোচনা করেছেন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্পাদনা কালে (যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, অনাদ্যের পুঁথি ইত্যাদি) ধর্মঠাকুর সম্পর্কে বহু কৌতূহলপ্রদ আলোচনা করে তাঁর মনীষার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাই যে তাঁর সমস্ত আলোচনা একত্র করে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি বক্তব্যটি তাঁর কি ? জটিল ধর্মঠাকুরকে তিনি আরও গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছেন দুঃসহ ফুটনোট যোগ করে। প্রকৃত কথা বলতে কি ডঃ সুকুমার সেন রূপরামের ভূমিকায় (২য় সং) ধর্মঠাকুর সম্পর্কে যা আলোচনা করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনারহিত। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে তিনি চূড়ান্ত সত্যনিষ্ঠা ও প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই আলোচনা থেকে আমি প্রভূত উপকার লাভ করেছি যদিও শেষ পর্যন্ত আমার বিশ্বাস স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করেছে। আমার জ্ঞান ও বিদ্যা সামান্য। গবেষণা স্বল্প, সঞ্চয় কম, আমার গবেষণায় নিঃসন্দেহে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি রইলো, রইলো সমালোচনার অবকাশ। তবে আমি ব্যবসায়ী গবেষক নই। সম্পূর্ণ সৌখিন আমার কাজ। তাই আমি ফাঁকি দেবার চেষ্টা করিনি। যা বুঝেছি, জেনেছি, দেখেছি তাই সোজা প্রকাশের চেষ্টা করেছি। সীমিত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে অতি-পণ্ডিত বা অতি-বুদ্ধিমান সাজার অভিনয় করিনি।

ধর্মঠাকুরের তত্ত্বগুলি সমালোচনা হোক, এই ভরসায় বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠায় এগুলি ছাপিয়েছি কিন্তু সমালোচনা কেউই করে পাঠাননি। বরং দুইজন গুরুদেবতুল্য ডক্টরেট আচার্য অসূয়া প্রকাশ করে পত্রাঘাত করেছেন। সে পত্রগুলি প্রকাশ করে তাঁদের আর অমর্যাদা করতে চাইনে। শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে শুধু পত্রাঘাত নয় লগুড়াঘাত আছে জেনেই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। এই প্রসঙ্গে সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করি, পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞানতপস্বী শ্রীনারায়ণ চৌধুরী শ্রীপ্রশান্ত দাশগুপ্ত (অধ্যাপক, হুগলী মহসীন কলেজ), শ্রীযুক্তা কল্যাণী দত্তের (অধ্যাপিকা, বাসন্তী দেবী কলেজ) নাম। এঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার লেখা এবং বেতার আলোচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পত্রযোগে। শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র, আই-সি-এস মহাশয়ও আমার লেখার প্রচুর সমাদর করেছেন।

রাঢ় অঞ্চল সম্পর্কে ধর্মপূজার খবর বীরভূমের ইতিহাসে নেই। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে এই তত্ত্ব ও তথ্য সংগৃহীত ও লিখিত হলে অনেক অবলুপ্ত তথ্য আমাদের হাতে আসত। এখন লৌকিক দেবদেবী দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। জমিদারি উচ্ছেদের পরও বহু পূজা লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি পূজাপীঠ সরজমিনে তদন্ত করে পূজার বিবরণী সংগ্রহ করলে কোনো না কোনো নূতন তথ্য পাওয়া যাবেই। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন পূজাবিবরণী (প্রায় দুইশত গ্রামের) যা সংগ্রহ হয়েছে তার সবটা ছাপানো সম্ভব হল না। তবে সংগৃহীত মূল্যবান তত্ত্ব বা তথ্য যথাসাধ্য সন্নিবেশ করলাম।

বিভিন্ন প্রবন্ধে ভাগ করে আমি নানা পত্রিকায় লেখাগুলি পাঠাই। ইচ্ছা ছিল, কোনো

বড় পত্রিকা এগুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অন্ততঃ কিছুটা বের করুন, তাতে প্রচার এবং প্রকাশের সুবিধা হবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সকল রকম আন্তরিক প্রচেষ্টাই বিফল হয়েছে। একমাত্র পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ "বিশ্ববাণী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপাতে সম্মত হন এবং যা পাঠিয়েছি তিনি তাই অবিকৃতভাবে ছেপে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আর ছেপেছেন কিছু শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক "রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা" ও "সাহিত্য তীর্থে", শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র "কথাসাহিত্যে", শ্রীফণীভূষণ রায় "বেতার জগতে"। তাছাড়া নানা পত্রিকায় যেমন, গল্পভারতী, অমৃত, ভাবমুখে, কম্পাস, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, আর্য পত্রিকা, Folk Lore অমৃতবাজার ইত্যাদিতে কিছু লেখা প্রকাশ হয়েছে। এই সুযোগে ঐ সকল পত্রিকার সম্পাদকদের আমার আন্তরিক সুগভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার মত অগণিত সাধারণ মানুষ আমাকে নানাদিক থেকে সাহায্য করেছেন গ্রাম-বিবরণী সংগ্রহকার্যে। প্রত্যেকের নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিশেষভাবে যাঁদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁদের কথা বলছি—শ্রীনবকিশোর হাজরা এম-এ, বি-টি (লোকপাড়া), শ্রীমধু রায় (কলি), শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইন্দ্রগাছা), শ্রীরাধাদামোদর মিত্র (সিউড়ী), শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীদেবীদাস চ্যাটার্জি (চিনপাই), শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য (সিউড়ী), শ্রীভাস্কর সেন (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, সিউড়ী), শ্রীযোগেশ সরকার (কেন্দ্রগড়িয়া), শ্রীকালীচরণ সরকার (সিউড়ী), শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল (ইন্দ্রগাছা), শ্রীশম্ভুনাথ বিদ্যারত্ন (মোহনপুর), শ্রীশত্রুঘ্ন চক্রবর্তী এম-এ, বি-টি (সহকর্মী), শ্রীমান শিবনাথ চ্যাটার্জি, বি-এস-সি, বি-টি (সহকর্মী), কবি শ্রীসুবল সেন (তাঁতিপাড়া), স্নেহাস্পদা শ্রীমতী গায়ত্রী দে সিংহ (সিউড়ী), অধ্যাপক জনাব আলি হোসেন সাহেব (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, সিউড়ী), শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল (দৌলতপুর, ২৪ পরগণা) ও সহোদর শ্রীমান মুকুল মিত্র, এম-এ, বি-এড।

তাছাড়া ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ডি-ফিল, ডি-লিট, এফ্-এ-এস (অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়ের নিকটও প্রচুর স্নেহ লাভ করেছি। বৈষ্ণবাচার্য ডঃ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ডি-লিট মহাশয়ও অনেক তথ্য ও উপদেশাদি প্রদান করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী শান্তা মিত্র এম-এ, আর্থিক দিক দিয়ে আমাকে সাহায্য না করলে এই কাজ আদৌ হত কিনা সন্দেহ। তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে বিবাহের অল্পদিন পরই চাকুরী গ্রহণ করে আমাকে খাড়া রাখার চেষ্টা করে গেছেন। সংসারের বহুবিধ ঝঞ্ঝাট তার উপর তাঁকে সামলাতে হয়েছে। কলিকাতাস্থ বেলেঘাটা নিবাসী আমার মামাশ্বশুরগণ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবারীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু আমাকে নানাদিকে সাহায্য করেছেন। তাঁরা আমাকে প্রায়শঃ কোলকাতা অবস্থানে গাড়ীও জুগিয়ে গেছেন সকল সময় অযাচিতভাবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই ফার্মা-কে-এল-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়কে। তিনি আমার লেখাগুলিকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করে তৎপরতার সঙ্গে প্রকাশ

করেছেন। ফার্মা কে-এল কোম্পানীর প্রকাশনা বিভাগের প্রধানতম কর্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সরখেল মহাশয়ের অশেষ ধৈর্য, যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে Mr. W. Kilpatrik সাহেবকে। তিনি সুদূর আমেরিকা চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মঠাকুর সম্পর্কে Research করতে এসেছিলেন। তিনি আমার গবেষিত বিষয়বস্তুতে যা আগ্রহ দেখিয়ে দিনের পর দিন প্রত্যেকটি লেখা পাঠ করে প্রশংসা করে গেছেন তা আমি কাছের মানুষদের নিকট পাইনি। শুধু তাই নয়, এমনই আশ্চর্য লোক তিনি, যতগুলি পত্রিকায় আমার লেখা বের হয়েছে সবগুলিই তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন কোলকাতায় খুঁজে খুঁজে। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে কানাইবাবু উৎসাহিত হন। দূরের মানুষটিকে এখান থেকেই আন্তরিক সপ্রেম ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, ভগিনী Sandra Robinson-ও আমার লেখা-গুলিকে বিশেষ মূল্যবান বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রীতি রইল।

সিউড়ী, বীরভূম
১ জানুয়ারী ১৯৭২

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপাদ, ঐতিহাসিক ও গবেষক, স্বর্গতঃ পিতাঠাকুর গৌরীহর মিত্র এবং পিতামহ শিবরতন মিত্র মহাশয়দ্বয়ের পুণ্যস্মৃতির স্মরণে

গ্রন্থকার

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীঅমলেন্দু মিত্র মহাশয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা-গ্রন্থ "রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর" প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে আমি অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করেছি। রাঢ়ের সংস্কৃতি, উত্তর রাঢ়ের নদীতীরবর্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ; ধর্মঠাকুর কোন্ দেবতা, ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ; বীরভূমে ধর্মঠাকুরের পীঠ ; অনুষ্ঠানাদির পরিচয় ; ধর্মপুজা ও গাজনের বিবরণ—এই পাঁচটি মূল অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রথম দৃষ্টিতেই গ্রন্থকারের তথ্য-সমাবেশের ভূয়সী প্রশংসা না-করে উপায় নাই। নব নব তথ্যের এমন অভূতপুর্ব সমাহরণ ইতঃপূর্বে কোনো গ্রন্থে দেখা যায়নি। ডক্টর মিত্র দীর্ঘ-কাল ধরে বহু আয়াসে এবং অকাতরে অর্থব্যয় করে অনুসন্ধান চালিয়ে, তাঁর সংগৃহীত তথ্য-সমূহ একত্র সংকলন করে শিক্ষিত-সমাজের গোচরে উপস্থাপিত করেছেন। এই কাজের জন্যে স্বদেশী সংস্কৃতির একজন ধারক ও বাহক স্বরূপে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন সন্দেহ নাই।

ডক্টর মিত্র তথ্যসংগ্রহে যেমন অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তেমনি তথ্যবিশ্লেষণেও তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। সে-জন্যে যে গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রয়োজন সাধ্যমতো তিনি তা করেছেন। সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত স্থলবিশেষে একদেশদর্শী মনে হলেও, একক প্রচেষ্টায় তিনি যা করেছেন তার বেশি আশা করতে গেলেও বিফলমনোরথ হতে হবে। কারণ, কোনো প্রদেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির অনুশীলন করতে গেলে সে-পথে অন্তরায় অনেক।

ডক্টর মিত্র চিরাচরিত অ্যাক্যাডেমিক্ পদ্ধতিতে লোকযান-অনুশীলনের চেষ্টা না-করে, সরেজমিনে পৌঁছে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা তথ্য-সংগ্রহ এবং তথ্য-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু, একটিমাত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে অনুসন্ধানে ব্রতী হলে সর্বত্র সার্থক হওয়া যায় না। কারণ, বিভিন্ন ধরণের জ্ঞাতি-বিদ্যার আলোক নানা কোণ থেকে ফেলতে না-পারলে গ্রাম-সমাজের জটিল সংস্কৃতির রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর হয় না। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব হচ্ছে এই ধরণের পরস্পরনির্ভর সহবিদ্যা। প্রত্যেকটি বিদ্যার ক্ষেত্রসীমাও প্রতিদিন প্রসারিত হচ্ছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে সর্বসমীক্ষণে এগিয়ে চলে সফল হওয়া সাধ্যাতীত ব্যাপার। সকল শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীদের সহযোগিতা ছাড়া এ-কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব। তথাপি আমাদের নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়, ডক্টর মিত্র

অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি বর্তমান বীরভূম জেলার আঞ্চলিক আদিম সংস্কৃতির একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গচিত্র লোকসমক্ষে তুলে ধরে বাঙ্গালী শিক্ষিত-সমাজের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে দিলেন।

স্বদেশী-ঐতিহ্য-সংগ্রহের সংকল্প হল শ্রীমান্ অমলেন্দুর কৌলিক সংস্কার। পুণ্যকীর্তি স্বর্গত শিবরতন মিত্র মহাশয় তাঁর পিতামহ। শিবরতনের পুঁথি-সংগ্রহ, গ্রন্থরাজি এবং সাময়িক-পত্র-পত্রিকা-সংগ্রহ নিয়ে "রতন লাইব্রেরী" স্থাপিত হয়েছিল। সিউড়ীর "রতন লাইব্রেরী" একদা বহু বিদগ্ধজনের মনের অন্ন যুগিয়েছিল। প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত বহু লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষক পণ্ডিতের এই লাইব্রেরী ছিল স্মৃতিকাগার। শ্রীমান্ অমলেন্দুর পিতা স্বর্গত গৌরীহর মিত্র মহাশয় "বীরভূমের ইতিহাস" রচনা ক'রে বাঙ্গালী-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে একটি বিশেষ ধারা সংযোজন করে গিয়েছেন।

যে-কোনো প্রদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে বিশেষ ঐতিহাসিক, সমাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা-বিন্যাসের ফলে আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপায়ণ হয়ে থাকে। এবং কালক্রমে সেই সংস্কৃতি তার আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বাঙ্গালী-সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়-লাভের উদ্দেশ্যে এই রকম আঞ্চলিক সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়-লাভ একান্তভাবে প্রয়োজন। একনিষ্ঠ গবেষক ডক্টর মিত্রের আলোচ্য গ্রন্থখানি এই ধরণের আঞ্চলিক অনুশীলনের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে রাঢ় ও ঝাড়খণ্ড গাঙ্গেয় উপত্যকার একটি অখণ্ড ভূখণ্ড। বর্তমান রাঢ়ের বীরভূম, মানভূম ও বাঁকুড়া—এই তিনটি জেলা ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এই অবিভক্ত ভূখণ্ডে আদিম অস্ট্রিক সংস্কৃতির ধারা রাঢ়ভূমির সর্বত্র এবং বিশেষভাবে এই তিনটি সীমান্ত জেলাতে প্রকটিত, সমীকৃত ও বিবর্তিত হয়েছিল। সমগ্র রাঢ়ভূমির গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে সীমান্ত-জেলাগুলির প্রত্যেকটি গ্রামে পাতিপাতি করে অনুসন্ধান চালিয়ে আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ করে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার পরে, সেগুলি একত্রে আলোচিত হলে, তবেই রাঢ়ভূমির সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ প্রকাশিত হবে। অনুরূপভাবে ঝাড়খণ্ডের আঞ্চলিক ও সামগ্রিক তথ্যাবলীর সঙ্গে সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে, ফলতঃ রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ-পরিচয়-লাভ সম্ভবপর হবে। অন্যথায়, কোনো বিশেষ জেলার সংস্কৃতির আলোচনা সেই জেলাতেই সীমাবদ্ধ রাখলে "অন্ধ-হস্তি-ন্যায়" অনুসারে তা একদেশদর্শী হতে বাধ্য। ডক্টর মিত্রের আলোচনাতেও স্থানে স্থানে এরূপ একদেশদর্শী দোষ স্পর্শ করেছে।

যোগ্য পণ্ডিতবর্গের দ্বারা রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা হলে বর্তমানে ডক্টর মিত্রের সংগৃহীত তথ্যাবলীর স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন আরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারত। তথাপি ডক্টর মিত্রের উদ্যম, উদ্যোগ, সন্ধান, সংগ্রহ ও উপস্থাপনা প্রশংসার দাবী করতে পারে। কারণ, "বীরভূম-বিবরণ", "বীরভূমের ইতিহাস" এবং নানা প্রকীর্ণ প্রবন্ধে ইতঃপূর্বে বীরভূমের যে স্বরূপ আমরা অবগত হয়েছি, ডক্টর মিত্রের এই গ্রন্থখানি তন্মধ্যে সর্বাধিক তথ্যনির্ভর। তাঁর এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বীরভূমের দুর্গম গ্রাম-সমাজের লোক-

সংস্কৃতির জীবন্ত নিদর্শনগুলি আমাদের গোচরে আসার ফলে বীরভূমিকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার সুযোগ পাওয়া গেল। বৃথা পাণ্ডিত্যের বাতাবর্তে ডক্টর মিত্র তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলীকে বিকৃত করেননি। ফলে, মৌলিক তথ্যসমৃদ্ধ তাঁর এই গ্রন্থখানি বর্তমানের এবং ভাবীকালের গবেষকগণের সামনে একটি নতুন দিগন্তের আভাস এনে দেবে।

ডক্টর মিত্র আপন ধীশক্তি এবং অধ্যবসায় ও অধ্যয়নের দ্বারা বহু তথ্যের ব্যাখ্যা করেছেন; বহু তথ্যের ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন; পক্ষান্তরে, অনেক তথ্যের ব্যাখ্যা করেননি, বা করতে পারেননি। প্রসঙ্গতঃ এর আগে যে-সকল আলোচনা হয়ে গিয়েছে তিনি সে-সব অভিমত ও সিদ্ধান্ত তাঁর অনুকূলে কাজে লাগিয়েছেন; অথবা, কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করে পূর্বসূরিগণকে মাঝে-মধ্যে ধরাশায়ী করেছেন। ডক্টর মিত্রের এই কর্মে যৌক্তিকতা আছে, আবার নাই-ও। কারণ, রাঢ়ভূমির প্রত্যেকটি জেলায় প্রকৃত জনসমাজে স্বতন্ত্র ও বিচিত্র ধর্ম ও লোকসংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে ব্রত-পার্বণ ও সামাজিক প্রথার মধ্যে ভিন্ন ও অভিন্ন বহু আচার-আচরণ লক্ষ করা যায়, যেগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা সম্ভবপর হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন সূত্র থেকে। সুতরাং কোনো বিশেষ জেলার আচার-আচরণের তাৎপর্য-ব্যাখ্যার সঙ্গে তার মিল না-হলে ভাষ্যকারের প্রতি অসহিষ্ণু না-হয়ে উভয় ব্যাখ্যার তুলনামূলক অনুশীলন করে ভিন্নতর বা গভীরতর তাৎপর্য নিষ্কাশন করাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

সর্বোপরি গবেষক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক সকলেই একই সারস্বত মাতৃমন্দিরের পূজারী। স্ব স্ব জ্ঞানবুদ্ধিমতে তাঁদের আহৃত উপচারে বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য, সারস্বত-সড়কেও সিঁদেল চোর অথবা "সৌখিন মজদুর"দেরও অপ্রতুলতা নাই। প্রামাণ্য মতবাদের বজ্রদৃঢ় প্রাসাদও একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায় প্রতিকূল তথ্যের ঝড়-ঝঞ্ঝায়। সে-সব বিচারের ভার কালের দরবারে ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে প্রকৃত গবেষকের ধর্ম। দেবতাকে প্রসন্ন করতে চাইলে সমবেত বন্দনাগানেই পূজামন্দির মুখরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনুরাগী গবেষক ডক্টর অমলেন্দু মিত্র নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। নতুন নতুন অনেক ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করেছেন কিছুমাত্র তথ্য ও তত্ত্বের বৈগুণ্য না-ঘটিয়ে। যেমন, 'রাঢ়' শব্দটির ব্যাখ্যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ নতুন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দে সংকলিত জৈনাগম আচারাঙ্গ-সূত্রে বিধৃত দেশবাচক 'লাঢ়' শব্দটি প্রাচীনতর অসট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অস্ট্রিক ভাষায় 'লাড়' শব্দটির অর্থ হল—সাপ। তির্যক্ নাগলোক 'লাঢ়'-দেশের বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বিচরণ করেছিলেন। 'লাঢ়' বা 'লাড়' অর্থে 'সাপ' হলে, নাগভূমিতে তাঁর বিচরণ ভবিষ্যতে এদেশে মনসাতত্ত্বের উৎপত্তির হেতু হতে পারে। মনসা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে জৈন-ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

'বির' শব্দটির প্রচলিত ব্যাখ্যাই তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, সমগ্র বীরভূম জেলায় ডোম-পর্যায়ভুক্ত 'বিরবংশী' জাতির যে অসংখ্য লোক বসবাস করছেন সে-দিকে তিনি লক্ষ্য করেননি। সরকারী-বিবরণেও ভুল সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে 'বিরহোড়' নামে

জাতি রয়েছে। আমার মনে হয়, 'বির' ও 'মান' জাতিবাচক শব্দ। 'বির'দের ভূমি—বিরভূম বা বীরভূম ; 'মান'দের ভূমি—মানভূম ; 'গোপ'দের ভূমি—গোপভূম ইত্যাদি।

ধানের নাম ও মাছের নাম সম্পর্কে তাঁর সংগ্রহ ও তাৎপর্য-ব্যাখ্যা নূতনত্বের দাবি রাখে। "নি মুড়ো দাগা"-বিষয়ে তাঁর গবেষণা বিস্ময়াবহ। 'পীঠস্থান' সম্পর্কে আলোচনাটি আরও ব্যাপক এবং তুলনামূলক হলে ভালো হ'ত। 'দীপান্বিতা', 'রাঙ্গুরুজি', 'সহেরা', 'বাহা পরব' সম্পর্কে তিনি সাধ্যমতো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনাটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আরও খুঁটিনাটি সন্ধান ও ব্যাপক অধ্যয়ন-সাপেক্ষে করা হলে প্রতিভার 'গৃহিণী-পনা' প্রকাশ পেত। সন্তানঘটিত সংস্কারগুলির আলোচনা সুন্দর, কিন্তু অপূর্ণ। ধর্মকর্ম-সম্পর্কে যে-সকল তথ্য তিনি বীরভূমের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন তা অভিনব এবং জানপদ সংস্কৃতির মর্মপ্রকাশক।

ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মদৈত্য এবং গোঁসাই-পূজার প্রদত্ত বিবরণে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলী (পৃ ৩৭) আরো বস্তুনিষ্ঠ হলে ভালো হ'ত। একদা আমি বলেছিলাম,—"কিন্তু বৌদ্ধবিহার বিধ্বস্ত হলেও, বৌদ্ধধর্মের অশরীরী ধারার নির্বাণ ঘটেনি। এখানকার একটি গ্রাম-দেবতার বিবর্তন লক্ষ করে, আর অজয় উপত্যকার এই অঞ্চলে বর্তমানের ধর্মীয় রূপান্তর প্রত্যক্ষ ক'রে আমরা অন্ততঃ এর কিছু আভাস পেতে পারি।

গ্রাম-দেবতা বলতে আমরা কি বুঝি? ভক্তের চোখে যাই বোঝাক না কেন, আমরা বুঝি, এঁরা হচ্ছেন এদেশের যুগ-যুগান্তরের সামাজিক সমুদ্রমন্থনের মৌন সাক্ষী আর সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের মূর্ত প্রতীক। দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে চাইলে, প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেকটি গ্রামদেবতার পুর্ণ-বিবরণ সংগ্রহ করা প্রাথমিক কর্তব্য। দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধারক মানুষগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে, তাঁদের দিনচর্যা ও আচার-বিচারের বিধি-নিষেধ যা আছে সে-সব লিপিবদ্ধ ক'রে নেওয়া।

পাঁড়ুকের পাশের গ্রাম রামনগরে একটি ঠাকুরের পূজা হয় দেখে এসেছি—নাম "সন্ন্যাসী ঠাকুর"। সে-দেবতার কোনও মূর্তি নাই। ঝোপঝাড়ে-ভরা একটি উঁচু 'ডাঙ্গায়' দেবতা "সন্ন্যাসী ঠাকুরের" আস্তানা। আমরা পূর্বে এঁকে ধর্মঠাকুরের বা সত্যপীরের রূপান্তর বলে মনে করেছিলুম। এখন মনে হচ্ছে, ইনি বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ছায়ারূপ হতে পারেন ; এবং সে বৌদ্ধ "সন্ন্যাসী ঠাকুর" অবশ্যই অবস্থান করতেন বিধ্বস্ত স্থানীয় বৌদ্ধ-বিহারে।

মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী, কাষায়বস্ত্রপরিহিত যে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী একদা এই বৌদ্ধ-বিহারে ধ্যানাসীন থাকতেন, বুদ্ধ-বীজ উচ্চারণ করতে করতে জনপদে বিচরণ করতেন, আবার সুযোগ বুঝে, গৃহস্থের বয়স্থা কন্যা কুমারীকে অপহরণ ক'রে ভিক্ষুণী করবার জন্যে সচেষ্ট হতেন —সে-কালের সেই ভক্তি শ্রদ্ধা ও আতঙ্কের প্রতিমূর্তিসমূহই ভোল বদল ক'রে, এ-কালে দেবতারূপে আঞ্চলিক প্রান্তের বনে জঙ্গলে, ডাঙ্গায় ডহরে, অশরীরী মূর্তিতে জনগণের পূজা আদায় করছেন—তাতে সন্দেহের কিছু নাই।

পক্ষান্তরে, এই অজয়-উপত্যকায় 'ভেক'ধারী আউল বাউল দরবেশ সাঁইয়ের বিশেষ

প্রাদুর্ভাব যা' দেখা যাচ্ছে, তাতে হয়তো-বা তর্কী-দাহনে ভস্মীভূত সেই 'ভৈক্ষ' বা 'ভেক'-ধারী অহিংসাবাদীদেরই পরম্পরা ছড়িয়ে রয়েছে। পুরাতন দেবগণ নতুন রূপে আজও যেন "অজানা মনের মানুষের সন্ধানে" হাটে বাটে নেচে গেয়ে ফিরছেন।"—(অমৃতবার্তা, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ৯-১০)।

উত্তর রাঢ়ের নদীতীরবর্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর মিত্র যে-সকল ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই সূত্রে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে, স্তরে স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু-গুলির স্থানীয় ঐতিহ্যসম্মত অনুশীলন করা হলে, বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাসের অনেক-গুলি অধ্যায়ই নতুন করে লেখবার প্রয়োজন দেখা দেবে—সে-বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। তবে, কেবলমাত্র বীরভূম জেলার নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহই প্রত্নসমৃদ্ধ নয়; দামোদর, রত্নান্, মুণ্ডেশ্বরী, দারকেশ্বর, আমোদর, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি অতি পুরাতন নদীগুলির তীরবর্তী স্তূপাবলী খনন ও যথাযোগ্য অনুশীলন করা হলেও বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহের ওপর নব নব আলোকসম্পাত সম্ভবপর হবে।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে ডক্টর মিত্রের কথাই ঠিক্। নানা ধর্ম-বিশ্বাসের সমবায়ে ধর্মঠাকুরের উদ্ভব। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধর্মঠাকুরের যক্ষ শূলপণি 'ব্যন্তর'-রূপের কাহিনী জৈনাগম কল্পসূত্রের টীকাতে রয়েছে। শুভচিন্তার ফলে একটি মৃত গোরুর রূপান্তর হলেন 'শূলপাণি'। যাই হোক্, ডক্টর মিত্রের মতো ব্যাপক অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে রাঢ়ভূমির প্রত্যেকটি জেলার তথ্যাবলী সংগৃহীত না হলে এবং তার সঙ্গে বহির্বঙ্গীয় তথ্যনিচয়ের তুলনামূলক আলোচনা না-করলে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-সম্পর্কে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না। ধর্মঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ উদ্ধার করতে চাইলে সমগ্র রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের ধর্মপূজানুষ্ঠানের বিবরণ তন্ন তন্ন ক'রে সংগ্রহ করা প্রাথমিক কর্তব্য। নাথ-ধর্মের কথা ভুললে চলবে না। প্রভু জগন্নাথের কথাও ভালোভাবে খেয়ালে রাখতে হবে। জৈন-ধর্মের সঙ্গে এ-সবের জটিল যোগ রয়েছে।

ধর্মঠাকুর শস্যদেবতা কিনা, বৌদ্ধদেবতা কিনা, আর্য বা অস্ট্রিক দেবতা কিনা, Rain-charm বা Sun Stone-এর বিবর্তন কিনা, অথবা, এ-সবের সমবায়ে উদ্ভূত—সে-সমস্ত বিবরণ একত্র ক'রে পর্যালোচনা না-করলে "কুলো-মুলো-থাম" বলে হাতির স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তবে এটা ঠিক্, এই পূজা ভারতীয় একটি আদিমতম সংস্কারের বিবর্তন। উত্তর ভারতের নানা ধর্মপ্রবাহও কালক্রমে এসে এই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একে পুষ্ট করেছে। প্রসঙ্গতঃ, ডক্টর হজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর 'কবীর' গ্রন্থে সংকলিত "নিরংজন কৌন্ হৈ" প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

বহু শতাব্দ ধরে ধর্মঠাকুর-পূজার মূল প্রবাহে ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় প্রাচীন ও অর্বাচীন নানা ধর্মবিশ্বাসের উপনদী এসে মিলেমিশে একে পরিপুষ্ট ও জটিল করেছে। সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম এই ধারাটির সঙ্গে পূর্বভারতে বিবর্তিত বৌদ্ধ এবং বিশেষ করে জৈন-ধারারও একান্ত সমাবেশ ঘটেছে। হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের

আওতা থেকেও এ বিমুক্ত নয়। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য থেকে ঔপনিষদ্ ভাববাদের রসে এই গ্রাম-দেবতাটিকে আচারবহুল পূজার মাধ্যমে সঞ্জীবিত করে অদ্যাবধি টিকিয়ে রেখেছে।

রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে একদা আমি বলেছি,—"ওরাওঁ-দের 'ধর্মে'-পূজা লক্ষণীয় ব্যাপার। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি যে 'ধর্মে' বা ধর্মদেবতার পূজা করেন, ভগবানের সেই নাম বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত। তাঁহার মতে, বিহার হইতে এই 'ধর্মে' নামটি আসিয়াছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বুদ্ধদেবের 'ধর্ম' নাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাম্প্রতিক আবিষ্কার মাত্র। পক্ষান্তরে, দ্রবিড়-ওরাওঁদের 'ধর্মে'-ঠাকুর—'বিড়িবেলাস' বা নৈরাকার সূর্য-দেবতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সূর্য-ধর্মের পদ্ম ও কূর্ম-পীঠের কল্পনা, নিঃসন্দেহে এদেশের আদিবাসিন্দা দ্রবিড়-কোলদের দান। রাঢ়ীয় ধর্মদেবতাবিশেষের "অনুকূল কোলা" নাম, এই দৃষ্টিতে তাৎপর্যময়। ওরাওঁদের ধর্মে-দেবতার স্ত্রী পার্বতী ও সীতা। শ্বেতছাগ ও শ্বেত-কুক্কুট তাঁহার প্রিয় বলি। মদ, দুধ, আতপ চাউল তাঁহার প্রিয় উপচার। অন্ধ-কুষ্ঠ-ক্ষত নিরাময় করেন ওরাওঁ-মুণ্ডাদের ধর্মঠাকুর। 'হারো' বা 'কচ্ছপ'-কুলের ওরাওঁদের মুণ্ডা-পাহানের পূজায় তাঁহার পরিতুষ্টি। তাঁহার পুরাণ-কাহিনী একদিকে যেমন সুপ্রাচীন তাম্র ও পুরাতন লৌহযুগের লৌহজীবী বা বৈদিক ব্রাত্য অসুর-বিনাশনের স্মৃতিমণ্ডিত, অন্যদিকে, 'দিকৃডাক'-সমেত তাঁহার পূজাপদ্ধতি ও মৌলিক ভাবরূপেও যথেষ্ট ক্রম-বিবর্তন লক্ষিত হয়। এমন-কি, তাহাতে ঔপনিষদ্ প্রতিধ্বনি অতি সুস্পষ্ট।—"বাবা বাবা বাদর হারো ভৈরো, বাবাস্ নামহাই, জিয়ানুম রাদস্ হারো, ভৈরো, বাবাস্ নামহাই কায়ানুম্ রাদস, 'বাবা' 'বাবা' বাদর হারো, ধর্মে বাবাস্ জিয়ানুম্ রাদস্।"—অর্থাৎ হে ভাই, তুমি মুখে ভগবান্‌কে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া থাক; কিন্তু, সেই 'বাবা' তোমার প্রাণের ভিতরেই আছেন, [কূর্মরূপী] "ধর্মে বাবা" তোমার শরীরের ভিতরেই আছেন।—বলা বাহুল্য, এই "ধর্মে বাবা" বুদ্ধদেব কদাচ নহেন। ইনি পরমেশ্বর, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জনক—দীপক বাঘ ও অজগর-নাগ-বাহন আদিদেব ধর্মদেবতা। পক্ষধর ঘোড়া, মহিষ, বাঘ, সাপ, মশা, শ্বেতমাছি পরিবৃত, "নওয়া-চৈতি"-পূজায় পরিতৃপ্ত, ধানচাষী শিব-ধর্মের স্বরূপ রাঢ়ীয় কোল-দ্রবিড় সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে। ইহাতে [কেবল] 'বোধি-ধর্মের' প্রলেপ-লেপন, কল্পনাবিলাসমাত্র।—(পুঁথি-পরিচয়, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৯, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)।

মুদ্রিত 'ধর্মপূজাবিধান' ও 'ধর্মপুরাণ'-গ্রন্থমালায় ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-সম্পর্কে যে-সকল প্রকাশ্য ও সংগুপ্ত ইঙ্গিত রয়েছে, বা শাসনদেবতাসমেত ধর্মঠাকুরের পুজা-পদ্ধতিতে যে-সমস্ত পুরাতন রীতি-নীতির বিধি-বিধান দেওয়া রয়েছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে সুদীর্ঘ শতাব্দ কালের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পরম্পরার ইঙ্গিতবাহী। অপভ্রষ্ট ভাষার খোলস ছাড়িয়ে সে-গুলিকে ধৈর্য-সহকারে পাঠ ক'রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা উচিত। এ ছাড়া, ধর্মঠাকুরের পুজা-পদ্ধতি, পুরাণ-কাহিনী এবং ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যের অপ্রকাশিত বহু দলিল-দস্তাবেজ এখনও পাণ্ডুলিপির আকারেই রয়ে গেছে। সেগুলি নিবিষ্ট মনে পাঠ করে বুঝতে চেষ্টা করলে তা

থেকে এই বিষয়ে অসংখ্য নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এই সকল প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুরাতন পাণ্ডুলিপিগুলি ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-সন্ধানের পক্ষে অপরিত্যাজ্য উপকরণ। ডক্টর মিত্রের সংগৃহীত বহু তথ্যের এবং তথ্যঘটিত সমস্যার সমাধান এই সকল প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে বিধৃত রয়েছে। ডক্টর মিত্র স্বয়ং তাঁর সংগৃহীত ও আলোচিত তথ্যাবলী এই সকল গ্রন্থের নিকষে কসে কাজ ক'রে গেলে সারস্বত-সমাজে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন।

ডক্টর মিত্র ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যে-সকল ক্রিয়াকাণ্ডের আচার-আচরণ সংগ্রহ ও আলোচনা করেছেন সে-সকল তথ্য ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে অপরিহার্য। কিন্তু, এই সকল আচার-আচরণের অধিকাংশই বিভিন্ন জেলায় একই রূপে অথবা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত আছে। সেগুলিরও অনুরূপভাবে সন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ হওয়া উচিত। তার ফলেই তুলনামূলক বিচারে ধর্মঠাকুরের চূড়ান্ত স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভবপর হবে।

ভারতের পূর্ব প্রত্যন্তে ধর্মঠাকুর-পূজার বিবর্তনে ডক্টর মিত্র জৈন ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেননি। এ-যাবৎ এই দিক্‌টি নিয়ে কেউই তেমন কোনো অনুশীলন করেননি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় "জৈনধর্ম ও বঙ্গদেশ"-প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালে তথ্যবহুল যে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশ করেছেন তাতে নতুন পথের ইঙ্গিত আছে। বাংলাদেশের ইতিহাস-গ্রন্থে জৈনধর্ম সম্পর্কে অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন,—"জৈনগণের দ্বারায় অনুপ্রাণিত সাহিত্য বঙ্গভাষায় উপলব্ধ হয় নাই।"—কিন্তু, এ-কথা সর্বাংশে স্বীকার করায় অসুবিধা আছে।

লাঢ় বা রাঢ়দেশের বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে জৈনধর্মের বিশেষ প্রচার হয়েছিল। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বজ্রভূমির "অস্থিক বর্ধমানে" ও "স্বস্তিক বর্ধমানে" বহু বর্ষ যাপন করেছিলেন। 'জংভয়'-অসুরের আনুকূল্যে তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। 'তাড়'-পিশাচকে নিধন করে তিনি মোহমুক্ত হয়েছিলেন। ব্যন্তর যক্ষ 'শূলপানি' ধর্মকে বশীভূত করে চম্পা-বর্ধমানে তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন। মহাবীর-প্রচারিত জৈন-ধর্ম তখন এদেশের, বিশেষতঃ রাঢ়দেশের প্রাক্‌ব্রাহ্মণ্য আর্য ও বণিক্‌সমাজে ওতপ্রোত হয়ে মিশে গিয়েছিল। ফলে, বঙ্গ-ভাষায় পুরাতন ধর্ম ও মনসা-সাহিত্যে জৈন-ধর্মের প্রভূত প্রভাব লক্ষ করা দুঃখসাধ্য নয়।

রাঢ়দেশে সংকলিত ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কথায় জৈন-পুরাণ যে-ভাবে মিশে রয়েছে, কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ ক'রে তা দেখাচ্ছি। কোন্ ধর্মে কার প্রভাব কতখানি সে-পরিমাপ না-করেও বলা যেতে পারে, প্রাতিকূল্য ও আনুকূল্যের মাধ্যমে বিভিন্ন পুরাতন ও নতুন ধর্মে সংঘর্ষ ও সমন্বয় ঘটে থাকে। যেমন, ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী কমঠ ও ধরণেন্দ্র সর্প অর্থাৎ কূর্ম-ধর্ম, কমঠাসুর হয়ে জিন-ধর্মের প্রবর্তক পার্শ্বনাথের প্রথমে ছিলেন প্রতিকূল; পরে, অনুকূল হয়ে তাঁর ফণাধারী সর্প-লাঞ্ছন হয়েছিলেন। মহাভারতে রয়েছে—চম্পকতীর্থে একরাত্রি বাস করলে সহস্র গো-দানের ফললাভ হয়। এই আশ্বাসের সূত্রটি জিন মহাবীরের জীবন-চরিতে যক্ষ 'শূলপানি'র উৎপত্তি-কাহিনীর মধ্যে এবং ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কথায় ধর্মঠাকুরের মৃত গো-রূপ-ধারণে আশ্চর্যভাবে

প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। বজ্রভূমিতে “ব্যন্তর শূলপানি”-যক্ষের স্বীকৃতি লাভ করে তবেই জিন মহাবীর রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্বাবিংশ তীর্থংকর নেমিনাথ, যোড়শ তীর্থংকর শান্তিনাথ, পঞ্চদশ তীর্থংকর ধর্মনাথ, দশম তীর্থংকর শীতলনাথ প্রমুখ অনেক তীর্থংকরই রাঢ়দেশের বহুস্থলে স্বয়ং ধর্মঠাকুর হয়ে আজও পুজা পেয়ে আসছেন।

এ ছাড়া, অনেকে বলেন, পদ্মপুরাণের বেহুলা-কথা জৈনদের কাছ থেকেই পাওয়া। জৈনদেরও পদ্মপুরাণ আছে। অষ্টম শতাব্দে রবিসেন-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পার্শ্ব-নাথের নিকট পদ্মাবতী-ফণীশ্বরের উপস্থিতির বিবরণ রয়েছে। উপরন্তু, মনসাকাব্যের কেতকা, সনকাদি মূল-চরিত্রসমূহের অনেককেই দেখা যায়, তাঁরা ‘কেতক’, ‘শ্রেণিক’ প্রভৃতি নামে জিন মহাবীরের আত্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন। বাঙ্গালাদেশের মনসা হলেন, ‘শূলপানি’ শিবের কন্যা, জন্ম নিয়েছিলেন ‘পাতালে’ ‘নাগ’-লোকে। মিশরজ্ঞগণ হিন্দু পৌরাণিক ও গ্রীকৃগণের বন্দিত ‘পাতালকে’ বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে থাকেন।

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বীরভূমে ধর্মঠাকুরের পীঠমালার বিবরণ, কিংবদন্তী, প্রবাদ ও কাহিনী, অলৌকিক তত্ত্ব, ধর্মসাহিত্যের শ্লোক, পাঁচালী, ছড়া, গাজনের গান, ধ্যান-মন্ত্রাদি সংকলিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অনুষ্ঠানাদির পরিচয় এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ধর্মপূজার ও গাজনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি একদিকে যেমন নব নব তথ্যসমৃদ্ধ, অপর-দিকে তেমনি তুলনামূলক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ডক্টর মিত্রের আদর্শ অনুসরণ ক’রে বিভিন্ন জেলার প্রত্যেকটি গ্রামে এইভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে, তথ্যসমূহ সমাহরণ ক’রে সেগুলি সযত্নে প্রকাশ করা উচিত। তারপরে, জেলাভিত্তিক তথ্যগুলি একত্র করে তুলনামূলক আলোচনা করা হলে তার ফলেই রাঢ়ীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ-স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভবপর হবে। সেই অনুশীলনে রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত-অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গরিষ্ঠ-তথ্যাবলী-সম্বলিত ডক্টর মিত্রের এই গবেষণা-গ্রন্থখানির গুরুত্ব অসাধারণ বলে প্রতিপন্ন হতে থাকবে।

পরিশেষে বলি, স্বদেশপ্রীতির প্রেরণায় তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা-কর্ম ডক্টর শ্রীমান্ অমলেন্দু মিত্রের কুলব্রত। সেই ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁর মেজাজ অকপট এবং দৃষ্টিভঙ্গি সত্যসন্ধানী। স্বদেশপ্রেম তাঁর মজ্জায় মজ্জায় বিজড়িত। অদম্য অধ্যবসায়ে এবং একক আয়োজনে বীরভূম জেলার গ্রামে-গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ ক’রে এরূপ মৌলিক এবং অভিনব তথ্যসম্ভার শিক্ষিত-সমাজের গোচরে উপস্থাপিত করায় গুরুগৌরবধন্য শ্রীমিত্র তাঁর স্বদেশবাসী প্রত্যেকেরই অকুণ্ঠ সাধুবাদ-লাভের যোগ্য। তাঁর অনুশীলন একখানি সুন্দর গ্রন্থাকারে সংকলিত ও প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীমান্ মিত্র এবং গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পল্লীশ্রী, রতনপল্লী,
শান্তিনিকেতন,
২৭/৫/১৯৭১

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
রীডার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

পাতাডাঙ্গা গ্রামে (রাজনগর থানায়)
ব্রহ্মচারী পীঠ
(পৃঃ ৩৬, ২৩০)

বারুইপুর (ইলামবাজার থানা)
গ্রামে সিদ্ধেশ্বর ধর্ম্মঠাকুরের ঘোড়া
(পৃঃ ১৭৭)

বারুইপুর (ইলামবাজার)
লাউসেন পুজিত সিদ্ধেশ্বর ঠাকুরের মন্দির
(পৃঃ ১৭৭)

ধর্ম্মের গাজনোৎসবে ঘোড়ার সাজ
পরে নৃত্য—(সিউড়ী)
(পৃঃ ১৬৬, ১৮২)

লম্বোদরপুর (সিউড়ী থানা) গ্রামে ধর্ম্মভক্ত্যা
হাতে বেতের ছড়ি, বাণেশ্বর, গলায় উত্তরীয় ও মালা
(পৃঃ ২১৬)

সিউড়ী থানায় কচুজোড়ের রাজরাজেশ্বরী কালী ধাতুনির্মিত।
আড়াইশত বৎসর পূর্বে রাজা রুদ্রাচরণ রায় কর্তৃক পূজিতা।
(পৃঃ ২২২)

ধর্ম্মপীঠ ও বিভিন্ন আবরণ দেবদেবী
গ্রাম—কুলেড়া (সিউড়ী)
(পৃঃ ১২০)

রাইপুরে (সিউড়ী) ধর্ম্মস্থানে
মনসামূর্তি
(পৃঃ ২১৮)
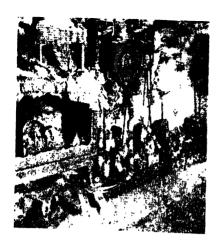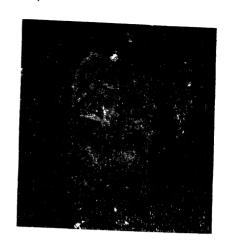
চামুণ্ডার মুখোশ—গ্রাম কামারহাটি
(থানা—ময়ূরেশ্বর)
(পৃঃ ১৬০)

বাঘরাইচণ্ডীর পীঠ
কামালপুর (সিউড়ী)
(পৃঃ ৩৪)
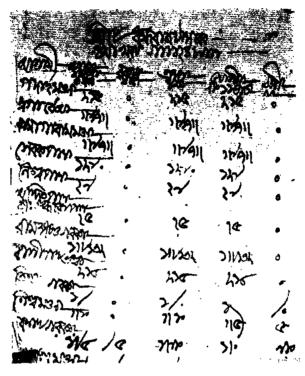
বাং ১২৪৮ সালের ধর্ম্মপূজার জমাখরচ হিসাবের একটি পৃষ্ঠা
গ্রাম কুমারপুর (ময়ূরেশ্বর থানা)

(পৃঃ ২১৬)

শ্রীনবকিশোর হাজরা, এম-এ, বি-টি মহাশয়ের সৌজন্যে

লম্বোদরপুর গ্রামে (সিউড়ী থানা) ধর্ম্মভক্ত্যার

সিউড়ী থানায় কচুজোড় গ্রামে কালীর
নিকট ধর্ম্মঠাকুর ও ভৈরব
(পৃঃ ৬৮, ২১২)
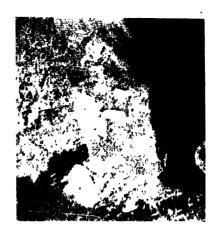
কোমা গ্রামে (সিউড়ী থানা)
হস্তিনী ও ঘোটকের মৈথুর মূর্তি, ষষ্ঠীতলা
(পৃষ্ঠা ৮৪, ১৯৯)

ধর্ম্মঠাকুরের দেয়াশী
গ্রাম কুলেড়া (সিউড়ী থানা)
(পৃঃ ১২০)

সাঁইথিয়া থানায় কুনুড়ী গ্রামে বৌদ্ধস্তূপের
অনুকরণে ধর্ম্মঠাকুর, ব্রহ্মচারী ও
গোসাঁই পীঠের নমুনা
(পৃঃ ৩৮, ১১৮)
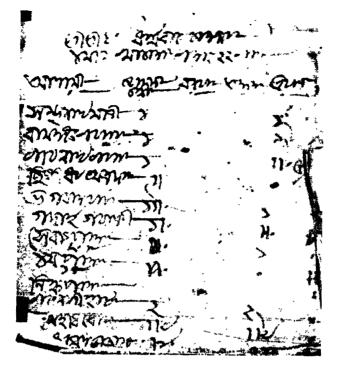
বাং ১২২২ সালের ধর্ম্মপূজার জমাখরচ হিসাবের একটি পৃষ্ঠা
গ্রাম – কুমারপুর (ময়ূরেশ্বর থানা)
নবকিশোর হাজরা, এম-এ, বি-টি মহাশয়ের সৌজন্যে

ঘুরিষা (ইলামবাজার থানা) গ্রামে ধর্ম্মঠাকুর
ষষ্ঠী, শীতলা ও মনসা
(পৃঃ ৭৪, ১৭৫)

ইলামবাজার থানায়
পায়ের গ্রামের বিচিত্র ধর্ম্মঘোড়া

সিউড়ীর ধর্ম্মরাজ পূজোয় পুতুল
(সাবিত্রী-যমরাজ)
(পৃঃ ৯৮, ১৭৭)

ভাঁড়াল নড়ানো অনুষ্ঠান

সাঁইথিয়ায় একটি ধর্ম্মপীঠ
(পৃঃ ১০৪)

গোয়ালপাড়ায় ধর্ম্মপূজায় শত শত
ঢাকবাদ্যের সমারোহ
(পৃঃ ১৮৫)
আলোক চিত্র—শ্রীধীরেন দাস

গোয়ালপাড়ায় ধর্ম্মপূজায় শূকরের ছিন্ন-
শীর্ষ বাজভাঁড়ালে পুরে জলে
ভাসানোর দৃশ্য
(পৃঃ ১৮৫)
আলোক চিত্র—শ্রীধীরেন দাস

দা-বাণ আরোহী ভক্ত্যা
(পৃষ্ঠা ১২৯)
(শিল্পী—শ্রীঅরূপ চৌধুরী)
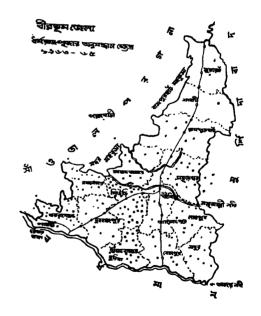
(সিউড়ী) রাইপুর (মল্লিকপুর অঞ্চল) বুড়োরাজ
কূর্ম্মমূর্তি ধর্ম্মরাজ (পৃষ্ঠে অঙ্কিত চরণচিহ্ন)
(পৃঃ ৬১, ২১৮)

ধর্ম্মঠাকুর ও ভাঁড়াল মাথায় শোভাযাত্রা
(শিল্পী—শ্রীঅরূপ চৌধুরী)

বীরসিংহপুর (সিউড়ী থানায়) গ্রামে
মগধেশ্বরী কালীমন্দিরের কোণে
ধর্ম্মঠাকুর, মনসা ও শীতলা
(পৃঃ ২১৯)

(সিউড়ী) কালিপুর গ্রামের ধর্ম্মভক্ত্যারা
হস্তিপৃষ্ঠে ধর্ম্মঠাকুর
(পৃঃ ২২২)

বড়রা (খয়রাশোল) গ্রামের ধর্ম্মস্থান
(পৃঃ ১৮০)

ইলামবাজার থানায় কড্ডাং গ্রামে
আদিরাক্ষ ধর্ম্মঠাকুর
(পৃঃ ১৮৬)

মনসা পূজায় শোভাযাত্রা—সিউড়ী
(পৃঃ ২১৪)

(সিউড়ী) কোমাগ্রামে ধর্ম্ম দেয়াশী
কাঁধে ধর্ম্মঘোড়া ও প্রস্তর নির্মিত হনুমান মূর্তি
(পৃঃ ১১১)
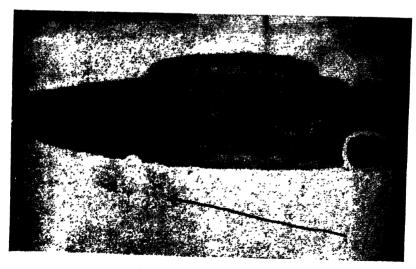
সাঁইথিয়া থানায় কুমুড়ী গ্রামে
আখের শালে উনুনের ধারে লিঙ্গাকৃতি ধর্ম্মঠাকুর
(পৃঃ ৯৮)

প্রথম অধ্যায়

রাঢ়ের সংস্কৃতি

রাঢ়ভূমি তথা পশ্চিমবঙ্গ আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই অঞ্চলে ভারতের সম্ভবতঃ সবচেয়ে পুরাতন বসতি ছিল এবং উত্তর ভারতে সভ্যতার গর্বে গর্বিত আর্যেরা যখন তাঁদের সভ্যতা বিস্তার করে চলেছেন তখন এই অঞ্চল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। লিখিত তেমন কোনো সাক্ষ্য আমরা পাইনে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস আমাদের নেই। ক্ষিতিমোহন সেন এই সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "বৈদিক যুগে বাংলাদেশের ভাষাকে ও বাংলার সংস্কৃতিকে ছোট করিয়া দেখানো হইয়াছে। বাংলাদেশের লোককে এবং সেখানকার রচনাকে পাখীর কচকচির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বেদোত্তর যুগে বাংলাদেশকে অযজ্ঞীয় বলা হইয়াছে। তীর্থযাত্রা বিনা সে-দেশে গেলে মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সংস্কৃত সাহিত্যে এজন্য বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক গ্লানিকর কথা আছে[১]।" আর্যদের এই আত্মম্ভরিতা আজ সহজেই চূর্ণ করে দেওয়া যায়। ব্রাহ্মণরা বহু চেষ্টা করেছেন আর্যেতর প্রভাব মুছে ফেলার জন্য, কিন্তু সফলকাম হন নি। রাঢ় অঞ্চল সেকালে আর্যেতর (সাঁওতাল, শবর, ওঁরাও যাদের বংশধর) অষ্ট্রিক জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। তাদের ভাষা, আচার, ব্যবহার সংস্কৃতি আজও পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের জীবনে ও সামাজিক আচারে দৃঢ়-মূল হয়ে আছে। ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বলেছেন; "টোটেম বা কুলকেতুর পূজা সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান ঝাড়ফুঁক, খাদ্যসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার টাবু বা ধর্মগত বাধানিষেধ পদ্ধতিতে বিশ্বাস—এইসব বিষয়ের প্রভাব ভারতবাসীর জীবনে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বেশীর ভাগই আদি অষ্ট্রালয়েড জাতি প্রচলিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়[২]"। বলা বাহুল্য ডঃ গুহের এই মত যে যথার্থ তা একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যায়।

সারা পশ্চিমবাংলায় কয়েক লক্ষ গ্রামের নাম আছে যাদের অনেকেরই আর্য শব্দতত্ত্বে কোনো অর্থ হয় না। কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা এবং উপভাষাতে তাদের কিছু কিছু অর্থ থাকলেও অনেকেরই অর্থ মেলে না। অথচ ঐ নামগুলির মানে নিশ্চয়ই এককালে ছিল। হয়ত অনেক উপভাষা কালের বুকে বিলীন হয়ে গেছে। আমরা মুণ্ডারী ভাষার সঙ্গে পরিচিত। এর অভিধানও তৈরী হয়েছে কিন্তু মুণ্ডারী অভিধানে পাওয়া যায় না এমন কতক-

গুলি ভাষাভাষী উপজাতি আজও বাস করে। যেমন ধাঙড জাতি। এরা রাঢ় অঞ্চলেরই অধিবাসী। কোলগোষ্ঠীর এক শাখা। এরা যে ভাষা বলে তার অনেকটাই সাঁওতালরা বোঝে না। উচ্চারণ ও বলবার ধরণও আলাদা। এরা এখন নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ক্রমে ক্রমে হিন্দু সংস্কৃতির আওতায় এসে পড়ছে। ভাষাগত দিক থেকে মুণ্ডা, হো ও সাঁওতালি ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কিন্তু জাতিগত দিক থেকে সাঁওতালরা পৃথক জাতি। মুণ্ডা ও কোলদের সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট মিল আছে। জীবন্ত ভাষার যা ধর্ম—নানা ভাষা থেকে শব্দসম্ভার আত্মসাৎ করা—মুণ্ডারী ভাষাগুলি তা করেছে। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এমন কি ইংরাজী শব্দ পর্যন্ত আধুনিক মুণ্ডারী ভাষায় বর্তমান। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন : "We found reasonable ground to conjecture that the Aryan invaders of India had come in contact with the Santals or a cognate race in primitive times and mentioned that the Prakrit, a very early form of vernacular Sanskrit, had adopted pure Santali terms[৩]."

সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কিত বিরাট পটভূমিকায় সবকিছু নিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ তবু সাধ্যমত আভাষ ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করব—

রাঢ় : "রাঢ়" কথাটিই প্রথম ধরছি। এই শব্দটি নিয়ে বহু সমস্যা ও তর্ক। নামটি বেশ প্রাচীন। অভিধানে সংস্কৃত শব্দ বলে চিহ্নিত করা আছে। গ্রীকরা এই নাম সম্ভবতঃ প্রথম ব্যবহার করে থাকবে। ভার্জিলের জর্জিকাশ কাব্যে "গঙ্গারিঢ়ি" নাম পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্তে "লাড়" বলা হয়েছে। সংস্কৃত "রাঢ়" শব্দ প্রাকৃতে 'লাড়' হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাঢ় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—"কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়" (চণ্ডীমঙ্গল) হিন্দী, গুজরাটি, মৈথিলী ও মরাঠী ভাষাতেও শব্দটির অর্থ, অসভ্য বা নীচ। বর্তমান গ্রামাঞ্চলে রাঢ় শব্দের কোনো ব্যবহার নেই কিন্তু সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে "রাঢ়" শব্দের অর্থে চুয়াড় বা অস্পৃশ্য এখনও বোঝায় এবং কথ্য বাংলা ভাষায় শব্দটির বহুল ব্যবহার আছে। (যেমন "ওমা, রাঢ়ে ছুঁয়ে দিলে"।) সাঁওতালি ভাষায় ধ্বনিগত দিক থেকে এই শব্দটির অনেকগুলি অর্থ হয়। যেমন লার=সুতো, লাড়=সাপ, রাঢ়=সুর। শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলভূমি ছিল এই অঞ্চল। বোধ হয় "লাড়" অর্থ সাপ—এই মূল অষ্ট্রিক শব্দটি জৈন ও গ্রীকরা গ্রহণ করে থাকবেন। বীরভূমের সাঁইথিয়া থানায় রাঢ়কুণ্ড বা রাঢ়খেন্দ নামে একটি গ্রাম এখনও আছে। কি অর্থে কতদিন আগে এই নামটি সৃষ্টি হয়েছে তা সহসা বলা শক্ত। বর্ধমানের কান্দরায় রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গা নামে আর একটি জায়গা আছে। বীরভূম সীমান্তে অজয়ের তীরে শ্যামারূপার গড়ের নিকটে রাঢ়েশ্বর শিব বিরাজ করছেন। নিকটে আর একটি আড়া (অর্থাৎ রাঢ়া সম্ভবতঃ) নামে আর একটি গ্রাম বর্তমান। কৃষ্ণমিশ্র রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেও রাঢাপুরীর নাম পাওয়া যায়।

বির ও মান : বীরভূমের ও মানভূমের বির ও মান এই দুটি শব্দ মুণ্ডারী ভাষায় আছে। "বির" মানে জঙ্গল এবং "মান" শব্দের অর্থ, গ্রামের প্রধানরা যে জমি নিষ্কর ভোগ

করত। "মান-বির" নামে জঙ্গলের নামও পাওয়া যায়। (এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে 'মান' শব্দটি বড়ই গোলমেলে। বিশ্বের বহু ভাষায় শব্দটি পাওয়া যায়)।

অষ্ট্রিক ধান : "দুবরাজপুর" নামে অনেকগুলি গ্রামের নাম রাঢ় অঞ্চলে পাওয়া যায়। সাঁওতালি ভাষায় দুবরাজ (<দুরোজ) একরকম ধানের নাম। এরকম বহু ধানের নাম অষ্ট্রিক শব্দভাণ্ডারে পাওয়া যায় এবং ঐসব নামে অনেক গ্রামের নামও নিষ্পন্ন হয়েছে। যেমন—বাদ, বাজোল, নরদা, গুড়গুড়ি, সুকুই, নাগি, বালাম, বুট, বুটমারি, বিরমশাল, বিরুটি, দাহিয়া, দাসরি, ডগরাশাল, গজালিয়া, গরাই, গুয়াতুফি, হালনি, মাকামসি, নণ্ড, লওয়ালি, কামানি, সুনী, সালকয়া, নানহা, ঝিঙেশাল, দল বা দাল (wild rice), ভাসা। আর একটি ধানের নাম হল লোটন ("বঙ্গীয় শব্দকোষে" শব্দটিকে সংস্কৃত বলা হয়েছে, কিন্তু অন্য অর্থে)। এখানে প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে লোটনষষ্ঠীর পুজার কথা। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, ষাট দিনে উৎপন্ন ষেটেরা ধান (ব্রীহি) থেকে ষষ্ঠী পুজার উদ্ভব[৪]। এই সিদ্ধান্ত সত্য হলে লোটন ধান থেকে লোটনষষ্ঠী পরিকল্পিত হয়েছে স্বীকার করতে হবে।

অষ্ট্রিক মাছ : রাঢ়ের নানাপ্রকার মাছের নাম থেকেও গ্রাম বা স্থান নাম নিষ্পন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ হিসাব কষা শক্ত। এখানে সামান্য কিছু উল্লেখ করছি—দাঁড়কা (স্থান), ঘুরষে (স্থান), কাঁই, খলসে (স্থান), পুঁয়ে, গড়ুই, বালকড়া, লুড়কুচি, ভেদা, ডুমির (স্থান), চ্যাচকো, ছোয়া চিমুড়ী, রাইখড়া, ভানকিনা (স্থান), পাঙ্গাশ (স্থান), বাইটকা, ভরুঙ্গা, ঘুনে (জাতি), খরশল্লা (স্থান), রয়না (গ্রাম) ইত্যাদি। এ তো ক্ষুদ্র হিসাব। কিন্তু হাজার হাজার মৌজা ও গ্রাম-নামের কোনো অর্থই হয় না। কোন্ আদিম ভাষার চিহ্ন ওদের মধ্যে টিকে আছে জানিনে। কয়েকটি উদাহরণ—রেঙ্গনা, কড্ডে, সাঁইথে, কুরুলিয়া, ভাড্ডি, সাড্ডি, ঝিরুল, কোয়ান্দা, ঠিবা, সারুর, ঘোন্দা, মস্তুলা, ঝাসরা, সেকেড্ডা, নেটুরী, লেবরা, গনডা, ঝোড়, বুদুর, তাড়াচি, উস্কা, নেতুর, তাংড়ি, গুগা, খরুণ, বেপুন, বুজুঙ্গ, কিচাই, হেরুয়া, উখা, ভোনরা, দোডাহা, ডোংরা, মোড্ডা, পেঙ্গা, গিধিলা, কোলরা, মসড্ডা, এণ্ডা, আম্ভা ইত্যাদি। কতকগুলি গ্রামের নামের তাৎপর্য আদিম ভাষা থেকে পাওয়া যায়। যেমন—'শাল' শব্দের যোগে বহু গ্রাম আছে। 'শাল' বলা হয় আখমাড়াই ও গুড় তৈরীর জায়গাটিকে। সাঁওতালি ভাষায় শাল মানেই গুড়। 'দমদম' কথার অর্থ ঘন। বাঁশের ঝাড় বা মাথার চুলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। "ভুতুড়া"=ভিজে মাটি। "দুমকা"=ছোট বড় টুকরা। "সাংড়া"=দুটি লোকের কাঁধে বাঁশে কিছু ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া। গড়গড়িয়া=বিবাহ সম্পর্কে দুটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। দামড়া=এঁড়ে বাছুর ইত্যাদি।

কালের প্রভাবে বিচিত্র সংস্কৃতির সংঘাত ও উন্নত ভাষাভাষীর সংস্পর্শে গ্রাম-নাম বদলেছে, বিকৃত হয়েছে। সুতরাং সব নামের অর্থভেদ হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। আর্য ভাষাও নানা মিশ্রণের ফলে কম জটিল হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমারের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"আর্য ভাষাকে যে ক্রমে ক্রমে অনার্য ভাষার কোল দ্রাবিড়ের ছাঁচে ঢেলে নেওয়া হয়, আর্যভাষা ক্রমে ক্রমে যে অনার্যেরই ঘরে জাত দিয়ে বসেছে, তা বুঝতে

দেশী হয় না৫।" আমাদের চলিত ভাষাতেও শত শত অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ মিশে আছে। তাদের রূপান্তরও ঘটেছে। সুতরাং সবগুলিকে চেনা দুষ্কর। আর্যপ্রভাবের ফলে বহু শব্দ সংস্কৃতগন্ধী হয়ে গেছে। যেমন "গঙ্গা" শব্দটি। মুণ্ডারী ভাষায় "গং"। আচার্য সুনীতিকুমার বলেন, "গঙ্গা শব্দটি অষ্ট্রিক শব্দজাত বলে অনুমান হয়৬।" কিন্তু প্রমাণ করা দুষ্কর। তাই সে চেষ্টা না করে খাঁটি দেশী শব্দ, যা কথ্য ভাষায় অপর্যাপ্ত ব্যবহার হয় তারই উদাহরণ দিই— ঢেঁকি, ঢেঙা, ডাং প্রভৃতি দেশী শব্দ বলে বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানে স্থান পাওয়ায় সর্বজন-বিদিত। এগুলি মুণ্ডারী ভাষায় আছে। তাছাড়া মুণ্ডারী ভাষার শব্দ, যা বহুল ব্যবহৃত হয় তার কিছু নমুনা দিচ্ছি—আফর=ধানের চারা, আঞ্জির=পেয়ারা, আঁয়া=প্রকৃত, (পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আঁয়া মিথ্যা কথা বলছে), বাদ=ডাঙ্গা, ডাবু=হাতা, বিরানো=অজানা (গাঁ), ডেঙ্গো=অবিবাহিত লোক (যেমন ডেঙ্গো ডাঙ্গসা লোক), ধাধস=নির্ভয়, (পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন শরীর বইছে না, যেন ধাধসে ঘুরে বেড়াচ্ছে), কুলি=গ্রামের পথ (হিন্দী=কুলি, সং=কুল্যা) যেমন :

> "খোকন আমাদের লক্ষ্মী
> গলায় দেবো তক্তি
> কোমরে দেবো হেলে,
> কুলি কুলি বেড়াবে যেন
> কুনো (কোনো) বড় মানুষের ছেলে।"

চলিত ভাষায় "কুলকুলি" বলা হয়, আহ্লাদে হৈ চৈ করে বেড়ানোকে। হড়পা=জোরে (হড়পা বান), লেড়ো=দুর্বল, লুড়ুং বুড়ুং=অলস (কাজ করার ইচ্ছা নাই, শুধু লুড়ুং বুড়ুং করছে) খুব সম্ভবতঃ কথাটি "নড়বড়" শব্দ থেকে এসেছে। নড়বড় > লড়বড় > লুড়ুং বুড়ুং। আলামরা=নেতিয়ে পড়া, ডোল=বালতি, কুত্=উৎপন্ন ধানের অংশ। ফোরা=ফাঁপা (ফোরা বাঁশ), হাসা=মাটি (হাসা পাথর), ইসবিস=উত্তেজিত হওয়া (ইসবিস কাঁকড়ার বিষ···বাংলা ঝাড়ন মন্ত্র), খালুই=মাছের চুপড়ী, গাদ্দি=একদল (মাছ সংখ্যায় বেশী হলে পুকুরে গাঁদি লাগে অর্থাৎ ভেসে ওঠে), ছিরছাতুর=ছড়িয়ে পড়া, আরি=হাত করাত, শেলেদা=শেলেদা বাঘ (কেঁদো বাঘ), আটন=দেবস্থান, আঁইড়ে বাস=বালিকা বয়স (পরিবর্তিত—ঐ তো আঁইড়ে বাস একটা কোলে, দিনরাত চ্যাঁ চ্যাঁ করছে), ডিগর=অবাধ্য (ভারী ডিগর ছেলে, সারাদিন বাঁদরামো করছে) ইত্যাদি। এসব ছাড়াও আরও কতকগুলি শব্দ উত্তর রাঢ় অঞ্চলে অবিরত ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু সেগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে কিনারা করা যায় না। যেমন উস্কুলি খুস্কুলি (অবিন্যস্ত বেশবাস), ডারপার (দুঃসাহসী), ডিঙ্গলে (মিষ্টি কুমড়ো), ঢাপা (বড়), লণ্ডুরে (উড়নচণ্ডী), ঘ্যাস্‌সড় (নোংরা), জলপটঙ্গা (জলবৎ), ঝুলফুলি (নবজাতকের ছেদিত নাড়ি), সেঁট্‌টেলচিপ্পি (মক্ষীচুষ), আঁধা ধাপুড়ি (আন্দাজে), ডালা (দেখা), বেত (মুখ), ঝলখলি (ঝাল্লাট), গাঁড়র (নিরেট বোকা), আপুসে দেওয়া (মেরে শেষ করে দেওয়া), খাটুলমাটুল (আসনপিঁড়ি হয়ে বসা), মাকড়কুদোমি (হল্লোড়), বিঁজি (ক্ষুদ্র), খিদিবিদি (অস্থির),

একাশি (কাৎ করে ঢালা) ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভাল যে, অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে, অষ্ট্রিক দ্রাবিড়ের মতই মিশর থেকে অপর একটি দলের মানুষ প্রত্নঐতিহাসিক যুগে এদেশে এসেছিল এবং আজ তাদের আর পৃথক কোন সত্তা নেই কিন্তু তাদের সংস্কৃতির ছাপ মুছে যায় নি। সে কারণে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব রাঢ় অঞ্চলে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

আর্য সভ্যতা নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা পরিসীমা নেই। অথচ আর্যরা যা দিয়েছেন তার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল ভাষা ও লিপি। অন্-আর্যদের লিপি নেই—তবে একেবারে কিছু ছিল না বলা চলে না। সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা ছবি আঁকার নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা ছিল। সিন্ধু সভ্যতার শিলমোহরের লিপি পড়া যায় নি। রাঢ় অঞ্চলে পর্যটন করে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে অনুরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন অনগ্রসর সমাজে নানাভাবে বিদ্যমান আছে। আমাদের বিবাহ, ব্রত, পুজা ও নানা তান্ত্রিক তুক্‌তাক ও সাঙ্কেতিক রেখাচিত্রের মধ্যে বহুলাংশে আত্মগোপন করে আছে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

নি-মুড়ো দাগা : আদিম সমাজের মানুষ শিকার ধরবার আশায় গুহাগাত্রে পশুর ছবি এঁকে রাখত। যাতে সেইসব পশু তাদের কাছে এসে তাড়াতাড়ি ধরা দেয়। এই ছবি আঁকার পিছনে ছিল বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ। এই ছবি আঁকার ব্যাপারটি আদিম বিশ্বাস ও তুক্‌তাক্ ছাড়া আর কিছুই নয়। শুনলে আশ্চর্য লাগবে, অনুরূপ একটি কৃত্য আজও রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে টিঁকে আছে। প্রথাটির নাম, নি-মুড়ো দাগা। অর্থাৎ মুণ্ডহীন দেহ আঁকা। কারও গোরু হারালে, সে গোয়ালঘরে কয়লা বা খড়ি দিয়ে মুণ্ডহীন একটি গোরুর ছবি এঁকে ফেলে। বিশ্বাস, এতে গোরুটি যেখানেই থাক, নিজে থেকে ফিরে আসবে। গোরুটি পাওয়া গেলে অসম্পূর্ণ ছবিটি সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ মুণ্ডটি এঁকে সেটি মুছে ফেলতে হয়। এই প্রথার আবার রকম-ফের আছে। কোথাও বা গোরু হারালে গোরুর খুঁটায়(গোঁজ)একটি পিঁড়ি বেঁধে দেবার নিয়ম পালন করা হয়। কোথাও বাড়ীর গিন্নী হারানো গোরুর খুঁটাটিকে বাঁ দিকে তিন পাক ঘুরে, মধ্যম আঙুল দিয়ে তিনটি সিঁদুরের দাগ টানেন, খুঁটার উপর। বিশ্বাস এর ফলে গোরুটি অনিবার্যভাবে তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসে। আবার কেউ গোরু হারালে গোহালের চালে দড়িটিকে তুলে রাখার রীতি পালন করে থাকে। এই রীতিগুলি কোন জাতের মানুষ বয়ে নিয়ে এসেছে, বলা শক্ত। তবে এই সকল উদাহরণের সাহায্যে আধুনিক ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের নেপথ্যে অন্তঃসলিলা আদিম লোকবিশ্বাসের স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। (সাঁওতাল জাতির মধ্যে খোঁজ করে জেনেছি যে গোরু, মহিষ হারানোকে তারা বলে "ডহরু"। ডহরু হলে তারা করে কি, যে কয়দিন প্রাণীটি হারিয়েছে, সে কয়টি পাতা একটি লাঠির আগায় বেঁধে নিকটস্থ হাটে হাজির হয়। একে বলে 'বিটলাহা'। সঙ্গে সঙ্গে লোক জমায়েৎ হয় এবং হারানো প্রাণীটির তল্লাস পাওয়া যায়। এই প্রথাটি অবশ্য বাস্তব বুদ্ধিজাত। এতে যাদুবিশ্বাসের কোনো চিহ্ন নেই)। এই ধরণের (নি-মুড়ো দাগা) সাঙ্কেতিক চিহ্নের আরও দু'একটি উদাহরণ পরে দিচ্ছি। আমাদের সেঁজুতি আলপনার চিত্রগুলির সঙ্গে প্রাচীন মিশরের হাইরোগ্লিফিক লিপি

একেবারে মিলে যায় তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীসুধাংশু কুমার রায় উল্লেখ করেছেন[৭]।

অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি বাইরে থেকে এসেছিল পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন। এখন প্রশ্ন, তাদেরও আগে কারা বাস করত এখানে? কি তাদের আচরণ ছিল? প্রশ্নটি জটিল। কারণ সংস্কৃতি-সংঘাতের দরুণ তা আর আলাদা করবার কোনো উপায় নেই। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সভ্যতার স্বরূপই কি আমরা সহজে চিনে নিতে পারি? সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ তাদের কাছে আমাদের ঋণ যতদূর সম্ভব অস্বীকার করে যাবার চেষ্টা করেছেন। লিখিত গ্রন্থে যা পাওয়া যায়, তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই—এই বিশ্বাসও আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে কার্যকর। কিন্তু সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। একটু চেষ্টা করলেই, যা ছিল তার ছাপ বা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবেই। মানব সমাজই পাথুরে প্রমাণের মত অজস্র চিহ্ন বহন করে নিয়ে চলেছে। 'Custom dies hard' প্রথা বা সংস্কার সহজে লোপ পায় না। তাই আদিম সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলে বর্তমানে আমাদের বয়ে নিয়ে চলা সংস্কার বা প্রথাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তুলনা করতে হবে বিশ্বের অনগ্রসর সমাজের সঙ্গে। তাহলেই বোঝা যাবে, এক ও অখণ্ড মানবজাতি একদা একই রকম ধ্যানধারণা নিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাঢ় অঞ্চল সম্পর্কে লিখিত প্রাচীন ইতিহাস সামান্য যা পাওয়া যায় তা হল বৌদ্ধধর্ম প্রসারের বিবরণ ও পরবর্তীকালে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ। এই দুই যুগের আবিষ্কৃত মূর্তি ও শিলালিপিও কিছু সাক্ষ্য বহন করছে। পরবর্তীকালের বৈষ্ণবতার ভাববন্যার তান্ত্রিকতা ম্লান হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও আদিম সংস্কার আমরা ত্যাগ করতে পারি নি। আমাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লৌকিক দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিতে সেগুলি পর্যাপ্ত পরিমানে টিঁকে আছে।

বৌদ্ধধর্মকে অপসারণের উদ্দেশ্যে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা কি রকম চেষ্টিত হয়েছিল তা লৌকিক দেবদেবীর পূজাপীঠগুলি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেক জায়গায় মাটির নীচে বৌদ্ধমূর্তিগুলিকে পুঁতে ফেলে শিব অথবা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাতেও ক্ষান্ত হন নি তান্ত্রিক সাধকরা। জনমনে বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রামায়ণ-মহাভারতের যাবতীয় উপাখ্যান স্থান বিশেষের উপর আরোপ করে গেছেন। সবগুলি জড়ো করলে মনে হবে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এখানেই ঘটেছে এবং হিন্দুপুরাণের তাবৎ ঘটনার পুণ্যক্ষেত্র এই রাঢ় অঞ্চল তথা পশ্চিমবঙ্গ। (মহাভারত, রঘুবংশ, হর্ষচরিত ইত্যাদি গ্রন্থে অবশ্য সুহ্মদেশের নাম পাওয়া যায়। বীরভূমে সুহ্মেশ্বরী দেবী এবং সুহ্মরায় নামে ধর্ম-ঠাকুরও আছেন। তাহলেও এই সুহ্মদেশ রাঢ় দেশ কিনা প্রমাণ করা শক্ত)। ঐ সমস্ত প্রবাদ কিংবদন্তী-বিলাসীরা মনেপ্রাণে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করে থাকেন। ভাবের ঘোরে ব্যবসায়ী পুরোহিত ও পাণ্ডারাও এই সমস্ত তত্ত্ব প্রচারে পুরুষানুক্রমে লিপ্ত আছেন।

পীঠস্থান: তান্ত্রিক সাধকরা সাধারণ মানুষদের যত রকমভাবে বিভ্রান্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল, রাঢ়ে অসংখ্য পীঠ ও উপপীঠগুলি সম্পর্কে উপাখ্যান সৃষ্টি। সতীর দেহাংশ থেকে এগুলির জন্ম, একথায় আস্থা স্থাপন করার মত কোনো

হেতুই নেই। ভাববাদের বিলাস পরিত্যাগ করে আমরা যদি একটু বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে নজর দেবার চেষ্টা করি তাহলে পীঠস্থানরহস্য পরিষ্কার হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। বারাণসীতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতরত্ন মহাশয়ের চরণপ্রান্তে যাবার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। সে সময় তাঁর নিকট পঞ্চমুণ্ডির আসন, পীঠস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে দিন দুয়েক কিছু বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যা বুঝেছি তা হল রূপকের অন্তরালে তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের যৌগিক ব্যাখ্যা। বাস্তববাদী দৃষ্টিতে সে আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। জটিলতা পরিত্যাগ করে সহজ সাধারণ বুদ্ধিতে জিনিষটিকে আয়ত্তের চেষ্টা করা দরকার।

পীঠস্থানগুলির সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন কালে, যদিও প্রাচীন কোনো দলিলে এগুলির সাক্ষ্য তেমন নেই। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে পীঠস্থান তৈরীর প্রথা খুব আধুনিক নয়। এগুলি সেকালের, যেকালে মানুষের ধ্যানধারণা, বুদ্ধিবৃত্তি সবই ছিল অনুন্নত। মিশর ও ইয়োরোপের বহুস্থানে পীঠস্থানের অনুরূপ বস্তু বিদ্যমান। প্রথম হল, মিশরে আদিম শস্য দেবতা ওসিরিসের মৃতদেহ যাতে শত্রুরা খুঁজে না পায় তার জন্য তাঁর স্ত্রী আইসিস স্বামীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে চারিদিকে কবর দিয়ে রাখেন। তাছাড়া ওসিরিসের জননাঙ্গ মৎস্যকুল ভক্ষণ করেছিল বলে তিনি লিঙ্গ পুজার এবং একটি ষাঁড় বলি দেবারও ব্যবস্থা করেন। (তুলনীয় ভারতীয় শিবলিঙ্গ ও বাহন ষাঁড়)। ঐ ষাঁড়কে অতি পবিত্র বলে গণ্য করা হত। (গ্রীষ্মে ওসিরিসের এবং বর্ষায় আইসিসের বাৎসরিক পুজা উৎসব আমাদের ধর্ম-শিবের গাজন ও মনসাপুজার কৃত্যাবলীর সঙ্গে যথেষ্ট মিল রাখে। এ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে)। জেমস ফ্রেজারের সংগ্রহ থেকে পুর্বোক্ত বিষয়ে আরও কয়েকটি উদাহরণ তাঁরই ভাষায় দিচ্ছি : "In modern Europe the figure of Death is sometimes torn in pieces and the fragments are then buried in the ground to make the crops grow well and in other parts of the world human victims are treated in the same way....According to the story of Romulus the first King of Rome was cut in pieces by the Senators who buried the fragments of him in the ground and the traditional day of his death, the 7th of July was celebrated with certain curious rites, which were apparently connected with the artificial fertilization of the fig.

...In chios men were rent in pieces as a sacrifice Dionysus. The Thracian Orpheus were similarly torn limb from limb. A Norwegian King, Halfdan the Black whose body was cut up and buried in different parts of his Kingdom for the sake of ensuring the fruitfulness of the earth[৮]. আমাদের কন্ধ উপজাতিরাও মনুষ্যদেহ খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রাখত। উদ্দেশ্য জমির উর্বরতা সাধন।

দীপান্বিতা : তাহলে এই যদি হয় আসল ব্যাপার, আমাদের পীঠস্থানগুলির উপর

অকারণ দেবত্ব আরোপ করার সার্থকতা কি! ওসিরিস প্রসঙ্গে আমাদের কালীপুজার রাত্রে দীপান্বিতার কথাও আলোচনা করা যেতে পারে। দেওয়ালী উৎসবের তাৎপর্য সম্পর্কে যত আলোচনাই করা হোক না কেন, কোনোটিই বাস্তব নয়—কাল্পনিক মনগড়া সব তত্ত্ব। ওসিরিসের বার্ষিক মৃত্যু-উৎসব দিনটি পালন সম্পর্কে নানাজনে নানাকথা লিখে গেছেন। প্লুটার্ক লিখেছেন: আইসিসের প্রতিরূপ একটি গোরুকে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হত। তারপর রাত্রিতে হত দীপান্বিতা। এই প্রথা সমগ্র মিশরে প্রতিপালিত হত। "It was a widespread belief that the souls of the dead revisit their old homes in one night of the year*" আলো জ্বালিয়ে তাদের কবর থেকে যাওয়া আসার পথ সুগম করে দেওয়া হয়। (আমাদের আকাশ-প্রদীপ তুলনীয়)। প্লুটার্ক প্রদত্ত সময় অনুসারে এই দিনটি হল ১৩/১৪/১৫-ই নভেম্বর। আমাদেরও কার্তিক বা নভেম্বরে দীপান্বিতা উৎসব হয়ে থাকে এবং গয়ায় পিণ্ডদান না করা পর্যন্ত কালীপুজার রাত্রে প্যাকাটি জ্বেলে পূর্ব-পুরুষদের প্রেতকে আহ্বান জানিয়ে শ্রাদ্ধ করার বিধি হিন্দুসমাজে চলিত আছে। (প্যাকাটির আগুন পুকুরের পানা-পাতা দিয়ে নেভানোর নিয়ম।) তাহলে দেখতে পাচ্ছি আদিবাসীদের আদিম বিশ্বাস উচ্চবর্ণের সমাজ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং দীপান্বিতার অর্থ ঐ এক এবং অদ্বিতীয়।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৃতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের সতীপীঠগুলির মিল অবশ্যই আছে। একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। এককালে যা ছিল লোকবিশ্বাস, তা তান্ত্রিক সাধকদের সুনিপুণ হস্ত-ক্ষেপে কাহিনী-সর্বস্ব পৌরাণিক পরম সত্যে পরিণত হয়েছে। অতএব আমাদের ঘোলাটে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটানো অবিলম্বে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

রাঙ্গুরুজি: মুণ্ডারী জাতির মধ্যে ট্রাইবাল সমাজের চিহ্ন আজও পরিষ্কারভাবে টিকে আছে। এই সমাজের দুটি বিভাগ—পশুজীবী ও শিকারজীবী। এই দুই আদিম বৃত্তিই আমাদের প্রায় সমস্ত ধ্যানধারণা ও কর্মের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সাঁওতালদের মধ্যে প্রাচীন শিকার-জীবী সমাজের চিহ্ন টিঁকে আছে তাদের "রাঙ্গুরুজি" পর্বের মধ্যে। ইনি পশু-শিকারে বাগড়া দেবার অপদেবতা। সমাজের বার্ষিক শিকার যাত্রার প্রাক্কালে বৃক্ষমূলে এই অপদেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্রে তারা বিবস্ত্র হয়ে নৃত্য করে এবং মূত্র ত্যাগ, মূত্র উৎসর্গ ইত্যাদি ঘৃণাকারজনক কাজ করে থাকে। এখন এই প্রথাটি (সর্বত্র নয়) সাঁওতাল বালকরা পালন করে। তার আগে মাঠে ইঁদুরের গর্তে জল পুরে ইঁদুর ধরে এবং পুড়িয়ে খায়। এই প্রথাটি একেবারে আদিম স্তরের। বৃক্ষমূলে বহু অপদেবতার পুজা হিন্দু তপশীল সমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু অনুরূপ ক্রিয়া কোথাও হয় কিনা এখনও সন্ধান পাই নি। হান্টার সাহেব বলেছেন, "The Hindoos have borrowed their household God and its secret rites from the primitive races whom they enslaved, that they have borrowed their village gods with the ghosts and demons that haunt so many trees and finally

that they have borrowed the sanguinary deity (Siva) who is universally adored by the lower orders throughout Bengal."[১০]

সহেরা : সাঁওতালদের একটি পর্বের নাম হোল সহেরা বা বাঁধনা। এটিকে ফসল পোঁতা শেষ হওয়ার পর্বও বলা যায়। হাণ্টার সাহেব একে "জোহরাই" বলেছেন। (অবশ্য অনুসন্ধানে জেনেছি, প্রতিটি সাঁওতাল-গ্রামের বাইরে শালগাছের নীচে একটি জাহের থান থাকে। জাহের অর্থে, প্রণাম। সেখানে তাদের বছরে দু'বার উৎসব হয়)। এই পর্বে গোরুর পুজা হয় বলে গোঠ পুজাও বলে। (হিন্দুদের গোষ্ঠকে কোনো কোনো অঞ্চলের সাঁওতালরা বলে, "গুপী পরব")। সোহেরার প্রথম দিনে গ্রামের সমস্ত গোরুগুলিকে একত্র জড় করে সামনে একটি ডিম রেখে তাড়ানো হয়। যে গোরুটি ডিমটি মাড়িয়ে চলে যাবে অথবা গিয়ে শুঁকবে, সেটিকে বলা হবে 'গোঠ্ গাই'। ঐ গোরুটিকে বিশেষ খাতির করে শিং-এ তেল মাখানো হবে। দ্বিতীয় দিনে গোরুর পুজা হয়ে থাকে। এদিন ধানের আঁটি দিয়ে মালার মত করে গোরুর গলায় বা শিং-এ পরিয়ে দেবার নিয়ম। রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে গোষ্ঠপর্ব যেভাবে এখন পালিত হয় তা এইরকম—গ্রামের সমস্ত গোরুগুলিকে একত্র জড়ো করে আটকানো হয়, তারপর উদ্দামভাবে অপর্যাপ্ত ঢাক ঢোলক বাজিয়ে সহসা ছেড়ে দেওয়া হয়। গোরুগুলি ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। হিন্দুদের গোষ্ঠপর্ব শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পর্ব কোন্ পথে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলা শক্ত। ট্রাইবাল কৃষিজীবী সমাজের স্মৃতিচিহ্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

বাঁকুড়া অঞ্চলে কার্তিক অমাবস্যা এবং বীরভূম অঞ্চলে পৌষ মাসে সাঁওতালদের মধ্যে সেহেরা বা বাঁধনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। রাঢ় অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যেও দেওয়ালির পরদিন গোরুর গায়ে ছাপ দিয়ে গোরু পরব হয়। বাঁকুড়ায় বর্ণহিন্দুদের মধ্যে এই পর্বকে "জামাই বাঁধনা" বলে। বর্ধমানের দঃ দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে এই বাঁধনাই আবার "বউনি বাঁধা" নামে পরিচিত। (পৌষ সং)। বাঁধনা পর্বে স্ত্রীপুরুষ অবাধ স্বাধীনতা পায় সাঁওতালদের মধ্যে। বাঁকুড়াতে গোরু পরবে জামাইকে টেনে আনা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে আদিবাসীদের ফসল ফলানোর কৃত্য হিসাবে যৌন-সংসর্গ এই পর্বের মূলে কার্যকর এবং আদিবাসীদের এই বিশ্বাস বিজড়িত অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে রূপান্তরিত হতে হতে চলেছে।

বাহা পরব : এছাড়া সাঁওতালদের মধ্যে আছে "বাহা পরব"। শালফুল যখন ফোটে তখন থেকে সুরু হয়। গোটা চৈত্র মাস জুড়ে এই পরব চলে। হাণ্টার সাহেবের মতে এই পর্ব দুদিনের। গ্রামের বাইরে জঙ্গলে পুরোহিতের পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে সে ফুল বিতরণ করতে থাকে। মারাং বুরু ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে মোরগ বলি দেওয়া হয়। এই পর্বটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে হিন্দুদের বৈশাখী পুর্ণিমায় পালিত শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল উৎসব। রিজলি সাহেব মুণ্ডাদের এই পর্ব সম্পর্কে লিখে গেছেন : "Sarhul or Sarjum-Baha, spring festival corresponding to the Baha or Baha Bonga of the Santals and Hos in Chait (March-April) when the Sal tree is in bloom.

Each household sacrifices a cock and make offerings of Sal flowers to the founders of the village in whose honour the festival is held."[১১]

কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও যাদুবিশ্বাস : প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কৃষিকে কেন্দ্র করেই আমাদের নানা সংস্কার ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। জীবিকার প্রধান তাগিদ ছিল কৃষিকর্ম। দেবদেবীর পুজানুষ্ঠান বা আচার বিচার, ব্রত, নিয়ম যাই ধরা যাক না কেন, শতকরা ৮০/৯০-টির উৎসই হল কৃষি। সর্বজনীন দেবী দুর্গাও শস্যের দেবী। তাঁর অপর একটি নাম শাকম্ভরী। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন, "রামায়ণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গা শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পুজিতা হতেন তার উল্লেখ আছে। শাকম্ভরী, দুর্গার অপর এক নাম। পৃথিবীরও নাম শাকম্ভরী। পৃথিবীর আর এক নাম সীতা। পৃথিবীই দেবী দুর্গা ; কারণ পৃথিবীর নাম অদিতি যাকে বেদে ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সূর্য তথা মিত্র দেবতার জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শাকম্ভরীই অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা তথা অন্নদা[১২]"। লক্ষ্মী দেবী তো প্রত্যক্ষ কৃষিদেবী। এঁর কথায় পরে আসছি। (কাটোয়া সব-ডিভিসানে মাঝিগ্রামে আষাঢ় নবমীতে শাকম্ভরীর পুজা হয়)।

গাড়সে ষষ্ঠী বা গার্সে ব্রত বা নল সংক্রান্তি : আশ্বিন সংক্রান্তিতে মেয়েরা ধান-মাঠে গিয়ে পুজা করে। রেকাবিতে আতপচাল, কাজল ইত্যাদি রেখে খড়ের দড়িতে (বড়ে) আগুন ধরিয়ে পুজা করার পর জমিতে একঘটি জল ঢেলে দেয়। এদিন ধানক্ষেতে একটি শর অথবা নলকাঠি পোঁতার নিয়ম। ওল, মানকচু, রাইসরিষা, আউশের আলোচাল, ঘি, মধু ইত্যাদি উপকরণে পূর্ণগর্ভা ধানকে সাধ দেয়।

ডাক সংক্রান্তি : বীরভূম অঞ্চলে কার্তিক সংক্রান্তিকে "ডাক সংক্রান্তি" বলে। এদিন ধানমাঠে গিয়ে ধানকে ডাক দিতে হয় ; 'ধান ফুলো' 'ধান ফুলো' বলে। বাঁকুড়ায় এই দিন-টিকে "মাথান ষষ্ঠীও" বলে। মেদিনীপুরে ধানমাঠে শরকাঠি পোঁতার একটি ছড়া পাওয়া যায় :

"অন্ সরষে শশার নাড়ি
যা-রে পোকা ধানকে ছাড়ি
এখানে আছে খুদ মালিকা
এখানে আছে ওল,
মহাদেবের ধ্যান করে বোল হরি বোল"

শ্লোকের ভাষা আধুনিক হলেও সংস্কারটি আদিম, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঁকুড়ায় মাথান ষষ্ঠীর একটি শ্লোক পেয়েছি :

"আয় ফুল ফুল ঝিঙের পাত,
গজলক্ষ্মী দুধু ভাত
লোকের বাড়ী আলথাল
আমার বাড়ী শুধুই চাল"।

বীরভূমের চাষীরাও অনুরূপ কামনা করে। শ্লোক পাইনি।

গুমা দেওয়া : শ্রীকামিনীকুমার রায় লিখেছেন, গুমা দেওয়া পর্বের কথা। সেটি এই— "আমন ধানের সাধভক্ষণ বা দোহদ দান সংস্কার বিশেষ। ধান গাছের গর্ভে শীষের উদ্গম হইলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে কৃষক গৃহস্থরা গন্ধাদি দ্বারা ধান্যলক্ষ্মীকে অভিনন্দিত করে। সেদিন তাহারা আমের পাতায় সুগন্ধি মশলা (তৈলপক্ব মেথি ইত্যাদি) মাখাইয়া প্যাকাটির মাথায় করিয়া ধানের ক্ষেতে গুঁজিয়া দিয়া আসে এবং ডাক দিয়া বলে :

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে সকল শস্যের গর্ভ বসে
রামের হাতে 'গুমা' ধান হইস তিন দুনা[১৩]"।

লক্ষ্মী ডাক : ডাঃ চারুচন্দ্র স্যান্যাল লিখেছেন, উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা ধান বাড়ীতে লক্ষ্মী ডাক প্রথা পালন করে। তারা উকা (পাটকাঠি) জ্বালিয়ে ক্ষেতে ঘুরায় ও শস্যের অধিক ফলন কামনা করে জোরে জোরে বলে ; 'সোরহা, সোগারে ধান টোনামোনা, মোর ধান পাকা সোনা। সোরহা[১৪]'।

সাঁঝ পুজনীর ব্রত : কার্তিক সংক্রান্তিতে হিন্দুদের সাঁঝ পুজনীর ব্রতও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। (অবশ্য এই ব্রত নবান্নের দিন এবং অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতেও পালিত হওয়ার বিধান আছে)।

গর্ভনা সংক্রান্তি : আশ্বিন সংক্রান্তিকে মেদিনীপুরে গর্ভনা সংক্রান্তি বলে।

আগে শরকাঠি বা নল পোঁতার কথা বলেছি। ঐ কাঠির মাথায় নাড়ু, হলুদ মাখানো কাপড়, পান ও মানপাতা বেঁধে একটি ধানমাঠে, একটি সারগাদায় এবং আর একটি ঘরের চালে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেন "নানাস্থানে আশ্বিনের সংক্রান্তিতে গার্সী, গারুই বা গারু ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থানে ইহা ধানগাছকে সাধ খাওয়ানো উৎসব। আশ্বিন সংক্রান্তিকে মেদিনীপুরে গর্ভিনী সংক্রান্তি বলে। চাষীরা প্রত্যূষে কাঁচা হলুদ বাটা, সরিষার তেলের সহিত মিশাইয়া ধানের ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিয়া বলে "ধান-রে সাধ খা, পাকা ফুল্যা ঘরে যা"। যাহাদের চাষবাস নাই এমন গৃহস্থের গৃহিণীরাও ব্রত পালন করিয়া থাকেন। ঘরদুয়ার পরিষ্কার করেন, লক্ষ্মীর পুজা করান, ছড়া আবৃত্তি করিয়া মশামাছি পোকামাকড় তাড়াইয়া দেন এবং চাষের কোনো জিনিষ ভোজন করেন না। "হালের অর্জন, জালের মাছ এইদিনে তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ[১৫]"।

ধান্য রোপণ : শস্য রোপণের সুরুতে বহু প্রকার তুকতাকের ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজেও এই বিশ্বাস অপ্রতুল নয়। কৌটিল্য বিধান দিয়েছেন, "প্রথম বীজমুষ্টি স্বর্ণ সংযুক্ত জল দ্বারা সিক্ত করিয়া বপন করিতে হয়। নিম্নবর্তী মন্ত্র তৎসঙ্গে পাঠ করিতে হয়। যথা : প্রজাপতি, কাশ্যপ, সূর্যপুত্র ও পর্জন্য দেবতাকে সর্বদা নমস্কার জানাইতেছি। সীতাদেবী আমার বীজ ও ধনসমূহের বৃদ্ধি সাধন করুন"। (রাধাগোবিন্দ বসাকের অনুবাদ) এই প্রথা যথাযথভাবে কোথাও পালিত হয় কিনা জানি না তবে রাঢ়ের কৃষকরা প্রথম চারা রোপণকালে সুপারি, তেল, সিঁদুর, কাজল, পান, চাল, গুড় দিয়ে ধানমাঠে একটা পুজা দেয়। বৃদ্ধ কৃষকদের মুখে শোনা যায়, প্রথম ধান্য রোপণকালে মেয়েদের চুল এলিয়ে ধান পোঁতার রীতি

ছিল। এই নিয়ম ঠিক এ অঞ্চলে কোথাও পালিত হয় কিনা, সন্ধান পাইনি তবে এই রীতির বহির্ভারতীয় দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। পরে এ প্রসঙ্গে আসছি।

পানের চাষ : পানের চাষ করবার সময়ও নানারকম নিয়ম পালন করার বিধান আছে। বরোজে "কুমারী পুজা" করা হয়। বরোজে রজস্বলা নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

আখ পোঁতা : আখ পোঁতার দিন ক্ষেত্রে পুজা দিতে হয়। তাতে লাগে নৈবেদ্য ও কালকলাই। মনসার ডাল পুঁততে হয়। ঐদিন কালকলাই-এর ডাল, বড়ি, নালিতার শাক খেতে নেই। মুড়ি ভাজা, কাপড় সেদ্ধ করা চলে না।

পণ্ডাসুর : আখবাড়ীতে পণ্ডাসুর নামে এক অপদেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। এঁর তুষ্টি বিধানের মানসে নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড পালিত হয়ে থাকে।

সাঁওতালি অনুষ্ঠান : ধান পোতার কাজ শেষ হলে সাঁওতালরা গ্রামের যাবতীয় ছোট বড় দেবদেবীর স্থানে প্রচুর ফসল পাবার উদ্দেশ্যে মোরগ বলি দিয়ে থাকে। একে বলে "হারিয়ার সিম"। বীজ বপন সুরু হলে মোরগ এবং দুগ্ধ উৎসর্গ করে আর এক রকম অনুষ্ঠান এর আগে হয়ে থাকে। তার নাম "এরক সিম"। ধান কাটার পর মাঘ মাসে (১লা) আর একবার অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই দিনটি সাঁওতাল জাতির নববর্ষ। বলা হয় যাত্রা। (দিনটির তাৎপর্য পরে আলোচনা করছি)। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন যে, এইদিন (চেয়ারের মত) দোলনায় বসিয়ে দু'জন মানুষকে দোলানো হয়। (প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে পাইনি)। যাই হোক, নববর্ষে যাত্রারম্ভের প্রতীক স্বরূপ এমন করা হয়, না শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার প্রভাবে এই রীতি গড়ে উঠেছে তা ধারণা করার মত প্রমাণ হাতে নেই। তবে একথা স্মর্তব্য যে যোগেশ রায় বিদ্যানিধি মশাই বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন ও রাস যাত্রার বয়স ৩০০ শত বৎসরের অধিক নহে[১৬]"।

মুঠ পূজা : কার্তিক সংক্রান্তির দিন মাঠ থেকে এক আঁটি ধান-গাছ বৌ সাজিয়ে (লক্ষ্মী) নিয়ে আসা হয়। যে লোকটি মুঠ্ আনবে সে সারাপথ কোনো কথা বলতে পারবে না। ছাতা মাথায় ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে মুঠ্ নিয়ে পৌছানোর পর তার পায়ে জল ঢালা হয় এবং জলধারা দিয়ে ঘরে বরণ করে তোলা হয়। এই মুঠ্ পৌষ মাস পর্যন্ত রাখা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন ধানগুলি ঝরিয়ে "বাউরী" বাঁধার নিয়ম। বাউরী কথার অর্থ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে সাঁওতালি ভাষায় Bauri অর্থ to wind thread, বাউরী জিনিষটি এই—খড়গুলি পাকিয়ে লক্ষ্মীর ভাঁড়ের গলায় বেঁধে দেওয়া হয়। সেটি সারা বছর থাকে। ধানের পালুই (গাদা), ঢেঁকি, ধানসেদ্ধ করার পাতনায় কিছু কিছু ধান দিতে হয়। পরদিন সেগুলি তুলে বিসর্জন দিয়ে ১লা মাঘ তারিখে মকর স্নান করে এক ঘটি জল নিয়ে এসে লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়। এই মুঠ্ দিয়ে কার্তিক সংক্রান্তিতে গোরু পরব বা গোরুর বিয়ে দেওয়ারও বিধি। বর্ধমান অঞ্চলে বাউরী বাঁধাকে "বউনী বাঁধা" বলে। বলা বাহুল্য এই প্রথা উৎপাদিত শস্যের প্রতি এবং যে গোরু লাঙ্গল টেনেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিদর্শন। সাঁওতালদের "বাধনা" পর্ব ও বাঁকুড়ার "জামাই বাধনা"ও এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বিবাহের সঙ্গে শস্য উৎপাদনের সম্পর্কে বিশ্বাসের কথা পরে আলোচনা করছি।

ক্ষেতুড়ী : মুঠ্‌ পুজাকে অনেক জায়গায় ক্ষেতুড়ী পুজাও বলে। আবার ক্ষেত্রপালকেও ক্ষেতুড়ী বলা হয়।

দাঁওন বা জেউড় বা দেনী আনা : মাঠে ধানকাটা শেষ হয়ে যায়। বাকী থাকে ঈশান কোণে তিন ঝাড় ধান। এই ঝাড় থেকে আড়াই আলুই ধান (অর্থ, আড়াই মুঠি পরিমাণ) যেন হয়। জমির মালিক স্নান করে একঘটি জল ঢেলে ঐ ধান্যগুচ্ছ উপড়ে নিয়ে আসে, তারপর সেগুলিকে কোনো গাছের উপর তুলে রাখে। মাঠে দাঁওন তুলবার সময় শাঁখ বাজাতে হয়। দাঁওন এনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধানের পালুই-এ রাখা হয়। আবার একদিকে কুলের কাঁটা, গোবর, কেঁচোর মাটি ও আলপনা দিয়ে রাখা হয়। এদিন কৃষাণ ইত্যাদিকে ভাল করে খাওয়ানোর নিয়ম। এই প্রথাকে "দাঁওন" আনা অথবা "জেউড় আনা" অথবা "দেনী" আনা বলে স্থানভেদে।

চাউরী বাউরী : কোনো কোনো জায়গায় এই দাঁওনের ধান, পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন তুলে এনে প্রত্যেক ঘরের আসবাবপত্র ও বাক্সে ছোঁয়ানো হয়ে থাকে। এই প্রথাকে বলে চাউরী বাউরী বাঁধা। গৃহের প্রাঙ্গণে জায়গায় জায়গায় মাড়ুলি ও আলপনা দেওয়া থাকে। সে সব জায়গায় কচুর পাতার ভিতর গোবর ও সর্ষের ফুল দিয়ে "চাউরী" বাঁধা হয় বাঁকুড়া জেলায়।

এখন দাঁওন শব্দের অর্থ কি? মুণ্ডারী ভাষায় এরকম শব্দ থাকলেও যথার্থ অর্থভেদ হয় না। তবে সাঁওতালদের আগমনের পূর্বে সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে "দামন" নামে এক পার্বত্য জাতি বাস করত। এখনও পাহাড়ী অঞ্চল "দামন-ই-কোঃ" নামে পরিচিত। ফার্সী ভাষায় দামন মানে কিনারা এবং কোঃ মানে পর্বত। অর্থাৎ পর্বতের কিনারা। এই "কিনারা" থেকে দামনের ধান আনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা বলা শক্ত। ইয়োরোপে Demeter বলে এক শস্য মাতার সন্ধান পাওয়া যায়। W. Manahardt বলেছেন যে Demeter শব্দটি ক্রীট দ্বীপের ভাষা Deai অর্থাৎ বার্লি থেকে উদ্ভব লাভ করেছে। এখন আমাদের "দাঁওন" শব্দটি ঐ Deai থেকে আস্‌ছে কিনা তাও বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিচার করা দরকার। ইয়োরো-পের শস্য উৎপাদন সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করলে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। "জেউড়" শব্দটিরও অর্থ অনুধাবন করা যায় না তবে মুণ্ডারী ভাষায় Jaru শব্দের অর্থ হল, properly riped.

আওনি বাউনি : শ্রীকামিনীকুমার রায় এর একটি বিবরণ দিয়েছেন—"পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিন সযত্নে রক্ষিত এক মুঠো ধান গাছ পুজা করিয়া এক গোছা শিব বাক্স, সিন্দুর, খাট-চৌকি, গোলা, গোশালা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দেন এবং বলেন :

"আওনি বাওনি চাওনি
তিন দিন পিঠা খাওনি
তিন দিন না কোথা যেয়ো
ঘরে বসে পিঠা খেয়ো"

আওনি অর্থে লক্ষ্মীর আগমন, বাওনি অর্থে লক্ষ্মীর বন্ধন, চাওনি—প্রার্থনা। উত্তরবঙ্গে প্রায় অনুরূপ আওরি বাওরি আছে[১৭]।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান যে কেবল রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ তা মনে করলে ভুল হবে। বহির্ভারতীয় অনুরূপ দৃষ্টান্তও কম নেই। এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে আদিম ট্রাইবাল সমাজের যে সমস্ত চিন্তা ও আচার কৃষি সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তারা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। বলা বাহুল্য এই সব চিন্তা, দেব দেবীর তত্ত্ব কল্পনা করে সেগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত না। সেগুলি ছিল অনেকটা ম্যাজিকে বিশ্বাসের মত। W. Manahardt এবং জেমস ফ্রেজারের সংগ্রহ থেকে তুলনামূলক বিচারের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দিচ্ছি—

জার্মানীতে শস্যক্ষেত্রে শস্যমাতার অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। ঐ শস্যমাতাই শস্য পরিপক্ব হতে সাহায্য করে থাকে বলে বিশ্বাস। কোনো কোনো অঞ্চলে শস্যের শেষ আঁটি দিয়ে কাপড় পরিয়ে নারীমূর্তি সাজিয়ে ক্ষেতে বসিয়ে রাখা হয়। কোথাও শেষ আঁটি কেটে আনা হয় আনন্দ উৎসবের সঙ্গে এবং জল ঢালা হয়। (the last sheaf is carried joyfully home and honoured as a divine being···and then drenched with water.)। তারপর শস্য মাতাকে এক গাদা কাঠের উপর তুলে রাখা হয়। মেক্সিকো, ব্রিটেন, স্কটল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সেও শেষ আঁটি শস্য দিয়ে অনুরূপ নারীমূর্তি তৈরী করা হয়ে থাকে। শস্য মাতার পরিবর্তে কোনো কোনো জায়গায় শস্য বুড়ী, শস্য কুমারী বলে অভিহিত করা হয়। পোল্যাণ্ডে শস্যের শেষ ঝাড়টিকে "বাবা" (অর্থ বৃদ্ধ স্ত্রীলোক) বলে। বোহেমিয়াতে "বাবা" দিয়ে একটি নারীমূর্তি গড়ে মাথায় খড়ের টুপি পরিয়ে দেবার রীতি। তারপর একটি মালা পরিয়ে বাড়ী আনা হয়। লিথুয়ানিয়ায় একে বলা হয় "বোবা" (অর্থ ঐ)। রাশিয়াতেও শস্যের শেষ ঝাড়কে স্ত্রীলোকের মত সাজিয়ে নাচগানসহ খামারে নিয়ে আসা হয়। বুলগেরিয়ায় এই স্ত্রীলোকটিকে বলা হয় শস্য-রাণী। উৎসবের পরিবর্তিত রূপ এই যে, মূর্তিটিকে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে জলে নিক্ষেপ করা হয় যাতে পরবৎসর প্রচুর ফসল ও বৃষ্টিপাত হয় অথবা সেই মূর্তিটিকে পুড়িয়ে ছাইগুলি শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়ায় শস্য কর্তনের পর মস্ত একটি শোভাযাত্রা সহ শস্য রাণীকে গাড়ীতে বসিয়ে বের করা হয়। আমেরিকাতেও অতি প্রাচীনকাল থেকে অনুরূপ প্রথা পালনের বিধি আছে।

সুমাত্রা দ্বীপে ধান পোঁতার ও ধান কাটার সময় নানারকম অনুষ্ঠান পালন করা হয়। শেষ ঝাড়টিকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ছাতার নীচে বয়ে আনার বিধি। মধ্য সেলিবিস দ্বীপে ধান পোঁতার সময় মাঠে পান পোঁতা হয়। ঐ সব দেশে যে স্ত্রীলোক শস্যমাতাকে প্রথম পুঁতবে সে স্নান করে চুল এলিয়ে কাজ করবে। ধানের চারা তৈরী হলে সেগুলিকে নিয়ে মাঠের মাঝে অথবা এক কোণায় পোঁতা হবে। গান চলবে সঙ্গে—ঝুড়ি ঝুড়ি ধান দাও। তুমি বিদ্যুৎ চমক বা পথিককে দেখে ভয় পেয়ো না। সূর্য তোমাকে আনন্দ দিক, ঝড়ের সঙ্গে তুমি সন্ধি কোর। বৃষ্টি তোমার মুখ ধুইয়ে দিক[১৮]।

মাঠে ধান কাটার আগে শস্যমাতাকে একত্র বাঁধা হয়। তারপর প্রথম ফসল কেটে ভোজ হবার পর উৎসবের সঙ্গে ছাতা মাথায় পবিত্রভাবে থলিতে পুরে নিয়ে এসে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। "মেক্সিকোতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় মেয়েরা এলোকেশী হয় শস্য যেন এই এলোকেশের মত গোছা গোছা লম্বা হয়ে ওঠে—এই কামনায়[১৯]" রেড ইণ্ডিয়ানরা বীজ বোনা ও ফসল কাটার সময় কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে।

ফসল ফলানোর সঙ্গে নাচ গানও সারা পৃথিবীতে চলিত আছে। আমাদের দেশে তো কথাই নেই। ফসলের নাচ গান আমাদের নানা লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যে স্থান লাভ করেছে, রূপান্তরিত হয়েছে নানারূপে। আমাদের নবান্ন উৎসবের মতই নূতন ফসল ওঠার পরবর্তী পর্যায়ে শস্যোৎসবও সারা দুনিয়ায় চলিত আছে।

গাড়সে ষষ্ঠীর ব্রত উপলক্ষে চিন্তাহরণ বাবুর উদ্ধৃতিতে দেখা যাবে, ধানগাছকে সাধ খাওয়ানোর কথা। অর্থাৎ শস্যমাতা গর্ভিনী আছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে পৃথিবীর বহু অনগ্রসর সমাজে শস্যমাতাকে গর্ভিনী মনে করা হয় ফসল ধরার প্রাক্কালে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই—

ইন্দোনেশিয়াতে ধান ফুটবার সময় ধানের গুচ্ছকে গর্ভিণী স্ত্রীলোক মনে করে। মাঠে বন্দুকের আওয়াজ বা চীৎকার করা চলে না। সেই সঙ্গে তারা, মৃত্যু বা দৈত্যদানার কথা সেখানে আলোচনা করে না। গর্ভিণী স্ত্রীলোকের মত পুষ্টিকর খাদ্যও তারা ধানকে খেতে দেয়। ধানের শিষ দেখা দিলে তারা শিশু জন্মেছে মনে করে। ছোট ছেলের মত স্ত্রীলোকেরা মাঠে গিয়ে তাদের খাওয়াবার অভিনয় করে। আমেরিকাতেও অনুরূপ বিশ্বাস চলিত আছে। এরকম বিশ্বাস ছাড়া আরও একরকম ভাবনা আদিম সমাজের মধ্যে চলিত আছে, যে স্ত্রীলোক ফসলের শেষ ঝাড় কেটে বাঁধবে সে অবশ্যই পরবৎসর গর্ভিণী হবে। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ফসলের সঙ্গে সন্তান জন্মের সম্পর্কে একটি বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাস থেকে আমাদের ষষ্ঠীদেবী সৃষ্টি হয়েছেন সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। মালয় ও অন্যান্য বহু দেশে মাঠ থেকে সাতটি শিষ কেটে তেল মাখানো হয়, তারপর রঙীন সুতো বেঁধে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে লম্বা একটা চুপড়ীতে বসানো হয়। কৃষকের বাড়ীতে অপর একজন স্ত্রীলোক সেটিকে বয়ে নিয়ে আসে মাথায় ছাতা ধরে যাতে কচি বাচ্চার সূর্যতাপ না লাগে। চুপড়ি পৌঁছে গেলে পরিবারের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা অভ্যর্থনা করে বাড়ীতে তুলে বালিশ বিছানা সমেত দোলনায় বসিয়ে দেয়। সন্তান জন্মের পর যে সমস্ত আচার পালিত হয়, সেই রকম কৃষকপত্নী তিনদিন ধরে নিয়মাদি পালন করে থাকে।

মুঠ্‌পুজা, বাঁধনা, জামাই বাঁধনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিশ্বাসের পরিচয় আমরা রাঢ় অঞ্চলে পাই, অনুরূপ বিশ্বাসের বহির্ভারতীয় দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে কিছু দেওয়া গেল—

ইয়োরোপের বহু জায়গায় এবং বালি, জাভা প্রভৃতি স্থানে বিবাহের অনুষ্ঠানাদি ফসল কাটার সময় পালন করার রীতি আছে। ফসল কাটার আগে কতকগুলি ফসলের শিষ একত্র

বেঁধে তেল, রঙ ইত্যাদি মাখিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। তারপর বিবাহ-ভোজ ও ফসল কাটা সুরু হয়। নূতন মাদুর, আলো এবং প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে সাজানো হয় বাসর। ফসল কেটে জমা করার পর সেখানে ৪০ দিন কেউ ঢুকতে পায় না, পাছে বরকনে বিরক্ত বোধ করে। হার্সটনের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "দঃ ভারতে নানা উপজাতির মধ্যে দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বরকে মাটি চষবার বা মাটি চষা সংক্রান্ত কোনো ক্রিয়ার অনুকরণ করতে হয়"। "কুর্মিদের প্রথা অনুসারে নববধূর আঁচলে শস্যের বীজ বেঁধে দিতে হয়। অন্যত্র দেখা যায় বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হল গাছ পোঁতা। দঃ ভারতের স্থান বিশেষে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন হিসাবে উই ঢিবির উপর ধান এবং ডালের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে বীজগুলির অঙ্কুর উদ্গম হবে তখন বরবধূ মিলে এই অঙ্কুরিত শস্য কূয়োয় বিসর্জন দিয়ে আসবে[২০]"।

আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের আচার অনুষ্ঠান পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। স্বামী সোহাগিনী হবে কিনা, বিবাহ মঙ্গলজনক হয়েছে কিনা, সন্তান সন্ততি হবে কিনা ইত্যাদি জানার উপায় সম্পর্কে দেশকালভেদে বহুবিধ আচার প্রচলিত আছে। এখানে সাঁওতালদের বিবাহে একটি আচারের উল্লেখ করছি—বিয়ের আগে একটি পাত্রে সিঁদুর মাখানো ভিজে ন্যাকড়ায় কতকগুলি ধান ভিজিয়ে রাখা হয়। বিবাহের পর যখন শোভাযাত্রা বর-কনেকে নিয়ে ফিরে আসে, তখন সেই পাত্রে রক্ষিত শস্যগুলিকে পরীক্ষা করা হয়। যদি সব দানাগুলিই অঙ্কুরিত হয় তাহলে বুঝতে হবে, বধূ বহু প্রসবিণী হবে, অল্পকিছু অঙ্কুরিত হলে স্বল্প সংখ্যক সন্তান এবং আদপে অঙ্কুরিত না হলে ঘোর অমঙ্গল সূচিত হবে। এই প্রথাটি উপজাতীয় সমাজের শস্য জন্মানোর সঙ্গে স্ত্রীলোকের সন্তান সম্ভাবনার আদিম বিশ্বাসের এক জীবন্ত নিদর্শন। বিহারের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ই এই প্রথা পালন করে থাকে।

বৃষ্টিপাত ও অনাবৃষ্টির তুক্‌ : আষাঢ় মাসে বৃষ্টিপাত সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল ও তপশীল জাতির মধ্যে একটি অনুষ্ঠান পালনের বিবরণ কর্ণেল ডালটন দিয়ে গেছেন—"Each cultivator sacrifices a fowl and after some mysterious rites a wing is stripped off and inserted in the cleft of a bamboo and stuck up in the rice field and dung heap. If this is omitted it is supposed that the rice will not come to maturity[২১]"।

অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য আদিম সমাজের যাদুবিশ্বাস প্রায় অবিকৃতভাবে চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। এই ধরণের যাদুবিশ্বাসের নানা দিক দিয়ে বিকেন্দ্রীভবন ঘটেছে। লৌকিক দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠানে বলিদানে। ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে, পুকুর বা নদীর ঘাটে বহুপ্রকার কৃত্যের মধ্যে এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। (ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বিশ্লেষণে দীর্ঘ আলোচনা পরে করছি)। এই বিশ্বাস কেবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নেই। নৃতাত্বিক শরৎচন্দ্র রায় অনাবৃষ্টি-কালে বিবসনা নারীদের লাঙল টানার কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক কালে সংবাদপত্রেও

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথা পাওয়া গেছে। রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য নানা অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড পালিত হয়। সবগুলি সহসা সংগ্রহ করা কঠিন। প্রায় লোপও পেয়ে আসছে। দু'একটা বলছি—অনাবৃষ্টিকালে এই অঞ্চলে লোকের বাড়ীতে গিয়ে কদর্য গালাগালি করে, ব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি ভাঙ্গার নিয়ম প্রতিপালিত হয়। ইলামবাজার থানার কুড়মিঠা গ্রামে অনাবৃষ্টি কালে একজন নষ্টা স্ত্রীলোক রাত্রিবেলা উলঙ্গ হয়ে ডুন (জল সেঁচের উপকরণ) ধরে জল সেঁচত। এখন সে প্রথা আর নেই। কোথাও বা মেয়েরা দল বেঁধে গান করতে বের হয়। একজনের মাথায় থাকে কুলো, ধান, কলসী ইত্যাদি। গৃহস্থ স্ত্রীলোকরা এসে জল ঢালে। রাভা উপজাতিদের মধ্যে অনাবৃষ্টিকালে স্ত্রীলোকরা অথবা পুরুষ মানুষ, স্ত্রীলোকের সাজ পরে গভীর রাত্রে দরজায় দরজায় চাষবাসের যন্ত্রপাতি এবং বীজধান নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বহির্ভারতীয় অনুরূপ তুলনীয় অনুষ্ঠান—রাশিয়ার Ploska গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বিবস্ত্রা হয়ে গ্রামের প্রান্তে গিয়ে জল ঢেলে থাকে। (রাঢ় অঞ্চলে আর একটি রীতি পালিত হয়—পিতামাতার এক সন্তান, কোনো স্ত্রীলোক অতিবৃষ্টি দমনের উদ্দেশ্যে উলঙ্গ হয়ে উঠানে একটি বাটি পুঁতে দেয়)। তাছাড়া ১০৮ পুরের (গ্রাম) নাম ভাঁড়ের মুখে উচ্চারণ করে মুখ বন্ধ করে এক ডুবে জলে পুঁতে ফেলে, অনাবৃষ্টির সময়। অনাবৃষ্টিকালে গ্রাম্য দেবদেবীর পুজা, ক্ষেত্রে বলিদান, দেবমূর্তি অথবা শিলাখণ্ডে জল ঢালা ইত্যাদি প্রথাও ব্যাপকভাবে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত আছে। যেমন সাঁইথিয়া থানার এক গ্রামের ধানমাঠে 'মদলাক্ষি' নামে এক দেবী আছেন। পুজার পর বলিদানের রক্ত মাটিতে পড়লেই বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস। সাধারণভাবে এই দেবী আশ্বিন মাসে শুক্লা চতুর্দশীর দিন পুজিতা হন। মদলাক্ষি নামটি নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবজাত অর্থাৎ পরবর্তীকালে প্রদত্ত আর প্রথাটি আদিম সমাজের নরবলির রক্তে জমির উর্বরতা সাধন এবং বৃষ্টিপাতের তুকতাক—এই উভয়ের সমন্বয়। সিউড়ী থানায় কচুজোড়ে কচ্চিকা দেবীর শিলাসনে অনাবৃষ্টিকালে জল ঢালতে হয়। সেই জল গড়াতে গড়াতে নিকট-বর্তী একটি দীঘিতে পড়ামাত্রই বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে বলে প্রবল লোকবিশ্বাস বর্তমান। আদিম সমাজের আর একটি লোকবিশ্বাস হল, বৃষ্টি না হলে বৃষ্টির দেবতারূপে কল্পিত একটি পাথরকে রৌদ্রে রেখে দেওয়া। বৃষ্টির অভাব ঘটলে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ার নানা জায়গায় ধর্মঠাকুরকে রৌদ্রে রেখে দেওয়া হয়। সিউড়ী থানার গোবরা গ্রামের এক বৃদ্ধ কৃষক জানিয়েছে যে, বাল্যে সে দেখেছে যে বৃষ্টির অভাব ঘটলে গ্রামের লোকরা ধর্মঠাকুরের পুজা দিত এবং অনিবার্যভাবে সেদিনই বৃষ্টি হত। নিদেন পক্ষে দু'চার ফোঁটাও। এ তার স্বচক্ষে দেখা। আদিবাসীদের মধ্যে আর একটি প্রথা চলিত আছে—বৃষ্টি হবার মত মেঘ যখন আকাশে এসে জমতে থাকে তখন একজন আকাশের দিকে বাঁ হাত বাড়িয়ে কড়ে আঙুল দিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে কোন জায়গায় বৃষ্টি পড়বে তার নির্দেশ দিতে থাকে। ১৮৯১ সালে রিজলি সাহেবের বিবরণ থেকে ভূমিজ জাতির 'কাড়াকাটা' উৎসবের কথা পাওয়া যায়। বৃষ্টি সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মোষ অথবা ছাগ বলি দেবার রীতি ছিল। এ না হলে নাকি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা[২২]।

অনাবৃষ্টি : শস্যের অপদেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে সমগ্র

পৃথিবীর অনুন্নত কৃষিজীবী সমাজে হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। নরবলি প্রথার দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু—"উড়িষ্যার দক্ষিণভাগে কন্ধ জাতির মধ্যে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মেরিয়া নামক নরবলির প্রচলন ছিল। প্রায় শতবর্ষ হইতে কন্ধগণ বাধ্য হইয়া মানুষের পরিবর্তে মহিষ বলি দিয়া আসিতেছে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ক্ষেতের মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়ার রীতি ছিল। কোনো কোনো গ্রামে আবার সেই ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া ছাইগুলি মাঠে বা যে নদী হইতে সেচ দেওয়া হইত, সেই নদীর জলে মেশানো হইত। মানুষটিকে বলি দেবার পরদিবস তাহার মাথা এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ অস্থি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া একটি জীবন্ত ভেড়ার সহিত একত্র দগ্ধ করা হইত। এইদিনের ছাই মাঠে ছড়ানো হইত অথবা জলে গুলিয়া ঘরে বা শস্যের গোলায় শস্য রক্ষা হইবে এই আশায় লেপিয়া দেওয়া হইত"[২৩] বলা বাহুল্য এই রীতির পরিবর্তিত রূপ রাঢ় অঞ্চলে যথেষ্ট দেখা যায়।

জুড়ি দেওয়া : রাঢ়ের বীরভূম অঞ্চলের আর একটি অনুষ্ঠান হল 'জুড়ি দেওয়া'। অনাবৃষ্টি কালে উঁচু একটা জায়গায় কোনো পুরানো গাছের নীচে গ্রাম্যদেবতা বা দেবীর পুজার আয়োজন করা হয়। দরজায় দরজায় ব্রতীরা ঢাক পিটিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। চীৎকার করে, 'জুড়ি দে'···'জুড়ি দে'···বলে। ওদিকে পুজাও চলে। আগুন জেলে নানা দ্রব্য পোড়ানো হতে থাকে। ("জুড়ি" বা "যুড়ি" শব্দের অর্থ ভেদ করতে পারি নি)। বলিদানের প্রথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রাচীনকালের নরবলি এখন পশুবলিতে পরিণত হয়েছে। ধান কাটা শেষ হলে মাঠে মোরগ, শূকর ইত্যাদি বলিদান অতি সাধারণ ঘটনা। রাঢ় অঞ্চলের ধান কাটার পর মাঠে মুরগী বলি দিয়ে বাঘরায় চণ্ডী, দানা ক্ষেত্রপাল ইত্যাদির পুজা হয়ে থাকে।

অনাবৃষ্টির ব্রত : বৈশাখ মাসে মেঘকে তুষ্ট করার জন্য মেঘারাণী ব্রত পালিত হয়। উত্তরবঙ্গের হুদুমা পুজার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। এই অনুষ্ঠানে মেয়েরা নগ্ন হয়ে বরুণ দেবকে আহ্বান জানায়। উঃ বঙ্গে তিস্তা বুড়ীর পুজাও এই উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। মেয়েরা মূর্তি তৈরী করে সিঁদুর মাখিয়ে কাপরচোপড়ে সাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরে এবং গৃহস্থের প্রাঙ্গণে মূর্তিটি স্থাপন করে জলে ভিজিয়ে দেয় মূর্তিটিকে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাচগানও চলতে থাকে[২৪]।

নববর্ষোৎসব : সম্বৎসর ধরে আমরা যতগুলি উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকি, তার মধ্যে অধুনা নববর্ষোৎসব অন্যতম। ১লা বৈশাখ নব বৎসর উৎসব পালন করা হলেও একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এই উৎসব একান্ত বাহ্য ব্যাপার। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে কোনো যোগ এর নেই। প্রাচীন পুঁথি, চিঠিপত্র এবং আধুনিক গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে এর বিন্দুবিসর্গও পরিচয় পাওয়া যায় না।* লিখিত প্রমাণ না থাকলেও মানুষের ভিতর

* বৈশাখ মাসে যে সকল ব্রত হিন্দুরা পালন করেন—(১) মেঘারাণী ব্রত ; (২) অশ্বত্থ-নারায়ণ ব্রত ; (৩) পুণ্যিপুকুর ব্রত ; (৪) দশ পুতুল ব্রত ; (৫) হরিচরণ ব্রত ; (৬) সন্ধ্যামণি

ধারাবাহিকভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া আচার ব্যবহারের পরিবর্তন সহজে হয় না। কিন্তু সে প্রমাণ দুর্লভ। নববৎসর পালনের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যথা তৈজসপত্রাদি মার্জনা, গৃহসংস্কার, নববস্ত্র পরিধান, শুচিতা বিধান ও আত্মশুদ্ধি, পরবৎসরের জন্য কল্যাণ কামনা, পুরাতন বৎসরের জীর্ণ যা কিছু তাকে ফেলে আসার বিধি ইত্যাদি। এগুলির কোনটিই ১লা বৈশাখ পরিদৃষ্ট হয় না। এদিকে এসে জড়ো হয় ব্যবসায়ীদের লাল চিঠি এবং আলোকপ্রাপ্ত বান্ধব-শ্রেণীর সুদৃশ্য অভিনন্দনজ্ঞাপক কার্ড। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নববর্ষোৎসবের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্জিকায় উদ্ধৃত বচন অনুসারে নববর্ষারম্ভে প্রতি গৃহে ধ্বজা রোপণ করিতে হইবে। কিন্তু এই নির্দেশ কত দিনের ও ইহার মূল কি জানি না। এই নির্দেশ পালনের কোনো নিদর্শনও দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীরা যে হালখাতার উৎসব অনুষ্ঠান করেন তাহা সাধারণতঃ পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠিত হইলেও কেহ কেহ অক্ষয় তৃতীয়া প্রভৃতি পবিত্র দিনেও ইহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ী মহলে সীমাবদ্ধ এই উৎসবকে ঠিক জনসাধারণের নববর্ষ উৎসব বলা যায় না। তবে বর্তমানে পশ্চিমের আদর্শে বাংলাদেশে নববর্ষোৎসব গড়িয়া উঠিতেছে[২৫]"।

এই প্রসঙ্গে মনীষী যোগেশ রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্যও উল্লেখ্য, "আমরা ১লা বৈশাখ নববৎসর ধরিতেছি ; কিন্তু এই রীতি বেশী দিনের নয়। মাত্র ১৬২৯ বৎসর পুর্বে ২৪১ শকে ইং ৩১৯ সালে ইহার আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও ভারতের সর্বত্র নয়। তখন হইতে আমাদের বর্তমান পাঁজির গণনা চলিতেছে। সে সময়ে চৈত্র-বৈশাখ, বসন্ত ও আশ্বিন-কার্তিক, শরৎ ; এইরূপ হইত। এখন ঠিক তাহা হয় না[২৬]।" তিনি আরও হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের ঋষিরা হিমঋতু থেকে বছর গুণতেন। তাছাড়া শরৎ ঋতু থেকেও আর এক বৎসর গণনা সুরু হয়। অগ্রহায়ণ মাসকে সে কারণে মার্গশীর্ষ মাস বলা হত। অগ্রহায়ণই ছিল শরৎ বর্ষের প্রথম মাস। সে প্রায় খৃঃ পূর্ব ৪৫০০ বছর আগের কথা। কার্তিক পুর্ণিমায় রাসযাত্রা হয়। সে সময়েও এক সময় বর্ষ আরম্ভ করার বিধান ছিল। শরৎ ঋতুর বর্ষারম্ভ, বিজয়া দশমীর দিন থেকে সুরু হত এবং ঐদিন নববর্ষ প্রবেশের পুর্বে যে সমস্ত আচার ও কৃত্য পালনীয় তা পরিষ্কারভাবে আজও টিকে আছে। শারদোৎসবের বয়স খুব অল্প নয়। বিদ্যানিধি মশাই দেখিয়েছেন, সাড়ে ছয় হাজার বছর ধরে এই উৎসব চলে আসছে। বোম্বাই ও গুজরাট প্রদেশের লোকে কার্তিক শুক্ল প্রতিপদে নূতন বৎসর গণনা করে। তারা মনে করে দীপালি নববর্ষের পুর্বরাত্রির উৎসব।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নববর্ষ কোনো নির্দিষ্ট তারিখে যুগ যুগ ধরে পালিত

ব্রত ; (৭) গোকাল ব্রত ; (৮) ধর্মঘট ব্রত ; (৯) রুক্মিণী দ্বাদশী ব্রত ; (১০) সীতানবমী ব্রত ; (১১) চম্পক ব্রত ; (১২) ফলদান ব্রত ; (১৩) মিষ্ট সংক্রান্তি ব্রত ; (১৪) রামনাদার ব্রত ; (১৫) দাড়িম সংক্রান্তি ; (১৬) কলাছড়া ব্রত ; (১৭) মধু সংক্রান্তি ; (১৮) আইত সংক্রান্তি ; (১৯) আদর সংক্রান্তি ; (২০) পৌর্ণমাসী ব্রত ; (২১) ধনগছানো ব্রত ইত্যাদি।

হচ্ছে না। কালে কালে তারিখ বদল হয়ে গেলেও রীতিনীতির সাক্ষ্য পূর্বাপর বজায় আছে। গ্রাম বাংলায় নববর্ষোৎসব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা সংস্কার ও বিশ্বাসের কথায় এসে পড়ি। দুর্গোৎসব ও দোল, এই দুটি উৎসব গ্রাম বাংলায় কেন, ভারতের বহু স্থানে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। অনেকেই জানে না, এগুলি নববর্ষোৎসব। এখন ধর্মীয় ভাব এগুলির মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। সুদূর অতীতে এই দিন গুলির তাৎপর্য প্রয়োজন-ভিত্তিক ছিল। গুজরাটের গর্বা উৎসবও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ির ভিতর প্রদীপ রেখে নারীরা চতুর্দিক বেষ্টন করে নৃত্য করে। বিদ্যানিধি মশাই লিখেছেন, "হাঁড়ির ভিতর শতচ্ছিদ্র পথে রশ্মি বাহির হইতে থাকে, যেন সূর্য। নববর্ষের সূর্যই গর্ভ। নবরাত্রের অন্তে নববর্ষের সহিত নবসূর্য উদিত হইবে[২৭]।" বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে গরব পুজার নমুনা পেয়েছি। এখন তার আসল রূপ নাই। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, গুজরাটের ধরণের নববর্ষোৎসব এখানেও উদযাপিত হত। আজ অবলুপ্ত প্রায়। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নববর্ষ পালনের একটি উদাহরণ দিয়েছেন—"জয়পুর অঞ্চলে পাঙ্কাদের মধ্যে নববর্ষ উপলক্ষে একমাস ধরে অবাধ যৌনমিলন উৎসব চলে[২৮]।" সাঁওতালদের বাঁধনা পর্বেও অনুরূপ ব্যাপার আছে। এই পর্ব কার্তিক থেকে পৌষ পর্যন্ত স্থানভেদে হয়ে থাকে। এটিই তাদের নববর্ষোৎসব। তবে তারিখের যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় তার কারণ অন্যত্র। রাঢ় অঞ্চলে তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ১লা মাঘ অনুরূপ অবাধ মিলনের ব্যবস্থা ছিল বলে শোনা যায়। এই অবাধ যৌনমিলন অশ্লীলতার চর্চা মনে করলে ভুল করা হবে। আদিম সমাজের জমির উর্বরতা বৃদ্ধির যাদু-বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মূলে ক্রিয়াশীল।

রাঢ় বাংলায় ১লা মাঘ একটি দিন যা সংস্কৃতির ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করতে পারে। যোগেশবাবু গণনা করে বলেছেন, "ষোলশত বৎসর পুর্বে পৌষ সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। পরদিন ১লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন। সে দিন আমরা দেব-খাতে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান[২৯]।" বিদ্যানিধি মশাই-এর এই উক্তিটি এই পর্যায়ে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগাবে।

রাঢ অঞ্চলে তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ১লা মাঘটি যেমন পবিত্র উৎসবের দিন বলে গণ্য হয়, তেমন আর বছরের কোনো দিনটি নয়। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে যথার্থ যে কি আছে তা বলা শক্ত। আর্য ভাবনা ও গণনার সূত্র তারা গ্রহণ করে এখনও টিকিয়ে রেখেছে কিনা প্রমাণ করা যায় না। দিনটি ফসল উৎপন্নের পরবর্তী উৎসবের অন্তর্ভুক্ত তা নিঃসন্দেহে বলা চলে কিন্তু সংস্কৃতির বিচারে মাত্র ষোলশত বৎসর পুর্বে এর সুরু তা মনে হয় না। খুব সম্ভবতঃ ট্রাইবাল সমাজের অতি প্রাচীন স্মৃতি এই ১লা মাঘের উৎসবের মধ্যে আজও রক্ষিত হয়ে আসছে। রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত নববর্ষোৎসব বলে যদি কিছু থাকে তা হল এই ১লা মাঘের উৎসব। পৌষ সংক্রান্তির পিঠা পরব ও লক্ষ্মীপুজা তো বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে খ্যাত। এ সম্পর্কে বহু মনীষী বহু আলোচনাই করেছেন। মাঘমণ্ডল ব্রত (সূর্যোপাসনা) সম্পর্কেও কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। সে আলোচনা বর্ণ হিন্দুদের সম্পর্কে। কিন্তু তপশীল সমাজের

ঐ মাঘোৎসবের কথা কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমার সন্ধানে নেই।

১লা মাঘকে রাঢ় অঞ্চলে তপশীল সম্প্রদায় বলে 'আখ্যান' বা 'আখ্যেন' দিন। এর অর্থ কি জানি না। কাজ চালাবার জন্য ভেবে নিতে হয়েছে, "ক্ষণ" কথাটি "আ" উপসর্গ যোগে "আক্ষেণ" শব্দটি তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ মহাক্ষণ বা পুণ্যক্ষণ। সূর্যের উত্তরায়ণ প্রবেশের ক্ষণ। কিন্তু শব্দটি সংস্কৃত নয় বলে মনে হয়। মুণ্ডারী ভাষায় এরকম কোনো শব্দ নেই। ওঁরাওরা ধান মাড়াই কালে কাঠের হাতলযুক্ত একরকম আঁকশি ব্যবহার করে (যা ছড়িয়ে পড়া ধানকে কাছে টেনে নেবার জন্য ব্যবহৃত হয়) তাকে বলে 'আখিন'। এর দ্বারাও অর্থভেদ হয় না। বীরভূমে রাজনগর থানায় একটি গ্রামে কয়েকটি অপদেবতার সঙ্গে "আক্ষেণ" নামে এক দেবতাও বাউরী জাতি কর্তৃক ১লা মাঘ পুজিত হন। (অপর দেবতাগুলির নাম ঘেন ঘেন, উতরণ ও সিচেন। আক্ষাণের পুজা প্রথম হয়, তারপর, পরপর তিনদিন, ঘেন ঘেন, উতরণ ও সিচেনের পুজা হয়ে থাকে। উপবাসী থাকার পর বেলা ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত পুজা চলে। ভর নামানোও হয়)।*

মাঘের আক্ষাণ দিনটির একটু পরিচয় দিচ্ছি—রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে কোনো না কোনো অর্বাচীন অথবা অবৈদিক দেবদেবী, গাছতলা, ধানমাঠ, পুকুর পাড়, আখবাড়ী প্রভৃতি জায়গায় না আছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্রহ্মদৈত্য, বাঘরায় চণ্ডী ও দানা। তবে অধিকাংশই দেবী। Fertility cult-এর সঙ্গে দেবীপুজা সম্পৃক্ত, তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এবং এই সংস্কৃতি অবৈদিক† দেবদেবী ছাড়াও নানাপ্রকার বুড়ী, ভূত, প্রেত, অপদেবতা প্রভৃতিও আছেন। এদের পুজানুষ্ঠানের সন্ধান অষ্ট্রিক জাতির বিভিন্ন শাখার

* কুলটি থেকে শ্রীসুখময় সরকার এই সম্পর্কে আমার বেতার আলোচনার প্রতিবাদ জানিয়ে যুগান্তরে লিখেছিলেন "আক্ষেণ" শব্দের অর্থ, ক্রমবর্ধমান। শব্দকল্পদ্রুমে আছে। সূর্য উত্তরায়ণে প্রবেশ করছে। এটা যথার্থ হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কিন্তু আমি কোনো অভিধানে শব্দটি পাই নি।

† আক্ষাণ দিনে পুজিত (বীরভূম অঞ্চলে সংগৃহীত) আরও কয়েকটি দেবদেবীর নাম : (১) কুদরো বুড়ী ; (২) মালঞ্চ বুড়ী ; (৩) কদম বুড়ী ; (৪) বনকুমারী ; (৫) ফেঁসেরা ; (৬) কামা মেঝেন ; (৭) কাটাইচণ্ডী ; (৮) কালাপাহাড় ; (৯) মশান ; (১০) চোরদানা ; (১১) গোবর লোটন ; (১২) বসত বুড়ী ; (১৩) বাণেশ্বরী ; (১৪) জানাবুড়ী ; (১৫) দেলোবুড়ী ; (১৬) ধনীক্ষা চণ্ডী ; (১৭) পাথরা চণ্ডী ; (১৮) পায়রা চণ্ডী ; (১৯) পাহাড়ী মা ; (২০) গর্ভকোঁড় বা গর্ভকোঙার ; (২১) পলাশী ; (২২) ফুল্লরা চণ্ডী ; (২৩) মুরগী ঠাকরুণ ; (২৪) লটাবুড়ী ; (২৫) সোনাই চণ্ডী ; (২৬) সিদ্ধেশ্বরী ; (২৭) বাগান বুড়ী ; (২৮) বসন্ত বুড়ী ; (২৯) গোঁসাই ; (৩০) ভাজই কুমারী ; (৩১) ঢেলাই চণ্ডী ; (৩২) চানাই চণ্ডী ; (৩৩) সাত ভাই ; (৩৪) গ্রাম-দৈত্য ; (৩৫) পণ্ডাসুর ; (৩৬) তাড়িক্ষা চণ্ডী ; (৩৭) লোটন চণ্ডী ; (৩৮) ক্ষেত্রপাল ; (৩৯) তিলাই চণ্ডী।

মধ্যে পাওয়া যায়। আদিবাসীদের অবদানপুষ্ট এই সকল দেবদেবী এখন গ্রামাঞ্চলে জাঁকিয়ে বসেছেন এবং শুধুমাত্র তপশীল সম্প্রদায়ই নয়, উচ্চবর্ণের লোকেরাও এতে যোগ দেন, ব্রাহ্মণে পুজা করেন। এদিন গ্রামাঞ্চলে অনেকে বাস্তু পুজা করে থাকেন। এদিন কারও ধান মাড়াই বা ধান সেদ্ধ করতে নেই। তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সম্বৎসর ধরে লালিত শূকর, ছাগ, মোরগ, মেষ এদিন বলি পড়বে—হবে মহাভোজ। নব বস্ত্রাদি ক্রয় করার রীতি আছে সাধ্যমত। আর আছে পচাই মদ। এদিন তারা কারও নিষেধ শোনে না। অনেকের বাড়ীতে মদ তৈরী করা হয় পবিত্র বস্তুজ্ঞানে। কারণ বহুস্থানে দেবতার সামনে ঐ মদ্য নিবেদন করা হয় পুজার উপকরণ রূপে। ঢাক, ঢোল, মাদল বাজে সকাল থেকে। ভর নামে কোনো উপবাসী ভক্ত। এই ভরকে বলে 'আগোসান'। (আকর্ষণ ?) (এটি আর একটি অজ্ঞাত শব্দ। মুণ্ডারী অভিধানে পাওয়া যায় না।) ভর-নামা লোক কাঁচা পশুমুণ্ড চিবাতে থাকে—লম্ফ ঝম্ফ দেয়। জিজ্ঞাসু স্ত্রীলোকদের ভূতভবিষ্যৎ বর্ণনা করে। মানত শোধ, গড়াগড়ি ও দণ্ডী দেয়। রাঢ়ের বিশিষ্ট গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুরও এদিন অনেক জায়গায় পুজা পান। তাছাড়া আছে মেলা। ব্রহ্মদৈত্য, গোঁসাই, বাঘরায় চণ্ডীর পুজা উপলক্ষে মেলা বসে। (পরে আলোচ্য)।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে যে সকল মেলা বসে তা ১লা মাঘও থাকে। ঐ মেলাগুলি উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির আওতায় পড়ে। এগুলির প্রভাব "আক্ষেণের" সঙ্গে কিছু আছে কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। 'আক্ষাণ' দিনে পুজিত দেবদেবীগুলিকে বস্তুবাদী বিচারে কয়ভাগে ভাগ করা চলে দেখা যাক—(১) অপদেবতা অর্থাৎ corn spirit। শস্য কর্তন, মাড়াই ও গোলায় তোলা শেষ হয়েছে এখন আগামী বৎসরের জন্য শস্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন; (২) শস্য দেবতা উদ্দেশ্য ঐ; (৩) বার্ষিক ভূত বিতাড়ন পর্ব—সম্বৎসর পর গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে নানা ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হয়, রোগশান্তি ও ভূত বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। যাতে পর বৎসর গ্রামের লোক সুখে দিন কাটাতে পারে; (৪) নবান্ন উৎসব; (৫) বৃষ্টি দেবতার পুজা।

এগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা কষ্টকর হয় না যে আর্য জাতি যখন বহু সহস্র বৎসর পুর্বে ট্রাইবাল জীবনযাপন করতেন তখনকার সংস্কার এগুলি। (আর্যদের কয়েকটি শাখা উন্নততর চিন্তাভাবনা, সাহিত্য ধর্মকর্ম নিয়ে গেছেন)। আদিবাসীদেরও দানে পুষ্ট হয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু সমস্যা রয়ে যায়, ঐ ১লা মাঘ তারিখটি নিয়ে। ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বলেছেন, প্রত্নভূমধ্য জাতি নরবলি প্রথা ও জমির উৎপাদন শক্তিবৃদ্ধির জন্য নানারূপ অনুষ্ঠান এদেশে নিয়ে এসেছিল[৩০]। ফ্রেজারের গ্রন্থ থেকে[৩১] তুলনামূলক আলোচনার জন্য উত্তর আমেরিকার Creek Indian-দের ফসল কাটার পরবর্তী উৎসবের বিবরণ তুলে দিলাম—

ওদের শস্য কর্তনের পরেই প্রধান বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে কেউ নূতন শস্য গ্রহণ করা দূরে থাক স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এদিন লোকেরা নববস্ত্র পরিধান করে। বাসনকোসন মেজে পরিষ্কার করে। পুরাতন বৎসরের যাবতীয় জীর্ণ গৃহস্থালী সামগ্রী একত্র

জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। (আমাদের কালীপুজার রাত্রে অলক্ষীর পুজা এবং জীর্ণ গৃহ-স্থালী দ্রব্যাদির অগ্নিকাণ্ড স্মর্তব্য)। তারপর আগুন নিভিয়ে সমস্ত ছাই ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর পুরোহিত এসে নানাপ্রকার যাদুবিদ্যার সাহায্যে প্রতি গৃহে নূতন পাত্রে অগ্নি ও ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। যারা সম্বৎসর পাপ করে থাকে তাদেরও নানা-ভাবে উপবাসের দ্বারা শুচিতা বিধান এবং (পাপ) বমনের দ্বারা পাপ দুরীকরণের ব্যবস্থাও করা হয়। (তুলনীয় বিজয়া দশমীর দিন শুচিতা বিধানের জন্য শবরোৎসব)। সন্ধ্যার পুর্বেই প্রতি গৃহের পুরাতন আগুনের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত নিভিয়ে ফেলবার নিয়ম। তারপর সকলে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে নিষ্পাপ চিত্তে অখণ্ড নীরবতা পালন করে। পুরোহিত অরণির সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বালন করে পবিত্র বেদীর উপর রক্ষা করেন। বিশ্বাস এই যে, নূতন অগ্নি পুর্ব বৎসরের সমস্ত পাপকে দমন করে ফেলবে। (তুলনীয় আমাদের বিল্ব বৃক্ষমূলে দুর্গাদেবীর বোধন। বিদ্যানিধি মশাই লিখেছেন, "অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের নাম বোধন। বিল্বকাষ্ঠের অরণি, এই হেতু দেবী বিল্ববাসিনী। দুর্গা অগ্নিস্বরূপা। অগ্নি সকল শক্তির প্রতিনিধি। অরণিতে অগ্নি উৎপাদন হয়। সেই অগ্নি কুমার। তিনিই কুমারী দুর্গা[৩২]।" এরপর একঝুড়ি নূতন ফল বা ফসল আনা হয়। পুরোহিত কিছু তেল ও মাংস সহযোগে ঐ শস্য বা ফল পিষ্ট করে অগ্নিতে আহুতি দেয়। পাপ মোচনের জন্য একটি পশুও বধ করা হয়। এরপর পুরোহিত নানারকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে থাকে। স্ত্রীলোকরা উৎফুল্ল হয়ে অগ্নি নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যায়। এই উৎসব আটদিন স্থায়ী হয় এবং শেষ দিনে লোকেরা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলা ও স্নান করে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটায়। (তুলনীয় নবরাত্র ব্রত ও শবরোৎসব)। বিদ্যানিধি মশাই-এর বক্তব্য এই, "নববর্ষ প্রবেশ হেতু শবরোৎসবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শবর জাতির বাস ছিল। বোধ হয় তাহাদের রাজা নবরাত্র করিতেন। তাঁহার শবর জাতীয় প্রজা ঘট বিসর্জনের পর জলকাদা লইয়া খেলা করিত। নববর্ষারম্ভে হর্ষক্রীড়া স্বাভাবিক[৩৩]।"

লিথুয়ানিয়ার কৃষকরাও ডিসেম্বরের সুরুতেই নূতন ফসল ওঠার পর মদ্য, শস্য ও মোরগ উৎসর্গ করে কৃষিদেবতার উপাসনা করে থাকে। বেচুয়ানার অধিবাসীরা নিজেদের শুদ্ধ না করে নূতন ফসল গ্রহণ করে না। এই ঘটনা ঘটে নববর্ষের দিন।

নবান্ন উৎসব : বাঙালীর ঘরে ঘরে উদ্‌যাপিত নবান্ন উৎসবের কথা নূতন করে বলার কিছু নেই। অন্যদেশের দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে তুলনার জন্য আলোচনা করা যেতে পারে। ইয়ো-রোপের সর্বত্র শস্যদেবতাকে মানুষের মত মূর্তি গড়ে বা পিঠা তৈরী করে উৎসব অনুষ্ঠানের পর ভক্ষণ করার রীতি আছে যা আমাদের নবান্ন উৎসবের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়। ভারতে নীলগিরির পার্বত্য উপজাতিরা অন্য উপজাতির লোক দিয়ে প্রথম বীজ বপন ও শস্য কর্তন করায়। প্রথম কর্তিত শস্য দিয়ে পিঠা তৈরী করে মদ্যমাংসসহ দেবতাকে উৎসর্গ করে ভোজন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে নবান্ন উৎসবকে "পনগল" বলে। নূতন চাল, নূতন পাত্রে দুধসহ সেদ্ধ করা হয় উত্তরায়ণ শুরু হবার প্রথম দিন। সবাই উৎসুক হয়ে পাত্রের ভিতর

তাকিয়ে থাকে। দুধ যদি বেশী উথলায় (তুলনীয় "বাঙ্গালীর সোহাগ উথলানো") তাহলে পরবৎসর সমৃদ্ধশালী হবে বলে ধরা হয়। পরমান্ন তৈরী হলে গণেশকে উৎসর্গ করার পর সকলে গ্রহণ করে।

অতএব এই সকল দৃষ্টান্ত তুলনা করলে অনুমান করা শক্ত হয় না যে আমাদের ভাববাদী চিন্তাধারা শস্যমাতাকে, শস্যদেবী লক্ষ্মীরূপে পরিণত করেছে এবং লক্ষ্মী থেকে তাঁর পতি, বিষ্ণু বা নারায়ণ-উপাসনা এসে স্থানলাভ করেছে নবান্ন-উৎসব বা শস্য-কর্তন পর্বে। আসলে এগুলি হল আদিম সমাজের অবদান এবং এই সকল বিশ্বাস এমন কালে জন্মগ্রহণ করেছিল যখন উচ্চতর ভাববাদ এবং ঈশ্বরবাদ মনুষ্য জাতির কল্পনায় ছিল না। এই প্রসঙ্গে জেমস, ফ্রেজারের মন্তব্য প্রকাশ করে আলোচনা শেষ করছি—

The spring and harvest customs of our European peasantry deserve to rank as primitive···they are practised not in temples or churches but in the woods and meadows, beside brooks, in barns on harvest fields and cottage floors. The supernatural being whose existence is taken for granted in them are spirits rather than deities : their functions are limited to certain well defined departments of nature : their names are general, like the Barley-mother, the old woman, the maiden, not proper names like Demeter, Persephone, Dionysus. Their generic attributes are known but their individual histories and characters are not the subject of myths. For they exist in classes rather than as individual, and the like members of each class are indistinguishable[৩৪]."

মেড়া পোড়ানো : সাধারণতঃ হোলির দিন মেণ্টাসুরের প্রতীক স্বরূপ কোনো মূর্তিকে পোড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু বীরভূমের অনেক অঞ্চলে নবান্নের দিন প্রচুর পরিমাণে শরের ফুল রৌদ্রে শুকিয়ে নানাভাবে পোড়ানো হয়। এই শরের ফুলকেই মেড়া বলে। নবান্নের দিন মেড়া পোড়ানোর অর্থ সহজবোধ্য। নূতন শস্য গোলায় উঠেছে এখন Corn-spirit-কে দাহ করা হল। এই প্রথাটি বিশ্বের আদিম সমাজে নানারূপে বজায় আছে।

অলক্ষ্মীর বিতাড়ন : কালীপুজার রাত্রে অলক্ষ্মী বিতাড়নের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। ভাঁড়ার ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল জড়ো করা হয়। একজন ভাঙ্গা টোকার মধ্যে সেই জঞ্জালের কিয়দংশ নিয়ে একটি কাঠি দিয়ে টোকাটিকে পিটতে পিটতে নিকটস্থ ধানমাঠের দিকে যায়। মুখে বলতে থাকে, "অলক্ষ্মী যাও ছারেখারে···"। ধানমাঠে গিয়ে সেই জঞ্জালগুলি নিক্ষেপ করে সবুজ ধান অথবা শিষ টোকায় নিয়ে আবার পিটাতে পিটাতে ফিরে আসে ভাঁড়ার ঘরে। তখন সে অবিরত জপতে থাকে, "লক্ষ্মী এসো সোনার ভারে"। এইভাবে সাতবার আনাগোনার পর সম্বৎসরের ব্যবহৃত চালুনী, ঝুড়ি, টোকা, কুলো, ভাঙ্গা দ্রব্যাদি জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় প্যাকাটির সাহায্যে। প্রতিটি লোককে অগ্নিসংকারে

অংশগ্রহণ করতে হয়। দেওয়ালির দিন থেকে এককালে যে নববর্ষ পালন করা হত, তারই স্মৃতি এই প্রথাটি।

হোলির আগুন : হোলিকে আমরা ধর্মীয় রূপদান করেছি কিন্তু আদিবাসীদের হোলি উৎসব পালনের রীতি লক্ষ্য করলে এর পশ্চাতে বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। মুণ্ডা জাতিরা খড় বা বাঁশ দিয়ে একটি ঘরের মত করে পিটুলীর তৈরী মানুষ বা ভেড়ার মূর্তি রাখে। তারপর সেটিতে অগ্নি সংযোগ করে থাকে। উড়িষ্যার আদিবাসীরা একটি জীবন্ত ভেড়াকে দগ্ধ করে। মথুরা অঞ্চলে একজন মানুষকে আগুন স্পর্শ করে লাফাতে হয়। গোরখপুরে হোলি উপলক্ষে একটি বানরকে মেরে গ্রামের সীমানায় রেখে দেবার নিয়ম। উত্তরপ্রদেশে কোনো কোনো জায়গায় হোলির সময় গায়ে ফুল ও গন্ধের প্রলেপ মেখে সেই বস্ত্র পরে ঘষে তুলে আগুনে দেবার বিধি আছে। সেই সঙ্গে মানুষটি যত দীর্ঘ তত দীর্ঘ একখণ্ড সুতো মেপে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। বিহারে, সংগৃহীত কাঠে আগুন ধরিয়ে, সেই আগুনে ছোলা গাছ, তিসি, সুপারি, নারিকেল পিঠা প্রভৃতি নিবেদন করার রীতি। রাজসাহী, মৈমনসিংহ, বরিশাল, মেদিনীপুর থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত পশ্চিমে হাজারিবাগ, এমন কি সুদূর কুমায়ুন পর্যন্ত সর্বত্র হোলির পরে যে ছাই পড়ে থাকে, তাকে বিশেষ দৈবগুণসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। গঞ্জামে, সেই ছাই মাঠে ছড়ালে দ্বিগুণ ফসল হবে বলে লোকে বিশ্বাস করে। কোথাও বা শস্যে পোকা লাগবে না এই ভরসায় ছাই গোলার মধ্যে রেখে দেয়। হাজারিবাগ জেলায় হোলির পোড়া কাঠ কোনো ফল গাছের উপর ছুঁড়ে ফেললে দ্বিগুণ ফল ধরবে বলে লোকে মনে করে। মধ্যপ্রদেশে গণ্ড জাতি হোলির আগুনে তপ্ত লাঙ্গলের ফাল দিয়ে বৎসরের প্রথমে ভূমি কর্ষণ করে[৩৫]।

এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে হোলি উৎসবে অগ্নিকাণ্ডই আসল ব্যাপার—ব্রাহ্মণ্য সমাজ একে যত চাপা দেবার চেষ্টা করুন না কেন! ধর্মঠাকুরের গাজনে যে আগুন নিয়ে খেলা, আগুন বা ছাই নিয়ে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড হয়ে থাকে তারও তাৎপর্য এই তত্ত্বের মধ্যে নিহিত। (নির্দিষ্ট অধ্যায়ে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

সাঁকো স্নান : শিশু-জন্ম এবং দাঁত ওঠার ব্যাপার নিয়ে সারা দুনিয়ার অনগ্রসর সমাজে অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত আছে। একটি অনুষ্ঠান এই রকম—জোড়া মাসে দাঁত উঠ্‌লে (পুং-শিশুর) তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কোনো সাঁকোর নীচে। সেখানে মাটির শৃগাল শকুনী গড়ে কিছু পুজা ও নানারকম তুক্‌তাকের পর শিশুটিকে সাঁকোর নীচের জলে স্নান করিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। সকল বর্ণের মধ্যে এই প্রথা পালিত হত। এখন 'নবশাখ' সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে টিকে আছে। এই সাঁকো স্নানের আবার রকম ফের আছে। অন্নপ্রাশনের আগে দাঁত উঠ্‌লে কোনো কোনো জায়গায় আবার শিশুকে দুটি পাশাপাশিভাবে ফাঁক করে রাখা ইঁটের উপর দাঁড় করিয়ে স্নান করানো হয়ে থাকে। এই সব স্নানের তাৎপর্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। এই প্রথা আর কোন্ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে তারও সন্ধান পাই নি। তবে

যেখান থেকেই আমদানী হোক এটি একটি আদিম যাদুবিশ্বাসের অন্যতম নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

দন্তরুচি : দাঁত ওঠার মত দাঁত পড়ে গেলেও নানারকম কৃত্য আমাদের মধ্যে চলিত আছে। যেমন পড়ে যাওয়া দাঁত ইঁদুরের গর্তে দেবার নিয়ম যাতে ইঁদুরের মত চমৎকার দাঁত শিশুর জন্মায়। প্রশান্ত মহাসাগরে Raratonga দ্বীপের অধিবাসীরা শিশুর দাঁত পড়ে গেলে আমাদের মতই ইঁদুরের গর্তে নিক্ষেপ করে আবৃত্তি করে—"Big rat! little rat! here is my old tooth. Pray give me a new one." জার্মানীতেও ব্যাপকভাবে লোক-বিশ্বাস আছে যে উৎপাটিত দন্ত ইঁদুরের গর্তে দিতে হয়। ভাবলে বেশ আশ্চর্য লাগে। নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর আদিবাসীরা, শিশুর দাঁত জলের ধারে কোনো গাছের ফোকরে রেখে দেয়। সেটি যদি জলে পড়ে যায়, তবে লক্ষণ উত্তম। কিন্তু সেটি যদি বাইরে বেরিয়ে পড়ে অথবা পিঁপড়েরা তার উপর চরে বেড়ায়, তাহলে তারা মনে করে শিশু নানারকম মুখের অসুখে ভুগবে।

আঁতুড়ের পরবর্তী কৃত্য : আমাদের দেশে আঁতুড় ঘর সম্পর্কে নানারকম বিশ্বাস ও তুক্‌তাক প্রচলিত আছে। অশিক্ষিত ধাই সম্প্রদায় এইগুলি বয়ে নিয়ে আস্‌ছে। মাদুলি ধারণ, পেঁচোয় পাওয়া, ছেদিত নাভি সম্পর্কে সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলি অল্পবিস্তর আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কার অনগ্রসর সমাজের দান। পৃথিবীর বহু আদিম সমাজে এই সমস্ত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু নমুনা—

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় লোকবিশ্বাস এই যে নাভি বাঁধার সুতো জলে নিক্ষেপ না করলে জাতকের স্বাস্থ্য ভাল যায় না। কুইন্সল্যাণ্ডে বিশ্বাস যে, শিশুর একাংশ ভূতরূপে বিরাজ করে। সুতরাং ঠাকুমা আঁতুড়ের বস্তগুলি বালিতে পুঁতে রেখে সেই স্থানটি গাছের ডাল দিয়ে গোলাকারে চিহ্নিত করে তাদের মাথাগুলি ছাঁদনাতলার ধরণে বেঁধে দেয়। ক্যারোলিন দ্বীপে শিশুর নাভিকে একটি খোলার মধ্যে রেখে গাছে বা অন্য কোনো স্থানে স্থাপন করা হয় যাতে সে উত্তম বৃক্ষারোহী হতে পারে। কী দ্বীপের অধিবাসীরা নাভিকে মনে করে জাতকের ভাই অথবা বোন। সুমাত্রার বাটকদের মধ্যে ফুলকে (Placenta) অনুরূপ ভেবে থাকে। এই রকম বিশ্বাস বহু জায়গায় আছে। Cherokees-রা বালিকাদের নাভি উদুখলের নীচে পুঁতে রাখে যাতে সেই বালিকা ভালো রুটি তৈরী করতে পারে। কিন্তু বালকের নাভি গাছের উপর টাঙিয়ে দেওয়া হয় ভালো শিকারী হবে বলে। পেরুর ইনকারা অসুস্থ শিশুকে, রেখে দেওয়া নাভি চুষতে দেয়। প্রাচীন মেক্সিকোবাসীরা বালকের নাভি যুদ্ধক্ষেত্রে পুঁতে দিত যাতে সে ভালো সৈনিক হয় কিন্তু বালিকার নাভি বাড়ীর মধ্যে পুঁতত, উত্তম গিন্নী হবে এই আশায়। বার্লিনে নাভি শুকিয়ে জাতকের বাপের হাতে দিয়ে চিরকাল রক্ষা করতে বলা হয়। এতে নাকি শিশু কুশলে থাকবে। ব্যাভেরিয়াতে নাভিকে কাপড়ে জড়িয়ে রেখে খুঁচিয়ে অথবা টুকরা টুকরা করে কাটার নিয়ম আছে যাতে শিশু ভবিষ্যতে কুশলী শিল্পী হয়ে ওঠে এই বিশ্বাসে।

আমাদের আঁতুড়ে গো-মুণ্ডে ষষ্ঠীপুজা হয়ে থাকে। বহির্ভারতীয় তুলনীয় দেবীও আছেন। (এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা ষষ্ঠী ও শীতলা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

নুনপালা : চৈত্রমাসে "নুনপালা" বলে একটি দিনকে গণ্য করা হয়। এইদিন লবণ গ্রহণ করতে নেই। এদিনও বাঘরায় চণ্ডী ইত্যাদি বহু গ্রাম্য দেবদেবীর পুজা দিতে হয়। নুনপালা দিনটি তপশীল সম্প্রদায় কর্তৃকই প্রধানতঃ পালন করা হয়।

পান্তপালা : সাধারণতঃ বৎসরে দুদিন পান্ত ভাত খাবার নিয়ম। পঞ্জিকার ভাষায় অরন্ধন। প্রথম হল, ভাদ্র সংক্রান্তির দিন রেঁধে রেখে পরদিন ১লা আশ্বিন, ষষ্ঠী পুজায় ভোগ দিয়ে খাওয়া হয়। দ্বিতীয় হল, সরস্বতী পুজার দিন চৌদ্দ শাক দিয়ে নানারকম কলাই ও গোটা তরকারী (সংখ্যায় প্রতিটি ৫ অথবা ৭) সহ ব্যাঞ্জন ও ভাত রান্না করে পরদিন ষষ্ঠী-দেবীকে ভোগ দিয়ে খেতে হয়।

মাড় উৎসর্গ : অনেক জায়গায় জিতাষ্টমীর দিন পুর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে মাড় গড়িয়ে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এ রীতি বর্ণহিন্দুদের মধ্যে একেবারেই চলিত নেই।

কুমারী পুর্ণিমা : কার্তিক পুর্ণিমা তিথি। বরকনে বিয়ের প্রথম বছর পালন করে। (উড়িষ্যায় এই রীতির চলন বেশী।)

পনা সংক্রান্তি : বৈশাখের শেষ দিনকে বলে। একে পাটুয়াও বলে। সাতদিন উপবাস করা হয়। পরবকে বলে ঝামু যাত্রা। ব্রতীরা কাঠের রণপা চড়ে দেবদেবীর নামে ঘট বহন করে আগুনের মধ্যে হাঁটে। (এ রীতিও উড়িষ্যায় পালিত হয়ে থাকে।)

ঘোড়া পুর্ণিমা ঘোড়ার যাত্রা : চৈত্র পরব বা চৈত্র দোল। নৌকার মাঝিরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। (এটিও উড়িষ্যায় পরিদৃষ্ট হয়।)

সন্তান ঘটিত : সন্তান কামনায় আর্য ভাবনায় যেমন নানা যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড আছে, তেমনি অনগ্রসর সমাজেও অজস্র রকম ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব নেই। কবচ-মাদুলি ধারণ, দেবস্থানের প্রসাদ গ্রহণ, বিধিনিষেধ মানা, মানত রাখা, অপদেবতার স্থানে ঢিল বাঁধা, নিঃসন্তান দম্পতির বস্ত্রাঞ্চলে গিঁঠ দিয়ে অষ্টমী স্নান এবং স্ত্রীর আঁচলে বালি বাঁধা প্রভৃতি বহু সংস্কারই পালিত হয়ে থাকে। অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। শস্য জন্মের সঙ্গে সন্তান জন্মের বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কিছু নমুনা দিই—ব্যাভেরিয়া আর অষ্ট্রিয়ার চাষীরা বিশ্বাস করে যে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে গাছের প্রথম ফলটি খাওয়ানো গেলে পরের বছর সেই গাছ থেকে অজস্র ফল পাওয়া যাবে। ইতালি কৃষকরা মনে করে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেয়েরা যদি বীজ বোনে তাহলে গর্ভস্থ ভ্রূণের অনুপাতে গাছটি বড় হবে। আমাদের মতই দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস, মেয়েরা জোড়া ফল খেলে জোড়া সন্তানের মাতা হবে। খোন্দ উপজাতি, বন্ধ্যা নারীকে সন্তান কামনায় দুটি স্রোতের সঙ্গমস্থলে স্নান করায়। জাঠদের বিশ্বাস, তিনটি গ্রামের সীমানায় গিয়ে স্নান করলে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। পাঞ্জাবের নানাজায়গায় মানুষের ধারণা চৌমাথার মোড়ে পাঁচটি কুয়োর জলে স্নান করলে বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে। অনুরূপ বিশ্বাস আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার

অধিবাসীদের মধ্যে আছে। দঃ ভারতে নানা উপজাতির মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বরকে মাটি চষতে হয়[৩৬]।

কুর্মিদের প্রথা, দক্ষিণ ভারতের প্রথা এবং সাঁওতালদের বিবাহের সময় শস্যের অঙ্কুরোদ্গম পুর্বে আলোচনা করেছি। রাঢ়ের মনসা পুজাতে অনেক জায়গায় শস্য পরিপুর্ণ একটি চাকা লাগানো নৌকা, বরকে সারা গ্রামে টেনে বেড়াতে হয়। এরও অর্থ সম্ভবতঃ সন্তান জন্ম সম্পর্কিত।

ঝড় সংক্রান্ত : ঝড় নিবারণের জন্য নানারকম তুক্‌তাক পৃথিবীর সকল আদিম সমাজে প্রচলিত আছে। মধ্যযুগে ডাকিনীরা রুমালে গিঁঠ দিয়ে ঝড় দমন করত। সেই গিঁঠযুক্ত রুমাল নাবিকরা ব্যবহার করত। আমাদের এদিকেও দু'একটা নমুনা পাওয়া যায়। প্রবল ঝড় উঠ্‌লে তাকে থামাবার জন্য বাড়ীর উঠানে একটি পিঁড়ি ফেলে দেওয়া হয়। যাতে ঝড় একটু শান্ত হয়ে বসতে পারে।

রোগ নিরাময় দোষ মুক্তি ইত্যাদি : রোগ নিরাময়, অপঘাত বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যু হলে আমাদের সমাজ নানারকম তুক্‌তাকের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এইসব বিশ্বাসের মুল আমরা প্রাচীন মিশর এবং আদিবাসীদের কাছ থেকে পেয়েছি। কবচ, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক, দোষ ছাড়ানো, জলপড়া, তেলপড়া, আমসী পড়া ইত্যাদি তুক্‌তাকের অন্ত নেই। অনুন্নত সমাজের মধ্যে এই বিশ্বাস অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল। সাঁওতাল জাতি প্রেত ভয়ে অসুস্থ ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে একটি কাস্তে ঝুলিয়ে রাখে। রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে তেমাথায় দাঁড় করিয়ে পালাজ্বরের রোগীর দোষ ছাড়ানো হয়। রাতকানা এবং শয্যামূত্রের রোগীও নাকি ঐ তেমাথায় একটি ক্রিয়ার ফলে আরোগ্য লাভ করে। রোগী তেমাথায় এসে রাত্রিবেলা কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে বসে থাকবে। কোনো লোক হঠাৎ সেখানে এসে ভয় পেয়ে প্রশ্ন করলেই একটি পাণ্টা উত্তর দিয়েই রোগী ছুটে পালাবে। লোকবিশ্বাস এই যে, শয্যামূত্র এবং রাত-কানা রোগ ঐ আগন্তুকের দেহে সঞ্চারিত হয়ে যাবে।

সাঁওতাল জাতিদের মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের আগে একজন লোক বাঁ হাতে একটি মোরগ উঁচু করে ধরে চিতার বাঁ দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে তারপর একটি খুঁটার সঙ্গে মোরগটির গলায় একটি কীলক পিটিয়ে গেঁথে ফেলে। রোগীর দোষ ছাড়াতে হলে একটি মোরগকে ধরে তার মুখের সামনে কিছু শস্যদানা রাখা হয়। সে যেই এক আধটু ঠোক্‌রাতে সুরু করলে অমনি যাদুকর সেটিকে ডান হাতে নিয়ে দ্রুত মাথার উপর ঘুরিয়ে বাঁ পা এবং বাঁ বগলের নীচে দিয়ে মোরগটিকে পার করে। অনুরূপ ভাবে বাঁ হাতে ধরে ডান পা এবং ডান বগলের নীচে দিয়ে পার করা হয়। এইভাবে তিনবার ঐ ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি চলে। এরপর রোগীর হাত থেকে কয়েক দানা চাল মোরগটিকে খুঁটতে দেওয়া হয়। যদি মোরগটি চাল গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে রোগীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে। রোগীর অবস্থা জানার জন্য সাঁওতাল ওঝা বালির উপর তিনটি চক্রাকার দাগ কাটে। একটি চক্র আরোগ্যের, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর এবং তৃতীয়টি জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার দ্যোতনা করে। এরপর একটি

সরু কাঠের টুকরা নিয়ে আলগা ভাবে খাড়া করে ধরে ঠোকা দেওয়া হয়। দেবতার নির্দেশে কাষ্ঠখণ্ডটি যেদিকে এগিয়ে যাবে, সেইটিই রোগীর পরিণতি বলে ধরতে হবে। চুরির কিনারা হদিস করার বেলাতেও এই রকম কাণ্ড করা হয়।

হিন্দুদের মত সাঁওতালদের মধ্যেও অস্থি নিয়ে গিয়ে নদীতে দিতে হয়। তবে তারা দেয় দামোদা (দামোদর) নদীর ঘাটে। একটি শাল গাছের লাঠি মাটিতে পুঁতে একটি লোহার খাড়ু ও পয়সা রেখে দেয়। অস্থি জলে ভাসানোর পর ভিজা কাপড়ে ডাঙ্গার উপর হাঁটু গেড়ে বসতে হয় পুর্বমুখে। তারপর ভিজা বালি তুলে তিনটি মন্দির তৈরী করতে হয়। সেখানে মিঠাই মুড়কি ইত্যাদি দিয়ে মারাং বুরু প্রভৃতি দেবতার নামে পুজা দেওয়া হয় তারপর আর একবার স্নান করে বাড়ী যায়।

বর্ণ হিন্দুরা মৃত্যুর পর বহু আচার পালন করে থাকে। যেমন যেখানে রোগী মারা যায় সেখানে একটি পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়, শ্রাদ্ধকর্মের অধিকারীকে প্রেত ভয়ে লোহা ধারণ করতে হয়, সৎকার কর্মের পর শ্মশান যাত্রীদের নিমপাতা চিবিয়ে বাড়ীর দরজায় রক্ষিত আগুনে হাত সেঁকে নিতে হয় ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এ সমস্তই আদিবাসীদের অনুন্নত বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে পাওয়া।

ভুলো লাগা ভুলো পোড়ানো : অপদেবতার প্রভাবে পথ ভুল করা, বিপথে চলে যাওয়া বা নিশির ডাকে ঘর ছেড়ে বের হওয়াকে ভুলো লাগা বলে। ভুলো লাগার নিরাময়-কল্পে মাঠে খুঁটা পুঁতে ছাগল ইত্যাদি বলিদান এবং ভুলো পোড়ানের ব্যবস্থা আছে। (বিস্তারিত আলোচনা, "ধর্মঠাকুর ও বেতের ছড়ি" অধ্যায়ে দ্রঃ)

ডাইনী, পুকোশ : ভূত প্রেত, ডাইনী ইত্যাদিতে বিশ্বাস দুনিয়ার সকল সমাজেই অল্পবিস্তর আছে এবং ঐসব বস্তুর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত আছে। ভূত বিতাড়নের শ্রেষ্ঠতম কৃত্যগুলি ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসবে আত্মগোপন করে আছে তা পরে দেখানো হবে। ডাইনী বলে একজাতীয় স্ত্রীলোককে চিহ্নিত করা হয়। রাঢ়ে এদের বলে 'পুকোশ'। তারা নাকি দৃষ্টিপাত মাত্রেই শিশুদেহের রক্ত শোষণ করে নেয়। এর প্রতিকার হল, সেই ডাইনী আবার যেদিন আসবে সে দিন বাড়ীর দরজায় একটি ধান-মই ফেলে রাখা। সে যদি প্রকৃতই ডাইনী হয় তাহলে সে কিছুতেই ওটাকে সরাতে চাইবে না। দূরে দাঁড়িয়ে সরিয়ে নেবার জন্য মিনতি জানাবে। সেই সময় তার মাথায় একটু নুন ছিটিয়ে দিলে সে উল্টে পড়ে গড়াগড়ি দেবে এবং ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাই তার থাকবে না। তা ছাড়া ডাইনী ইত্যাদির দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্য শিশুর কপালে থুথুর টিপ, কড়ে আঙুল কামড় দিয়ে রাখা ইত্যাদি সযত্নে পালিত হয়ে থাকে। সাঁওতালদের মধ্যে গ্রামে মড়ক উপস্থিত হলে মনে করে কোনো ডাইনীর কাজ। ডাইনীকে খুঁজে পেলে তাকে হত্যা করতে ইতঃস্তত করে না তারা। শিশু সামান্য আঘাত পেলে সাঁওতাল মা তুক্‌তাক করে। তার নাম 'আটাসি পাটাসি'।

বশীকরণ : তন্ত্রগ্রন্থে মারণ উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বহু নির্দেশ রক্তবর্ণ হরফে

বটতলায় ছাপা বই পাওয়া যেত। সে সব বই-এ যে সকল অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ দেখা যেত তার সঙ্গে তন্ত্র বা ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। আদিম যাতুবিশ্বাস ও তুকৃতাক অবলম্বন করে কতকগুলি সুবিধাবাদী তথাকথিত তান্ত্রিকদের কাণ্ড। বাস্তবক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ফলে অনুরূপ তুকৃতাকের বা বিশ্বাসের অভাব ঘটে না। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি—পুরুষ মানুষকে বশ করার উদ্দেশ্যে গোটা সুপারি কোনো স্ত্রীলোক গিলে ফেলে। পরে মলের সঙ্গে সেই সুপারি নির্গত হলে সেটিকে ধুয়ে কুচিয়ে পানের সঙ্গে বাঞ্ছিত পুরুষকে খাওয়ালে সে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ে যায়।

উচাটন : হিংসার বশবর্তী হয়ে লোকে তুকৃতাকের সাহায্যে নানাভাবে ক্ষতি করে থাকে বলে আমরা বেশ বিশ্বাস করে থাকি। কোনো ভাল বস্তুর উপর লোকের কুনজর পড়েছে, এই ভাবনা অল্পবিস্তর সবাই ভাবে। নির্মিয়মান বাড়ীর উপর ঝাঁটা, জুতো টাঙ্গানো তো সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। ক্ষতি করা, ঝগড়া বাধানো, মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিচিত্র বিশ্বাস, বিচিত্র আচরণ ও বিচিত্র রকম প্রতিকারের উপায় দেখা যায়। রোজা, ওঝা, গুণিনদের এসবে একচেটিয়া অধিকার। বলাবাহুল্য মাত্র ঐ সমস্ত লোক-ভীতির মূলে সত্য থাক বা না থাক এগুলি সমস্তই এসেছে আদিবাসীদের অনুন্নত চিন্তা ভাবনা থেকে। সাঁওতালদের মধ্যে অনুরূপ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করছি—কারো গোরু দুধ দিচ্ছে বেশী, তার বাড়ীর প্রাঙ্গণে গোপনে একটু দুধ পুঁতে দাও, কারো গাছে ভালো ফল হচ্ছে, লুকিয়ে ফল পুঁতে রাখো, কাউকে মারতে চাও, মানুষের হাড় পুঁতে দাও—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সন্দেহ হলে, সাঁওতাল গুণিন এসে স্থানটি নির্ণয় করে বস্তুটি তুলে ফেলে দেয়, তাহলেই শাস্তি। গ্রামে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হলে শত্রুর দরজায় মল ত্যাগ করে আসা অতি সাধারণ ঘটনা। শত্রুপক্ষ জিঘাংসাপরায়ণ হলে, সেই বিষ্ঠার উপর ঝুড়ি ধোয়া জল, সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিশ্বাস, এর ফলে নাকি দোষী ব্যক্তির সর্বাঙ্গ ঘা-এ ভরে যায়।

ধর্মকর্ম : ধর্মকর্ম আমাদের সমাজিক জীবনে প্রধানতম অংশ অধিকার করে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বয়ে নিয়ে আসছে নিজেদের বিশ্বাস ভাবনা ও ধারণা। কিছু বদলেছে, বিকৃত হয়েছে অপরের কাছ থেকে স্বাঙ্গীকরণ করেছে। তবু একটু সতর্ক হয়ে বিচার করলে এই ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচারের ভিতর আদিবাসীদের অবদান সহজেই নির্ণয় করা যায়। আচার্য সুনীতিকুমার বলেন "ধানের চাষ, পান সুপারীর ব্যবহার ভারতীয় সভ্যতায় এগুলি অষ্ট্রিক জাতির দান বলে মনে হয়। আর তাছাড়া এদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান আমাদের হিন্দু পূজা পদ্ধতিতে ও বিবাহের আর শ্রাদ্ধের নানা অনুষ্ঠানে আর হিন্দুর পুনর্জন্মবাদের অন্তরালে অবস্থান করছে বলে অনুমান হয়[৩৭]।"

পাহুড় : পাহুড় শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় জৈন ধর্মগ্রন্থে। "ধর্ম পুজাবিধানেও" শব্দটি আছে। কেউ কেউ পাহুড় শব্দের অর্থ করেছেন, অধিকার। সাঁওতালি ভাষায় পাহুড় অর্থ উৎসর্গের জন্য রক্ষিত মোরগ। কুক্কুট সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্য আছে। হিন্দুধর্মেও কুক্কুট সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত পাই। দুর্গা ও কার্তিক কুক্কুটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। (সিউড়ী থানার রাইপুর

গ্রামে "মুরগী ঠাকরুণ" নামে এক দেবী বাউরী সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিতা হন। মুরগী ঠাকরুণের স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে বহির্ভারতীয় সূত্র অনুসন্ধান করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, ট্রানশালভেনিয়া, হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য বহু দেশের কৃষকরা বিশ্বাস করে যে শস্যক্ষেত্রের অপদেবতা বা Corn Spirit হল মোরগ। শস্যক্ষেত্র থেকে মোরগ ভূত বিতাড়নের জন্য অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড ও বিশ্বাস তাদের মধ্যে রয়েছে। ঐসব দেশে কোনো কোনো জায়গায় মোরগের মূর্তি তৈরী করে শস্যক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়। কোথাও বা জীবন্ত মোরগকে শস্যের শিষ দিয়ে সাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। কোথাও বা ফসল কাটার সময় একটি জীবন্ত মোরগ রেখে ফসল কাটা শেষ হওয়ার পর মোরগটিকে সারা শস্যক্ষেত্রে তাড়িয়ে নিয়ে নানাভাবে বধ করে পালকগুলি পর বৎসর চাষের আগে মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তর আমেরিকার কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে বসন্তকালে শস্য দেবীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা মনে করেন যে, অমর জীবনের অধিকারিণী একজন বুড়ীই হল শস্য উৎপাদনের কর্ত্রী, এবং তার প্রতিভূ হল জলমোরগ। এদেশেও মোরগ নিয়ে অনেক প্রকার কৃত্য সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের মধ্যে চলিত আছে। মুণ্ডাদের বিষ-নাশন কাজে মোরগ ঝাঁপ সুবিদিত প্রথা। সাঁওতালরা শব সৎকার কালে একটি গাছে মোরগকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করে রাখে তা হাণ্টার সাহেব দেখিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, সিংহলের আদিবাসীরা মহামারীর সময় মোরগ বলি দেয়, ভূত শাস্তির উদ্দেশ্যে। এখন স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যেতে পারে আমাদের এই মুরগী ঠাকরুণটি ঐ আদিম বিশ্বাসেরই এক টুকরো চিহ্নস্বরূপ এখনও টিঁকে আছে।) পাহুড়ের কথায় ফিরে আসা যাক—পাহুড় অর্থে মোরগ গ্রহণ করে অনুমান করা. যেতে পারে যে শব্দটি অষ্ট্রিক মূল থেকে জৈনরা প্রাকৃতে গ্রহণ করে থাকবেন। পরে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলার কুক্কুটি ব্রতও এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য।

করম পর্ব: সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির মধ্যে বর্ষাকালে অথবা হেমন্তকালে "করম পরব" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন, এটি বর্ষা উৎসব এবং বাংলাদেশের ভাদু উৎসব তারই হিন্দু সংস্করণ। কিন্তু করম ও ভাদু এই দুটি অনুষ্ঠানের চেহারা ভালভাবে লক্ষ্য করলে এই ধারণা যথার্থ বলে মনে হয় না। (বাঙ্গালীরাও করম পর্ব পালন করে। এর বিস্তারিত বিবরণ শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রদান করেছেন[৩৮]।) বরং করম পরবের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পুজানুষ্ঠানের বেশ কিছুটা মিল আছে। (পরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে)। বীরভূমের সিউড়ী ও দুবরাজপুর থানায় যথাক্রমে করমশাল ও করমকাল নামে দুটি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। আগে দেখিয়েছি "করমশাল" একটি ধানেরও নাম।

সাত ভাই: শীতলা, মনসা এবং চণ্ডীর সাত ভগিনী এবং সাত বন-বিবির পুজা বাংলা দেশের নানা স্থানে চলিত আছে। কিন্তু সাত ভাই-এর পুজা বিশেষ চলিত নেই। সিউড়ী থানার লখীন্দরপুর গ্রামে ক্ষীর বৃক্ষতলায় ডোম সম্প্রদায় সাতটি মাটির ঢিবি গড়ে মুরগী বলি সহ ১লা মাঘ সাত ভাই-এর পুজা করে। কাটোয়ায় তাঁতিপাড়ায় কার্তিক পুজার দিন,

কার্তিকের পাশে কোনো এক রাজা এবং তার ৬ ভাই (মোট ৭)-এর মূর্তি গড়ে পুজা করা হয়। পুজা বারোয়ারী। এই সংস্কৃতির মূল কি তা হদিস করতে পারি নি।

ভাজই কুমারী : দুবরাজপুর থানায় জামথলি গ্রামে ডোম সম্প্রদায় বরাহ দ্বাদশীতে মুরগী ও পাঁঠা বলি সহ ভাজই কুমারীর পুজা দেন।

কুদরো বুড়ী : এই বুড়ীর পুজা তপশীল সম্প্রদায় কর্তৃক নানাস্থানে হয়ে থাকে। সাঁওতাল গ্রামেও এই দেবী আছেন। রিজলি সাহেব লিখেছেন—"Kudra and Bisay-chandi malignant ghosts of cannibalistic propensities"[৩৯] রাজনগর থানায় ভবানীপুর গ্রামে ধরম পণ্ডিত (ডোম) ১লা মাঘ মুরগী বলি দিয়ে কুদরো বুড়ীর পুজা দেয়।

মালঞ্চ বুড়ী : খয়রাশোল থানায় একটি গ্রামে আছেন। সাঁওতালদের পৃথিবী সৃষ্টির উপকথায় মালিন বুড়ী নামে এক দেবীর নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি তারই পরিবর্তিত রূপ।

অন্যান্য বুড়ী : লটাবুড়ী, বসতবুড়ী, বাগানবুড়ী, আহীরবুড়ী, বসন্তবুড়ী, জানাবুড়ী, দোলা বুড়ী, কদম বুড়ী, কাজলী বুড়ী, বাঁধি বুড়ী, গড় বুড়ী, ঝেঁটেনি বুড়ি ইত্যাদি নানা নামের বুড়ী পুজিত হন। ঝেঁটেনি বুড়ীর পুজা বাউরীদের কারণ তাদের এক সম্প্রদায় আছে ঝেঁটেনি নামে।

গর্ভকোঁড় বা গর্ভকোণ্ডার : সিউড়ী থানার রণপুর গ্রামে এই দেবতাটি আছেন। পুকুর পাড়ে একটি ঢিবির সামনে লোহার চিমটে ও মাটির ঘোড়া রেখে গোয়ালাষ্টমীর দিন (রাধাষ্টমী) পুজা করা হয়। ভর নামে মদ, মাংস, বলিদান সবই চলে।

মাদনা : বাঁকুড়া জেলায় পুজিত। ইনি ঘাড় মটকানো দেবতা। তপশীল সম্প্রদায় পুজা দেয়।

মোহনগিরি : যাদের বাড়ীতে থাকে তারা একটা কাজলের এবং একটি সিঁদুরের দাগ দেওয়ালে দিয়ে রাখে। আষাঢ় মাসে পিঠে দিয়ে পুজা হয়। পাঁঠা বলিও পড়ে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে বলি দেবার নিয়ম। রাঢ়ের বহু স্থানে এবং সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত এই অপদেবতার পুজা হয়ে থাকে।

দুবোইবাবা : প্রাচীন বীরভূমির অন্তর্গত—এখন জামতাড়া মহকুমায় কুকরোগ্রাম, বামুনগাঁও, বোরাটাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে এই অপদেবতার পুজা হয়ে থাকে। শ্রাবণের প্রথম সোমবার। সকল বর্ণের পুজা। দৈ-চিঁড়ের প্রসাদ দেওয়া হয়। ভর নামে। প্রবাদ, ব্রাহ্মণদের পেট না ভরা পর্যন্ত ভর নামা লোকটির পেটের কুঞ্চন বা অস্থিরতার বিরাম হয় না। কোনো কোনো গ্রামে হাজার পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সাপে কাটা রোগী এই দেবতার ফুল বেলপাতায় আরোগ্য লাভ করে বলে প্রবল লোকবিশ্বাস। (ভর নামা লোককে বলে, "চটিয়া")

মা-ভুমনী : মুর্শিদাবাদের নও পুকুরিয়া ও আরও ২/১টি গ্রামে বৈশাখ মাসে পুজা ও মেলার অনুষ্ঠান হয়। মূর্তি চতুর্ভুজা প্রস্তরময়ী।

মশান : শ্মশান থেকে মশানের উৎপত্তি। গাছের গোড়ায় অথবা মাঠে অপদেবতা মনে করে পুজা করা হয়। খুব সম্ভবতঃ শ্মশানকালী এইরূপে পরিবর্তিত হয়েছেন।

মহাদানা দানা চোরদানা : বাগদী ডোম ইত্যাদি সম্প্রদায় মুরগী বলি দিয়ে পুজা করে। অনেকের বিশ্বাস এঁরা সাপের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ান।

গ্রাম দৈত্য : সকল সম্প্রদায়ের পুজা। সাধারণতঃ মাঠে থাকেন। স্থান বিশেষে শূকর বলিও হয়ে থাকে।

ক্ষেত্রপাল : ক্ষেত্রের অধিকর্তা। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই আছেন। অনেক জায়গায় নিত্য পুজা হয়। নান্নুর থানার মোহনপুর গ্রামে নিত্য পুজা ছাড়াও আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে ও আশ্বিন মাসের মহানবমীতে বিশেষ পুজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতে করে থাকেন। মুর্শিদাবাদে ১০৮ কলসী জল ঢালা হয়। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার প্রভাব স্পষ্ট।

দাঁতিন দন্তেশ্বরী রক্তদন্তী : সিউড়ী থানার রণপুর গ্রামে আশ্বিনে একবার এবং আর একবার ১লা মাঘ এই দেবী পুজিতা হন। পাঁঠা বলি পড়ে। পুজাটি সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের। (দেবীর শিলাখণ্ড ময়ূরাক্ষী ব্যারেজের জলে নিমগ্ন।) দুবরাজপুরের ১ মাইল পশ্চিমে আছেন দন্তেশ্বরী এবং সিউড়ীর নিকট বড় মহুলায় আছেন রক্তদন্তী।

পাহাড়ী মা : পুর্বোক্ত গ্রামে এই দেবী আছেন। একটি নাগচিহ্ন সমন্বিত মনসার ভগ্নাংশ মাটিতে পুঁতে তার উপর একটি ছোট ঢিবি তৈরী করে তার উপর ত্রিশূল, চিমটে ও মাটির ঘোড়া রেখে ভাদ্র মাসে বগাপঞ্চমীর দিন পুজা করা হয়। পুজারী বাউরী সম্প্রদায়। এঁরই নাম পাহাড়ী মা।

বনকুমারী : বাউরী ও বাগদীদের পুজা। ১লা মাঘ। এই দেবীকে বনজঙ্গলের কর্ত্রী বলে মনে করা হয়।

বেলতলি : মুরারই থানায় গোপালপুর গ্রামে একটি প্রাচীন বেল গাছের কোটরে রক্ষিত দুইখণ্ড শিলা বৈশাখ মাসে পাঁঠা বলি সহ কালীর ধ্যানে পুজিতা হন।

খাজুটি ঠাকুর : নান্নুর থানার গ্রাম বালীশ্বরের এই দেবতা আছেন। অনেকে এঁকে ভৈরব বলে থাকেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার দিন বিশেষ পুজা ও ভর হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকরা ঔষধ নেয়।

ঢেলাই চণ্ডী : ময়ূরেশ্বর থানার কামারহাটি গ্রামে এই দেবী বিজয়ার পরদিন একাদশীতে এবং বৈশাখী পুর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের সঙ্গে পুজিতা হন। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি কামনায়ও পুজা করার বিধি আছে।

গুটুনী দেবী : নান্নুর থানায় মোহনপুর গ্রামের ধানমাঠে আছেন। লোকে এঁকে কালী মনে করে।

বাঘরায় চণ্ডী ও ব্রহ্মদৈত্য : পৃথক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৪ আনার পুজা : চৈত্র মাসে মঙ্গলবার শীতলা পুজার পরদিন গাছের নীচে শূকর ও মুরগী বলি দিয়ে ভূঁইয়ারা পুজা দেয়। পাতার ঠোঙায় বলির রক্ত ধরে পান করা হয়। কোনো মূর্তি থাকে না। মাটির ঢিবিতেই পুজা হয়। প্রবাদ, ঘোড়ায় চড়ে দেবতা দুষ্ট দমন করে বেড়ান। গ্রাম মাহারু (দুমকা)।

বাঘরায় চণ্ডী

বীরভূম অঞ্চলে অনেকগুলি লৌকিক দেবীর পুজা হয়ে থাকে। তাঁদের অধিকাংশই 'চণ্ডী' নামের সঙ্গে যুক্ত। তা বলে এগুলিকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত পুজা বলে মনে করলে ভুল হবে। অনুন্নত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের অনুকরণে বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত, পুজায় নিযুক্ত করার ফলে এই অবৈদিক দেবীগুলি চণ্ডী নামে পরিচিত হয়েছেন। কয়েকটি দেবীর নাম করছি—কাটাই চণ্ডী, ধনীক্ষা চণ্ডী, পাথরা চণ্ডী, পায়রা চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, চানাই চণ্ডী, তাড়িক্ষা চণ্ডী, বারাই চণ্ডী এবং বাঘরায় চণ্ডী। শেষোক্ত বাঘরায় চণ্ডীর পুজা প্রধানতঃ তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি নেই। সাধারণ শিলাখণ্ডে গাছতলায় বা ধানমাঠে পুজা হয়ে থাকে। পুজারী সচরাচর তপশীল সম্প্রদায়েরই হয়। তবে কোনো কোনো জায়গায় ব্রাহ্মণেও পুজা করেন।

বীরভূমে শত শত গ্রামে এই দেবীর পুজা হয় ধান কাটার পর। স্বভাবতঃই মনে হবে এই দেবী শস্যদেবী ছাড়া আর কিছু নন। অথচ লোকবিশ্বাস, বাঘ এই দেবীর বাহন। সাঁইথিয়া থানায় বাগরাকোন্দা নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে প্রবল লোকবিশ্বাস এই যে, বাঘ এসে রাত্রিবেলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যায় এবং মাঝে মাঝে বাঘের পায়ের ছাপও নাকি দেখা যায়। গ্রামটির নামও লক্ষণীয় বিষয়। ডুমুরিয়া নামে একটি গ্রামেও এঁকে বাঘের দেবী বলা হয়ে থাকে। পুজা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে এবং এক, দেড় হাজার লোককে ভোজন করানো হয়। কোনো কোনো গ্রামে এই দেবীকে আবার গ্রামদৈত্য নামেও অভিহিত করা হয়। রিজলি সাহেব ভূমিজ ও সাঁওতালদের মধ্যে বাঘুৎ বা বাঘভূতের পুজার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "Who protects his votaries from tigers, is worshipped in Kartik on the night of the Amabasya or the day preceding it. The offerings are goats, fowls, ghee, rice etc., which may be presented either in the homestead or on the high land close to the village." (Tribes & Castes of W. B. by A. Mitra)।

কিন্তু এই বাঘরায় চণ্ডী কে? ইনি পুরাণোক্ত চণ্ডী, না চণ্ডীর অষ্টশক্তির অন্যতমা বারাহী? বারাহীর ধ্যানে আছে হস্ত, খড়্গ, মুষল, হল্ ও বেদ। অথচ এই দেবীর পুজানুষ্ঠান অবৈদিক পদ্ধতিতে তপশীল জাতি কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়। মূর্তি বা ধ্যানের কোনো বালাই নেই। এখন শব্দতত্ত্ব ধরে "বাঘ" থেকে "বাঘরায়", না, "বাগড়া" থেকে বাগড়াই > বাঘরায় নিষ্পন্ন হয়েছে তা বলা শক্ত। বাগড়া বা বিঘ্ন বিনাশকারী দেবীও হতে পারেন; কিন্তু এরকম মনে করার পথে বাধা আছে। কারণ বীরভূম অঞ্চলের প্রবলতম গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে এই সব লৌকিক অপ্রধান দেবদেবীর বেশ সম্পর্ক আছে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বাঘরায় নামে এক ধর্মঠাকুর সিউড়ী থানায় লম্বোদরপুর গ্রামে আছেন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত "চিঠিপত্রে সমাজচিত্র" (বিশ্বভারতী) গ্রন্থে "ধর্মঠাকুরের কুটুম্বিতার বিবরণে" বাঘরায় ও শশীরায়

ধর্মঠাকুরের উল্লেখ আছে। রাঢ় অঞ্চলে বহু স্থানে ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবী হিসাবে বাঘরায় চণ্ডী বর্তমান। "পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি" গ্রন্থে মেদিনীপুরে বারা গ্রামে বিখ্যাত ধর্মকামিন্যা "রায়বাঘিনী" এবং হাওড়া হুগলী জেলায় বরদা পরগণায় শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে "শ্রীশ্রীরায়বাঘিনী" নামে ধর্মঠাকুরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই সব উদাহরণ থেকে দুই দেবদেবীর অবাধ মিশ্রণের রূপটি বোঝা যায়। সাঃ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩১৯, পৃঃ ১৬৭-৭০) ময়মনসিংহের "বাঘাই"-এর প্রসঙ্গও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। গন্ধ উপজাতির মধ্যে "বাঘেসর"-এর নামও উল্লেখযোগ্য। বাঘ টোটেম বা কুলকেতু থেকে ব্যাঘ্র দেবীর উদ্ভব তা এই দুটি উদাহরণ থেকে মনে করা যেতে পারে। বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের প্রভাবে এই দেবীর জন্ম অথবা এই দেবী থেকেই দক্ষিণরায়ের উৎপত্তি হয়েছে কিনা তাও বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। সাঁওতালদের মধ্যে এক অপদেবতা হল "বাঘুৎ বোঙা"। মুণ্ডারী ভাষায় "বাঘাই" শব্দের অর্থ হল, বিপজ্জনক। আবার "Bag aenom" নামে একটি শব্দ আছে যার মানে হল, a variety of rice plant। এটি বেশ অর্থবহ। কারণ শস্য সংক্রান্ত বিষয় থেকে এই দেবীর সৃষ্টি হয়েছে মনে করতে কোনো বাধা থাকে না। শস্য কর্তনের পর পুজার ব্যাপকতাও লক্ষণীয় বিষয়। আমাদের পৌরাণিক চণ্ডীও তো শস্য দেবী শাকম্ভরী।

বাঘরায় চণ্ডী ধর্মঠাকুরের কামিনী হিসাবে যেখানে বিরাজ করছেন সেখানে ধর্মঠাকুরের বার্ষিক গাজনের সময় তাঁর পুজা হয়। তাছাড়া প্রায় সব জায়গাতেই এই দেবীর পুজা হয় ১-লা মাঘ, "আক্ষান" দিনে। পুজানুষ্ঠানে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই। ইচ্ছামত ছাগল, মুরগী বলি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র শেখপুর নামে একটি গ্রামে দেখেছি মুরগীর ডিম বলি দিতে।

সিউড়ী থানায় হাসানাবাদ নামে একটি গ্রামে আছেন, বরাই চণ্ডী। ঐ ১-লা মাঘই পুজা হয়ে থাকে। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে কয়েকজন ভক্ত্যা উপবাসী থেকে শুদ্ধ হন এবং উত্তরীয় ধারণ করেন। পুজারী বাউরী সম্প্রদায়ের। ধর্মঠাকুরের গাজনের প্রভাব এতে স্পষ্ট।

আরও ব্যাপক অনুসন্ধান এবং তুলনামূলক গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত বাঘরায় চণ্ডীর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমি সামান্য আলোকপাত মাত্র করলাম।

ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মদৈত্য এবং গোঁসাই পুজা

বীরভূমে যতগুলি মেলাখেলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ব্রহ্মদৈত্যের মেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মেলা একান্তভাবে গ্রাম্যমেলা এবং অধিকাংশ স্থানেই ১লা মাঘ হয়। এই অঞ্চলে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মদৈত্য ও গোঁসাই পুজার ব্যাপক প্রসার আছে। এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা বা অনুসন্ধান এ পর্যন্ত হয়নি। ("ব্রহ্মডাঙ্গা" শব্দটির উৎপত্তিও এই প্রসঙ্গে নির্ণয় করা দরকার।)

ব্রহ্মদৈত্যের মেলা ব্রহ্মচারী পুজার অংশবিশেষ। ব্রাহ্মণ সন্তানের অপমৃত্যু থেকে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মদৈত্য অপদেবতার কথা সকলেরই শোনা আছে। খুব সম্ভবতঃ ঐ অপদেবতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ব্রহ্মচারী পুজার সৃষ্টি। কিন্তু কোন্ স্থানে এই পুজা ও মেলার

উদ্ভব এবং বিস্তার তা নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। তবে এটি রাঢ়ের বিশেষতঃ বীরভূম জেলার মধ্যেই প্রবলভাবে বিদ্যমান।

১লা মাঘ সকালের দিকে ব্রহ্মচারী পুজা হয়। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেই পুজা করেন। মানত ইত্যাদি না থাকলে গ্রামীন জনসাধারণ বড় একটা এ সম্পর্কে খোঁজ রাখে না। তারা সমবেত হয় কাতারে কাতারে মেলা দেখতে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু জাতির স্ত্রী পুরুষ জমা হয় কয়েক হাজার। ফেরীওয়ালারা সাময়িক দোকানপাট সাজায়। কুমার আর ডোমরা আসে রাশি রাশি মাটির হাঁড়ি কলসী আর বাঁশের কাজের বিভিন্ন আসবাব নিয়ে। শহুরে মেলার মত এসব মেলায় জৌলুষ বা চটক বিশেষ কিছু থাকে না। বিকাল হবার আগেই আস্তে আস্তে মেলা ভেঙে যায়। পড়ে থাকে ব্রহ্মডাঙ্গা।

ব্রহ্মচারী পুজা পীঠে কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি থাকে না। থাকে কয়েকটি শিলাখণ্ড অথবা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো থাকে থাকে স্তূপাকৃতি পীঠ। মাটিতে পোঁতা থাকে একটি ত্রিশূল। একজোড়া খড়ম পাশাপাশি সাজানো থাকে, আর কিছু মাটির ঘোড়া। ব্রাহ্মণের পুজায় কোনো বলিদান হয় না। তপশীল সম্প্রদায় যেখানে পুজারী সেখানে আড়ালে অথবা সামনে হাঁস, মুরগী, পাঁঠা বলি হয়। পুজা উপকরণ রূপে তারা পচাই মদও নিবেদন করে। ব্রাহ্মণের পুজা উপকরণে তেল, সিঁদুর, রক্তচন্দন, ফুল, গাঁজা, দুধ ও মিষ্টি দেওয়া হয়। এই দেবতা বা অপদেবতার কথা পুরোহিত দর্পণ, কোনো শাস্ত্র বা পুরাণে নেই। তাই হয়ত, কোন্ মন্ত্রে পুজা করার বিধি তা কোনো পুরোহিতই জানেন না। পুজা শেষে চণ্ডীপাঠ করার রীতি আছে। এর বিস্তারিত অনুসন্ধানের ফল পরে দিচ্ছি।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "দঃ পঃ বাংলার কোনো কোনো স্থানে নিম বা অন্যান্য গাছে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বা ব্রহ্মচারীর পুজা হয়। ইনিই ধর্মমঙ্গল কবিদের প্রত্যাদেশদাতা ধর্মঠাকুর। এর উল্টো পিঠ অপদেবতা ব্রহ্মদৈত্য"[৪০]।

গোঁসাই এবং ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য ধর্মঠাকুরের চেয়ে কম নয়। সাঁওতালদের মধ্যেও গোঁসাই পুজা চলিত আছে। তবে আচার অনুষ্ঠানাদির কোনো বৈচিত্র্য নেই। এই পুজানুষ্ঠান-গুলি আপাতদৃষ্টিতে অর্বাচীন মনে হলেও এর জড় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অলৌকিক ঘটনা ও ভীতি থেকে এই পুজার উৎপত্তি হতে পারে, আবার বৌদ্ধ, শৈব, তান্ত্রিক সাধকদের স্মরণার্থে হওয়াও অসম্ভব নয়। দুই অনুমানের পক্ষেই তথ্য আছে। যে সব পুজা সাধকদের নামে প্রচলিত হয়েছে তাঁদের নাম পরিষ্কার পাওয়া যায়। আর যেগুলির কোনো সূত্র পাওয়া যায় না, সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার সেগুলি নিয়েই সমস্যা। বীরভূমে ব্রহ্মদৈত্যের মেলাগুলি ন্যূনপক্ষে দুশো বছর ধরে চলে আসছে কিন্তু ঊর্ধ্বপক্ষে কত পূর্বকাল থেকে সুরু হয়েছে তা নিরূপণ করতে পারিনি। তপশীল সম্প্রদায়ের হাতে এই পুজার পর্যাপ্ত প্রসার থাকলেও এই পুজা ব্রাহ্মণ্য ধর্মজাত বলে মনে হয় এবং ধর্মঠাকুরের মত এঁরাও আঞ্চলিক দেবতা। গৌরীহর মিত্র মহাশয় লিখেছেন, "খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যাংশে বীরভূমে নাথ সম্প্রদায়ের এক সময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। নন্দীগ্রাম অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত নাথ গোস্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী

সংক্রান্ত অনেক কথা প্রচলিত আছে। এই নাথ গোস্বামীর সমাধির এখনও পুজা হয়। তারাপীঠ প্রসঙ্গে যে বশিষ্ঠের কথা উল্লেখ আছে, তিনি নাথপন্থী সন্ন্যাসী মীননাথের পূর্বাচার্য বলিয়া কথিত হন এবং তিনি বীরভূমে তান্ত্রিক সাধনার শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার নামেই 'বশিষ্ঠারাধিতা তারা' এই প্রবাদের প্রচলন হইয়াছে। নাথপন্থী সন্ন্যাসিগণ তাঁহারই অনুবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোল ও চেদিরাজ কর্ণদেবের অধিনায়কত্বে বৈষ্ণবধর্ম আলোচনার জন্য নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বীরভূমে আর একদল সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়[৪১]"।

এখন এই সকল সন্ন্যাসীর স্মৃতি ব্রহ্মচারী এবং গোঁসাই পুজার মধ্যে নিহিত থাকা অসম্ভব নয়।

ব্রহ্মচারী পুজা থেকেই ব্রহ্মদৈত্যের মেলা। বীরভূমের বাইরে অন্যান্য স্থানে আছে কিনা তার হদিস পাইনি। কেবল মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে ফেব্রুয়ারী মাসে একটি ব্রহ্মদৈত্যের মেলা হয় বলে শ্রীঅশোক মিত্র আই-সি-এস সম্পাদিত "Fairs & Festivals in West Bengal" পুস্তিকায় উল্লিখিত হয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মদৈত্যের হদিস্ যে না পাওয়া যায় তা নয়। "North Indian notes & quires" (Allahabad 1883) পুস্তকে পাওয়া যায়, কোনো কোনো শ্রেণীর রাজপুত, ভূত কর্তৃক উপদ্রুত হলে "মনসা রাম" নামক এক ব্রহ্মদৈত্যের পুজা করে। এই লোকটি রাজা তেজসিংহের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছিল। ব্রহ্মদৈত্য হয়ে সে বাস করে সীতাপুর জেলায়। এটাই-জেলায় বিলসর ঢিবির উপর এক রাজা তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এতে পুরাণ-মল্ল নামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের আব্রু রক্ষার অসুবিধা হচ্ছিল। সেই ব্রাহ্মণ প্রতীকারের আবেদন করে ব্যর্থ হয় এবং আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করে। সেই অবধি তার ব্রহ্মদৈত্য সেই অঞ্চলে অত্যাচার করে আসছে।

অবশ্য ব্রাহ্মণের অকালমৃত্যু জনিত ভৌতিক ধারণাই যে এই পুজা প্রচলনের একমাত্র হেতু তা মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল আমাকে জানিয়েছেন যে তাঁর অনুমান, বর্ধমানে পাণ্ডু রাজার ঢিবি এলাকায় যে সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী বাস করতেন তাঁরাই কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে এদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরাই ব্রহ্মচারী রূপে পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু এ অনুমানেরও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মচারী ও গোঁসাই পীঠ দেখে কিছু ধারণা করা শক্ত। শিলাখণ্ড এবং ত্রিশূল-খড়ম ইত্যাদিই সম্বল। রেঃ হোয়াইট হেড তাঁর Village Gods of South India গ্রন্থে তামিলনাদে গ্রাম্য দেবতার স্থানে ত্রিশূল প্রোথিত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪০)।

সিউড়ী থানার খটঙ্গা গ্রামে একদা এক রাজা কর্তৃক তাঁর কন্যার সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণের অবৈধ সংস্রব জনিত অপরাধে হত্যাকাণ্ডের কাহিনী পাওয়া যায়। সেই হত্যাকাণ্ডের মাঠটি 'সাতবিঘার মাঠ' নামে এখনও বিদ্যমান। এখন ঐ কাহিনীর স্মৃতিরক্ষায় ব্রহ্মচারী পুজার প্রচলন কিনা তা অনুমান করা চলে না। তবে খটঙ্গার নিকটবর্তী নগুরী গ্রামে ব্রহ্মদৈত্যের মেলা প্রাচীনতম মেলা বলে অনুমান করি। শতবর্ষ পূর্বে হাণ্টার সাহেব এই ব্রহ্মদৈত্যের কথা উল্লেখ করেছেন[৪২]।

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় এই—সিপাহী বিদ্রোহের সময় কতিপয় বিদ্রোহী সিপাহী প্রাণভয়ে জঙ্গলাকীর্ণ বীরভূম অঞ্চলে পালিয়ে আত্মগোপন করেন বলে অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। (সিউড়ী থানায়) পাথরচাপুড়ী এবং (দুবরাজপুর থানায়) বক্রেশ্বরে যথাক্রমে দাতাসাহেব ও খাঁকিবাবা বিখ্যাত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত হয় ওঁরা ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক। খাঁকিবাবা ঘোড়ায় চড়তে পারতেন। যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁর আগ্রহ ছিল। সংগঠন শক্তিও ছিল। দাতা সাহেব হিন্দু মুসলমানের মিলন সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সমাধিভূমি আজও হিন্দু মুসলমানের পুজার স্থান। দাতা সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে পাথরচাপুড়ী গ্রামে মহাসমারোহে মেলা বসে। খাঁকিবাবার মৃত্যু হয় ১৩৪০ সালে। অনুমান করা যেতে পারে এই সব সাধক পুরুষদের মত আরও অনেক পলাতক এই সব অঞ্চলে এসে জনসাধারণের মনে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ফলে তাঁদেরই স্মরণে ব্রহ্মচারী পুজা ও মেলা হয়। নিকটস্থ রাজার পুকুর গ্রামে বালক ব্রহ্মচারীও অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। এই বালক ব্রহ্মচারীর পুজা ১লা মাঘ পাতাডাঙ্গা গ্রামেও হয়। সিউড়ী থানায় কুলেড়া গ্রামে এক বাগদী পুজারীর প্রতিষ্ঠিত পীর-আটনে দাতা সাহেবের আবির্ভাব নাকি প্রত্যক্ষগোচর করা যায়। কিন্তু প্রাচীনত্বের বিচারে, হাণ্টার সাহেবের বিবরণী পাঠে এ অনুমান টেঁকে না।

(সিউড়ী থানায়) কামালপুর এবং লাবপুর থানায় বিষয়পুর ধর্মঠাকুরের স্থানে ব্রহ্মচারী আছেন। (সিউড়ী থানায়) সিঙ্গুর গ্রামে ব্রহ্মচারীতলায় বাণগোঁসাইকে নিয়ে নৃত্য ও চড়ক হয়। (সাঁইথিয়া থানায়) মালাবেড়িয়া গ্রামে ধর্মতলার কিছু দূরে বেলতলায় এক ব্রহ্মচারী আছেন। এঁর কাছে পুজা ও মানসিক করলে মৃগী রোগ আরোগ্যলাভ করে বলে লোকবিশ্বাস। (খয়রাশোল থানায়) কৃষ্ণপুর গ্রামে বুড়ো রায় ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে বাবা গোঁসাই নামে একজন ব্রহ্মচারী। গাংমুড়ি (রাজনগর থানা) গ্রামে ধর্মস্থানে ব্রহ্মচারী ও গোঁসাই আছেন। তাছাড়া ঐ গ্রামে কুমুই জাতির পুজিত দ্বিতীয় এক ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন গোঁসাই। (সাঁইথিয়া থানায়) কুমুড়ী গ্রামের গোঁসাই পীঠের নাম আউল গোঁসাই পীঠ। স্তূপাকৃতি পীঠ। আবার কুমুড়ীর তিন মাইল দক্ষিণে হাথোড়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের নাম আউলা ধরম। (ইলামবাজার থানায়) ধর্ম মন্দিরের বারান্দার সংলগ্ন পুর্বদিকে একটি গাছতলায় সন্ন্যাসী গোঁসাই-এর আটন আছে। ওখানে একটি পাল যুগের বাসুদেব মূর্তির মস্তক ও কয়েকটি মাটির ঘোড়া পড়ে আছে। সেখানেও আর একজন গুপ্ত ধর্মঠাকুর আছেন বলে লোকশ্রুতি। (সিউড়ী থানায়) লখীন্দরপুরে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন ব্রহ্মদৈত্য। বৈশাখী পুর্ণিমায় এঁরও পুজা হয় ধর্মঠাকুরের সঙ্গে। পাতাডাঙ্গা গ্রামে ধর্মতলায় অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে আছেন গোঁসাই ও ব্রহ্মচারী। (এই উদাহরণগুলিতে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ব্রহ্মচারী এবং গোঁসাই-এর যোগাযোগ পরিস্ফুট হবে)।

পুর্বোল্লিখিত নগুরী গ্রাম ছাড়া ১লা মাঘ ব্রহ্মদৈত্যের মেলা বসে থাকে (সিউড়ী থানায়) অজয়পুর, পতণ্ডা, (সাঁইথিয়া থানায়) পাঁড়ুই, মারকোলা, সাঁইথিয়ার রক্ষাকালী তলায়, (লাবপুর

থানায়) লায়েকপুর ও দাঁড়কা গ্রামে। (খয়রাশোল থানায়) বড়রা গ্রাম সন্নিহিত সাঁওতাল পরগণায় কালিয়া ব্রহ্মার মেলাও বিখ্যাত। এ সম্পর্কে একটি ছড়া শোনা যায়—"যত সব অকর্মা, চলে যা কেলে ব্রহ্মা।"

ব্রহ্মচারী পীঠে অজয়পুরে চণ্ডীপাঠ হয়। নগুরী গ্রামে চণ্ডীর পুজা হয়ে থাকে। (সিউড়ী থানার) আর একটি গ্রাম লম্বোদরপুরে গাঁজা ও দুধ ভোগ দিয়ে চণ্ডীর ধ্যানে ও মন্ত্রে পুজা করা হয় ব্রহ্মচারীর। (সিউড়ীর) কুবীরপুরে ১লা মাঘ ব্রহ্মচারীর পুজা হয়, মেলা হয় না। পতগুা গ্রামে পুকুর পাড়ে নিমগাছতলায় ব্রহ্মদৈত্য আছেন। গ্রামের সরকাররা এঁর সেবাইৎ ও পুরোহিত। পাঁড়ুই গ্রামে পতগুার জমিদার ও গোমস্তা দোলগোবিন্দ সরকার পানোন্মত্ত অবস্থায় মেলা দেখতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন। তারপর থেকে পতগুায় ব্রহ্মদৈত্যের পুজা ও মেলার প্রতিষ্ঠা। সে প্রায় ১৫০/২০০ বছর আগের কথা। এই পতগুা গ্রামের ব্রহ্মচারী হাঁটুর বেদনা নিরাময় করতে পারেন বলে এঁর নাম "হাঁটু পালোয়ান।" রোগীকে ঐ দেবস্থানে একটি ঢিল ঝুলিয়ে দিতে হয়। ব্রহ্মচারীর সামনে পাঁঠা বলি হয়ে থাকে। একটু আড়ালে তপশীল সম্প্রদায় হাঁস মুরগী বলি দেয়। পুর্বে এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল। পাঁড়ুই গ্রামে ১লা মাঘ থেকে এই ব্রহ্মদৈত্যের তিনদিন ধরে মেলা হয়। পুজা এখন হয় না। (সিউড়ী থানার) জীবধরপুর গ্রামে "পালোয়ান" নামে এক ব্রহ্মচারী আছেন। বাউরীরা ১ মাঘ পুজা করে। দুড়াই গ্রামের ধাঙ্গড় পাড়ায় কালী ও মনসার সঙ্গে যুক্তভাবে ব্রহ্মচারী পুজিত হন। পৌষ সংক্রান্তি ও বৈশাখী পুর্ণিমায় মুরগী ও পাঁঠা বলি সহ পুজা হয়। হাসানাবাদ গ্রামে বাউরীদের পুজিত আছেন বাবা গোঁসাই, ব্রহ্মচারী ও মনসা। ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্যে মুরগী বলি হয়। পচাই মদও উৎসর্গ করা হয়। মানুষ ও গোরুর নানারকম চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে। এ ছাড়া পানুড়ে, ছোড়া, সিঙ্গুর, শ্রীকণ্ঠপুর, কাঁখুটে, বাতাসপুর, কোমা, (রাজনগর থানার) নাকাশ, (মহম্মদ বাজার থানার) শালদহ, তেঁতুলবাঁধ, (ময়ুরেশ্বর থানার) বাজিতপুর, (খয়রাশোল থানার) কৃষ্ণপুর, বড়রা, (ইলামবাজার থানায়) ঘুরিষা, (লাবপুর থানায়) চৌহাট্টা, দাঁড়কা এবং (বীরভূম সন্নিহিত বর্ধমানের) হিজলগড়ায় ব্রহ্মচারী আছেন। এখানে উল্লেখ্য যে (সিউড়ী থানার) রাইপুর গ্রামে এক কালীর নাম "ব্রহ্মচারী কালী"। কেন্দ্রগড়িয়া (খয়রাশোল থানা) গ্রামের ধানমাঠে আছেন "বদনচক্ গোঁসাই" বা ব্রহ্মচারী। প্রবাদ, সেই মাঠে ধান কাটবার আগে ভোগ না দিলে নানা-রকম মুর্তি ধারণ করে বিঘ্ন উপস্থিত করেন। চাষীরা কখনও কোনো সাপ, বীভৎস জন্তু ইত্যাদি দেখে ভয় পায় কিন্তু ভোগ দিলে নাকি নিশ্চিন্ত হয়ে ধান কাটতে পারে। যেখানে গোঁসাই আছেন, সেখানে তাঁর ভয়ে কেউ ধান চুরি পর্যন্ত করে না। বাউরীরা ১লা মাঘ পুজা করে। ঐ গ্রামেই মাঠের মাঝখানে একটি পুকুরে আছেন আর একজন ব্রহ্মচারী। মাঘের প্রথমে ব্রাহ্মণে ভোগ দেন। অন্য আর একটি পুকুর—ঘোড়া পুকুরে মনসা ও গোঁসাই আছেন। শাঁওতালিতে (শ্রাবণ সং) মুচিরা পুজা করে। (সিউড়ী থানায়) হাটইকড়া গ্রামে নরসিংহতলা নামে একটি স্থান আছে। নিমগাছের গোড়ায় একজন বাগদী ১লা মাঘ পাঁঠা বলি দিয়ে পুজা করে। হোম ও ভর হয়। (লাবপুর থানায়) লায়েকপুর গ্রামে "সাহেব" নামে একজন পীর

আছেন। হিন্দু মুসলমানে বৃহস্পতিবারে পূজা দেয়। জিনিষপত্র হারালে সিন্নি দিলে তা পাওয়া যায় বলে লোকবিশ্বাস বর্তমান। (দুবরাজপুর থানায়) মেটেলা গ্রামে ব্রহ্মচারী-স্থান আছে অনেকগুলি। গাঁজা, চিঁড়ে, দুধ, মিষ্টি ভোগ হয়। (সাঁইথিয়া) মারকোলা গ্রামে ব্রহ্মচারীর আশ্বিনের নবমীতে পূজা হয়। (ময়ূরেশ্বর থানায়) কামারহাটি গ্রামে ও গ্রামের বাইরে দুটি সন্ন্যাসীতলা আছে। বর্তমানে পূজা রহিত হয়ে গেছে। (রাজনগর থানায়) দুবরাজপুর নামে একটি গ্রামে নদীর ধারে একজন ব্রহ্মচারীর পূজা হয় প্রতি মঙ্গলবার গাঁজা ও ভোগ সহ। বলি হয় না।

গোঁসাই : গোঁসাই ও ব্রহ্মচারী একই বস্তু বলে আমার ধারণা। এটিও ব্রহ্মচারীর মত ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে তপশীল সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত। পূজা হয় ঐ "আ-ক্ষেণ" দিবসে অর্থাৎ ১লা মাঘ। (সিউড়ী থানার) পুরন্দরপুর, হাসানাবাদ, রণপুর, কুলেড়া গ্রামে গোঁসাই আছেন। কামালপুরে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে একজন আছেন, অপর একজনের পূজা হয় প্রতি শনিবারে। রাইপুর ও মল্লিকপুরে ডোমদের পূজিত গোঁসাই আছেন। ১লা মাঘ মোরগ বলি সহ পূজা হয়। (রাজনগর থানার) নাকাশ, পাতাডাঙ্গা ও তাঁতিপাড়া গ্রামে গোঁসাই পূজা হয়। তাঁতিপাড়ায় চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের হোমের দিন পূজা হয়ে থাকে। (খয়রাশোল থানায়) পালপাই, হজরৎপুর গ্রামে গোঁসাই আছেন। মুন্দিরা গ্রামে ২রা মাঘ গোঁসাই-এর মেলা বিখ্যাত। মামুদপুরে গোঁসাই-এর শনি ও মঙ্গলবার মালসা ভোগ সহ পূজা হয়। (মহম্মদ বাজার থানায়) খয়রাকুঁড়ি, ভুতুড়া প্রভৃতি বহু গ্রামে গাঁজা, আতপ, মিষ্টি ভোগ দিয়ে গোঁসাই পূজা হয়। (নান্নুর থানার) খুজুটি পাড়ার গোঁসাই-এর নাম "জটাধারী"। এমন নামও বহুস্থানে পাওয়া যায়।

: গোঁসাই-ব্রহ্মচারী মেলার মত বীরভূমে কিছু পীরের মেলাও বসে থাকে।

গ্র ন্থ প ঞ্জী

১. চিন্ময় বঙ্গ পৃঃ ৬।
২. ভারতের জাতি পরিচয় পৃঃ ২৮।
৩. The Annals of Rural Bengal (Bibhun) p. 176.
৪. লোকায়ত দর্শন পৃঃ ৩৫৮।
৫. ভারত সংস্কৃতি পৃঃ ৬।
৬. Ibid, পৃঃ ৯৫।
৭. বাংলার ব্রত এবং Prehistoric India & ancient Egypt.
৮. The Golden Bough.
৯. Ibid.
১০. The annals of Rural Bengal (Bib).

১১. The Tribes & Castes of Bengal.
১২. শ্রীশ্রীদুর্গা পৃঃ ৬৮-৬৯।
১৩. লৌকিক শব্দকোষ।
১৪. The Raj Banshis of N. Bengal.
১৫. বাংলার পাল পার্বণ পৃঃ ১০-১১।
১৬. পূজাপার্বণ।
১৭. লৌকিক শব্দকোষ।
১৮. The Golden Bough.
১৯. বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ পৃঃ ২৬।
২০. লোকায়ত দর্শন।
২১. The Tribes & Castes of W. B.
২২. Ibid.
২৩. হিন্দু সমাজের গড়ন পৃঃ ৭৩।
২৪. নববর্ষের ব্রত—রবিশঙ্কর (গল্পভারতী, বৈশাখ ৭৫)।
২৫. বাংলার পালপার্বণ পৃঃ ৭।
২৬. পূজাপার্বণ পৃঃ ১৮।
২৭. Ibid, পৃঃ ১৩৭-৩৮।
২৮. লোকায়ত পৃঃ ৪২৯।
২৯. পূজাপার্বণ পৃঃ ৩।
৩০. ভারতেব জাতি পরিচয়।
৩১. The Golden Bough.
৩২. পূজাপার্বণ পৃঃ ১২৯।
৩৩. Ibid, পৃঃ ১৩৮।
৩৪. The Golden Bough p. 542.
৩৫. হিন্দু সমাজের গড়ন—শ্রীনির্মলকুমার বসু।
৩৬. লোকায়ত।
৩৭. ভারত সংস্কৃতি।
৩৮. বাংলার লৌকিক দেবতা।
৩৯. The Tribes & Castes of Bengal.
৪০. রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা।
৪১. বীরভূমের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পৃঃ ৬৭-৬৮।
৪২. Annals of Rural Bengal (Bib) p. 131.

উত্তররাঢ়ের নদীতীরবর্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতি

বর্তমানে বীরভূম জেলা উত্তর রাঢ়ের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত। রাঢ় অঞ্চলের দেবদেবী, পুজাপার্বণ ও আচার অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন।

নদীর তীর ধরে অনুসন্ধান করলে প্রাচীনত্বের বহু পরিচয় আজও সেখানে পাওয়া যায়। বীরভূমে ছুটি বড় নদী ময়ুরাক্ষী এবং অজয়। তাছাড়া কোপাই বা শাল; হিংলো এবং বক্রেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি ছোট নদী আছে।

অজয় উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

অজয়ের উপত্যকায় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ অনুসন্ধান কার্য সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি জায়গায় চালিয়েছেন। জয়দেব কেন্দুবিল্বের আধমাইল দূরে অজয়তীরে মুন্দিরা নামে এক পরিত্যক্ত গ্রামে কতকগুলি ঢিবি পরীক্ষার ফলে তিন হাজার বছরের প্রাচীন তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে লাল ও কালো রঙে চিত্রিত মৃৎপাত্র, নলযুক্ত পানপাত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার। প্রাপ্ত পুরা দ্রব্যগুলির সঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং রাজস্থান ও মধ্যভারতের (অনুমানমূলক ইতিহাসের যুগের) স্থানসমূহ থেকে পাওয়া নিদর্শন সমূহের সাদৃশ্য আছে।

অজয় তীরে দেউলী নামে আর একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি সুরথ রাজার প্রবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এই গ্রামটিকে প্রত্নতত্ত্বগতদিক থেকে খুব সমৃদ্ধ বলে অনুমান করেছেন। সত্বর সেখানে খনন কার্য চালানো হবে। অজয় তীরে সুপুর, ঘুরিষা ইত্যাদি গ্রামের চেহারা ও সাংস্কৃতিক উপাদান অত্যন্ত প্রাচীন। বারুইপুর গ্রামে লাউসেন পুজিত সিদ্ধেশ্বর ধর্মরাজ বর্তমান। খয়রাশোল থানার বড়রা গ্রামকে শতবৎসর পূর্বের ম্যাপে পাণ্ড্রা* নামে দেখানো হয়েছে। ভীমগড় অঞ্চলে পাণ্ডবদের বসবাসের প্রবাদ বর্তমান। গড়, পরিখার চিহ্ন ও পাণ্ডবদের নামানুসারে ডাঙ্গা ও শিবমন্দির বিরাজিত। সরকারী গেজেটে (১৯১০) এই প্রবাদের উল্লেখ আছে। সুপুর, রাইপুর, ইলামবাজার, পার্শণ্ডী, বড়রা প্রভৃতি গ্রামগুলি এককালে ভাল বন্দর

* সাঁওতালি ভাষায় Pandra, অর্থ—Having a white Skin, greyish in colour পুং Pandri, Pandua—Greyish colour, applied to buffaloes.

ছিল। অজয় নদ ধরে ব্যবসায় বাণিজ্য চলত শত বৎসর পূর্বেও[১]। অজয়তীরে বর্ধমান জেলায় ঢেকুরে ইছাই ঘোষের দেউল বর্তমান। এর ১২।১৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে বীরভূমের দুবরাজপুর থানায় যশপুরে ঢেকুরেশ্বর শিবঠাকুর বর্তমান। তপাদারের মাঠ, তাঁতিপাড়ার মাঠ, কামারের মাঠ, বাঁজনগড়ের মাঠ প্রাচীনত্বের চিহ্ন বহন করছে।

ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী সভ্যতা

ময়ূরাক্ষী বীরভূমের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিতা। এই নদী দুবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে "কাণা" নাম ধারণ করে পুনরায় মূল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। Sir William Wilcox এই কাণা নদীগুলিকে কৃত্রিম এবং চাষের সুবিধার জন্য প্রাচীনকালে এইগুলিকে বড় নদী থেকে কেটে বের করা হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন[২]।

এই উক্তি সত্য হলে প্রাচীনকালে বীরভূম অঞ্চল কৃষিকার্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল, বলা চলে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ময়ূরাক্ষীর অদূরে সিউড়ীর নিকট এক পুরাতন প্রস্তরযুগীয় স্থান আবিষ্কার করেছেন। বিরলদৃষ্ট প্রস্তরযুগীয় এক প্রস্তর কুঠার এবং তাম্রযুগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু হাতিয়ারও উদ্ধার করা হয়েছে। ময়ূরাক্ষীর উত্তরবর্তী দ্বারকা নদীর তীরে আরও একটি প্রস্তরযুগীয় স্থান সাফল্যজনক ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত ক্ষুদ্রায়তন দ্রব্য সমূহও তাম্র যুগের লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ময়ূরাক্ষীর উভয় তীর বরাবর বাহ্যতঃ অনুসন্ধান করলে প্রাচীন সভ্যতার বিশেষ কোনো কিছু ধরা পড়ে না। তার প্রবাদ ও কিংবদন্তী সমৃদ্ধ বহু গ্রাম বর্তমান। যেমন ভাণ্ডীর বন। সেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পিতা বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম ছিল বলে কথিত এবং বিভাণ্ডেশ্বর শিব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বলা হয়। এই শিব এতদঞ্চলের একমাত্র পশ্চিমলিঙ্গ শিব। ভাণ্ডীর বনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, খটঙ্গা, রাইপুর, কেন্দুলী, গোপালপুর অঞ্চলে মধ্যযুগে সামন্ত রাজা বা স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজাদের শাসন বজায় ছিল। তার চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। ভাণ্ডীর বনের আধমাইল দক্ষিণে বীরসিংহপুর। এই গ্রামে কালীর নিকট ধর্মঠাকুর, মনসা এবং শীতলা আছেন। কালীমূর্তি প্রস্তর খোদিত। কথিত হয়, এই কালী মগধের রাজা জরাসন্ধের ছিল। সাধারণে বলে মগধেশ্বরী। এই মূর্তি মহাকালের উপর উপবিষ্টা। তন্ত্রোক্ত "বিপরীত রতাতুরা"। কালীমাতার জনৈক বৃদ্ধ সেবাইত ৺যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, যে মহাকালের নিম্নে দেবনাগরী অক্ষরে রাজা জরাসন্ধের নাম উৎকীর্ণ ছিল। তিনি, তাঁর পিতা ও পিতামহের নিকট ঐ কথা শুনেছিলেন। বৎসর বৎসর অঙ্গরাগ হওয়ার জন্য ঐ লিপি মুছে গিয়েছে[৩]। কথিত আছে যে জরাসন্ধ রাজা মগধ ও বিহারে রাজত্ব করতেন। কালিকাদেবী তাঁর কুলদেবতা ছিলেন। জরাসন্ধ নিহত হলে শ্রীকৃষ্ণ কালিকাদেবীর বিগ্রহমূর্তি নিয়ে তাঁর পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে গমনের আদেশ দেন। এখন যেখানে বীরভূমের পুরাতন রাজধানী রাজনগর, সেইখানে এসে তাঁরা দেবীর সেবা প্রকাশ করেন। তখন স্থানটি অরণ্যসঙ্কুল ছিল। মুসলমান রাজত্বে এই কালিকাদেবী রাজনগরের কালীদহ নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে বিরাজ করতেন।

সময় সময় লোকে দেবীর হাত ও মাথা দেখতে পেত বলে শ্রুত হয়। জনৈক মুসলমান গোরক্ত রঞ্জিত একটি ছুরিকা ঐ পুষ্করিণীতে ধৌত করার ফলে দীঘির উত্তর দিক ভেঙ্গে গিয়ে এক জলস্রোতের সৃষ্টি হয় এবং কুশকর্ণিকা নামক একটি নদীতে মিলিত হয়। কালিকাদেবী ঐ স্রোতের সঙ্গে চলে এসে বীরসিংহগ্রামে প্রকাশিত হয়ে আরাধিতা হতে থাকেন*। এই কালীমাতা রাজা বীরসিংহ কর্তৃক পুজিতা হতেন। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ায় রাজা নিহত হন এবং দেবী খটঙ্গা গ্রামের পূর্বস্থিত ধান্য গ্রামের জঙ্গলে কিছুদিন ছিলেন। জঙ্গলমধ্যে এখনও প্রস্তর নির্মিত বাড়ীর অংশ এবং ইষ্টকালয়ের ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান আছে। যে স্থানে কালীমাতা ছিলেন সেই স্থান কালীতলা নামে পরিচিত। এই কালী সম্পর্কে অপর একটি জনশ্রুতি আছে—কালীমাতা নাকি ময়ূরাক্ষীর সুলঙ্গ নামক দহে ছিলেন। খটঙ্গা গ্রামের জনৈক ধীবর উক্ত দহে মাছ ধরতে গিয়ে কালীকে পায় এবং পূর্বোক্ত ধান্যগ্রামের জঙ্গলে রেখে দেয়। ময়ূরাক্ষীর সুলঙ্গদহ বীরসিংহ জয়রামবাটির ধ্বংসস্তূপের ঠিক উত্তরে অবস্থিত। ঐ ধীবরের বংশধর অদ্যাবধি খটঙ্গা গ্রামে আছে। কালীপুজার রাত্রে খটঙ্গা গ্রামের রায়েরা যে পুজা ও বলি দেন কেবলমাত্র তার নৈবেদ্য ও বলির ছাগমুণ্ড ঐ ধীবরের বংশধর এখনও পেয়ে থাকে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের একটি ছাড়পত্র থেকে জানা যায় যে রাজনগরের মুসলমান রাজগণের নিকট কালীর সেবাপুজার জন্য বাৎসরিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাওয়া যেত।

(ধর্মঠাকুর সম্পর্কে অনুসন্ধানকার্যে ভাণ্ডীরবন গ্রামে জানতে পারি যে এইখানে এককালে কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ এবং স্তূপ বর্তমান ছিল কিন্তু এর বিন্দুমাত্র প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি।)

কালীর প্রসঙ্গে বড় মহুলার কালীও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামটি সিউড়ী থানায়, ময়ূরাক্ষীর তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার কালী খুবই বিখ্যাত। কার্তিক অমাবস্যায় মৃণ্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিতা হন এবং পরবৎসর দেবীপক্ষে একাদশীর দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম লখীন্দরপুরের ধর্মভক্ত্যারা এই কালীর সামনে নৃত্যগীত করে কিছু আহৃত ফল রেখে যায়। শ্রুত হয় মাধব মণ্ডল নামক একজন সাধক ক্ষিপ্তের মত কালীর সামনে বসে আরাধনা করতেন। ক্রমে কালীর পুজা মাধবের হস্তে অর্পিত হয়। রাজনগর-রাজ মাধবের অলৌকিক শক্তি দেখে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁকে কিছু সম্পত্তি প্রদানের অভিলাষ জানান। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃত হলে রাজা কালীর পাকা মন্দির নির্মাণ করে দেন। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে গাজনের শিবমন্দির, চামুণ্ডার পাকা মঞ্চ ও দুর্গার বেদী ছিল। কালক্রমে সে সব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ১৩২৯ সালে নূতন মন্দির নির্মিত হয়। পূর্বোক্ত মাধব দেবাংশী একবার দৈববাণী লঙ্ঘন করে ডাকাতের সামনে অগ্রসর হয়ে প্রাণ হারান। মন্দিরের ঈশান কোণে মাধবের করোটি এখনও পুজিত হয়ে আসছে।

ময়ূরাক্ষীর তীরে কোটাসুর গ্রামও বেশ প্রাচীন। সেখানে মদনেশ্বর শিবের সুউচ্চ মন্দির আছে। মন্দিরটি আধুনিক। কথিত হয় বকাসুরের এখানে নিবাস ছিল। নিকটবর্তী মৌড়েশ্বর শিবও কুন্তী আরাধিত বলে প্রবল লোকবিশ্বাস বর্তমান। মৌড়েশ্বরের নাম 'চৈতন্যভাগবতে' পাওয়া যায়—"একচক্রা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি" (আদিখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়).

এই সকল অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের ব্যাপক ভাবে পুজা হয়ে থাকে। তবে শিবের মাহাত্ম্য বেশী হওয়ায় ধর্মপুজার জৌলুষ বর্তমানে তেমন নেই।

ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরে স্বগুনপুর গ্রামের ধর্মঠাকুরের পুজা খুবই বিখ্যাত। আচার অনুষ্ঠান ও পরিবেশে প্রাচীনত্বের চিহ্ন বর্তমান আছে। তারই কয়েক মাইল দূরে ডানজনা গ্রামে মনসা পুজার যে ধুম আছে তা বীরভূমে আর কোথাও নেই। এই মনসা ও ধর্মপুজাও বহু যুগ ধরে বজায় আছে।

কোপাই নদী

কোপাই বা শাল এবং হিংলো দুটি ক্ষুদ্র নদী। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই নদীগুলির তীর বরাবর সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিভাগ বৎসর চারেক আগে লুপ লাইনের ধারে কোপাই তীরে একটি খননকার্য চালিয়েছেন। জায়গাটির নাম মহিষডাল। ওখানে "ক্যালকোলিথিক" যুগের কয়েকটি, ইঞ্চি দেড়েক লম্বা পোড়া মাটির রিয়েলিষ্টিক ধরণের লিঙ্গ পাওয়া গেছে। তাছাড়া কিউব আকৃতির ক্রমপর্যায়ে ছোট থেকে বড় কয়েকটি দাবার ঘুঁটির মত পোড়ামাটির বস্তু পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটির ওজন তার নীচের মাপটির চেয়ে দ্বিগুণ, দেখে অনুমান করা হয়েছে যে ওগুলি ওজনের একক হিসাবে ব্যবহার করা হত। কিছু পোড়া চালও পাওয়া গেছে। সেকালের গ্রামটি অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়েছে[৫]।

হিংলো নদী

হিংলো নদীর তীরেও ধর্মঠাকুরের ব্যাপকভাবে পুজা হয়ে থাকে। এইসব অঞ্চলও প্রত্নতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে মূল্যবান বলে প্রতীয়মান হয়।

সাধন পীঠ

ময়ূরেশ্বর থানা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এককালে তান্ত্রিক ও শৈব সাধকদের সাধক পীঠ ছিল। তান্ত্রিকতার প্রসার বা বিকাশ বীরভূমে কিভাবে হয়েছিল তা জানবার কোনো উপায়ই আজ নেই। তবে কতকগুলি বিখ্যাত মহাপীঠ ও উপপীঠ বীরভূমে আছে। যথা তারাপুর, বক্রেশ্বর, অট্টহাস (ফুল্লরা), নন্দীপুর, নলহাটি, কঙ্কালীতলা। কিন্তু বক্রেশ্বর বাদ দিয়ে একমাত্র ময়ূরেশ্বর থানায় শাক্ত ও শৈব উপাসনার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায় রূপপুর এবং ময়ূরেশ্বরে (বীরভূম) বুদ্ধমূর্তি বর্তমান। তাঁরা যথাক্রমে শিব ও ধর্মঠাকুর বলে পুজিত। নলহাটি থানায় বারাগ্রামে প্রচুর বুদ্ধ ও বৌদ্ধমূর্তি এবং ভদ্রপুরের নিকট দেবগ্রামে ধর্মচক্রমুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধভট্টারকের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল[৬]। এর দ্বারা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এই অঞ্চলে এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রসার ছিল এবং শাক্ত ও শৈবগণ ঐ প্রভাবকে অপসারিত করেন। বৌদ্ধ প্রভাবের চিহ্ন এই অঞ্চলে যেমন লক্ষ্য করেছি, তেমন আর কোনো

অঞ্চলে নয়। বুদ্ধদেব এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করে গেছেন, এই মর্মে, ধর্মঠাকুরের পুজার উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণাকালে কিছু প্রবাদও উদ্ধার করতে পেরেছি।

বীরভূমের নদীগুলির তীর বরাবর বিস্তৃত ও ব্যাপক অনুসন্ধান করা দরকার। এই কার্য সমাধা হলে রাঢ়দেশ তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অতীত সাংস্কৃতিক জীবনের উপর নূতন আলোক সম্পাত হবে।

গ্র ন্থ প ঞ্জী

১. ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক—এ. মিত্র, আই-সি-এস (সেন্সাস ১৯৫১)।
২. Lectures on irrigation in ancient Bengal (c. u.).
৩. শিবরতন মিত্রের স্মারকলিপি।
৪. ওমালির গেজেটিয়ার (১৯১০)
৫. সংবাদপত্র ও স্থানীয় যোগাযোগে প্রাপ্ত তথ্য।
৬. বীরভূম বিবরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মঠাকুর কোন্ দেবতা

ধর্মঠাকুরের ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "ঐতিহাসিক দলিলে রাজদেবতা ধর্মের উল্লেখ পাচ্ছি প্রথম বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে পাওয়া বিজয় সেনের তাম্রপট্টানুশাসনে (ষষ্ঠ শতাব্দী)। অনুশাসন আরম্ভ হয়েছে, ধর্মের বন্দনা করে। (ঐতিহাসিক যাঁরা অনুশাসনটি আলোচনা করেছেন তাঁরা সবাই উদ্দিষ্ট দেবতাকে মহাযান বৌদ্ধ দেবতা লোকনাথ মনে করেছেন।) 'যিনি পুরুষের পুণ্যকর্মের ফলহেতু, সত্য এবং তপস্যা যাঁর মূর্তি, ইহলোক পরলোকের যিনি উপায়, সেই 'ত্রিলোক' নাথ ধর্ম (জয়যুক্ত হোন)।'

এই বন্দনা ধর্মঠাকুরের পক্ষে বেশ খাটে। আরও একটা প্রমাণ আছে বলে মনে করি। তাম্রপট্টের শীর্ষে…"রাজ বিজয় সেনস্য" এই নামযুক্ত মোহর আছে। মোহরে এক দেবতার চিত্র। তার তলায় রাজার নাম। বহু অরযুক্ত দীর্ঘায়িত এক চক্র পিছন করে দ্বিভুজ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। ডান হাত উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত, বাঁ হাত কোমরের কাছে। ধর্মঠাকুর দ্বিভুজ এইটুকু ছাড়া মূর্তিকে ধর্মঠাকুর বলবার কোনো কারণ নেই। তবে পিছনের চাকাটি লক্ষণীয়। এ চক্র ধর্মচক্র, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রের ধর্মচক্র নয়, সে ধর্মচক্র গোল। দীর্ঘায়িত চক্রটির পরিসীমা রেখা কূর্মাকৃতি। ধর্মঠাকুরের কূর্ম প্রতীকের পেটের দিকে অনেক সময় চক্র আঁকা থাকত। এটি বরুণের পাশ হওয়াও সমান সম্ভব। সুতরাং বন্দনা-শ্লোকের দেবতাকে ধর্মরাজ মনে করবার পক্ষে জোরালো যুক্তি আছে।"ক

এটি একটি তথ্য মাত্র কিন্তু এর থেকে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ কিছুই বোঝা যায় না। মূর্তি তত্ত্ব দিয়ে এ দেবতাকে বোঝা সম্ভব নয়।

তবে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ কি? আসলে তিনি কোন্ দেবতা? ধর্মমঙ্গল কাব্য, ধর্ম-পুরাণ, ধর্মপূজা বিধান প্রভৃতি তত্ত্ব থেকে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া প্রকৃত কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না।

ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ দেবতা নন তা আধুনিক পণ্ডিতবর্গ মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "Dharma who is however described as the supreme deity, creater and ordainer of the Universe, superior even to

ক। রূপরামের ভূমিকা

Brahma, Vishnu and Siva and at times identified with them and he has nothing of the abstraction of the Buddhist Dharma about him"[১]

তা ছাড়া তিনি আরও বলেছেন, ধর্মের গাজনের নাচ-গান আর্য ধর্মের নয়। এগুলি দ্রাবিড় বা চীন তিব্বতীয় হতে পারে।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "ধর্মঠাকুরের পুজা চলে এসেছে দেশের তথাকথিত নিম্ন-স্তরের জনগণের মধ্য দিয়ে। এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় এঁদের অধিকার ছিল না। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণরা ব্যাপক ভাবে আসতে সুরু করেন গুপ্ত রাজাদের সময় থেকে। তাঁরা বাংলাদেশের প্রাচীনতর অধিবাসী নন। তাই ধর্মপূজার সঙ্গে তাঁদের সংশ্রব ছিল না পুরানো ব্রাহ্মণ যাঁরা আগে থেকে ছিলেন তাঁরা নবাগত ব্রাহ্মণদের দ্বারা কোণঠেসা হয়ে পড়েন। এঁদের অনেকে পরে বর্ণ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কেউ কেউ বা জাত খুইয়েছিলেন এমন অনুমানও অসঙ্গত নয়। চণ্ডালদের উপবীত সংস্কারের উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধ আচার্য অদ্বয়বজ্র দ্বাদশ শতাব্দীতে। রামাই পণ্ডিতের কাহিনীতে এই প্রাক্তন জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণদেরই জয় ঘোষণার চেষ্টা। এঁরা সূত্র উপবীতধারী ছিলেন না, ছিলেন তাম্র পবিত্রধারী। এঁদের বেদ ঋক, সাম, যজুর বাইরে। অথর্ববেদের ব্রাত্য সূক্তগুলি এমনি অব্রাহ্মণ্যপন্থী প্রাক বৈদিক আর্যদের লুপ্ত ভাণ্ডারের টুকরা। ব্রাত্য-ব্রতের উপাস্য, ব্রাতের উপাস্য এবং বৈদিক ব্রত বাহ্য। এই তিন অর্থেই অথর্ববেদের ব্রাত্য বাংলা সংস্কৃতির ধর্মঠাকুরের প্রাচীন প্রতিরূপ। ধর্মঠাকুরের পুজা ব্রত ছাড়া কিছু নয়। ধর্মঠাকুরের পুজায় বহু লোকজনের আবশ্যক, তিনি বহু লোকের পুজ্য সার্বজনিক দেবতা, ব্যক্তির উপাস্য মাত্র নন। সুতরাং তিনি ব্রাত্য, আর তাঁর পুজক হাড়ি ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অব্রাহ্মণ জাতি। সুতরাং ব্রাত্য তো বটেই"।[২]

"ধর্মঠাকুরের যেরূপ ধর্মপূজার পুঁথি এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় সেই পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার মিশে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় ও ইরাণীয় সূর্য পুজার ধারা এবং পলিনেশীয় আদিদেবতার বিশ্বাস এর মধ্যে বর্তমান। অধ্যাত্মভাবনা এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অবৈদিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা মিশ্রিত হয়েছে[৩]।"

ধর্মঠাকুরের পুজোপকরণে গাছ, হাঁস, শূকর বলি এবং ধর্মপুজার পদ্ধতিতে লৌকিক প্রভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। কৃচ্ছ্র সাধন ও দৈহিক নির্যাতনে ধর্মঠাকুরের তুষ্টিতে আর্যেতর প্রভাব লক্ষণীয়। ধর্মঠাকুরের পুজকবৃন্দ ব্রাহ্মণেতর ও অন্ত্যজ জাতি। ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করে বাসুলী, মনসা, পণ্ডাসুর, লোহজংঘ, ডামর শাঞ্জি, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবতা ও উপদেবতা পুজা পেয়েছেন। ধর্মঠাকুরের গাজন উৎসবে সর্বপ্রকার স্থানীয় বৃত্তি গৃহীত হয়েছে। মদ্যমাংস দিয়ে ধর্মপুজার ব্যবসা। নরমুণ্ড নিয়ে ধর্মের গাজনে নাচ হয়। ধর্মপুজা যে সমাজে বহুল প্রচলিত তার জনবিন্যাসে দেখা যায় যে সমাজ প্রাক আর্য আদিম কৌম সমাজের উত্তরাধিকারী। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "ধর্মঠাকুরে মূলতঃ ছিলেন প্রাক আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে[৪]।"

অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানের ক্ষমতা, রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দানের ক্ষমতা, কৃষিকার্যে সহায়তা করার ক্ষমতা এই সব বিশ্বাস এবং সংস্কার আদিম কৌম সমাজের বিশ্বাস এবং সংস্কারের ঐতিহ্যবাহী।

ধর্মের গোরুর মৃতদেহ ধারণ করে, আসাম অঞ্চলে বোড়োদের মধ্যে ছলনার কাহিনী সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "কাহিনীটি খুবই প্রাচীন এবং খুব প্রাচীন কালেই এই কাহিনী বৈদিক আর্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কাহিনীর সূত্র ও অনার্যদের কাছে পাওয়া (সম্ভবতঃ অষ্ট্রিকদের[৫]।)

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "Now dance as a fundamental religious ritual is certainly not Aryan ; it is neither Buddhistic nor Brahmanical. It may be Dravidian, it may also be Tibeto-Chinese but it is emphatically Austric[৬]."

তা ছাড়া ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনীটিকেও তিনি বলেছেন, "The story of the sacrifice of Sunnahsepa, the son of the Brahmin Ajigarta ; in place of Rohita the son of king Harischandra who had offered him to the God Varuna, as narrated in Aitaraya Brahmana, which is found among the mediaval myths of Dharma in its Brahmanised form is probably in itself a myth of Austric origin which obtained a place in the Brahmana work in Pre-Buddhist times[৭]."

তা হলে এর থেকে দেখা যাবে যে ধর্মঠাকুরের সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা এবং আর্য, অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ কতখানি হয়েছে তার হিসাব নিকাশ করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো দুরূহ। পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রাম বিবরণী থেকে সংগ্রহ করে ধর্মঠাকুরের পীঠ, বাহন ব্যবহারের বৈচিত্র্য, পূজা তারিখাদি এবং পূজার সূচনার বৈশিষ্ট্যগুলি একত্র করে দিলাম যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে কত রকমারি ধর্মবিশ্বাস এসে মিশ্রিত হয়েছে। এবং এই সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান হলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Buddhist survivals in Bengal, B. C. Law, vol. part I, p. 77-78.
২ রূপরামের ভূমিকা পৃঃ ১৫-১৬।
৩. রূপরামের ভূমিকা পৃঃ ১৮।
৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৫।
৫. রূপরামের ভূমিকা পৃঃ ৪।
৬. B. C. Law Vol., p. 78.
৭. B. C. Law Vol (part I)—"Buddhist survivals in Bengal", p. 78.

(খ) ধর্মঠাকুরের স্বরূপ

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নিয়ে এ পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে কিন্তু তিনি কোন্ দেবতা তা যথার্থরূপে নির্ণীত হয় নি। তিনি সূর্য, বরুণ, বিষ্ণু, যমরাজ। শিবের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক আছে, বৌদ্ধ প্রলেপও পড়েছে ; অনার্যগন্ধ তো আছেই।

কিন্তু ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বিশ্লেষণ যদি ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে করা যায় তাহলে ইনি পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যান। যেমন একজন গবেষক লিখেছেন : "ধর্মপূজকের দৃষ্টিতে ধর্ম হইতেছেন—গুণেশ্বর, সূক্ষ্মরূপ, শূন্যমার্গে স্থিত শূন্যদেব দিবাকর, গম্ভীর ধীর নির্বাণাখ্য মহেশ্বর, প্রলয়ে বটভাসিত মহাবিষ্ণু। ইনি কচ্ছপনেত্র, কচ্ছপবাহন, কচ্ছপরূপ, রামবর্ণ, বৃদ্ধরূপ, বস্ত্র-বিবস্ত্রজাতিবিহীন, নীলখগাসনবাহন, সর্বজীবেস্থিত নিত্য জগন্নাথ, ইনি শুক্ল অশ্বসিংহাসনারূঢ়, শ্বেত যজ্ঞোপবীতধারী, শ্বেতরূপ, চন্দ্রাদিত্যময় জগদ্ব্যাপী জ্যোতির্লিঙ্গ, জ্যোতিরানন্দময়, সনাতন পরমব্রহ্ম। ওঁকার ইঁহার কঠিন মূল, ছন্দোবিস্তার ইঁহার শাখা, ঋক্ সাম ইহার ফুল, যজু ইঁহার ফল, অথর্ব ইঁহার গন্ধ, পঞ্চম অর্থাৎ আয়ুর্বেদের ইনি ওঁকার এবং আয়ু আরোগ্য ধনপুত্রাদি চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির জন্য এবং অবশেষে সংসারভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে বল্লুকাপ্রকাশী এই নিরঞ্জন ধর্মের পূজা"[১]। অথচ সত্যিই ধর্মঠাকুর আদিতে এই ভাবনার দ্বারা পুজিত হতেন এবং এখনও হচ্ছেন কিনা তার পরিচয় পেতে গেল ধর্মঠাকুরের পুজানুষ্ঠান রাঢ়-অঞ্চলে আজও কিভাবে পালিত হয় তার তন্ন তন্ন বিবরণ সংগ্রহের প্রয়োজন। ধর্মের সঙ্গে কূর্মের সম্পর্ক এবং কূর্ম কি বস্তু তা পৃথক প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করেছি। ধর্মশিলা নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ডের তুলনামূলক বিচারে ঐ এক বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিশেষ কষ্ট হয় না এবং ঐ বস্তুবাদী সিদ্ধান্ত ভাববাদী সিদ্ধান্তের তুলনায় অনেক বেশী টেঁকসই ও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

কূর্মের পর ধর্মপূজার দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হোল ধর্মশিলা। ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। শিলাখণ্ডই হল ধর্মঠাকুরের প্রতীক। শিলার গড়ন নানা রকমের হয়। গোল, নোড়ার মত, বড় ব্যাসাল্ট পাথরের টুকরা, শালগ্রামের মত, Wood fossil-এর টুকরা, কোথাও বা পরিত্যক্ত শিবলিঙ্গ, ধর্মঠাকুর বলে পুজিত হন। (ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবের গাজনের যথেষ্ট মিল আছে এবং ধর্মঠাকুর ও শিব কিভাবে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত তা পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশ করা হবে।) এখন লিঙ্গ ও প্রস্তরখণ্ডকে ধর্ম বলে পুজার ঐতিহ্য কিছু একটা আছে। লিঙ্গপুজা যে অবৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ পণ্ডিতবর্গ দিয়েছেন। মিশরের ওসাইরিসের পুজার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পুজার যথেষ্ট মিল আছে। ওসাইরিস ছিলেন

শস্যদেবতা। তাঁর মৃতদেহ থেকে জননাঙ্গ পাওয়া যায় নি বলে তাঁর স্ত্রী আইসিস দেবী লিঙ্গ-পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "পৌরাণিক কাহিনীতে ধর্মকে বৃষ কল্পনা করা হয়েছে। সত্যযুগে তাঁর চার পা ছিল"[২]। ওদিকে ওসাইরিসের উপাখ্যানে আইসিস দেবী কর্তৃক ওসাইরিসের প্রতিভূ স্বরূপ বৃষকে প্রতিষ্ঠা করার কথা আছে। শুনতে একটু আশ্চর্য লাগলেও ওসাইরিসের পূজার প্রভাব যে এ দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভাষা এবং সংস্কার বিশ্লেষণ করলে এই সাযুজ্য পরিষ্কার ধরা পড়ে। শ্রীসুধাংশু কুমার রায় বড়ই চমকপ্রদ কথা বলেছেন[৩]। তিনি বলেছেন মিশরের ফারাও রাজাদের মধ্যে একজন বিতাড়িত হয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে আসেন। তাঁর মৃতদেহ (মমি করে) রাজমহলের কোনো এক জায়গায় লুকানো আছে এবং তাঁর বার্ষিক মৃত্যুদিবস স্মরণের দিনই হল গাজনের সন্ন্যাসীদের পালন এবং অনুষ্ঠান। তিনি আরও বলেছেন, মিশরের "ডো-আহোম-রা" থেকে "ধর্মরাজ" শব্দের উৎপত্তি। মিশরীয় প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আমাদের দেশীয় ভাষার মধ্যে ভুরি ভুরি প্রাচীন মিশরীয় ভাষার শব্দ খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি আমাদের ব্রত, সেঁজুতি-আল্পনার সঙ্গে হাইরোগ্লিফিক লিপি বা চিত্রলিপির আশ্চর্যজনক মিল দেখিয়েছেন। এই মিলের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "বাংলার ব্রত" পুস্তিকায়। (তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, বাংলার পণ্ডিতরা তাঁর এই মত গ্রাহ্য করেন নি কিন্তু বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে তিনি এমন এমন তথ্য এনেছেন, যা তাঁর মতকে আরও শক্তিশালী করবে)। রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করে শ্রীরায়ের এই মতকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তা আমার ধারণা জন্মেছে। এই ধারণার কথা প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করা হবে।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে এত বিষয় একসঙ্গে ভিড় করে আসে যে, সহজেই বিভ্রান্ত হতে হয়। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফসল ফলানোর সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কযুক্ত যে সমস্ত যাদুবিশ্বাসের প্রচলন ছিল সেগুলির সমন্বয় ঘটেছে বহু গোষ্ঠির ধর্মপূজায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আদিম বিশ্বাসের উপর বৌদ্ধ এবং আর্যধর্মের প্রলেপ পড়েছে। ধর্মঠাকুরের মিশ্র স্বরূপের এটিই প্রধান হেতু।

ধর্মঠাকুরের মন্দির এখন বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হলেও প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে অনুমান করা শক্ত হয় না যে, ধর্মঠাকুরের কোনো মন্দির এককালে ছিল না। উন্মুক্ত স্থানে পুজা হত অথবা সাময়িক আচ্ছাদন দেওয়া হত। রাঢ়ের এখনও বহু স্থানে ধর্মপুজার কয়দিন ধর্মশিলাকে মন্দির থেকে বের করে উন্মুক্ত স্থানে রেখে পুজা হয়ে থাকে এবং কোনো পুজাস্থানই ৫০০ বছরের আগেকার বলে মনে করা চলে না। এইটি একটি মস্ত বড় লক্ষণীয় বিষয়। আদিম সমাজে rain-charm এবং sun-stone হিসাবে যা ব্যবহার করা হত ধর্মশিলা সেই বস্তুই হওয়া সম্ভব। কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যগুলি প্রচারের ফলে দেবতাকে স্থায়িভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং আর্য-ভাবনা ও পরিকল্পনা মিশ্রিত হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এখন ধর্মঠাকুর মূলত rain-charm এবং sun-stone-এর বিবর্তনের ফল, তা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করছি।

স্নান সংক্রান্ত

গ্রামের বিবরণী থেকে বিশদভাবে বোঝা যাবে ধর্মঠাকুরের স্নানসংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি। সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মঠাকুরের স্নান-শোভাযাত্রা ও বাণেশ্বরের স্নান একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া। সাধারণত পুকুর বা নদীতে ধর্মশিলাকে স্নান করানো হয়। সারা বছর জলে ডুবিয়ে রাখার দৃষ্টান্তও আছে। দুধ এবং মদেও স্নান করানো হয়ে থাকে। কোথাওবা ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে স্নান করানোর বিধি। কোনো গ্রামে বৈশাখী পুর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যায়, পরদিন সকাল বিকালে দু'বার, এবং পরদিন একবার—এই মোট চারবার স্নান করানো হয়। বীরভূমে কয়েকটি গ্রামে অনেকগুলি ঘাটে পর্যায়ক্রমে ধর্মঠাকুরকে স্নান করানোর নিয়ম। অনেক গ্রামে সারারাত ধরে ধর্মঠাকুরকে প্রতিটি বাড়ীর সম্মুখে নিয়ে যাওয়া ও পুজা দেওয়া হয়। প্রতি বাড়ী থেকে ভক্তরা বের হয়ে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালেন। (পুজার শেষদিনে ভক্তরা বাণেশ্বরকে নিয়ে বাড়ী বাড়ী প্রদক্ষিণ করার সময় বাড়ীর মেয়েরা বেরিয়ে এসে ভক্তদের পায়ে জল ঢালে)। তারপর ভোরবেলা পুকুরে নিয়ে গিয়ে ধর্মঠাকুরকে দুধগঙ্গাজলে স্নান করানো হয়। পুরোহিত এইদিন উলঙ্গ অবস্থায় আংট (অক্ষত শীর্ষ) কলা-পাতা পরিধান করেন। কোনো গ্রামে ভক্তরা ধর্মঠাকুরের স্নানজল (দুগ্ধমিশ্রিত) কলসীতে পুরে মাথায় নেয় এবং দেবাংশী মাথায় টোকা নিয়ে ভর হয়। কোথাও বা ভক্তরা গ্রামে যতগুলি পুকুর আছে তার সবগুলিতে ডুবে এসে ধর্মের মাথায় ফুল চড়ায়। কোনো এক গ্রামে দেখেছি ধর্মঠাকুরের পুজার চতুর্থ দিনে ধর্মঠাকুরকে ঘাটে নিয়ে গিয়ে দু'জন ভক্ত জলে আধঘণ্টা ডুবে বসে থাকে।

জলে নেমে প্রসাদ ভক্ষণ, স্নানজলে প্রদীপ জ্বালানোর চেষ্টা, পুকুর থেকে চড়কগাছ তুলে আনা বা জলের ধারে গিয়ে চড়কগাছকে নিমন্ত্রণ জানানো সবই বিশ্লেষণের এক পর্যায়ে পড়ে। (দাতুড়ীঘাটা আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কূর্ম প্রসঙ্গে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হবে)।

ভাঁড়াল নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড

ধর্মপুজানুষ্ঠানে মত্তভাঁড়ালের ব্যবহার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এরও আবার বৈচিত্র্য প্রচুর। ভাঁড়াল আনার বিচিত্র অনুষ্ঠান, ভাঁড়াল নিয়ে খেলা, ভর বা আবেশ, মত্ত নিয়ে মারামারি, ভাঁড়াল নড়ানো অনুষ্ঠান, ভাঁড়াল মাথায় ছুট, ভাঁড়াল পুজা, ভাঁড়াল জাগানো, ভাঁড়াল ভাসানো, রাজভাঁড়াল, ফুলভাঁড়াল, দুধভাঁড়াল, মাণিকভাঁড়াল প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি যথাসময়ে বিস্তারিত বলা হবে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন, মত্তভাঁড়াল বরুণের সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত করছে[৪]। তাঁর অনুমান একদিক থেকে যথার্থ কিন্তু আমাদের আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে। যাক তার আগে ধর্মঠাকুর সম্পর্কে আর একটি দরকারী কথা বলে নিই।

গ্রীষ্মে ধর্মপূজা ও অগ্নি

(ক) প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ধর্মপূজা হয় বা হবার বিধি।

(খ) ধর্মপূজার সময় ধর্মঠাকুরের মাথায় আগুন চড়ানো হয়। কোথাওবা ধর্মশিলা হাতে অগ্নি-পরিক্রমা করা হয়ে থাকে।

এগুলির "কেন" ভাববাদী দৃষ্টিকোণে বোঝা যাবে না। বস্তুবাদী আদিম সমাজের রহস্য বিশ্লেষণ করা দরকার। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন তুলনামূলক আলোচনা। আদিম সমাজ সারা বিশ্বে প্রায় একই প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডে অভ্যস্থ ছিল; কিন্তু কিভাবে তা এখনও গবেষণা-সাপেক্ষ। আমাদের সম্বল শুধুমাত্র তথ্য। যার দ্বারা কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারে মাত্র—সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান হয় না।

আদিম সমাজের rain-charm-এর প্রথা এবং Magical control of sun এই উভয় যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য নানাবিধ যাদুর সমন্বয় ঘটেছে ধর্মপূজায়। জেমস ফ্রেজার rain-charm-এর উদ্দেশ্যে নানাদেশের অনুন্নত অধিবাসীরা কি পন্থা অবলম্বন করত তার[৫] উদাহরণ দিয়েছেন। উল্লেখিত ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে ক্রিয়াকাণ্ডগুলির সঙ্গে তার কিছু কিছু মেলানোর চেষ্টা করা যেতে পারে—

মধ্য অষ্ট্রেলিয়ায় Dieri-দের মধ্যে অনাবৃষ্টির কালে একটি বারো ফুট লম্বা গর্ত করে কাঠ দিয়ে কোণাকৃতি কুঁড়ে ঘরের মত করে। দু'জন যাদুকর চকমকি পাথরের সাহায্যে হাত কেটে রক্ত বের করে। তারপর দুটি পাথর একটি কুঁড়ের মাঝখানে রেখে লোক দুটি পাথর দুটি বয়ে নিয়ে গিয়ে সর্বোচ্চ গাছের চূড়ায় নিয়ে বসায়। এর ফলে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস। তারপর যুবকরা মাথায় ঢুঁ মেরে কুঁড়ে ঘরটি ভেঙ্গে ফেলে। জাভায় লোহার শিক দিয়ে পিঠে খোঁচাখুঁচি করে রক্তপাত ঘটানো হয়। সেই রক্ত মাটিতে পড়লে বৃষ্টি হয়। আবিসিনিয়ায় Egghion গ্রামে গ্রামে রক্তপাত সহ মরণাস্তিক লড়াই করা হত অনাবৃষ্টি কালে। (তুলনীয় চড়কের সময় গাজনের ভক্তদের রক্তপাত)। গ্রীসে Thessaly ও Macedonia-তে অনাবৃষ্টিকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোভাযাত্রা বেরুত। তারা কূপ এবং ঝরণার চারিপাশে ঘুরত। শোভাযাত্রার পুরোভাগে একজন বালিকা সুসজ্জিত অবস্থায় থাকত। তাকে একটু পর পরই জল ঢেলে অভিষিক্ত করা হত। Serbian-দের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা আছে। ভারতে পুণা অঞ্চলেও অনাবৃষ্টিকালে একই রকম প্রথা অনুষ্ঠিত হয়। (বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও এইরূপ শোভাযাত্রা এবং জল ঢালার নিয়ম বজায় রয়েছে)।

দক্ষিণ এবং পশ্চিম রাশিয়ায় rain-charm হিসাবে নানা ধরণের স্নানের প্রথা আছে। দক্ষিণ রাশিয়ায় Kursk-এ অনাবৃষ্টিকালে মেয়েরা একজন অজ্ঞাত পরিচয় পথিককে ধরে জলে চুবায়। আর্মেনিয়াতে rain-charm হিসাবে পুরোহিতের স্ত্রীকে জলে চোবানো হয়। শ্যাম-দেশে বৃষ্টি না হলে বৃষ্টিদেবতাকে আচ্ছাদন থেকে এনে রৌদ্রে রেখে দেওয়া হয়। "In a samoan village certain stone was carefully housed as the representative

of rain making god and in time of draught his priests carried the stone in procession and dipped it in a stream."৬

নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর ta-ta-thi উপজাতিরা এক টুকরা পাথরকে ভেঙ্গে চুর করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়। উঃ পঃ অষ্ট্রেলিয়াতে এক জায়গায় এক গাদা পাথর অথবা বালি জড়ো করে তার উপর magic stone বসানো হয় এবং তারপর পাশে নাচ গান চলে। পরে পাথরের উপর জল ঢেলে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দেওয়া হয়। নিউ বৃটেনে Sulka-রা একটা পাথরকে ছাই দিয়ে কালো রঙ করে এবং তার সঙ্গে কতকগুলো গাছগাছড়া দিয়ে রোদে রেখে দেয়। মণিপুরে একটা উঁচু পাহাড়ে একটা পাথর আছে। বৃষ্টির দরকার হলে রাজা ঝরণা থেকে জল এনে পাথরে ছিটিয়ে দিতেন। জাপানের Sagami-তে একটি পাথর আছে। তার উপর জল ঢাললে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয় বলে লোক-বিশ্বাস। (রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুর ছাড়াও অনুরূপ প্রস্তরখণ্ডে জল ঢেলে বৃষ্টিপাতের বিশ্বাস রয়েছে)। মধ্য আফ্রিকার Wakondvo উপজাতিরা বৃষ্টিপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে যাদুকরের কাছে যায়। তার কাছে থাকে rain-stone। সে অর্থের বিনিময়ে পাথরটিকে তেল মাখিয়ে জলে ডুবিয়ে দেয়। ফ্রান্সের বহু জায়গায় অনাবৃষ্টিকালে সাধুসন্তদের মূর্তি জলে চোবানো হয়ে থাকে। গ্রীস, রোম এবং নিউগিনির নানা জায়গায় অনাবৃষ্টির সময় পুরোহিত গাছের ডাল ভেঙ্গে জলে চোবায় এবং সেই জল চারিদিকে ছিটাতে থাকে।

তুলনীয়—ধর্মঠাকুরের ডালভাঙ্গা পর্ব। এই পর্বে ধর্মভক্তরা যথাক্রমে জামগাছ, বাবলা-গাছ, গামার গাছ ও করমগাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে আসে ধর্মপূজার আগের দিন রাত্রে। কিন্তু এগুলি দিয়ে আর কিছু করা হয় না। কোনো অনুষ্ঠান ছিল, তা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। অনুমান করা যেতে পারে বৃষ্টিপাতের জন্য অনুরূপ কোনো ক্রিয়াকাণ্ড ছিল।

Thessaly-র Crannon-রা অনাবৃষ্টিকালে মন্দিরে সংরক্ষিত একটি পিতলের রথকে ঝাঁকি দেয়। সেই শব্দ মেঘগর্জনের অনুরূপ মনে করা হয়। ঐ গর্জনে মেঘ আকৃষ্ট হবে বলে বিশ্বাস। (তুলনীয়—রথারূঢ় ধর্মঠাকুর : (বীরভূম ও বাঁকুড়া), মেঘরায় নামে ধর্মঠাকুর. বোলপুর থানার একটি গ্রামে পাঁচশত ঢাক পিটিয়ে কৃত্রিম মেঘগর্জন সৃষ্টির প্রচেষ্টা।)

রোম নগরীর বহির্দেশে Mars-এর মন্দিরে lapis mantalis নামে এক ধরণের প্রস্তর-খণ্ড থাকত। অনাবৃষ্টিকালে ঐ প্রস্তরটিকে রোম নগরীর মধ্যে টেনে বেড়ানো হত। Timo-rese-রা পৃথিবীদেবীর কাছে কালো শূকর বৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলি দিত। আর সূর্যকিরণ চাইলে লাল অথবা সাদা শূকর সূর্যের উদ্দেশ্যে বলি দিত। (তুলনীয়—বোলপুর থানায় একটি গ্রামে ধর্মের উদ্দেশ্যে শূকর বলি দিয়ে রাজভাঁড়ালে পুরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মের উদ্দেশ্যে সাদা ছাগ বলি সুবিদিত প্রথা)। আসামে গারোরা অনাবৃষ্টিকালে একটি কালো ছাগ বলি দেয়। জাপানের কোনো কোনো জায়গায় অনাবৃষ্টিকালে একটি কালো কুকুর নিয়ে পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় কুকুরটিকে মেরে তার গড়িয়ে পড়া রক্ত ধুয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকে।

শ্মশান খেলা গোর খেলা কাল্‌কে পাতার নাচ

ধর্মঠাকুরের অনুষ্ঠানে মড়ার মাথা নিয়ে গলিত শবদেহ নিয়ে, খেলা করা একটি বিশেষ প্রথা। এই প্রথা এখন সব জায়গায় টিকে নেই। তবে রাঢ়ের বহু অঞ্চলেই বজায় আছে। শ্মশান খেলা, গোর খেলা এবং কাল্‌কে পাতার নাচ একই বস্তু। (পাতা অর্থ, সাঁওতালি ভাষায় চড়ক।) কিন্তু ধর্মঠাকুরের পুজায় গলিত নরদেহ নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ডের কোনো সঙ্গতি পাওয়া যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ইহার অনার্যত্বে সংশয় নাই"[৭]। এখন এই অনুষ্ঠানগুলি অনিবার্যভাবে প্রাচীন কোন সমাজের যাদুবিশ্বাসের অন্তর্গত। ভিন্নমুখী উদ্দেশ্যে যাদুবিশ্বাসগুলি প্রথামত চলে আসতে আসতে এখন জট পাকিয়ে গিয়েছে। ফ্রেজারের বই থেকে এ সম্পর্কে কিছু তুলনামূলক তথ্য পাওয়া যায়। তা এই রকম—New Caledonia-তে কবর থেকে মৃতদেহ খুঁড়ে বের করা হয়। তারপর একটি গুহাতে নিয়ে গিয়ে পরস্পর জুড়ে কঙ্কালটিকে কতকগুলি পাতার উপর ঝুলিয়ে জল ঢালা হয়। ঐ জল পাতার উপর গড়িয়ে নীচে পড়লে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস। রাশিয়ায় বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে মদ্যপের মৃতদেহ তুলে তাকে কোনো জলা বা হ্রদে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া বিশ্বে অনেক জায়গায় পূর্বপুরুষদের সমাধি-ক্ষেত্রে নাচ, বিশেষত যমজ ব্যক্তির কবরের নিকট নাচ, বৃষ্টিপাতের অনুকূল বলে মনে করা হত। Ornico-র Red Indian উপজাতির মধ্যে মৃতের হাড়গুলি এক বছর পর তুলে এনে পুড়িয়ে বাতাসে ছাই উড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস ঐ ছাই বৃষ্টি বয়ে আনে।

মদ্যভাঁড়ালের ক্রিয়াকাণ্ডগুলি একাধারে rain charm এবং অন্যধারে উৎপাদনের সহায়ক (শস্য ও সন্তান) হিসাবে যাদুবিশ্বাসের অন্তর্গত বলে মনে করা যেতে পারে। (মদ্য-ভাঁড়ালের বিস্তারিত ক্রিয়াকাণ্ড ধর্মের গাজনের বিবরণে গ্রাম ধরে ধরে দেওয়া হবে।) এখন এই মদ্য ব্যবহারের প্রথা বিশ্বের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের প্রথার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—

আইরিশরা মৃত্যু উৎসবে মদ্য পান করে। দঃ আফ্রিকায় টুশিরা মৃত্যু ঘটলে উপবাস দিয়ে মদ্যপান করে। উলওয়াদের মধ্যে দেখা যায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মদ্যপান করার প্রথা। জাম্বেসীর তিসিন্নাইদের পচাই মদ "বোনা" অনুষ্ঠানে মৃতের কবরে ঢালা হয়[৮]। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, যাদুবিশ্বাস অনুসারে প্রাচীন মানুষের পক্ষে নবজাতককে পাবার—সন্তান উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে মদ্যের সংস্পর্শ মূল্যবান হবার কথা। সাঁওতালদের সৃষ্টি উপাখ্যানে এই বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মারাং বুরু তাদের মদ তৈরী করতে শেখালো—এই মদ পান করার পরই তাদের মধ্যে প্রজননের উৎসাহ প্রথম দেখা দিলো—তারই ফলে সম্ভব হলো মনুষ্যজাতির আবির্ভাব। প্রাচীন পর্যায়ে আটকে থাকা মানুষদের মধ্যে দেখা যায় যৌনমিলনমূলক উৎসবের প্রধানতম অঙ্গ হল মদ্যপান।...উৎসবের মদ্য ব্যবহারকে আধুনিক সমাজের শুঁড়িখানার আলোয় চিনতে গেলে ভুল করা হবে—কেননা তার পিছনে মূল কথা হলো ঐ তরল প্রাণশক্তি ব্যবহারের সাহায্যেই প্রকৃতিতে নবজন্মের আয়োজন করা"[৯]।

রাঢ় অঞ্চলে ধর্মপুজায় মন্ত ব্যবহারের হেতু আরও গবেষণাসাপেক্ষ হলেও আদিম যাদুবিশ্বাস-এর মধ্যে বজায় রয়েছে তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে।

পদ্ম

ধর্মপুরাণ ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধর্মের সঙ্গে পদ্মের সম্পর্ক উল্লিখিত হয়েছে। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন: "যে ধর্মঘরে নিরঞ্জনের বসতি তাহা নিঃসন্দেহে সহস্রার পদ্মের প্রতিচ্ছবি"[১০]। ভাববাদী দৃষ্টিতে এই পদ্মের বহু প্রকার জটিল ও যৌগিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পদ্ম সম্পর্কে এই সব ভাবনা অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, ধর্মঠাকুরের বেলায় নয়, কারণ ধর্মসাহিত্যের ঐতিহ্য বেশী দিনের নয়, কিন্তু ধর্মঠাকুরের পুজা সুপ্রাচীন। বস্তুতান্ত্রিক বিচারে হেষ্টিংস সাহেবের একটি উক্তিই যথেষ্ট—"In Egypt and amongst the Saivite in India the lotus is a symbol of the reproductive act".[১১]

(গ) সূর্য ও ধর্মঠাকুর

ধর্মঠাকুরকে সূর্যদেবতার সঙ্গে অভিন্ন বলেও প্রতিপন্ন করা যায়। কূর্ম সূর্যদেবতার প্রতীক। কূর্ম, ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ, কখনওবা ধর্মরূপী। ধর্মঠাকুর উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক এবং শুভ্রবর্ণ। তাঁর প্রতীক শ্বেতবর্ণ। তিনি রুষ্ট হলে ধবলরোগ হয়। তাঁকে আরাধনা করলে ধবলরোগ থেকে মুক্তি হয়। ঋগ্বেদে আছে :

"উদয় হয়ে মিত্র সম আরোহি ঐ উর্ধ্ব আকাশ
শারীরজ কিংবা মানস ব্যাধি কর বিনাশ"। (অনুবাদ)

"এই সূক্তগুলি রোগশান্তির জন্য পঠিত হয়। উপাখ্যান এই যে, প্রস্কন্ধ ঋষি রোগশান্তির জন্য ইহার দ্বারা সূর্যের স্তব করিয়াছিলেন। সূর্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহার ত্বকদোষ নিরাময় করিয়াছিলেন। শৌনিক বলিয়াছেন—"এই মন্ত্রত্রয় সূর্য সম্বন্ধীয়, পাপনাশক, রোগঘ্ন, ভুক্তিমুক্তি, ফলপ্রদ"[১২]।"

ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি। সূর্যের ধ্যানেও বলা হয়েছে, "নিরালম্ব রথে মার্গে শূন্যমূর্তি দিবাকরম্‌"[১৩]। ধর্মঠাকুরের মত সূর্যেরও এই গুণগুলি আছে: "অন্ধং কুষ্ঠং হরেত্তস্য দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবং"[১৪]। ধর্মঠাকুরের ধ্যানে বলা হয়েছে সূর্য এবং ধর্ম অভিন্ন: "শূন্যমার্গে স্থিতং নিত্যং শূন্য দেব দিবাকরং তমহং ভজামি শ্রীধর্মায় নমঃ[১৫]"। ধর্মঠাকুর যে সূর্য থেকে অভিন্ন তার পরিচয় ধর্মমঙ্গল-কাব্যে পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরকে ধ্যান করে শালে ভর দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে, "স্ত্রীহত্যার পাপ যায় সূর্যে গরাসিতে"। (ঘনরাম)। ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে শালে ভর দেবার অব্যবহিত পূর্বে রঞ্জাবতী অর্ঘ্য দেন—

"সূর্য অর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী
ওহে সূর্য সহস্রাংশু তেজোময় রাজি
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর,
অর্ঘ্য কর গ্রহণ কর ঠাকুর দিবাকর"। ইত্যাদি—(ঘনরাম)

সূর্য এবং ধর্মঠাকুর অভিন্ন হলেও ধর্মমঙ্গলে কোথাও কোথাও সূর্য এবং ধর্মঠাকুর ভিন্ন দেবতারূপে চিত্রিত হয়েছেন। গোলাহাট পালায় ধর্মঠাকুরের আদেশে এবং হনুমানের নির্দেশে সূর্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন।

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর চূড়ান্ত পরিণতি পশ্চিমোদয় পালায়। সূর্যকে পশ্চিমে উদয় করাতে না পেরে লাউসেন নিজের হাতে মাথা কেটে ধর্মকে নিবেদন করায় ধর্মঠাকুর লাউসেনকে জীবন ফিরিয়ে দিয়ে সূর্যের পশ্চিম উদয় দেখালেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : "বেদের বরুণের মত ধর্মমঙ্গলের ধর্ম সূর্যের অধ্যক্ষ, 'বিমো মমে পৃথিবীং সূর্যেন'। লাউসেনের আত্ম-হত্যায় চারিদিকে আক্রন্দ পড়েছিল। প্রাকৃত পৈঙ্গলের একটি কবিতার ভাষায় "হাকন্দ পলে"। তাই এই ঘটনা বা অনুষ্ঠানের নাম হাকন্দ। উচ্চারণ বিকৃতিতে হাকণ্ড। এই হাকন্দের ঘটনা সূর্যপূজাঘটিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান—একরকম ছিন্নমস্তা-সাধন। এ অনুষ্ঠানের অনুরূপ প্রক্রিয়া বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের সাধনমালায় গ্রথিত (২৭২) বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুণাকর গুপ্ত-রচিত যমারিসাধনের মধ্যে মিলবে। এই সাধনের বলিমন্ত্রে যমের সঙ্গে বরুণের উল্লেখ আছে। যমের সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বেদে, অবেস্তায় যম বিবস্বানের পুত্র। ধর্মমঙ্গলের হাকন্দ অনুষ্ঠানের দেবতার সঙ্গে যমের প্রত্যক্ষ সূত্র অন্ততঃ একটা আছে। বেদে, অবেস্তায় যমের অনুচর ও দূত, কুকুর। সাংযাত্রিক লাউসেন যখন হাকন্দে যাচ্ছিলেন তখন এক কুকুর তাঁর সঙ্গ নেয়। এই প্রসঙ্গে ধর্মরাজপুত্র যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথে কুকুর সহযাত্রীর কথা স্মরণীয়। বাটুয়া কুকুর পশ্চিম-উদয়ের পালা সময় পর্যন্ত হাজির ছিল। তুলনা করুন ঋগ্বেদের ঋষির প্রার্থনা যমের উদ্দেশ্যে—

উরূণ সাবসুতৃপ্পা উদুম্বলৌ
যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যম্ দৃশয়ে সূর্যায়
পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্।

স্থূলনাস, প্রাণলোভী, উদুম্বল (?) এই দুই যমের দূত জনমধ্যে বিচরণ করে। তারা যেন আজ এখন আমাদের আবার দেয় ভদ্রজীবন যাতে সূর্যকে দেখতে পাই[১৬]"। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে লাউসেনকে 'কশ্যপতনয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে সূর্যদেবতাও কশ্যপতনয়। ছোট-নাগপুরের ওঁরাও জাতিরা তাদের প্রধান দেবতাকে 'ধর্মেশ' নামে অভিহিত করে থাকে। তাঁর আদি নাম "বিরিবেলাস"। এর অর্থ, সূর্যরাজা বা সূর্যপ্রভ[১৭]। এই দেবতার রঙ সাদা, সাদা রঙের পাঁঠা কিম্বা মুরগী বলি দিতে হয়।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে রাঢ় অঞ্চলে প্রাপ্ত তথ্য

কোনো কোনো গ্রামে ধর্মপূজায় সূর্যার্ঘ্য দেওয়ার বিধি আছে। অধিকাংশ স্থানেই সাতবার প্রদক্ষিণ করার মধ্যে সূর্যপূজার ইঙ্গিত বর্তমান। খুজুটিপাড়া (বীরভূম) থেকে প্রাপ্ত কিংবদন্তীতে ধর্মের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে, জ্যোতিষ্মান্ শ্বেতবর্ণের পুরুষ, শ্বেত অশ্বারোহণে,

তা সূর্যেরই রূপ। ধর্মঠাকুরের কুষ্ঠ শ্বেতি প্রভৃতি রোগ আরোগ্যের ক্ষমতার কথা সর্বত্রই বজায় আছে। ঐ সকল রোগ নিরাময়ের কামনায় রাঢ় অঞ্চলে সূর্যের উদ্দেশ্যে শ্বেতপদ্ম মানসিক করার প্রথা বিদ্যমান। এককালে বীরভূম অঞ্চলে সূর্যপূজার বেশ প্রচলন ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় অজস্র সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার দরুণ। বীরভূমে তিন প্রকার সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। (১) পাদুকা-পরিহিত পদ্মাসনে দণ্ডায়মান, পদ্মহস্ত, দ্বিভুজ (পাইকড় গ্রামে)। (২) বারা, ঢেকা, দক্ষিণগ্রাম, নারায়ণপুর, প্রভৃতি স্থানে অশ্বসারথিযুক্ত দণ্ডায়মান। (৩) অশ্বসারথিসহ রথোপবিষ্ট মূর্তি। (দ্বিতীয় প্রকার মূর্তি সিউড়ী রতন লাইব্রেরীতে একটি রক্ষিত ছিল।) শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন : "পাল রাজগণের সময়েও এদেশে সূর্যোপাসনা প্রচলিত ছিল[১৮]।"

এখন সূর্য-উপাসনা আর্যধর্মের বাইরে অনুসন্ধান করা দরকার। যোগেশ রায় মহাশয় লিখেছেন : "ইজিপ্টের ফারাও আখেনটন এক মিটন্নী রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় রাজ্যে সূর্যোপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দের কথা। তৎকালে তাঁহার রাজ্যে অপদেবতার পুজা প্রচলিত ছিল। সূর্যপূজা প্রবর্তিত করিয়া তিনি আখেনেটন বা রবিপ্রিয় নাম লইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সূর্যস্তুতি পড়িলে মনে হয় ঋগ্বেদের সবিতা স্তুতির অবিকল অনুবাদ[১৯]।" স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ লিখেছেন : "গ্রীকদের হেলিওস, রোমদের সোল, পারসিকদের মিত্র বা মিতু, কালদিয়াদের ব্যাল বা বেল, কাননোইটদের মোলক ইজিপ্টবাসীদের রা, ওসাইরিস, হোরাস বা থা সকলে এক সূর্য তথা মিত্র দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম বা রূপ[২০]।" কিন্তু এই সকল তথ্য থেকে বোঝা শক্ত কে কার কাছে ঋণী। সুতরাং আমাদের আরও পিছিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে অনুন্নত আদিম সমাজে সূর্যকে কেন্দ্র করে কি রকম ক্রিয়াকাণ্ড ছিল বা আজও আছে। জেমস্ ফ্রেজার তাঁর বইয়ে Magical Control of the Sun অধ্যায়ে যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু তথ্য তুলনা করার জন্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

প্রাচীন মেক্সিকোর লোকরা সূর্যকে জীবনীশক্তির মূল উৎস বলে মনে করত এবং যেহেতু হৃৎপিণ্ড হল জীবনের প্রতীক সেজন্য মানুষ এবং প্রাণীদের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড সূর্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। সূর্যের উত্তাপ যাতে কমে না যায় সেইজন্য নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়ে রক্তপাত ঘটানো হত এবং বন্দীদের হত্যা করা হত। গ্রীসের Rhodians-রা সূর্যের উদ্দেশ্যে রথ এবং চারটি ঘোড়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করত। স্পার্টা, পারস্য প্রভৃতি দেশবাসীরা সূর্যের উদ্দেশ্যে ঘোড়া বলি দিত। তাছাড়া সূর্যের দক্ষিণায়ন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আদিম সমাজে বহু অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত ছিল। গ্রহণের সময় পেরুর Ojebway এবং পেরুর Sencis-রা সূর্যের পানে আগুনে তীর নিক্ষেপ করত। উদ্দেশ্য সূর্যকে আবার আগুণ ধরিয়ে দেওয়া। প্রাচীন মিশরের রাজা সূর্যের প্রতিনিধি হিসাবে চারিপাশে ঘুরতেন (তুলনীয় ধর্মমন্দিরের চারিপাশে ভক্ত্যাদের ঘোরা)। New Caledonia-তে যখন বহুদিন সূর্য দেখা যেত না তখন যাদুকর কতকগুলি গাছগাছড়া ও প্রবাল, ছোট ছেলের চুল দিয়ে জড়িয়ে কবরখানায় গিয়ে মৃতের দাঁত ও চোয়াল

সংগ্রহ করত। তারপর যে পাহাড়ে প্রথম সূর্যকিরণ দেখা দেয় সেখানে গিয়ে একটি চওড়া পাথরে তিন রকম গাছগাছড়া এবং একঝাড় শুকনা Coral রেখে বাকী জিনিষগুলি পাহাড়ের উপর বেঁধে ঝুলিয়ে দিত। পরদিন সকালে এসে সে ঝুলন্ত জিনিষগুলিতে আগুন ধরাত। তারপর শুকনা Coral-গুলিকে পাথরে ঘষতে ঘষতে পূর্বপুরুষদের ডাক দিয়ে বলত, 'হে সূর্য! তোমাকে গরম করবার জন্য আমি এই ক্রিয়া করছি, তুমি মেঘ খেয়ে শেষ করে ফেল'। সূর্যাস্তের সময় এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হত। সূর্যোদয়ের জন্য আর একটি যাদুবিদ্যা ছিল। একটি ছিদ্রযুক্ত গোল পাথরে জ্বলন্ত শলাকা বার বার প্রবেশ করিয়ে বলা হত, সূর্যকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি, যাতে সে মেঘকে খেয়ে ফেলে জমিকে শুকিয়ে ফেলে।

এবার ধর্মশিলার সঙ্গে সূর্যশিলার পরিষ্কার তুলনা করা যায়। Bank Islanders-রা সূর্যকিরণ ফিরে পাবার জন্য কৃত্রিম সূর্য হিসাবে একরকম পাথর ব্যবহার করত। তারা Sun-Stone-এর চারিদিকে লাল রঙের সুতো বেঁধে প্যাঁচার পালক দিয়ে জড়াত তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে উঁচু গাছের উপর ঝুলিয়ে দিত।

এই সকল উদাহরণ থেকে স্বভাবতঃই আমরা মনে করতে পারি যে, সূর্য-সংক্রান্ত যাদুবিদ্যাগুলিও ফসল ফলানোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অতিবৃষ্টির ফল এবং দীর্ঘকাল সূর্যের অন্তরালে অবস্থান, উভয়ই শস্য নাশের কারণ। এই মূল প্রয়োজনের তাগিদে অনুরূপ যাদুবিশ্বাসের (magical faith) জন্ম। এ দেশেও সূর্য-সংক্রান্ত যাদুবিদ্যা নিম্নপর্যায়ের মানুষের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে। এই সূর্যসংক্রান্ত যাদুবিদ্যা ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠানে এসে মিশ্রিত হয়েছে সে সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি জন্মানো চলে। বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মপূজার যোগদানের ফলে এই মিশ্রণ স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সূর্য-ধর্ম সম্পর্কের কথা পরবর্তীকালে উন্নততর ভাবনার যোজনা মাত্র।

(ঘ) ধর্মঠাকুর ও বরুণ

ধর্মঠাকুরকে অনেক ক্ষেত্রে বরুণদেবতা বলে মনে করা হয়। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক কি এবং কতখানি তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আর্য সংস্কৃতিতে যম এবং বরুণকে রাজা বলা হত। পরলোক পথিককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, "স্বধায় মত্ত রাজা দুজন যম আর বরুণকে তুমি দেখতে পাবে[২১]।" ধর্মগাজনের দাতুড়ঘাটা পর্ব জলোৎসবের মত। অঘোর বাদল (ধর্মমঙ্গল কাব্যে) পালায় জলাধিপতি বরুণের স্বরূপের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মপূজার ভক্ত্যারা যে ধর্মঘট অনুষ্ঠান করেন তার সঙ্গে বারুণীর সম্পর্ক আছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "বরুণের মত ধর্মেরও ঘর। দু-দেবতাই ধৃতব্রত এবং তাঁদেরও ব্রত অলঙ্ঘ্য। বরুণের নামান্তর ধবল, ধর্মনিরঞ্জন। বরুণের শ্বেত নির্ণিক, ধর্মের ধবল বসন। বরুণ মায়াবী, 'ধর্মের বিষয় আর কহনে না যায়[২২]।' ঘর ভরা অথবা গৃহ ভরণ অনুষ্ঠান পুত্রেষ্টি যজ্ঞবিশেষ। বরুণ পুত্র দান করেন, ধর্মের নিকট মানসিক

করলে তেমনি পুত্র লাভ হয়। ধর্মপূজা বিধানে ধর্মের নিকট ছাগ বলির মন্ত্রে বরুণের উল্লেখ আছে। যেমন, ওঁ পাশ তং বরুণাজ্জাত...ইত্যাদি।

বরুণ প্রঘাস নামে বরুণপাশ মোচনের জন্য একটি অনুষ্ঠান আষাঢ় পুর্ণিমায় করা হত। (মৈত্রায়নী সংহিতা ১, ১০, ১১) এই অনুষ্ঠানে স্ত্রীকে তার গোপন প্রেমাস্পদের নাম প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিত করার বিধান ছিল[২৩]। আষাঢ় পুর্ণিমায় ধর্মঠাকুর বহু জায়গায় পুজিত হন। কিন্তু বরুণ প্রঘাসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্ততঃপক্ষে এই ক্ষেত্রে ধর্মঠাকুরকে মেলানো যায় না।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে মণ্ডভাঁড়ালের ক্রিয়াকাণ্ড দাড়ুড়ীঘাটা, গাজন অনুষ্ঠানে স্থানবিশেষে জলক্রীড়ার অনুষ্ঠান, জল থেকে ধর্মশিলা তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি তথ্য থেকে বরুণ-দেবতার সঙ্গে ধর্মঠাকুরকে অভিন্ন বলে বোঝানো যেতে পারে।

বরুণ সম্পর্কে নূতন ধরণের বলিষ্ঠ আলোচনা করেছেন মনীষী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আলোচনার কিছুটা তুলে দিচ্ছি—"বৈদিক আর্যদের কাছে স্বর্গের এক দেবতার নাম বরুণ এবং অধ্যাপক রথ অনুমান করেছেন, আদিপর্বে এই বরুণই ছিলেন বৈদিক দেবলোকের মধ্যে প্রধান ; কালক্রমে তাঁর গৌরব ইন্দ্রের গৌরবের নীচে চাপা পড়েছিল। আফ্রিকার দিন্‌করা তাদের এই বরুণেরই নাম দেয় দেনগডিৎ।

They worship a high god, Dengdit, lit. "Great Rain" sometimes called Nyalich and a host of ancestral spirits called yok. The Nyalich is the locative of a word meaning 'above' and literally translated, signifies in the above (E. R. E. 4 : 707) এবং দিন্‌কদের বিশ্বাস অনুসারে তিনিই দ্যাবা-পৃথিবীকে পরস্পর থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। ঋগ্বেদে বরুণ সম্বন্ধেও সেই কথা।"

"ঋগ্বেদে (৬, ৩৬, ১) ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, 'তুমি প্রকৃতই অন্ন।' এর সঙ্গে নবাভিষিক্ত রাজার প্রতি নাইজিরিয়ার জুকুনদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলনা করা যায়—they bow down before him and cry "Our rains, our crops, our health, our wealth"

"ওদের স্তোত্রের একটি নমুনা :

Father Rain falls into a solitary place
Father Rain falls into a solitary place
The Lord was in untrodden ground
Hold the Father well, He holds our few souls
Hold the Rain well, He holds our few souls"

(M. Monier Williams-Sans-Eng. dictionary[২৪])

বরুণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করার আর প্রয়োজন নেই। ধর্মঠাকুরকে যদি এই বরুণের মধ্যে আমরা পাই তাহলে আমার বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হচ্ছে। ধর্মঠাকুরের মধ্যে সম্পৃক্ত, আদিবাসীদের rain charm-এর ম্যাজিক, ব্রাহ্মণদের হাতে বরুণরূপে চিহ্নিত

হয়েছেন। অনাবৃষ্টি কালে আজও রাঢের বহুস্থানে বরুণের পুজা হয়ে থাকে। সুতরাং ধর্ম-ঠাকুরকে বরুণের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে পূর্ব প্রবন্ধগুলিতে যা প্রমাণ করতে চেয়েছি তা আরও জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে।

(ঙ) ধর্মঠাকুর ও কূর্ম

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্মের বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ধর্মের পাদপীঠরূপেই কূর্মের ব্যবহার। যেখানে পাদপীঠরূপে কূর্মের ব্যবহার রয়েছে সেখানে কূর্মের পৃষ্ঠদেশে ধর্ম-ঠাকুরের দুটি পাদুকালাঞ্ছনের চিহ্ন থাকে। আবার সব সময় থাকেও না। কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুরও আছেন। অর্থাৎ বাহন আর দেবতা এক হয়ে গেছেন। কূর্মমূর্তি কখনও চতুষ্কোণ পাথরের পাদপীঠের উপর স্থাপন করা থাকে। কখনও বা বিনা পাদপীঠেই কূর্মমূর্তি দৃষ্ট হয়।

ধর্মঠাকুরের কূর্মপ্রতীক বা বাহনের কথা কোনো পুরাতন পুঁথি পুস্তকে নেই। বাহন হিসাবে ধর্মপুরাণে যা উল্লেখ আছে তা হল উলূক। সে যাই হোক, প্রত্নতত্ত্বগত দিক থেকে কূর্মের শিলামূর্তি যা দেখা যায়, তাদের বয়স ৩০০ থেকে ১০০০ বছরের বেশী নয়। অত্যন্ত ক্ষয়ে যাওয়া কূর্মও দেখেছি। তাদের বয়স অনুমান করা সম্ভব হয়নি। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগে অবশ্যই)। বীরভূম অঞ্চলে সিউড়ী, নান্নুর, মহম্মদবাজার, সাঁইথিয়া, বোলপুর, খয়রাশোল থানার বহু গ্রামের ধর্মশিলার সঙ্গে কূর্ম অথবা পাদুকাচিহ্ন সমেত কূর্ম, ধর্মঠাকুর বলে পুজিত হন। সিউড়ী থানার মুড়োমাঠে ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতির বৈশিষ্ট্য হল, সেটির একটি শ্বেতশৃঙ্গ আছে। সম্ভবতঃ হাতির দাঁত দিয়ে তৈরী। শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"তে কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুরের কিছু খবর দিয়েছেন (বাঁকুড়া জেলার)।

এখন কূর্মের স্বরূপ অবগতির চেষ্টা করছি—

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্য এবং কূর্মের সম্পর্ক পূর্বে বলা হয়েছে। কূর্মকে অন্যদিক থেকে দেখা যাক। ধর্মঠাকুর যে কচ্ছপরূপ ধারণ করেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় ধ্যানে—

"কচ্ছপরূপধরং মহিংমনোহরং নির্লেপং নিরঞ্জনং[২৫]"

মন্ত্রে আছে

"শ্রীধর্মায় নমঃ। কূর্মবাহনায় নমঃ। উলুক বাহনায় নমঃ। ধবল খচরায় নমঃ"[২৬]

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ; "ধর্মঠাকুর গোড়ায় কূর্মদেবতা ছিলেন না। তবে তাঁর পুজায় কূর্মদেবতার পুজা এসে মিশেছে। কূর্মদেবতা, সূর্যদেবতা এবং জলদেবতা। ধর্মঠাকুরও অনেকটা তাই। ধর্মঠাকুরের বুটপরা অশ্বারোহী সিপাই মূর্তির বর্ণনা কোনো কোনো ধর্মপুরাণ পুঁথিতে আছে—

'হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা,
অবশেষে বোলাইলে গৌউড়ের রাজা।'

এমনি সূর্যমূর্তি অনেক পাওয়া গেছে। এ মূর্তি ও তার পুজা এদেশে চালু করেছিল ইরান থেকে আগত মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা। এই সঙ্গে কূর্ম পুজারও প্রসার বেড়েছিল বলে মনে করি।

তবে আরও আগে এ পুজা অজ্ঞাত ছিল না। বর্ষায় বৃষ্টি না হলে কূর্মপুজার বিধি আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে।

শতপথ ব্রাহ্মণে সূর্যকে কূর্ম বলা হয়েছে। দশ অবতারের মধ্যে কূর্ম দ্বিতীয় অবতার। প্রথম অবতার মীনের কাহিনীও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। সে কাহিনী যে বাইরে থেকে এসেছে একথা পণ্ডিতরা স্বীকার করেন। কূর্ম অবতারের কোনো বিশিষ্ট কাহিনী পুরাণে নেই। যা আছে তা পৃথিবী অথবা মন্দর পর্বত ধারণের। পৃথিবী ধারণের কাহিনী সম্ভবতঃ ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কূর্ম যে ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ তাও এর সঙ্গে সংযুক্ত।…মঙ্গলার্থে কূর্ম পোষার উল্লেখ পাচ্ছি বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায়। বরাহমিহিরের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে রাজারা যেমন কুকুর ও কুক্কুট পুষতেন তেমনি কূর্মও পুষতেন। সুলক্ষণ কূর্ম পোষা হত ক্রীড়া সরোবরে অথবা ইঁদারায় রাষ্ট্রবিবর্ধনের সুলক্ষণ বলে। 'কাজল বা ভ্রমরের মত শ্যামবর্ণ অথবা বিন্দুর দ্বারা চিত্রিত পৃষ্ঠ অবিকৃত শরীর কিংবা সাপের মত মাথা ও স্থূল গলা যার এমন (কূর্ম) রাজাদের রাজ্যবর্ধন করে। বৈদূর্যবর্ণ স্থূলকণ্ঠ ত্রিকোণ গূঢ়ছিদ্র প্রশস্ত পৃষ্ঠাস্থি—এমন ভালো কূর্মকে রাজা মঙ্গলের জন্য রাখবেন ক্রীড়া সরোবরে অথবা জলপূর্ণ কূপে।' এখানে ধর্মঠাকুরের কূর্মপ্রতীকত্বের জন্য যাত্রাসিদ্ধি নামের একটা অর্থ মিলল। সাধারণতঃ কচ্ছপ অযাত্রা বলেই ধরা হয়।

কূর্মকে যে একদা পুজা করা হত তার উল্লেখ পেয়েছি কথাসরিৎসাগরের সঙ্কলিত বেতাল বর্ণিত ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসীর গল্পে। অঙ্গদেশের বৃহদ্‌বট্ গ্রাম নিবাসী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামী পুজা করবেন বলে তাঁর তিন ছেলে সমুদ্র থেকে কূর্ম আনিয়েছিলেন।…কূর্ম মূর্তিগুলি প্রায়ই ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতীক নয়, কেন না সেসব মূর্তির পিঠে ধর্মের পা আঁকা আছে। সেই 'ধর্মের পাদুকা'ই ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক।

উলূক বাহনং ধর্মং দেবং তেজোময়াত্মকম।
ইদানীং কূর্মপৃষ্ঠেতু দিব্যরূপং নমোঽস্তুতে[২৭]।"

কূর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বা ধর্মবিশ্বাসে আর যা যা সূত্র পাওয়া যায় তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

যোগশাস্ত্রে বহিঃস্থ উদ্গারাদি 'নাগ বায়ু'র এবং সংকোচনাদি 'কূর্ম' বায়ুর গুণ বলা হয়েছে। মহাকাল জপ করে এদের চৈতন্য সম্পাদন করাতে হয়[২৮]। সাঁওতালি উপকথায় পৃথিবী সৃষ্টির উপাখ্যানে কূর্ম কর্তৃক পৃথিবীর ভার বহনের উল্লেখ আছে[২৯]। কূর্মচক্র নামে একটি চক্র আছে। জপাদির যথাবিধি স্থান নির্দেশ করে সেই স্থানে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করা হয়। তারপর ঐ চতুস্রকে নয় কোষ্টায় বিভক্ত করে একটি কূর্মচক্র নির্মাণ করা হয়[৩০]। আসন-শুদ্ধির মন্ত্রে কূর্মদেবতার উল্লেখ আছে[৩১]। সামান্যার্ঘ্যে কূর্মদেবতাকে প্রণাম জানানের বিধি আছে[৩২]। কূর্মমুদ্রা নামে একটি মুদ্রাও আছে[৩৩]। তাছাড়া পাঁচজন সিদ্ধ গুরুর অন্যতম হলেন কূর্মনাথানন্দনাথ[৩৪]।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় টোটেম বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন,

"শতপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মাপ্রজাপতির কূর্ম রূপের কথা আছে। ঐ কাছিমই আবার কশ্যপ নামে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ থেকে সুরু করে পুরানো যুগের পুঁথিপত্র আলো করেছে[৩৫]।"

ভাববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কূর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক কিছুই পরিষ্কার হয় না বরং কূর্ম নিয়ে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং বস্তুতান্ত্রিক পথে কূর্মের রহস্যভেদের চেষ্টা করা দরকার।

আদিম মানবজাতির সমাজ সংগঠনে এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হল টোটেম বিশ্বাস। মর্গান আমেরিকার যে ৬টি ট্রাইবকে ভাগ করে দেখিয়েছেন তাতে সেনেকা, কেউগার, ওননডগা, মোহক, ওনেইডা ট্রাইবগুলির অন্যতম গোত্র হল কাছিম। টুসকারোয়ার দুটি উপদলে বড় কাছিম, ছোট কাছিম গোত্র আছে[৩৬]। আমাদের দেশেও ওঁরাও সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির নানা দলের মধ্যে হরো বা হারো গোত্র বিরল নয়। সাঁওতালি ভাষায়, হরো মানে কাছিম। মেক্সিকোর জুনি জাতিদের অন্যতম টোটেম হল কাছিম। জেমস ফ্রেজার বলেছেন : "the tortoise are supposed to be reincarnation of human dead for they are called the "Ourselves" of the Zuni[৩৭]।"

এই টোটেম বিশ্বাস আধুনিক সমাজের নানাস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করেছে। হিন্দুদের দেবীদের বাহন ও প্রতীকের মধ্যে টোটেম বিশ্বাস কিছু পরিমাণে মিশে আছে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম। শ্রীবিনয় ঘোষ ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গে বলেছেন : "কূর্ম-প্রতীকও কোনো নিষাদ জাতির কূর্ম টোটেমের চিহ্ন বলে মনে হয়[৩৮]।" কিন্তু ধর্মঠাকুরের কূর্ম যে সম্পূর্ণ টোটেম বিশ্বাসেরই পরিণতি তা প্রমাণ করবার মত উপাদান আপাততঃ হাতে নেই। আদিম সমাজের যাদুবিশ্বাসের অন্য একটা দিক ধরে আর একভাবে বিচার করা যেতে পারে—

বৃষ্টিপাতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি কৃষিকার্যের অন্তরায়। আদিম সমাজে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা যেদিন স্বীকৃত হয়েছিল সেদিন থেকে জীবন ধারণের তাগিদে প্রতিকারের উপায়ও খুঁজতে হয়েছিল মানুষকে। তারা জানত না বৃষ্টিপাত বা অনাবৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ। তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হত তুকতাক ও যাদুবিদ্যার। তুকতাকগুলি মূলতঃ ছিল ফসল ফলানো, জীবনের ভয় ও সন্তানজন্ম—এই তিনটিকে কেন্দ্র করে। (রাঢ়ের সংস্কৃতি এবং পূর্ব অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) কূর্ম নিয়ে যাদুবিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছিল তা প্রমাণ করা কঠিন নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে কূর্মপূজার বিধির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এটি সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য। কারণ এই বিধিটি সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী। কৌটিল্য যদি বলে না যেতেন তাহলে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা শক্ত হত। এই তত্ত্বটিই পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করলে কূর্মপুজার প্রভূত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

আদিম অনগ্রসর সমাজে বৃষ্টিপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রায় সব জায়গাতেই তুক্তাকের আশ্রয় নেওয়া হত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি—

Orinoco প্রদেশের ইণ্ডিয়ানরা ব্যাঙকে জলদেবতা মনে করে। সেজন্য তারা ব্যাঙ্ মারে না। অনাবৃষ্টি কালে তারা একটি পাত্রে ব্যাঙ্ রেখে সেটিকে প্রহার করে। Aymara

ইণ্ডিয়ানরা ব্যাঙ্ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীর মূর্তি গড়ে পাহাড়ের উপর রেখে দিয়ে আসে বৃষ্টি হবার জন্য। কলম্বিয়ার Thomson Indian-রা এবং ইয়োরোপের কিছু লোক বিশ্বাস করে ব্যাঙ্ হত্যা করলে বৃষ্টি হয়। মাদ্রাজে রেড্ডীরা (কৃষক) ব্যাঙ্ ধরে বাঁশের পাথায় বেঁধে নিমপাতা জড়িয়ে দরজায় দরজায় মেয়েরা গান করে এই বলে ; "স্ত্রীব্যাঙ্ চান করবে, হে বৃষ্টি দেবতা তাকে একটু জল দাও।" প্রতি বাড়ী থেকে লোক বের হয়ে এসে ব্যাঙের গায়ে জল ঢালে। বাংলা দেশেও বৃষ্টিপাত না হলে ব্যাপকহারে ব্যাঙের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। এ তথ্য সকলেরই জানা।

ব্যাঙ্ উভচর প্রাণী হলেও বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। কচ্ছপ উভচর হলেও মূলতঃ জলচর। বৃষ্টিপাতের charm হিসাবে কূর্মকে পাওয়া না গেলেও অপর দুটি আদিম কারণ—ভয় ও খাদ্য সংগ্রহ কার্যে, কচ্ছপ নিয়ে যাদুবিশ্বাসের কথা ফ্রেজার সাহেব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেমন—ইরাকে ভূত বিতাড়নের উদ্দেশ্যে লোকেরা বন্যজন্তুর ছাল ও মুখোশ পরে, হাতে কচ্ছপ বা কচ্ছপের খোলা নিয়ে, চীৎকার করে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াত। আর একটি হল, Torres strait-এর অধিবাসীরা ডুগং এবং কাছিম ধরার উদ্দেশ্যে কাছিম ও ডুগং-এর মূর্তি ব্যবহার করত। British New Guinea-র লোকদের মধ্যেও কচ্ছপ ধরার কাজে নানারকম যাদুবিশ্বাসের প্রথা প্রচলিত ছিল।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় কূর্ম পোষার যে বিধি আছে তার মূল উদ্দেশ্যই হল rain charm হিসাবে কচ্ছপের ব্যবহার। স্বয়ং ধর্মঠাকুরই বৃষ্টির দেবতা (এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। ধর্মপুজার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ধর্মশিলা অথবা বাণেশ্বরকে শোভাযাত্রা সহ পুকুর ঘাটে নিয়ে স্নান করানো এবং নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড করা হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের নির্দিষ্ট কোনো বিধি নেই। সে যাই হোক, এই অনুষ্ঠানটির নাম 'দাদুর' বা 'দাদুড় ঘাটা'। এই শব্দটির মানে নিয়ে 'তুলো ধুনি ধুনি আঁশুরে আঁশু' করা হয়েছে এ পর্যন্ত ; কিন্তু সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যাই কেউ দিতে পারেন নি। দর্দুর মানে ব্যাঙ এইটুকু বলেই থামতে হয়েছে। ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে জলক্রীড়াও নাকি করা হত। ধর্মপূজা বিধানে 'জলসাপুট' নামে একটি শব্দব্রহ্ম বিরাজ করছে। সম্ভবতঃ এটি জলক্রীড়াকেই বোঝাচ্ছে। বীরভূমে অন্ততঃ ২টি গ্রামে ধর্মপুজার আগের দিন রাত্রে দাদুর ঘাটার সময় জলক্রীড়া করার বিধি আছে। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে জলক্রীড়ার সম্পর্ক কি ? জলক্রীড়া আর কিছুই নয়, rain charm—এ সম্পর্কে আমি স্থির নিশ্চিত। সাঁওতালি ভাষায় দাদুর শব্দের অর্থ, অনেক বেশী। বীরভূমে রামপুরহাট থানায় দাদুর নামে একটি গ্রাম ও মৌজা ছিল (১৮৫১ সেন্সাস)। এখন সেটি নেই। বর্ধমান জেলাতেও অনুরূপ গ্রাম বা স্থান নাম বর্তমান। কিন্তু এর দ্বারা কোনো কিছুর নিরাকরণ হয় না। আসল কথা হল, শব্দটি হবে যাদুর ঘাটা। 'যাদু' শব্দটি ফার্সী। 'জাদ' শব্দের অর্থ সন্তান। তার থেকে যাদু বা জাদু। বাংলাতেও বাৎসল্য সম্পর্কে যাদু বলা হয়। সাঁওতালি অভিধানে যাদুর সঙ্গে নিষ্পন্ন কিছু শব্দ আছে। যেমন Jadgo—To Scratch

Jadhio
Jadhiokal } at any time
Jadio

Jadui—The Cocoons of the Tasar silk worm

Jadwahi—To warm oneself at a fire.

বীরভূম অঞ্চলে যাদুপটুয়া (যদুপতিয়া বা যাদুপতিয়া) নামে একটি জাতিও আছে। যারা মন্ত্রের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করতে পারে বলে মনে করা হয়। (হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মেই তারা বিশ্বাসী)।

সাঁওতাল ও ওঁরাওদের মধ্যে ফাল্গুন মাসে মেয়েদের একরকম নাচের নাম "যাদুর নাচ" ও "যাদু পরব"। মুণ্ডা জাতির মধ্যেও "জাদুরা" পরবের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক শ্রীনির্মল কুমার বসু[৩৯]।

সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যাদু শব্দটি অষ্ট্রিকমূল। সেটি পরিবর্তিত হতে হতে দাদুর ঘাটায় দাঁড়িয়ে গেছে। (১৯২৩ সালে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ছাপানো "ধর্মপূজা বিধানে" দাদুর ঘাটা বলে ছাপা হয়েছে। সেইটিই ভ্রান্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। কারণ গোটা বইটাই বিকৃত এবং অপভ্রংশ শব্দে ভর্তি। আগে বলেছি, ধর্মঠাকুরকে বুঝতে গেলে এ সমস্ত অর্বাচীন গ্রন্থকে একেবারে বাদ দিতে হবে।) রাঢ় অঞ্চলে অনুসন্ধান কালে বহু জায়গায় আমি "যাদুর ঘাটা" বলতে শুনেছি। এবং এইটিই হওয়া খুব স্বাভাবিক। ধর্মঠাকুর নিয়ে যাদুবিশ্বাস ও তুকতাকের তো অন্ত নেই। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন: "গাজনের দাহুড় ঘাটা পর্ব জলোৎসবের মতো। এখানেও বরুণের পুজার ইঙ্গিত। ধর্মের পূজায় মদ দেওয়া নিষিদ্ধ নয়। এতেও বরুণের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত[৪০]।" তাঁর এই মন্তব্য যথার্থ। তবে কেবলমাত্র বরুণ বললেই যথেষ্ট হয় না। আদিম সমাজেরও বৃষ্টিপাতের যাদুবিশ্বাস এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। ধর্মঠাকুর ও বরুণ প্রসঙ্গে দেখিয়েছি বরুণের কল্পনা শুধুমাত্র আর্যধর্মে একচেটিয়া নয়। অনুন্নত সমাজের বৃষ্টি কামনা, আর্যধর্মে বরুণরূপে পর্যবসিত হয়েছেন। ধর্মপূজায় পুরোহিত যেদিন থেকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেদিন থেকে আর্যভাবনা ধর্মপুজায় প্রবিষ্ট হয়েছে। ধর্মপূজায় যে মদ্য ভাঁড়ালের ব্যবহার তাও rain charm-এর ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। ডঃ সেন এই মদ্য ভাঁড়ালকেও বরুণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন[৪১]। (মদ্য ভাঁড়াল ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)। সুতরাং শুধু কূর্ম নিয়ে বিচার করলে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বোঝা যাবে না। আলোচিত তত্ত্বটি যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে কূর্মের পৃষ্ঠদেশে ধর্মের পাদুকালাঞ্ছনের যে চিহ্ন থাকে তা পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সমাজের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমত যথার্থ; "ধর্মঠাকুর গোড়ায় কূর্মদেবতা ছিলেন না, তবে তাঁর পুজায় কূর্মদেবতার পুজা এসে মিশেছে[৪২]।" ধর্মশিলা নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড এবং কূর্মপুজার উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে একই বস্তু তাই এই মিলন সাধন সহজ হয়েছে বলে আমার ধারণা। শ্রীবিনয় ঘোষ কূর্ম সম্পর্কে মন্তব্য

করেছেন, "ধর্মের কূর্মমূর্তিই আসল অকৃত্রিম মূর্তি" এবং "ধর্মঠাকুর কেবল শিলামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন ভাস্কর্যের অবনতির জন্য[৪৩]।" শ্রীঘোষ একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী। কিন্তু বলাবাহুল্যমাত্র ধর্মঠাকুরের পূজা উৎসব অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা না করেই নূতন কিছু বলার আনন্দে তাঁর এই মন্তব্যের প্রকাশ। তাঁর এই মত কোনোদিক থেকেই গ্রাহ্য করা চলে না।

(চ) ধর্মঠাকুর ও শিব

শিবের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক আছে। ধর্মপুরাণের মতে শিব, ধর্মঠাকুরের অন্যতম সন্তান। ধর্মের গাজনের নামান্তর দেউলপূজা বা দেহারা পূজা। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রায়ই এক রকম। বাংলার নাথপন্থী যোগীদের কোনো কোনো অনুষ্ঠানে ধর্মপূজার কিছু কিছু প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছিল[৪৪]। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন : "শিবের নীলাবতীর সঙ্গে ধর্মের নীল অনিলের এবং অথর্ববেদের ব্রাত্য সূক্তাবলীর নীল-লোহিতের ও মাতরিশ্বাপবমানের তুলনা করা যায়[৪৫]।" "ধর্মপূজাবিধানে" স্থাপন-ডাকে ধর্মঠাকুরকে আহ্বান করার রীতি আছে। যথা—"কৈলাস ছাড়িয়া গোঁসাঞি করহ গমন[৪৬]।"

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ধর্মরাজের সঙ্গে বহু জায়গায় শিব অভিন্ন হয়ে গেছেন। ১৮১৫ সালে ওয়ার্ড সাহেব ধর্মপূজাকে দ্বিতীয় প্রকার শিবপূজা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের পুশুরী ও রায়কালী নামে দুটি গ্রামের ধর্মরাজের গাজন ও চড়কের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : "Another form of Shiva. A black stone of any shape becomes the representative of this God. The worshippers paint the part designated as the forehead and place it under a tree ; others place the stone in the house and give it silver eyes, and anoint it with oil and worship it. Almost every village has one of these idols.

A festival in honour of this God is observed by some of the lower orders in Voishaku in the day. The ceremonies as like those of the swinging festival with the addition of bloody sacrifices, the greater number of which are goats. At this time devotees swing on hooks, perforate their sides with cords, pierce their tongues with spits, walk upon the fire and take it up in their hands, walk upon thorns and throw themselves upon spikes, keeping a severe fast. The people who assemble to see these feats of self torture, are entertained with singing music and dancing etc……[৪৭] ধর্মঠাকুর সম্পর্কে এইটিই সবচেয়ে পুরাতন মুদ্রিত বিবরণ। এর আগে ওয়ার্ড সাহেবের বিবরণী সম্পর্কে কেউ উল্লেখ করেন নি[৪৮]। হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে শিবের গাজন ছাড়া বীরভূমে ধর্মঠাকুরের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। অবশ্য দৈত্যপূজার উল্লেখ তিনি করেছেন।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, ধর্মের সঙ্গে শিব এমন জড়িয়ে গেছেন কেন? ধর্মপুরাণে যা বলা হয়েছে তা হল অশিক্ষিত হস্তের কর্ম। ঐ মতের কোনো বাস্তব মূল্য নেই। "ধর্ম পুজাবিধান" তো আরও চমৎকার। নিছক আবর্জনা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। মাটির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। শিবঠাকুরের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগের কতকগুলি কারণ হতে পারে তা অনুমান করা যায়—

(ক) রাঢ় অঞ্চলে একদা শৈবধর্মের ও শক্তিসাধনার প্রভূত ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটেছিল। যেহেতু ধর্মঠাকুরের পুজাবিধি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোনো কেন্দ্রবিন্দু নেই, সেইহেতু অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকের হাতে এই সাযুজ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষিণাকালীর কাছ থেকে মদ্যভাঁড়াল আনা বা ভৈরব ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মূলই হচ্ছে দক্ষিণাচারী শক্তিসাধনা ও শৈবতান্ত্রিক প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

(খ) বৌদ্ধমতবাদ ও প্রসারকে বিতাড়ন ও দমন করার বহু দৃষ্টান্ত ধর্মঠাকুরের পুজা প্রসঙ্গে আমি সংগ্রহ করেছি। তার থেকে এই ধারণা করা চলে যে, বৌদ্ধ পুজা এবং বুদ্ধ-মতাবলম্বীদের কোণঠাসা করবার জন্য তান্ত্রিক সাধকরা প্রবাদ-কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে স্থানমাহাত্ম্যবৃদ্ধি ঘটানোর উদ্দেশ্যে নানা কাহিনী এবং পীঠ, উপপীঠ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন ভাণ্ডীরবন (সিউড়ী থানা) অঞ্চলে পাঁচটি বৌদ্ধ স্তূপাধিকারীর কথা জেনেছি। আজ তাদের চিহ্নমাত্র নেই। পৌরাণিক বিভাণ্ডক মুনির পুজিত শিবঠাকুর ও মন্দির আছে। একথা অবশ্যই মনে করা চলে বৌদ্ধদের অপসারিত করে শৈবরা প্রাধান্য লাভ করেছিল। এরকম দৃষ্টান্ত আরও আছে। এই পরিবর্তনের যুগে লৌকিক প্রবলতম দেবতা ধর্মঠাকুর শিবস্বারূপ্য লাভ করবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

(গ) ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রায় একই রকম। কে যে কার কাছে ঋণী তা সহসা বলা শক্ত। তবে শিবপুজার ভারতব্যাপী প্রসারতা, প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্য আলোচনা করলে অনুমান করা যায় ধর্মঠাকুরের চেয়ে শিবই প্রাচীন দেবতা। ধর্মঠাকুর অবশ্যই প্রাচীনতম তবে যে রূপে পুজিত হচ্ছেন সে রূপে নয়।

রাঢ় অঞ্চলে সংগৃহীত তথ্য থেকে ধর্মঠাকুরের শিবসাযুজ্য বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করছি। প্রথম শিবসাযুজ্য হল শক্তিকে কামিনীরূপে গ্রহণ—

শক্তি কালী: কচুজোড় গ্রামে দক্ষিণাকালীর নিকট, ধর্মঠাকুরের নিকট বলিদানের পর একটি বলি দিতে হয়। কালীর নিকটেও দ্বিতীয় এক ধর্মঠাকুর আছেন। নবেলেড়া (ময়ূরেশ্বর) গ্রামে ধর্মঠাকুরের মধ্যভাঁড়াল আনা হয় গোয়ালশাহী গ্রামের দক্ষিণাকালীর কাছ থেকে। তাঁতিপাড়া (রাজনগর) গ্রামে ধর্মরাজ তাঁর পুজার সময় গ্রামস্থ বড় কালীর নিকট হতে একটি টাকা পান। পরিবর্তে ধর্মের স্থান থেকে কালীকে একটি ঝাঁটা, তালাই, কলা এবং পরমান্ন পাঠাতে হয়। লখীন্দরপুর (সিউড়ী) গ্রামের ধর্মভক্তরা সংলগ্ন বড় মহুলা গ্রামের কালীর সামনে গিয়ে নৃত্য গীত করে এবং ফল-ভাঙ্গা অনুষ্ঠানে সংগৃহীত ফলের কিয়দংশ রেখে আসে। কোনো কোনো গ্রামে ধর্মরাজ কালীপুজার সময়ও পুজা পান। তাছাড়া

শত শত গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কালী বিরাজ করছেন বলে দেখা যায়।

চণ্ডী : রাঢ়ের বহু গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, মড়কচণ্ডী, দুর্গা ইত্যাদি আছেন। কামারহাটি (ময়ূরেশ্বর) গ্রামে অশ্বত্থ গাছের নীচে আছেন ঢেলাই চণ্ডী। বিজয়ার পর একাদশীর দিন এবং বুদ্ধ পুর্ণিমার সময় ধর্মঠাকুরের সঙ্গে পুজিতা হন। আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল পালি গ্রামে (বর্ধমান) কিরীটেশ্বরী দেবীর সামনে ভক্তরা গিয়ে শরীরে বাণ ফোঁড়ে। সঙ্গে ধর্মঠাকুর থাকেন অবশ্য। এই চণ্ডীদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন লৌকিক চণ্ডী (শস্যের বিভিন্ন দেবী)।

এখন শিবঠাকুর কিভাবে ধর্মরাজের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন তার বিস্তারিত (এ পর্যন্ত যতটুকু অনুসন্ধান করেছি) হিসাব এখানে প্রদান করা হল—

ধর্মরাজের শিবসাযুজ্য কেবলমাত্র শক্তিকে স্ত্রী বা কামিনীরূপে স্থাপন করেই বীরভূম ক্ষান্ত হয় নি, অন্যান্য নানা আচার-অনুষ্ঠান ও নামাবলীর দ্বারা এই ঝোঁক এতদঞ্চলে প্রবল-ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে[৪৯]।

গোয়ালপাড়া গ্রামে ধর্মশিলাগুলিকে মন্দির থেকে বের করে যেখানে গ্রামের দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে বুড়ো রায় নামে একটি স্বাভাবিক শিবলিঙ্গাকৃতি শিলা ভূপ্রোথিত আছে সেখানে গিয়ে তিন দিন রাখতে হয়। বুড়ো রায় ধর্মরাজকেও অনাদিলিঙ্গ বলা হয়।

ধর্মরাজপুজায় প্রায় স্থানে অনুষ্ঠিত আগুন খেলা, বাণ ফোঁড়া, দা-বাণ খেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি মহুরাপুর গ্রামের মৌড়েশ্বর শিবের চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনে অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবের আড়ালে ভৈরবের নিকট বলিও হয়।

শেখপুর গ্রামের শিবের চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনে ধর্মরাজের পুজার মতই ভক্ত্যা হয়। বাণেশ্বরকে স্নান করায় (যাদুর ঘাটা), উত্তরীয় নেয়। ধূপবাণ, জিহ্বাবাণ প্রভৃতি সবই হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বাড়ী বাড়ী গম কুটে শক্তু তৈরী করে ভক্ত্যাদের ঐ শক্তু খেতে দিতে হয়। মৌলপুর গ্রামে শিবপুজায় ক্রিয়াকাণ্ডাদি সবই ধর্মপুজার অনুরূপ। পাতাপরবও[৫০] হয়।

জুবুটিয়া গ্রামে জপেশ্বর শিবের গাজনে ও পুজায় ধর্মরাজপুজার মত লাগড়া ভাঙ্গা হয়। বাণেশ্বরকে স্নান করানো ও মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়। ভক্ত্যারা হয় হাড়ি, বাগ্‌দী থেকে নবশাখ পর্যন্ত। গোপডিহি গ্রামে চড়কডাঙ্গায় শিবের উৎসব ধর্মের অনুরূপ (দোলন সেবা ইত্যাদি)।

সিঙ্গুর গ্রামে ধর্মপুজার পর বাণগোঁসাইকে এক বৎসরের মত গ্রামের একটি শিবালয়ে রেখে যাওয়া হয়। এখানে ভাঁড়াল নড়ানোর সময় যে শ্লোক বলা হয়, তার একটি লাইন উল্লেখযোগ্য : "উত্তরে মৌলপুরে যে বাবা শিব আছেন তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম"।

কচুজোড় গ্রামে কালীমন্দিরে ধর্মরাজ ও ভৈরব এবং একটি শিবমন্দিরের পাশে বটবৃক্ষের নীচে একজন ধর্মরাজ ও ভৈরব আছেন। এখানে বলি হয় না। শিবচতুর্দশীর দিন শিবের উদ্দেশ্যে যখন তেল পোড়ানো হয় তখন ধর্মরাজ ও ভৈরব পুজা পান। তা ছাড়া কচুজোড়ের মূল ধর্মরাজ জ্যৈষ্ঠ-পুর্ণিমায় তাঁর গ্রাম-পরিক্রমার সময় এঁদের সংগে সাক্ষাৎ করে

যান। কচুজোড়ে জটাতলা নামে একটি জায়গায় অপ্রকাশিত ধর্মরাজ আছেন বলে কথিত হয়। সেখানেও একটি শিবলিঙ্গ ছিল। সম্প্রতি গ্রামের উত্তরবর্তী সংগ্রামপুরের এক ব্রাহ্মণ নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজরাজেশ্বরী কালীর নিকটে যে ভৈরব আছেন তিনি ধর্মপুজার সময় বুড়ো রায়ের নিকট যান।

ভুরকুনা গ্রামে ধর্মের সঙ্গেই আছেন ভৈরবনাথ। পান্নুড়ের ধর্মমন্দিরে শিব ও ভৈরব আছেন। কোদাইপুর গ্রামে শিব আছেন ধর্মশিলার বামে। কামালপুর ধর্মতলায় ভৈরব ও ধর্মরাজের সঙ্গে যুক্তভাবে অপর একজন ভৈরব আছেন। গোলাপগঞ্জে ধর্মরাজের সঙ্গে আছেন ভৈরবনাথ। লাউজোড়েও তাই। ঐ গ্রামে জ্যৈষ্ঠ-পুর্ণিমায় ধর্মের গাজনে কোনো ভক্ত্যা হয় না। চৈত্র মাসে শিবের গাজনের ভক্ত্যারা ধর্মরাজের সামনে এসে গান গাইতে গাইতে ভর নামে।

লম্বোদরপুর ধর্মতলায় শিব ও কালভৈরব আছেন। ধর্মরাজের বলি ভৈরবের সামনে হয়। নির্ভয়পুর ধর্মতলায় ভৈরব আছেন। ধর্মরাজের সঙ্গেই এঁর পুজা হয়।

খড়গ্রামে মুক্তস্নানের পর ধর্মরাজকে শোভাযাত্রাসহ গ্রামের খড়্গেশ্বর শিব, নাককাটি শিব, দক্ষিণাকালী ও ষষ্ঠীতলায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কড্ডাং গ্রামে ধর্মরাজের সামনে বলি হয় না। মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থ বটুকভৈরবের সামনে ধর্মপুজার সময় বলি হয়।

খয়রাকুঁড়ি গ্রামে ধর্মের ডাইনে শিবলিঙ্গ। বাইরে গাছতলায় কাল ও বটুকভৈরব। ধর্মরাজের সঙ্গেই এঁদের পুজা হয়। আদিত্যপুর গ্রামে চাঁদ রায়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন শিব। বারুইপুর গ্রামে ধর্মতলার সন্নিকটে শিব আছেন। মল্লিকপুর গ্রামের ধর্মরাজ শিবমন্দিরে বিরাজ করছেন। নবেলেড়া গ্রামে ধর্মের পাশে আছেন শিব। উষগ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে আছেন ভৈরব। মেটেল্যা ধর্মমন্দিরের পাশেই আছেন কালভৈরব।' বাঁধানো বেদীতে তিনটি শিলাখণ্ড ও ত্রিশূল পোঁতা। ধর্মরাজের সঙ্গেই এঁর পুজা হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়।

রাতমা গ্রামে ধর্মভক্ত্যারা ত্রিপুরেশ্বর শিবের সামনে বাণগোঁসাইসহ শিব ও ধর্মরাজকে ডাক দেয়।

কৃষ্ণপুর গ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে আছেন পঞ্চানন। হজরৎপুর গ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে শিব আছেন। গজালপুর গ্রামে ধর্মরাজের সন্নিকটে জলেশ্বর শিব আছেন। খড়গ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীসহ শিব আছেন। এঁর পুজা হয় চৈত্র-সংক্রান্তিতে।

ভগবানবাটী গ্রামে রঘুনাথ ধর্মরাজের সঙ্গে কালিন্দর শিব ভৈরবনাথ ও অন্যান্য বহু দেবতা আছেন। বেলিয়ার ধর্মমন্দিরের পুর্বে সংলগ্ন একটি ভগ্নপ্রায় মৃত্তিকা-প্রোথিত শিবলিঙ্গ আছে। স্থান দেখে অনুমান করা যায় যে, এককালে এখানে একটি শিবমন্দির ছিল। ধর্মরাজের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শিব বিদায় নিয়েছেন। সাঁইথিয়ায় নন্দিশ্বরী উপপীঠস্থানে আছেন নন্দিকেশ্বর ভৈরব। নন্দিশ্বরী ও ভৈরবের পুজা হয় বৈশাখী-পুর্ণিমায় এবং দুর্গাপুজার সময়। কোমা গ্রামে চতুর্দশীর দিন মূল দেয়াসী পর্যাপ্ত পরিমাণে তীক্ষ্ণধার শলাকাখচিত বাণেশ্বরের

উপর শুয়ে ভক্ত্যাবাহিত হয়ে গ্রামস্থ জলেশ্বর শিবের নিকটে আসেন। সেখানে জিহ্বাবাণ, কোকবাণ, আগুনখেলা—এসমস্ত হয়। মেটেল্যা গ্রামে ধর্মপূজার দিন কালারায়কে নিয়ে এসে মূল ধর্মস্থানের নিকট কালভৈরবের বেদীতে স্থাপন করে চড়ককে নিমন্ত্রণ জানাতে যেতে হয়। রাতমা গ্রামে ধর্মাপুষ্করিণীর পাড়ে ক্ষেত্রপালের ও ভৈরবদেবের পূজা হয়। পলপাই গ্রামের ধর্মরাজের নাম চন্দ্রেশ্বর। নিকটে একটি ষাঁড়ও রক্ষিত আছে। বলা হয় দেবতার বাহন ওটি। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় পুজা হয়। ধ্যানমন্ত্র : "ঐ হ্রীং চন্দ্রেশ্বর ধর্মরাজায় নমঃ"।

গাংমুড়ি গ্রামে ধর্মপুজায় ভক্ত্যারা ধর্মরাজকে ডাক দেয় এই বলে : "ও বাবা ধর্মরাজ হে", "ও বাবা গাজনের বুড়ো শিব হে", "দেলো শিব হে"[৫১] "বাবা নীলকণ্ঠ হে", "হাটতলার ধর্মরাজ হে"। মুড়োমাঠ গ্রামে ধর্মরাজ বিরাজ করছেন স্ফটিকেশ্বর শিবমন্দিরে। ধর্মপুজার সময় ধর্মরাজকে আর-একটি শিবমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আসেন সাবেক আটনে। নিকটস্থ তেঁতুলতলায় আছেন ভৈরব। তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে তিন দিনের জন্য ধর্মতলায় রক্ষা করা হয়। ভবানীপুর গ্রামে ভিন্ন গ্রাম থেকে একটি মদের জালা নিয়ে এসে ধর্মের নিকটস্থ ভৈরবের নিকট স্থাপন করে পুনরায় পুজা করে ও ছোট ছোট ভাঁড়ে মদগুলি বণ্টন করে নেয়। ঐ গ্রামে ধর্মের গাজনে যে শ্লোক বলে তা এই : "বল শিবৈঃ বল শিবৈঃ বল শিবৈঃ হেঃ, ও বাবা ধর্মরাজ হে"। ইন্দ্রগাছা গ্রামে ধর্মপুজার সময় ধূপবাণ খেলা চলার কালে সেই ভক্ত্যা জ্বলন্ত ত্রিশূল মাথায় নটরাজের ভঙ্গীতে নৃত্য করে। মারকোলা গ্রামে ধর্মপুজার তৃতীয় দিন অর্থাৎ উত্তরীয় মোচনের দিনে ধর্মস্থানে নীলপুজা হয়।[৫২]

হাড়াইপুর গ্রামে ধর্মরাজের সংগে নিত্য শিব ও কালীপুজা হয়। অবিনাশপুরেও তাই। গৌরনগর গ্রামে ধর্মের ভক্ত্যারা উচ্চকণ্ঠে হাঁকে : "কাশীর বিশ্বেশ্বর", "জয় ধর্মরাজ"···ইত্যাদি। স্বগুণপুর গ্রামেও তাই। কুলেড়া গ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে বিশ্বনাথ শিব আছেন। জামথলি গ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে স্ফটিকেশ্বর ও নীলকণ্ঠ শিব আছেন। ধর্মের সঙ্গেই এঁদের পুজা হয়। লখিন্দরপুর গ্রামের ধর্মভক্ত্যারা সংলগ্ন বড় মহুলা গ্রামে ভুঁইফোড়নাথ 'শিবমন্দিরে' (এখানেও বটুকভৈরব আছেন) গিয়ে ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ করে নৃত্য করে এবং কিছু ফলমূল (ফলভাঙ্গা অনুষ্ঠানের সময় আহৃত) দেবতার উদ্দেশ্যে রেখে আসে। তারপর তারা নিকটস্থ কালীবাড়ীতে যায়।[৫৩] ভুঁইথিয়া গ্রামে ২৭-এ চৈত্র থেকে ২রা বৈশাখ পর্যন্ত মনসা ও শিবের গাজন-উৎসবাদি ধর্মরাজ পুজার গাজন অনুষ্ঠানাদির অনুরূপ (দেবতাস্নান, হবিষ্যান্ন, দাহুড়ঘাটা, গ্রাম-পরিক্রমা, দেবস্থান পরিক্রমণ ইত্যাদি)। হিজলগড়া গ্রামে বুড়ো রায় ও ধর্মরায়ের সঙ্গে আছেন বুড়ো শিব ও আবালেশ্বর শিব। মহুগ্রামে ধর্মরাজের কাছে আছেন ভৈরবনাথ। এখানে অন্যতম ধর্মরাজ হলেন পঞ্চানন। ছিনপাই গ্রামে ধর্মরাজের সম্মুখে ছাগ বলিদানের পর ছিন্নশীর্ষ ছাগদেহগুলি ধর্মমন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত ভৈরব মূর্তির উপর রক্ষা করা হয়। ধর্মমন্দিরের উত্তর পার্শ্বে শিবমন্দিরও আছে। বেজুরী গ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে শিব আছেন। তেঁতুলবাঁধ গ্রামে ধর্মরাজের নিকটে আছেন মনসা ও ভৈরব। ধর্মপূজার সঙ্গেই ভৈরবের পূজা হয়। হিজলগড়া গ্রামে ত্রয়োদশীর দিন ভক্ত্যারা স্নানাদি করে শিব ও হনুমানজীর পূজা করে এবং শিবের

সামনে লোহার দণ্ডে দুই পা ঝুলিয়ে অধোমুখে শিবপূজা করে। শিরা, রসা গ্রামেও তাই হয়। পাতাডাঙ্ গ্রামে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে ধর্মস্থানে মহাকাল ভৈরব আছেন।

তুলনীয় শিবের বাণব্রত উৎসব

এই উৎসব বীরভূমের পাইকোড় গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বীরভূম বিবরণী'র ২য় খণ্ডের ৫-৯ পৃষ্ঠায় এই উৎসবের কথা যা আছে তা এই :

"দেয়াশী এবং বালাভক্তকে শ্রীপঞ্চমীর পূর্বের অমাবস্যায় ক্ষৌরকার্যান্তে শুচি হইতে হয়। ঐদিন হবিষ্যান্ন ভোজন বিধি। প্রতিপদ হইতে শ্রীপঞ্চমীর দিন উপবাস এবং ব্রতকথা শ্রবণ। সপ্তমীর দিন পারণা। দেয়াশী ও বালাভক্ত ভিন্ন অপর ভক্তগণ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা চতুর্থীতে কিম্বা শ্রীপঞ্চমীর দিনেও ক্ষৌরকর্ম করিয়া ভক্ত হইতে পারে। চতুর্থীর দিন শ্মশানে গিয়া একটি নরমুণ্ডের কঙ্কাল কুড়াইয়া আনিয়া তাহাতে তৈল সিঁদুর লেপন করিতে হয়। পরে একজন ভক্ত সেই সিঁদুরাক্ত নরশির কঙ্কাল এক হস্তে ও একটি বেল অপর হস্তে লইয়া অপর তিনজন ভক্তের সহিত নৃত্য করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন পূর্বাহ্নে শিবের অভিষেক এবং হোম হইবে। এইদিন সমস্ত ভক্তকেই পুনরায় ক্ষৌর হইতে হয়। বৈকালে ভক্তগণ নদীস্নান করিতে যায়। যাইবার সময় সমস্ত ভক্ত শিবমন্দিরের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইবে। পাণ্ডা মন্দিরের পৈঠায় দাঁড়াইয়া বেত্র ঘুরাইয়া "বারগাছে নারিকেল" মন্ত্র পাঠ করাইবেন। তৎপরে দণ্ডবতী পাঠ করাইয়া শিবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভক্তগণ আঙ্গিনা হইতে বাহির হইবে। নদীতে যাইবার পথে গ্রামের উত্তরে এক অশ্বত্থমূলে অধিষ্ঠিতা হাটগাছার কালীকে "দণ্ডবতী" পাঠপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইবে। পাণ্ডা "ঘাট ঘাট মহাঘাট" মন্ত্র পাঠ করাইবেন। অতঃপর ভক্তগণ স্নান করিবে। স্নানের পর তাহারা নদীর অপর পারে চলিয়া গেলে পাণ্ডা ঘাটে (এপারে) দাঁড়াইয়া, "বল মন হরি বল, হরি বল, ভকত ভাই, নেচে গেয়ে ঘর যাই"—এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। অমনি ওপার হইতে ভক্তগণ দলে দলে এপারে আসিয়া দাঁড়াইবে। পাণ্ডা তাহাদিগের সর্বাঙ্গে 'দেবকুঁড়া' নামক ভাণ্ড হইতে (হোমশেষের শান্তিজল) শান্তিজল ছিটাইয়া দিবেন। জল ছিটাইয়া দিবামাত্র ভক্তগণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে কেহ পথে, কেহ শিবমন্দিরের আঙ্গিনায় গিয়া পড়িবে। অনেকে অচৈতন্য হইয়া যাইবে। তখন ঐ দেবকুঁড়ার জল দিয়া তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরে, সকলে একত্র হইয়া হোমশেষ ভস্মতিলক গ্রহণ করিবে। রাত্রে পুষ্করিণীর ঘাটে খিচুড়ি পাক করিয়া মাছ পোড়াইয়া সেই সমস্ত উপকরণে শিবের ভোগ দিতে হয়। ষষ্ঠীর দিন উপবাস। পূর্বাহ্নে পাণ্ডা সমস্ত ভক্তকে এক-একটি তুলসী-মঞ্জরী মন্ত্রপূত করিয়া দেন। ভক্তগণ তাহা কটিদেশে বাঁধিয়া রাখে। ইহার নাম "কাচবন্ধন", (কাছাবন্ধন ?)। পরে অঞ্চলে আতপতণ্ডুল ও তুলসী-মঞ্জরী লইয়া দণ্ডবতী পাঠের পর শিবকে দণ্ডবৎ করিয়া নদীতে গিয়া ভক্তগণ পূর্বদিনের মত মন্ত্রপাঠ ও স্নান করিবে। স্নানান্তে গদাধর নামক শিবকে (এ শিব সম্বৎসর নদীর জলে অবস্থান করেন) নদী হইতে তুলিয়া তাঁহার

মাথায় আতপতণ্ডুল, তুলসী দিয়া পূজা করিবে। পরে বালা ভক্তের জিহ্বায় বাণ ফুঁড়িয়া দিলে সে (কলার ভেলার সঙ্গে বাঁধা) একত্র তিনটি খাঁড়ার উপর চড়িয়া ভক্তদের স্কন্ধে প্রায় আধ মাইল পথ ঘুরিয়া ক্যাপাকালীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিবে। তথায় পাঁচালী পাঠ শুনিয়া সমস্ত ভক্ত পাণ্ডার বাড়ীতে আসিয়া (পাণ্ডাবাড়ীর) কোনো স্ত্রীলোকের নিকট ষষ্ঠীর কথা শুনিবে। সপ্তমীর দিন "পারণা" করিতে হয়।"

পাঁচালী

কাচবন্ধ : জলে আনি জলে বন্ধ, জলের জলতি বন্ধ, এক বন্ধ নয় দুয়ার,
অমুকের দশ দুয়ার। মোর বলে আস্থা রাখে,
মহাদেবের আজ্ঞায় লাগে বজ্রকপাট।

দণ্ডবতী : আদিবন্ধ অনাদিবন্ধ মূল ধর্মের পাট
ত্রিশকোটি দেবতা বন্ধ বৃদ্ধ মা বাপ
ডাইনে দামোদর বন্ধ বামে হনুমান
শিরে তুলি বন্দি গোসাঞী জাজ্জ্বল্যমান।
আকাশে চণ্ডিকা বন্ধ পাতালে বাসুকি নাথ
আপন আপন গুরুর চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥[৫৪]

বেত ঘুরাইবার মন্ত্র : বার গাছে নারিকেল তের গাছে তাল
তাহাতে উপজিল আন গিয়ে শাল
হনুমান আনিলে লাঠি বিশ্বকর্মা দিলে দড়ি
লাঠির উদ্দেশ্য গেল মহিমান গিরি,
লাঠির এইখানে কাটি
উজয় গিরি পর্বতে উপজিল লাঠি
আগে ধরে ব্রহ্মা পাছে ধরে শিব
যেখানে বালাভক্ত ধরে লাঠির সেইখানে জীব ॥

ঘাটশুদ্ধি : ঘাট ঘাট মহাঘাট, সোনা আর রূপোর পাট
হনুমান সৃজিলে ঘাট, সিঞ্চিলে পঞ্চম পানী। (জল)
ব্রত কর এসো এয়োরাণী—
জলকুম্ভীর, সপ্তসাগর, আজিকার ষষ্ঠীর চারি প্রহর রাত।
চারি প্রহর দিন না করে ব্রত
শুদ্ধ গঙ্গাজলে করিয়ে প্রহর,
আমিষ পানী নিরামিষ হউক
সুখে বালাভক্ত প্রহর করুক।[৫৫]

…আইলাম আইলাম পুর্ব দুয়ার
পুর্ব দুয়ারে সূর্য মণ্ডলি, তাতে আছে অরুণ প্রহরী[৫৬]
হে অরুণ প্রহরী ছাড় দুয়ার, আমার সত্ত্বে রইলো ভার।
তুমি যাও দক্ষিণ দুয়ার
আইলাম আইলাম দক্ষিণ দুয়ার
দক্ষিণ দুয়ারে যমের মণ্ডলি
তাতে আছে গরুড় প্রহরী।
হে গরুড় প্রহরী ছাড় দুয়ার, আমার সত্ত্বে রইলো ভার।
তুমি যাও পশ্চিম দুয়ার,—
আইলাম আইলাম পশ্চিম দুয়ার
পশ্চিম দুয়ারে বরুণ মণ্ডলি, তাতে আছে ভীমকাল প্রহরী
হে ভীমকাল প্রহরী, ছাড় দুয়ার,
আমার স্বত্ত্বে রইলো ভার
তুমি যাও জল কুমারের ঠাঁই…ইত্যাদি আরও ২১ ছত্র[৫৭]।

(ছ) ধর্মঠাকুর ও মনসা

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসার বিশেষ সম্পর্ক আছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "ঋগ্বেদের যম ও যমী বাংলার লৌকিক পুরাণে ধর্ম ও মনসা। যম ও যমী মানে যমজ ভাইবোন। ধর্ম-কেতকাও তাই। ধর্মের শরীরাংশ থেকে কেতকার উদ্ভব, যেমন হিব্রু পুরাণে আদম থেকে হবার উৎপত্তি। বাংলার লৌকিক পুরাণে সৃষ্টিপত্তনে ধর্ম-কেতকার যম জীবনের গোড়ার কথা নেই। আছে এইটুকু যে, তাঁদের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু সংসার করা হয়নি। বিয়ের পর ধর্ম-ঠাকুরের বৈরাগ্য উদয় হয়, তিনি বিবাগী হয়ে চলে যান তপস্যা করতে। তারপর আর কেতকার সঙ্গে দেখা হয়নি। এই কাহিনীর মধ্যে যেটুকু অনুক্ত আছে, সেটুকু ঋগ্বেদের যম-যমী সূক্ত (১০১০) পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ ধর্মের কোন ইচ্ছা ছিল না এই অবৈধ ও অসঙ্গত বিবাহে, কেবল কেতকার নির্বন্ধেই তা হয়েছিল।…ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাই যে, ধর্মের বিষ—প্রাচীনতর অর্থ রেতস্, পান করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিদেবাকে জন্ম দিয়েছিলেন[৫৮]।" তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধর্মের কামিনী হলো মনসা। এই পৌরাণিক পরিকল্পনা রাঢ়ের জনজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ধর্মঠাকুর ও মনসা পাশাপাশি বিরাজ করছেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে এই বিশ্বাস কার্যকর রয়েছে তার কোন প্রমাণ আমরা পাই না। ডঃ সুকুমার সেন মধ্যযুগীয় একটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। "বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক চূড়ামণি দাস তাঁর 'গৌরাঙ্গ বিজয়ে' গৌরাঙ্গের গঙ্গাযাত্রা প্রসঙ্গে ভাগলপুরের কাছে ধর্মঠাকুর ও মনসার তৎকাল প্রসিদ্ধ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন—

'বাহাগলপুর তেজি যাইতে উত্তরে,
দেখিলত ধর্মরাজা মনসার ঘরে'[৫৯]

ধর্মের কামিন্যা মনসা দেবী হওয়ার দরুণ আস্তে আস্তে অন্যান্য দেবীরাও ধর্মকামিন্যায় পরিণত হলেন। কি সুত্রে এবং কিভাবে এই সংযোগ সাধিত হয়েছিল, তা নির্ণয় করা দুরূহ। বীরভূম ও সন্নিহিত অঞ্চলে মনসার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করে তুলে দিচ্ছি।—

ঈশ্বরপুর (সাঁইথিয়া থানা) গ্রামের সুন্দর রায় ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসা যুক্তভাবে আছেন। বৈশাখী পুর্ণিমায় ধর্মপুজার সময় চারদিন ধরে মনসার গান হয়। পুজার চতুর্থ দিনে 'গাছমঙ্গলা' হয়ে থাকে। অর্থাৎ সুতো দিয়ে অশ্বত্থ গাছকে কয়েক পাক বেষ্টন করে ধর্মঠাকুরকে মাথায় নিয়ে সেই গাছকে সাতবার পরিক্রমণ করা হয়। মুর্শিদাবাদের ভাসতর ও ঘাসিয়াড়া গ্রামেও ধর্মপুজায় গাছমঙ্গলা হয়। অথচ এই গাছমঙ্গলা বিধিটি মনসাদেবীর পুজাতেই অনুষ্ঠিত হবার কথা। (সিউড়ী থানায়) কালিপুর, কুলেড়া ও হুড়াই গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে একত্র মনসা আছেন। ধর্মপুজায় মনসার গান হয়। হাসনাবাদ গ্রামে চর্মকার সম্প্রদায়ের পুজিত মনসার নাম তুলো রায়। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তুলো রায় নামে ধর্মঠাকুর আছেন, অবিনাশপুর, করিধ্যা, কালিপুর এবং কুলেড়ায়। কোনোক্রমে মনসার সঙ্গে নামবদল অথবা পুজাবদল হয়ে গেছে। তারই দৃষ্টান্ত এটি।) (মহম্মদবাজার থানায়) শালদহ, (খয়রাশোল থানায়) কেন্দ্রগড়িয়া, মামুদপুর, কৃষ্ণপুর, বড়রা, (দুবরাজপুর থানায়) মেটেলা, (রাজনগর থানায়) ভবানীপুর, পাতাডাঙ্গা, (লাবপুর থানায়) দাঁড়কা, (সিউড়ী থানায়) ভ্রমরকোল, (মুর্শিদাবাদের) হেতিয়া প্রভৃতি গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে নাগচিহ্নিত ঘটে মনসা আছেন। (ইলামবাজার থানায়) ঘুরিষা গ্রামে, বিজলী রায় ও কালা রায় ধর্মঠাকুরের বেদীতে সাতটি সর্পফণাআচ্ছাদিত সুন্দর একটি প্রস্তরনির্মিত (?) মনসা মূর্তি আছে। মূর্তিটি নিকটবর্তী গ্রাম পায়েরের এক পুষ্করিণীগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। (সিউড়ী থানায়) কালিপুর গ্রামে চাঁদ রায়, তুলো রায় ধর্মঠাকুরের কাছে তিনটি মনসা শিলা আছে। নাম—বড়-মা, মধ্যম-মা, ছোট-মা। ধর্মঠাকুরের সঙ্গেই একত্র মাথায় পদ্মফুল চড়ানো হয়। রাজনগর থানায় তাঁতিপাড়া গ্রামে ধর্মশিলার ডান পাশে সপ্তপুরের মৃত্তিকা নির্মিত একাধিক সর্পদ্বারা আচ্ছাদিত মনসা আছেন। বামপার্শ্বে অপর একটি প্রস্তরখণ্ড। নাম গোয়ালবুড়ি। ইনিও মনসা। ধর্মঠাকুরের সঙ্গেই এঁদের পুজা হয়। মন্দিরের ভিতর আর একপাশে অন্য একটি সিংহাসনে অনুরূপ নাগফণাবেষ্টিত মনসা রয়েছেন। ধর্মপুজার চতুর্দশীর দিন গোয়ালবুড়ির পুর্ব আটন (স্থান) সোনারপাড়ায় যেতে হয়। কৈবর্তপাড়ায় শাঁওডালি মনসা আছেন[৬০]। তাঁকেও আনা হয়। সপ্তপুরের মৃত্তিকানির্মিত সর্পবেষ্টিত যে মনসামূর্তি আছেন তাঁর পুজার সময় যে গান হয়, তার কিয়দংশ এই রকম—

(রচয়িতা অজ্ঞাত)

ওমা শোন শোন মা যশোদা রোহিণী
কালিন্দীর কালো জলে ডুবল নীলমণি (ধ্রু)

শ্রীদাম আসিয়া কহে যশোদা গো মাতা
শোনো মাগো কালকের কাননের কথা।
কালীদহের কালো কূলে মাগো চরাইছিলাম ধেনু,
কালীনাগ দংশেছিল পড়েছিল কানু
দাদা বলরাম মাগো কিবা মন্ত্র জানে,
কালকূটের বিষ দাদা লাথি মেলে নামে।
বনের মধ্যতে আছে দীর্ঘ সরোবর,
কালকূটের বিষ ভাসে জলেরই উপর,
সেই জল খেয়ে শিশু ঢলিয়ে পড়িল,
বলরামের নামে বিষ বায়ে উড়ে গেল।

সাপখেলার সময়—

হেদে নাকট ছোড়ি দে বাট কপাট
নাকিতা বলে বৈবি ডাক্ষিণী বিটি বাট[৬১]
বিষে ঢুলু ঢুলু করে দু আঁখি
ছেড়ে পালাবে হৃদি পঞ্জরে
হায়রে হৃদি পিঞ্জরে পাখী
বিষে ঢুলু ঢুলু করে দু'আঁখি
ওমা তুলসী মঞ্জরী
হায়গো মায়ের দিব রাঙা পায়
মা একবার ফিরে চা গো তুলসী মঞ্জরী
নম নম নম মাতা নম নারায়ণী
রক্ত জবা দিয়ে পুজব চরণ দু'খানি
চাঁদ বেনে সদাগর চম্পানগরে
চাঁদ বেনে চাঁদ বেনে জগতেতে জানি
এই বলে মাতা তোমায় দিয়ে পুষ্পপানি।

(রাজনগর থানায়) লাউজোড় গ্রামে ধর্মের সঙ্গে মনসা আছেন। (সিউড়ী থানায়) পুরন্দরপুর ধর্মতলায় নাগনাগিণী আছেন। প্রবাদ, কালেভদ্রে গর্ত থেকে মুখ বের করেন। কারও ক্ষতি করেন না কখনও। (বর্ধমান জেলার অন্তর্গত) চিঁচুড়িয়া গ্রামের ধর্মমন্দিরের সন্নিকটে তেঁতুলতলায় মনসা আছেন। পুজা শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। (ইলামবাজার থানায়) দেবীপুর ও পায়ের গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে একই বেদীতে মনসা আছেন। পায়ের গ্রামের মূর্তিটি সপ্তফণাবেষ্টিত। ঠিক প্রস্তর মূর্তির মত। আসলে তা সপ্তপুরের মৃত্তিকা নির্মিত। (দুবরাজপুর থানায়) জামথলি গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে তিন-চারটি মনসা আছেন। একজনের নাম পাতালস্থ মা। এই মনসাদের বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে গিয়ে পুজা করা হয়। (সিউড়ী থানার)

খটঙ্গা গ্রামে চাঁদ রায়, খোঁড়া রায় ও বিনোদ রায়ের নিকট যে মনসা আছেন তাঁর আড়ম্বরসহ পুজা হয় বৈশাখ মাসে ধর্মঠাকুরের সঙ্গেই। এই মনসার আর একবার পুজা হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। রায়পুর গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন চমৎকার কালো পাথরের নির্মিত মনসা-মূর্তি। এই মনসার সাত বোন আছেন বলে কথিত হয়[৬২]। সিউড়ীর বাউড়ী পাড়ায় শাঁওভালি পুজার স্থানেও মনসার সাতবোন আছেন বলা হয়[৬৩]।

শিব এবং ধর্মঠাকুরের পুজানুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ডগুলি কিভাবে মনসাপুজায় অনুপ্রবেশ করেছে তার একটি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছি (সাঁইথিয়া থানার) জুঁইথিয়া গ্রাম থেকে। এই গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি নদীর কাছাকাছি মনসার ঘর বা মন্দির। মন্দিরের সামনে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। সঙ্গে আছেন শিব। কোনো দেয়াশী নাই। ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিত্যপুজা করেন। দেবীর মূল পূজা চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রের ২৭-এ দেবীর পাট আঙ্গিনায় সন্ধ্যা থেকে মনসামঙ্গলের গান আরম্ভ হয়। পরদিন ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে হাড়ি ডোম পর্যন্ত ১৫।২০ জন ভক্ত্যা চুল, দাড়ি কেটে সারাদিন উপবাসী থাকেন এবং সন্ধ্যাবেলায় শিবের মূর্তিকে নদীতে স্নান করিয়ে তাঁর চরণামৃত পান করেন এবং হবিষ্যান্তে দেবীর পাট আঙ্গিনায় সারারাত্র শুয়ে থাকেন। পরদিন আবার শিবকে স্নান করিয়ে চরণামৃত নিয়ে ভক্ত্যারা আনন্দে মনসা মন্দিরের চারিপাশে নৃত্য করেন। একে লোকে দাদুর ঘাট বলে থাকে[৬৪]। এর পরদিন (৩০-এ) শিবকে পুনরায় স্নান করিয়ে মন্দিরের সামনে একটি কাষ্ঠাসনে বসিয়ে হোমাগ্নি জ্বেলে দেয়। পুরোহিত যথানিয়মে পূজা করার পর ভক্ত্যারা উপর দিকে পা এবং নিচের দিকে মাথা রেখে বাবাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। ভক্ত্যারা নিজেদের বাড়ী ফিরে যান ১লা বৈশাখ তারিখে। ঐদিন মন্দিরের সামনে সারারাত্র ধরে মনসামঙ্গলের গান হয়ে থাকে। পরদিন ২ বৈশাখ, দেবীকে নিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়। ঐ তারিখেই একটি ছোট মেলা বসে। তারপর অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে সাতবার ঘুরিয়ে গাছমঙ্গলা হয়। পরে মনসার অভিষেক করার পর, হয় তাঁর সামনে ছাগ বলি। রাত্রে মনসামঙ্গল গানের পর মনসার পূজা শেষ। গ্রাম পরিক্রমার সময় ভক্ত্যারা নানারকম জীবজন্তুর সাজে সজ্জিত হয়ে ঢাকের বাজনার সঙ্গে সমস্ত গ্রাম ঘুরে বেড়ায়।

ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসবের সঙ্গে আর একটি জায়গায় সর্পদেবী মনসার সম্পর্ক পাওয়া যায়। সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মপুজা হয়ে থাকে। পূর্ণিমার আগের ত্রয়োদশীর দিন গাজনের পর্ব সুরু হয়ে যায়। এই দিনটিকে এই অঞ্চলে বলে 'মুদভাঙ্গা' দিন[৬৫]। কথিত হয় এইদিনে সাপ ব্যাঙরা তাদের শীত ঘুম (hibernation) ছেড়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। (সাঁইথিয়া থানায়) মারকোলা গ্রামে ধর্মপুজায় 'মুদ' নামে একটি অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানে, একজন মানুষকে মাটিতে গর্ত কেটে শুইয়ে রেখে একটি প্রদীপ জ্বেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। উপরে সামান্য একটু ছিদ্র থাকে। এইভাবে উপবাসী ভক্ত্যা ২।৩ দিন মাটির নীচে অনাহারে থাকে। একেই মুদ বলা হয়। (সাঁইথিয়া থানার) নিমগড়ই গ্রামের মনসা পুজানুষ্ঠানের বিবরণও এখানে প্রদান করছি। এতে 'মুদ' সম্পর্কে ধারণা আর একটু স্পষ্ট হবে। (মহম্মদবাজার থানায়) ডানজনা গ্রামেও মনসা পুজায় মুদ আছে।

নিমগড়ই গ্রামে সর্পাচ্ছাদিত ঘটে মনসার পুজা হয় টিনের ছাদন দেওয়া ঘরে। পুজা হয় ভাদ্রের শুক্লা পঞ্চমীতে (বগা)। দেয়াশী মিস্ত্রী জাতীয়। পুজারী ব্রাহ্মণ।

পুজার আগের দিন বেলা আন্দাজ দেড়টার সময় দেয়াশীর বাড়ীর একজন স্ত্রীলোক ঐ মন্দিরে প্রবেশ করে। কিছু সময় পর মন্দিরের দরজাটি আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায় বলে প্রবল লোকবিশ্বাস বর্তমান। বাইরে থেকে বহু ঠেলাঠেলি করেও নাকি সে দরজা খোলা যায় না। বাইরে ভক্তরা মনসার পাঁচালী গাইতে থাকেন। ক্রমাগত গান চলে। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত। ভোর রাত্রের দিকে একজন লোক গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে মন্দিরের দরজা লেপে দেয়। দরজার পাল্লায় একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। মাটি লেপে দেওয়ার কিছুক্ষণ পর ঐ ছিদ্রের স্থান থেকে গঙ্গামৃত্তিকা খসে যায় এবং একটি সাপ নাকি মুখে করে একটি ফুল বাইরে নিক্ষেপ করে থাকে। তারপরই ঐ দরজা খুলে যায় এবং দেখা যায় স্ত্রীলোকটি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে আছে। (সম্ভবত এটি মুদেরই রূপান্তর)। দুপুরবেলা মনসার ঘটকে পুজারী ব্রাহ্মণ কোলে নিয়ে বের হন। ঢাক, ঢোল বাজতে থাকে। ভক্তরা ভর নামে। ঐ শোভাযাত্রার পুরোভাগে স্থাপন করা হয় চার চাকাযুক্ত কাঠের ছোট নৌকা। নৌকাটির মধ্যে নয়টি ভাগ। এক-একটি ভাগে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য সাজানো থাকে। যথা চাল, ডাল, সরিষা, হলুদ, সুপারি, ইঁদুরের মাটি অথবা গঙ্গামৃত্তিকা ইত্যাদি। নৌকাটিকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে একবার ঘোরানো হয় ঐ মন্দিরকে তারপর বাইরে একটি বেদীর সামনে দু-একটা অনুষ্ঠান সেরে, যেতে থাকে একটি পুকুরের দিকে। সেখানে গিয়েও কিছু পুজাদি হয়ে থাকে। গাছমঙ্গলাও হয়। (বেতের ছড়ি অধ্যায় তুলনীয়)

নৌকাটানা অনুষ্ঠানটির নিশ্চয়ই একটি তাৎপর্য আছে। চাঁদসওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার রূপক হিসাবে যদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে সেকথা স্বতন্ত্র কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানত বিবাহের পূর্বে মনসার পুজা দেবার বিধি আছে। সম্ভবত বেহুলার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করেই এই পুজা করার বিধি সৃষ্টি হয়েছে অথবা আদিবাসীদের সংক্রান্ত যাদুবিশ্বাস এই কৃত্যের মূলে ক্রিয়াশীল। (মহম্মদবাজার থানায়) গণপুর গ্রামে চৌধুরী বাড়ীর বিবাহের সময় সাঁওতাল পরগণার "একতালা" গ্রামের সদ্গোপ বাড়ী থেকে মনসা দেবীকে আনা হয়। বর নারিকেল বগলে মনসা দেবীর ডিঙি টেনে ভৈরবদেবের অশ্বত্থমূলে নিয়ে যায়। এই সময় গীত, বাদ্য, মনসার গান ও ভর হয়। এইভাবে গ্রাম প্রদক্ষিণের পর বিয়ে হয়ে থাকে।

রাঢ় অঞ্চলে উচ্চবর্ণ এবং নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে দশহরার দিন মনসার ডাল গৃহ-প্রাঙ্গণে পুঁতে প্রতি পঞ্চমীতে মনসাপুজা দেওয়া হয়। তারপর সেই ডাল বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জন দেওয়ার রীতি। বীরভূমে মল্লারপুরে মনসাপুজায় মুরগী বলি দিয়ে মাটিতে পোঁতা হয়। তারপর সেটিকে টুকরা টুকরা করে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

পূর্বে যে গাছমঙ্গলার কথা উল্লেখ করেছি, সে সম্পর্কে আরও দু-চারটি কথা বলা প্রয়োজন। মনসা এবং ধর্মঠাকুরের পুজায় বৃক্ষ বন্দনার সম্পর্ক যথাযথরূপে অনুধাবন করা যায় না। তবে ধর্মপুরাণে পাওয়া যায়, যেখানে প্রথম ধর্ম ও পরে তাঁর পুত্ররা তপস্যা করেছিলেন

তার কাছে ছিল এক বটগাছ। ধর্মকে বহন করে ভ্রমণক্লান্ত উলূক ঐ গাছে বিশ্রাম করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন রূপরামের ভূমিকায় দেখিয়েছেন, "ঋগ্বেদের এক সূক্তে যমের পত্রবহুল বৃক্ষের উল্লেখ আছে। সে পত্রবহুল গাছের তলায় দেবতাদের সঙ্গে যম সোম্ (?) পান করতেন—

যস্মিন বৃক্ষে সুপলাশে
দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।"

আর্যধর্মের বাইরেও বৃক্ষ বন্দনার কথা উল্লেখ করেছেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— "অরণ্যসঙ্কুল সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসিগণ তথা আর্যপুর্ব নাগজনগণ ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃক্ষ পুজা করিতেন। মোহনজো-দড়োতে একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে একটি বৃক্ষের শাখাদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মানা নগ্নদেহা বৃক্ষদেবী খোদিত আছে। দেবীর সমক্ষে আরাধনা-নিরত উপাসক এবং মাল্যগলে গন্ধর্বরাজ। সাঁচির মণ্ডন-শিল্প সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছে গহন কানন মাঝারে কিরূপ ভক্তিবিহ্বল চিত্তে পশুরাজ সিংহ, মাতঙ্গ, অশ্ব ও মৃগসহ বনস্পতির পুজা করিতেছে। ভারত ইতিহাসের যুগে যুগে আর্য ও অনার্যগণ অশ্বত্থের পুজা করিয়াছেন। সিন্ধু সভ্যতানুপ্রাণিত সুমেরীয় জনগণও বৃক্ষ পুজা করিতেন[৬৬]।" আমাদের বর্তমান সামাজিক জীবনেও গাছমঙ্গলা করে থাকি। যেমন বিবাহ উৎসবে ছাঁদনাতলায় কলাগাছ অথবা বাঁশের কঞ্চির চারিদিকে নাটাই-এর সুতো বেষ্টন করে গাছমঙ্গলা হয়। বর-কনে ছাঁদনাতলার চারিপাশে ঘোরে। এসব ছাড়াও বৈশাখ মাসে অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষে জলদান, বিল্ববৃক্ষ ও তুলসীচারায় পুজা, দুর্বার ব্যবহার, পঞ্চবটি রোপণ ও নবপত্রিকার পুজা ইত্যাদির দ্বারা বৃক্ষ বন্দনার পরিচয় পাই। ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বলেছেন, "নিগ্রোবটুগণ অশ্বত্থ পুজা প্রথম প্রচার করেছিল[৬৭]।" সুতরাং এর থেকে অনুমান করা যায় যে বৃক্ষবন্দনার ঐতিহ্য বহু পুরাতন এবং মনসা ও ধর্মঠাকুরের বিবর্তনের ইতিহাসে এক বৃক্ষপূজা নিঃসন্দেহে বড় একটি স্থান অধিকার করে আছে[৬৮]।

এখন ধর্মঠাকুর ও মনসা সম্পর্কিত বিষয়টির বহির্ভারতীয় সূত্র অনুসন্ধান করা যেতে পারে—

প্রাচীন মিশরের শস্যদেবতা ওসাইরিসের এবং তাঁর ভগিনী ও স্ত্রী আইসিস দেবীর উপাখ্যান, পুজা পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মপুজার যথেষ্ট সঙ্গতি দেখা যায়। প্লুটার্ক ওসাইরিসের যে কাহিনী দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এই রকম—ওসাইরিস হলেন পৃথিবীর দেবতা Set এবং আকাশের দেবী Nut-এর মিলনোদ্ভূত সন্তান। Nut-এর অপর সন্তান আইসিস দেবীর সঙ্গে ওসাইরিসের বিয়ে হয়। (তুলনীয় যম-যমীর বিবাহ)। রাজা হয়ে ওসাইরিস মিশরীয়দের অসভ্য অবস্থা থেকে মুক্ত করে আইন শেখালেন। এর আগে মিশরীয়রা নরমাংসাশী ছিল। আইসিস দেবী গম এবং বার্লির বন্য গাছ এবং ওসাইরিস চাষবাসের প্রথা আবিষ্কার করেন এবং মানব জাতিকে শস্য ভোজন করতে শেখান। পৃথিবীর সকল মানুষকে এই বিদ্যা শেখাবার জন্য তিনি আইসিসকে সাম্রাজ্যভার দিয়ে বিশ্ব পর্যটনে নির্গত হলেন। শিক্ষাদানকার্য সমাপনান্তে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এরপর তাঁর ভাই Set ষড়যন্ত্র করে জীবন্ত

Osiris-কে একটি বাক্সে পুরে নীলনদে নিক্ষেপ করেন। পরে আইসিস সেই বাক্স উদ্ধার করেন কিন্তু Set তা জানতে পেরে মৃতদেহটি খণ্ড খণ্ড করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। এর ফলে মিশরে ওসাইরিসের বহু কবর দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি কবরে এক একটি প্রত্যঙ্গ নিহিত আছে। প্রাচীন ইয়োরোপের প্রায় সর্বত্রই আদিম সমাজে রাজা বা অন্য কোনো ব্যক্তির দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রাখার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ফ্রেজার সাহেব দিয়েছেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত ভূমির উর্বরতা সাধন। (তুলনীয় ভারতের ৫১ পীঠ)। প্রবাদান্তরে পাওয়া যায় যে আইসিস দেবী প্রতিটি শহরে ওসাইরিসের মূর্তি তৈরী করে কবর দেন যাতে Set প্রকৃত কবর খুঁজে না পান। ওসাইরিসের জননাঙ্গ মৎস্য কর্তৃক ভক্ষিত হয়েছিল বলে আইসিস একটি লিঙ্গমূর্তি নির্মাণ করেন যা আজ পর্যন্ত উৎসবকালে মিশরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (তুলনীয় ভারতীয় লিঙ্গপূজা)। এই প্রসঙ্গে ষাঁড়ের কথাও উল্লেখ্য। যেমন ফ্রেজার লিখেছেন: "But the sacred bulls, the one called Apis, and the other Mnevis were dedicated to Osiris and it was ordained that they should be worshipped as gods in common by all the Egyptians since these animals above all others helped the discoveries of corn in sowing the seed and procuring the Universal benefits of agriculture[৬৯]." (তুলনীয় শিবের ষাঁড়)। এখন ওসাইরিসের পুজা হয় গ্রীষ্মকালে। মাঠ তখন শস্য শূন্য, নদী-জলাশয় প্রায় শুষ্ক এবং এই সময় corn-god থাকেন মৃত। (তুলনীয়, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ধর্ম-ঠাকুরের পুজাবিধি)। আর আইসিস দেবীর পুজা হয় বর্ষায়। ফ্রেজারের ভাষায়: "Egyptians held a festival of Isis at the time when the Nile began to rise. They believed that the goddess was then mourning for the lost Osiris and that the tears which dropped from her eyes swelled the impetuous tide of the river[৭০]." (তুলনীয় শ্রাবণ মাসের শাঁওতালি মনসা এবং ভাদ্র মাসের ভাতুলে মনসা পুজা)। ওসাইরিসকে বৃক্ষদেবতা, সূর্যদেবতা ও উর্বরতার দেবতা বলা হয়। (তুলনীয় গাছমঙ্গলা, ধর্মঠাকুর ও সূর্যের একাত্মতা)। ঐতিহাসিক হেরোডেটাস লিখেছেন, ওসাইরিসের সমাধি ছিল নিম্ন মিশরে Sais-এ। সেখানকার হ্রদে ওসাইরিসের দুঃখ-কষ্টের স্বরূপ দেখানো হতো রাত্রিবেলায়। লোকেরা শোক করত, বুক চাপড়াতো। একটু গোরুর মূর্তি তৈরী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। (তুলনীয় ধর্মঠাকুরের রাত্রিবেলা স্নানের শোভাযাত্রা, ঘোড়া টেনে নিয়ে যাওয়া এবং গাজনের সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকাণ্ড)। পুরোহিত একটি বাক্স সমেত বেদী বহন করেন। এই বাক্সে জল দেওয়া হয়। দর্শকরা চীৎকার করে ওঠে, ওসাইরিসকে পাওয়া গেছে। (তুলনীয়, দোলায় ধর্মশিলা এবং বাণেশ্বর বহন ইত্যাদি। বীরভূমে মালাবেড়িয়া নামক একটি গ্রামে জলে ডুবিয়ে রাখা চড়ক গাছকে অনুরূপভাবে জাগানো হয়। দর্শকবৃন্দ, 'এসেছে', 'এসেছে' বলে চীৎকার করে আজও)। মুদের কথা আগে বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানেরও তুলনামূলক বিচারে কিছু অর্থ পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার। ওসাইরিসের শোক প্রতিপালন

দিবসের শেষদিনে সূর্যাস্তের পর ওসাইরিসের একটি মূর্তি তুঁত কাঠের কফিনে রাখা হয় এবং নানা ক্রিয়াকাণ্ডের পর বালির কবরে রেখে দেওয়া হয়।

ফ্রেজার বলেছেন : "The ceremony was in fact a charm to ensure the growth of the corn by sympathetic magic[১১]". শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে কৃত্রিম কবর সৃষ্টির নজির আরও আছে। যেমন—পুর্ব আফ্রিকাতে Wagago-রা পুর্বপুরুষদের সমাধিস্থানে অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য rain charm হিসাবে কালো মোরগ, কালো ভেড়া এবং কালো গোরু বলিদান দিত। Moab-এর আরবরা শস্য কর্তনের পর একটুখানি জায়গা কাটতে বাকী রাখত। চাষী একঝাড় শস্যের সঙ্গে একমুঠো শস্য বেঁধে কবরের মত একটি গর্ত কেটে দুটি পাথর খাড়া করত। ঐ শস্যমুষ্টি ও ঝাড়টি তার মধ্যে রেখে চাষী বলত, "বুড়ো লোকটা মারা গেছে। ঈশ্বর আবার তাকে ফিরিয়ে দিন।" তারপরই গর্ত বুজিয়ে দেওয়া হত। জেমস ফ্রেজার আরও বলেছেন : "Under the name of Osiris, Tammuz Adonis and Attis the Moples of Egypt and Western Asia, represented the yearly decay and revival of life which they personified as a god who annually died and rose again from the dead[১২]". এখন আমাদের অনুমান করতে কোনো বাধা নেই যে ধর্মঠাকুরের মুদ রহস্য এইখানেই নিহিত আছে এবং এই মুদই মনসা, পুজায় প্রবিষ্ট হয়ে স্থানীয় রূপান্তর ঘটে চলেছে। একথাও ধরা যেতে পারে যে Osiris এবং Isis-এর পুজানুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের ধর্মঠাকুর ও মনসার যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। অনাবৃষ্টি তথা শস্যদেবতারূপে আদিম সমাজে যা বিশ্বাস বজায় ছিল তা ধর্মঠাকুরের পুজানুষ্ঠানে পরিষ্কারভাবে আজও টিঁকে রয়েছে।

(জ) ধর্মঠাকুর, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও রামচন্দ্র

বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ধর্মপুজাবিধান ও মঙ্গলকাব্যের কবিগণ। যেমন—

"তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ"[১৩]।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে—

"পিতামাতা দুঃখ পায় গৌড় কারাগারে
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ অবতারে।
মায়ার মায়ের গর্ভে জন্মিলা যখন
তোমা লাগি দুষ্ট কংশ দারুণ বন্ধন[১৪]।

বলাবাহুল্যমাত্র কবিগণের এই সমস্ত তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্বাচীন বলে মনে হবে। তন্ত্র লোপ পাওয়ার পর এ অঞ্চলে বৈষ্ণব প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয়। যেহেতু ধর্মঠাকুর

কোন্ দেবতা তার কোনো সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় না, সেইহেতু বৈষ্ণবরা ধর্মদেবতাকে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। ধর্মঠাকুরের নামাবলী অধ্যায়ে দেখা যাবে ধর্মঠাকুরকে নামের দিক থেকে বিষ্ণুর সঙ্গে এক করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া অল্পশিক্ষিত পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতও যথেষ্ট ছিল। যেমন জামথলি গ্রামে (দুবরাজপুর থানা) ধর্মপূজায় সিঁদুর ও রক্তচন্দন চলে না। খুজুটিপাড়া (নানুর) গ্রামে তুলসীপাতা দিয়ে শালগ্রামের ধ্যানে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। বড়া (নানুর) গ্রামে আবার বিল্বপত্রের সঙ্গে তুলসী একত্র ব্যবহার করার রীতি আছে। এটি শৈব ও বৈষ্ণব সমন্বয়ের একটি দৃষ্টান্ত। তাছাড়া জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রার প্রভাবও ধর্মঠাকুরের উপর পড়েছে। খুব সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এই প্রভাব এসে থাকবে।

এমন কি রামচন্দ্রের সঙ্গেও ধর্মঠাকুরকে অনেক জায়গায় অভিন্ন করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গলে উলূক ও হনুমান অভিন্ন। অনেক জায়গায় ধর্মপূজায় রামায়ণ গান হয়। হিজলগড়া, রসা, শিরা প্রভৃতি গ্রামে ধর্মপূজায় হনুমানের পূজা হয়। কোমা গ্রামে ধর্মবেদীতে একটি প্রাচীন হনুমান মূর্তি রক্ষিত আছে।

(ঝ) বাণেশ্বর ও বাণেশ্বরী

ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠানে. বাণেশ্বর শব্দটি সুপরিচিত। শিবের গাজনেও বাণেশ্বরের ব্যবহার আছে। বাণেশ্বর হল দেবতার প্রতীক যন্ত্র। "ধর্মপূজাবিধান" গ্রন্থে একে ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থে বাণেশ্বরের ধ্যানমন্ত্রও একটি আছে—

"ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়
কর্পূর কুন্দধবলেন্দু জটাধরায়
দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়।
ওঁ বাণেশ্বরায় নমঃ।"

বলাবাহুল্য, এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ খামখেয়ালীর নিদর্শন ও অর্থহীন। আসলে এই বাণেশ্বর বস্তুটি, আদিম যাদুবিশ্বাসের কোনও এক রকমফের ছাড়া আর কিছু নয়।

বাণেশ্বর যা দেখা যায়, তা হল বাণ বা শলাকাখচিত লম্বা একটি কাষ্ঠখণ্ড। পাথরের বাণেশ্বরও আছে (ভরাং গ্রামে, ইলামবাজার)। বাণেশ্বরকে বাণগোঁসাই বা বাণেশ্বরীও বলার রীতি আছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গেই বাণেশ্বরের পূজা হয়। বাণেশ্বরের স্নান এবং বাণেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করাও ধর্মপূজানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। পুকুর-ঘাটে বাণেশ্বরকে নিয়ে যাওয়ার নাম "বাণেশ্বর নড়ানো"। এবং বাণেশ্বরের স্নানকে বলা হয় "বাণামো"। বাণেশ্বরকে কাঁধে নিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয় ধর্মপূজার সময়। কোনো কোনো ধর্মঠাকুরের স্থানে দুটি বাণেশ্বর থাকে। ধর্মপূজায় বাণেশ্বরের বাণের উপর আনারস, আম ইত্যাদি ফল বিদ্ধ করার রীতি আছে। ভক্ত্যারা, উত্তরীয় ধারণের সময় বাণেশ্বরের শলাকাতেও একটি উত্তরীয় প্রদান করে।

বহু স্থানে ধর্মপুজার শেষ দিনে উত্তরীয় মোচনের পর সবগুলি একত্রে বাণেশ্বরের শলাকায় জড়িয়ে রাখা হয়।

বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা অঞ্চলে জানা যায় বাণেশ্বর কথাটি, বাণরাজা থেকে এসেছে। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার্থে এই নাম। কিন্তু কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। হরিদেবের রায়মঙ্গলে বাণেশ্বর নামে নৃপতি-বনিতার জন্মলাভের কথা আছে। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল টীকা করেছেন, "ইনি পৌরাণিক বাণরাজা নহেন। ইনি খাড়িনার রাজা ভদ্রেশ্বরের পুত্র। মাতার নাম বিমলা। ভদ্রেশ্বর স্বর্ণমন্দির দান করিয়া দক্ষিণেশ্বরের পুজা করায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই হেতু রাজা বাণ দক্ষিণরায়ের মন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন"[৭৫]। পিতৃদেব স্বর্গতঃ গৌরীহর মিত্র মহাশয় লিখেছেন, "নলহাটি থানায় বারা ও নিকটবর্তী নগরা, বাণেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে বাণরাজার রাজত্বের কথার প্রবাদ আছে। এতদঞ্চল একসময় প্রাগ্-জ্যোতিষরাজ বা আসাম রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। বাণ, নরক, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজগণ আসাম প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ভাস্করবর্মা নিজকে ভগদত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনি বাণ-রাজার মত শৈব বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কেহ কেহ বলেন যে সমধর্মাবলম্বী বাণরাজার নাম হইতে এতদঞ্চলে বাণরাজা সংক্রান্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে"[৭৬]। যাই হোক আমার ধারণা বাণখচিত কাষ্ঠখণ্ড এবং বাণেশ্বর নামটি এক জিনিষ নয়। বস্তুটি আদিম, উচ্চসমাজে গৃহীত হবার পর নামটি পরবর্তী কালে প্রদত্ত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নন্দীবাণেশ্বর নামে একটি গ্রামও আছে। মজার কথা এই যে, বাণেশ্বর থেকে বাণেশ্বরী নামে এক দেবীর উৎপত্তি হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এই দেবীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের কোনোই সম্পর্ক নেই। তবে ১লা মাঘ পূজা হয় বলে অতি সঙ্গত ভাবেই মনে করা যেতে পারে এই দেবী শম্ভুদেবী। ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরবর্তী মহম্মদ বাজার থানায় খয়রাকুঁড়ি গ্রামে বাঘরায় চণ্ডী ও বাণেশ্বরী যুক্তভাবে বিরাজ করছেন। সদ্‌গোপের পুজা। পুর্বে যাটটি পাঁঠা বলি হত। বাণেশ্বরীর পরিচয় উদ্ধার করতে গিয়ে জানতে পেরেছি যে, ময়ূরাক্ষী নদীর তীর বরাবর পুর্বদিকে বিভিন্ন স্থানে, সাঁইথিয়ার পর পর্যন্ত এই বাণেশ্বরীর ছয়জন ভগিনী আছেন। যথা—নন্দীশ্বরী (সাঁইথিয়ায় উপপীঠ), শঙ্খেশ্বরী (কটুনী-বৈদ্যপুর), তুধেশ্বরী, ঘাঘেশ্বরী, খগেশ্বরী ও কেচুরেশ্বরী (সাঁইথিয়া নন্দীপুর)। তিনটির অবস্থান নির্ণয় করতে পারি নি। উক্ত হয় যে, ঐ ভগ্নীবৃন্দের এমনই মাহাত্ম্য যে, তাঁরা অনাবৃত স্থানে থাকা পছন্দ করেন। আচ্ছাদন নির্মাণ করলে টেঁকে না। (কিন্তু সাঁইথিয়া নন্দীপুরে নন্দীশ্বরী উপপীঠে দেবীর মন্দির বর্তমান)। এই দেবীগুলির কথা বিশদ পর্যালোচনা করলে বীরভূমের শক্তি সাধনার একাংশের পরিচয় পাওয়া যাবে।

অনুরূপ সাত ভগিনী সম্পর্কে শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন: "বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার পল্লী অঞ্চলে পুজিত সাত বউনী (বা সাত বনদেবী ভগ্নীদের) রঙ্কিনী, চমকিনী, সনাকিনী প্রভৃতি এবং জঙ্গল মহালের বিভিন্ন স্থানে পুজিত জামমালা দেবীর সাত ভগিনীর বাসলি, চণ্ডী বিলাসিনী প্রভৃতির বা সাতটি বনদেবীর আকৃতি ও পুজাচারের সঙ্গে এই সাত

বিবির মিল দেখা যায়"[১৭] Rev. Whitehead-ও দেখিয়েছেন: "In the Tanjore district, the Chief Goddess of the large tribes of village deities are seven sisters who are regarded as emanating from Parvati, the wife ot Siva"[১৮]

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাত ভগিনী সম্পর্কে সর্বভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের একটি সূত্র ছিল। এই বিশ্বাস দ্রাবিড়ীয় অবদান হওয়া বিচিত্র নয়। তবে সাত ভাগনীর নামকরণের মধ্যে স্থানীয় নানা লৌকিক ভাবনা ও কল্পনা অনুপ্রবেশ করেছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই; যে কারণে বাণেশ্বর থেকে সহজেই বাণেশ্বরী নামকরণ করা হয়েছে।

(এও) ধর্মঠাকুরের কামিনী ষষ্ঠী ও শীতলা

ধর্মঠাকুর প্রায় ক্ষেত্রেই একক থাকেন না। একাধিক আবরণ দেবতা এবং কামিনীরূপে, ষষ্ঠী, শীতলা, চণ্ডী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি দেবদেবীরা বিরাজ করেন। কামিনী মনসার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক অতি নিবিড়। (৭৩ পৃষ্ঠায় ছ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এখানে ষষ্ঠী ও শীতলার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সংযোগের কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করব।

ষষ্ঠী এবং শীতলা অবৈদিক দেবী। এঁদের বিবর্তনের ইতিহাস সম্যক পাওয়া যায় না। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন, "ষষ্ঠীদেবী কার্তিকের স্ত্রী ছিলেন। দ্রাবিড় ভারতে প্রাচীনতম দেবদেবীদের মধ্যে কার্তিকেয় অন্যতম। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যে শীতলাষষ্ঠীর মত অনুরূপ দেবী আছে। তাহলে ষষ্ঠী; শীতলা প্রভৃতি অবৈদিক দেবীরা দ্রাবিড় সংস্কৃতির অবদান হওয়া অসম্ভব নয়।" ("শ্রীদুর্গা")। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, "রাকা দেবী আমাদের পুত্রদান করেন। সিনীবালী (কৃষ্ণচতুর্দশীর কলাচন্দ্র) লোকপালিকা, সুপ্রসবিনী। এসকলের 'কেন' অবশ্য ছিল, এখন আমরা তাহা উচ্ছেদ করিতে পারি না। কালক্রমে ষষ্ঠীদেবী শিশুপালিকা হইয়াছেন" ("বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" পৃঃ ১৩০)। কিন্তু এই ষষ্ঠীদেবী কোথা থেকে এলেন তা পাওয়া শক্ত। তবে মনে করা হয় ষষ্ঠীদেবীও দুর্গার সহিত অভিন্না এবং অন্যতমা মাতৃকা। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত হরিদেবের শীতলামঙ্গলে (বিশ্বভারতী) আছে, "শীতলা রুদ্র-শিবের শ্রমজ কন্যা এবং দক্ষিণরায় কালুরায়ের ভগিনী। পক্ষান্তরে শীতলা আবার মনসার সহচরীও বটেন। শীতলা সবিতৃকন্যা সাবিত্রীর দুহিতা হওয়ায় সূর্যসম্পর্কিতাও। শীতলা যমের ভগিনী, শঙ্করগৃহিণী, সদাশিবা অর্থাৎ চণ্ডী ও দুর্গার প্রকারভেদ" (ভূমিকা পৃঃ ২৫)। শ্রীধর্ম-পুরাণে শীতলাকে অথর্ব বেদের অধিষ্ঠাত্রীও বলা হয়েছে। ইনি দক্ষিণা কালিকাও। স্কন্দপুরাণে শীতলার বর্ণনা আছে।

এই দুই দেবীর বিবর্তনের ইতিহাস যাই হোক না কেন রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে শক্তির অভিন্ন প্রতীকরূপে ষষ্ঠী ও শীতলা গৃহীত হয়েছেন। ধর্মঠাকুরের মতই বস্তুতান্ত্রিক বিচারে সমস্ত "কেন"-র রহস্যভেদের চাবিকাঠি পাওয়া যায়। তার আগে ষষ্ঠী সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত তথ্যের দুএকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি—বীরভূমে "ইন্দ্রগাছা"

গ্রামে কোনো ধর্মশিলা নেই। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে একটি ধর্মের ঘোড়া এনে পুজা করার পর পরবৎসর নিকটবর্তী অরণ্য-ষষ্ঠীতলায় নিক্ষেপ করে নূতন ঘোড়া আনা হয়। এখন ধর্মঘোড়া ষষ্ঠীতলায় নিক্ষেপের কারণ কি? এর উত্তর পাওয়া যায় "কোমা" গ্রামে গেলে। সেখানে দেখা যায় ধর্মতলার সন্নিকটে একটি প্রস্তরে অর্বাচীন ছাঁদে যুগল হস্তিনী ও ঘোটকের মিথুনদৃশ্য খোদাই করা আছে। এই প্রস্তরখণ্ডকেই ষষ্ঠী বলে পুজা করা হয়। খোঁজ করলে এই সকল বৈচিত্র্যপুর্ণ নমুনা অসংখ্য পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে দেখতে পাচ্ছি ষষ্ঠীদেবী সন্তানজন্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা। আদিম সমাজে যাদুবিশ্বাসের কয়েকটি মূল বিষয়ের সঙ্গে এই তত্ত্ব মিলে যায়। অন্যদিক থেকে বিচার করা যায় শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ষষ্টিক বা ষষ্ঠীকা হলো ব্রীহিধান্য। চলতি যেট্টে ধান। এই ধান ৬০ দিনে পক্ক হয়। ষষ্ঠীদেবীর উপাসনার মধ্যে কৃষিভিত্তিক মাতৃপ্রধান সমাজ-জীবনের ইঙ্গিত রয়েছে" (লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ৩৫০)। লোটন ধান থেকে লোটন ষষ্ঠীর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গান্তরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, ধর্মঠাকুরের উৎসবে ফসল ফলানোর নানা যাদুবিশ্বাস লুকিয়ে আছে। তাই যদি হয়, তাহলে তাঁর সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর সম্পর্ক স্থাপন অতি সহজেই হতে পারে।[৭৯]

ষষ্ঠীদেবী সম্পর্কে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা তুলনারহিত। তাঁর আলোচনার সবটুকুই এখানে প্রকাশ করছি—"মধ্যযুগের বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল প্রধান কবিই জাতকর্মে 'ষষ্ঠীস্থান', 'সেট্যারা' বা ষষ্ঠীপুজার নানাবিধ বর্ণনা করিয়াছেন স্বল্প অথবা বিশদভাবে। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতপুর্ব ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য ব্যতীত কাতি, কাস্তি, দাসী ও চৌষট্টি বিড়ালবাহিনী সমেত দেবী ষষ্ঠীর মধুপুর গ্রামের আঁটকুড়া রাজাকে কৃপা করিতে যাওয়ার কাহিনীর সূত্র রঘুনন্দনের ভনিতায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।...ইহাতে ইঁহার পুজাপদ্ধতি এইরূপ—'পাষাণে বান্ধায়ে পিড়ি ফুলগাছ বেড়া অজা মেষ মহিষ দিবেক জোড়া জোড়া।' শিশুরক্ষায় ষষ্ঠীদেবীর ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ। ইঁহার পুজাবিধিও বিভিন্ন প্রকার। সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক, গোমুণ্ডে ষষ্ঠীপুজা। এই প্রথা রাঢ় অঞ্চলে এখনও নানাস্থানে প্রচলিত। বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম ও রূপরাম ইহার বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন।

শাস্ত্রীয় সূতিকা ষষ্ঠী পুজাপদ্ধতি এইরূপ—ততো গৃহদ্বারং প্রবিশ্য দ্বারপালান্ পুজয়েৎ। ষষ্ঠী দ্বার দক্ষিণপার্শ্বে ক্ষেত্রপালাদিভ্যঃ পাদ্যাদিকং দত্ত্বা ওঁ ক্ষেত্রপালাদয়ঃ কেচিদ যে তীক্ষ্ণ খড়্গধারিণঃ বালস্য হি হিতার্থায় বলিং গৃহ্নন্তু তৃপ্তয়ে। রঘুনন্দন কৃত 'কৃত্যচিন্তামণি' গ্রন্থে জাতকর্মে ষষ্ঠীপুজায় ষষ্ঠীকে 'মন্থানদণ্ড' রূপে পুজা করিবার বিধি আছে। দক্ষিণ রাঢ়ে মন্থান ষষ্ঠী বা মাথানী ষষ্ঠীর পুজা হয় ভাদ্রমাসে। কোনোও সরোবরে সাধারণতঃ গৃহস্থের 'জলহরি'তে দধিমন্থনী পুঁতিয়া তাহার শীর্ষদেশে দেবীকে আবাহন ও পুজা করা হয়। এই পুজার প্রধান উপকরণ হইল বাঁশপাতা, ঝিঙা আর অঙ্কুরিত আটকলাই। (বাঁশপাতা স্ত্রীরোগবিশেষের প্রতিষেধক। ঝিঙা পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। অঙ্কুরিত আটকলাই, ভীষ্মাদি অষ্টবসুর ন্যায় সর্বগুণান্বিতা অষ্টপুত্র কামনার ব্যঞ্জক। মাথানী ষষ্ঠীর পুজার দিনে ঝিঙা বা কলাই রাঁধিয়া খাইতে নাই।...মহাভারতে বনপর্বে ষষ্ঠী দেবসেনা, সভাপর্বে শ্মশানচারিণী শিশুখাদিকা

জরারাক্ষসীরূপে পরিচিতা। দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ষষ্ঠীদেবীর পরিচয় আছে—শ্মশানে নিক্ষিপ্ত মৃত শিশুকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যতা রথারূঢ়া দেবীরূপে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ষষ্ঠীকে 'জাতহারিণী সুঘোরা পিশিতাশনা' বলা হইয়াছে। সেইজন্য বিষ্ণুধর্মোত্তরে রাত্রি জাগিয়া ষষ্ঠীপুজার বিধান এবং সম্ভবতঃ 'দস্যুকে উঁচুপিঁড়ি'—এই প্রবচন অনুসারে 'কৃত্য-চিন্তামণি' মতে মহাষষ্ঠীকে শিশুর ধাত্রী বলিয়া তাঁহার নিকট তাহার রক্ষায়, দীর্ঘজীবনের ও সর্বকামনা পরিপূরণের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাহাই হউক, 'কার্তিকধাত্রী' ষষ্ঠীদেবীর এই সকল পরিচয় হইতে গোমুণ্ডে ইঁহার আসন রচনার ব্যাপার ব্যাখ্যা করা গেল না। অথচ এই প্রথা এখনও বর্তমান।

মৃত গোরুর সহিত দেবী ষষ্ঠীর সম্পর্ক কোনোও সুপ্রাচীন বিস্মৃত যোগাসূত্রের অবশেষ হইতে পারে। ইজিপ্টে হঠোর (Hathor < সং ষট্) নামে এক সুপ্রসিদ্ধ দেবী ছিলেন খৃঃ পূঃ ১৪৫০-এর দিকে। ইঁহার বিশেষ মহিমা ঘোষণা করা হইয়াছে পপিরাসে। উর্ধ্বাঙ্গে নারী এবং নিম্নাঙ্গে গাভী—এইরূপেই ইঁহাকে দেখা যায় ইহাতে। ইঁহার কাজ মৃতকে পর-লোকের পরে পুনর্জন্মের পূর্বে রসদ যোগানো। নামসাদৃশ্যে ও ক্রিয়াকলাপে ইঁহাকে আমাদের ষষ্ঠীদেবীর অনুকল্প অনুমান করা যাইতে পারে। ইন্দোমিশরীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইহা আর একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হওয়া অসম্ভব নহে। মুকুন্দরাম ও রূপরামের উল্লিখিত ষষ্ঠীর গোমুণ্ডাসন মনে হয়, ইহারই ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। নজর দোষ লাগিয়া বাড় কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় বিভিন্ন রবিশস্যের, বিশেষ করিয়া কাপাস বাড়ীতে গোমুণ্ড টাঙ্গাইবার রীতি এখনও রাঢ়ে বহুস্থলেই প্রচলিত। তাহার সহিত প্রেতযোনির অনুকল্প আকৃতি অনেকস্থলে স্থাপিত হয়। অর্ধ-নারী ও অর্ধ-গাভীরূপী দেবতা 'হঠোরের প্রতিমূর্তি আমাদের ষষ্ঠীদেবীর স্বরূপ আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কবিকঙ্কণ ও রূপরামের উদ্দিষ্ট অঞ্চলে এখনও আঁতুড় ঘরে গোমুণ্ড আনা হইয়া থাকে। একুশদিনে ষষ্ঠীপুজার পর গাভী আনিয়া গোময় গোমূত্র ত্যাগ করাইলে আঁতুড়ঘর পরিশুদ্ধ হয়।...বর্তমানে এই কৃত্যের নাম গোহালগঙ্গা। (অথর্ববেদের বিরাজসূক্তে (৮-৫-৫-১-১০) অসুরগণ, পিতৃগণ ও মানবাদির পোষণের নিমিত্ত ঈশ্বরের 'মায়া' রূপকে দোহনের কল্পনা আছে। এই কল্পনা, কপিল কল্পনার মূল বলিয়া মনে করি। আঁতুড়ঘরে গাভী-আনয়ন, নবজাত শিশুর পোষণের নিমিত্ত কপিলা-আনয়নেরই প্রতীক নিঃসন্দেহে)। গাভীর পরিবর্তে সূতিকা-গৃহের দ্বারে কড়ির চোখ বসানো গোময় নির্মিত দুইটি পুতুল—গোয়ালা-গোয়ালিণী নামে স্থাপন করার প্রথা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। 'গোয়ালিনী ডাকে' প্রথা প্রচলিত আছে দক্ষিণ রাঢ়ে। যাহাই হউক ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে, জাতকর্মে এই আচার সম্পূর্ণ লৌকিক।

এই বিষয়ে বৈদিক কৃত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। বৈদিক যুগে জাতকর্মাদি সংস্কারের মধ্যে গোরুর স্থান না থাকিলেও 'গোদান' নামে একটি বৈদিক ক্রিয়া ছিল ; কেশচ্ছেদন তাহার মুখ্য অঙ্গ। 'গো' শব্দের অর্থ কেশ এবং 'দান' শব্দের অর্থ ছেদন।...মহাভারতের সমাজেও এই আচার অজ্ঞাত ছিল না। মনুসংহিতায় এবং রঘুবংশেও এই আচারের উল্লেখ আছে।

পরবর্তী যুগে 'গো' শব্দের অর্থ 'কেশ' ভুলিয়া 'গোরু'—এই অর্থ গৃহীত হইয়া থাকিবে এবং এই অবকাশে তুক্‌তাক্ মন্ত্রের মাধ্যমে ষষ্ঠীপূজার জন্য প্রকৃত গোমুণ্ড আনার অভিচারিক ক্রিয়ায় ইহার রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নহে। অথবা ইহাও হইতে পারে, বৈদিক জাতকৃত্যে 'গোদান' প্রকৃত গোরুদানের অথবা গো-বধেরই কোনোও সংস্কার ছিল এবং এই সংস্কার পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হইয়া দেবী ষষ্ঠীর যূপে বা আসনে পরিণত হইয়াছে[৮০]।"

ডঃ মণ্ডলের এই আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও বিশ্লেষণ আর একটু বাস্তবমুখী হওয়া দরকার। রাঢ়ের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে শস্যবপন সংক্রান্ত উৎসব, বিভিন্ন প্রকার শস্যদেবী ষষ্ঠীর পূজা, গোরুপরব এবং সন্তান জন্মের সঙ্গে শস্য জন্মানো সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ ও যাদুবিশ্বাসের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই ধারায় চিন্তা করলে শস্য জন্মানোর দেবী কেন শিশু-পালিকা দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং গোরুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি হতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। (বুঝতে শুধু বাকি থেকে যায় তাঁর বাহন বিড়ালটিকে।) এবং যেহেতু ধর্মঠাকুর শস্যের তথা বৃষ্টিপাতের দেবতা সেইহেতু সহজেই ধর্মঠাকুরের কামিনীরূপে ষষ্ঠীদেবী গৃহীত হয়েছেন।

অতি সাম্প্রতিক কালে মিশরীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ফারাও রাজাদের আমলে সমাহিত করা বিড়ালদের কবরখানা আবিষ্কার করেছেন। প্রাচীন মিশরে Basat দেবতার প্রতিভূ স্বরূপ ২০০০ খৃঃ পূর্বাব্দে বিড়ালকে পূজা করা হত এবং মৃত বিড়ালকে মাটির পাত্রে রেখে সমাহিত করার নিয়ম ছিল। প্রাচীন মিশরীয় ঐ সংস্কার থেকে ষষ্ঠীর বাহন হিসাবে বিড়ালকে আমরা গ্রহণ করেছি কিনা, তা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিচার করা দরকার। আমাদের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ কার্যে মিশরীয় প্রভাব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

শীতলার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক স্থাপনের হেতু এই পথেই নিষ্পত্তি হতে পারে। অন্যত্র দেখিয়েছি, আদিম সমাজে ভূতবিতাড়ন ও রোগশান্তির জন্য যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ছিল, তা হুবহু রক্ষিত হয়েছে (বেত্রহাতে মশালসহ রাত্রিবেলা) ধর্মঠাকুর নিয়ে শোভাযাত্রার মধ্যে। মনসা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি আজকের রাঢ় অঞ্চলে মনসাপূজায় পণ্যসম্ভারপূর্ণ নৌকা টানার ক্রিয়াটি আদিম সমাজে রোগ বিতাড়নের একটি সুপ্রচলিত যাদুবিশ্বাস ছিল। শীতলাও মড়কের এবং মহামারীর দেবী। বলাবাহুল্য, আদিম যাদুবিশ্বাসের প্রত্যেকটির জট খোলা সুকঠিন ব্যাপার। তবু ভাববাদী মস্তিষ্কে কল্পনার ইন্দ্রজাল বোনার চেয়ে বস্তুমুখীন আলোচনায় সমস্যার সমাধান হবার আশা দেখা যায়। পূর্বোক্ত আদিম যাদুবিশ্বাসের বিবর্তনের পরিণাম হল, শীতলা। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রকার যাদুবিশ্বাসের সমন্বয় ঘটিয়েছে ধর্মপূজায়। সেই কারণেই অতি স্বাভাবিকভাবেই মনসার মতই, শীতলাও ধর্মকামিনীরূপে স্থান লাভ করেছেন।

দুর্গাও কালীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের প্রভূত সম্পর্ক দেখা যায়। তার কারণ ধর্মের গাজনের সঙ্গে শিবের গাজনের যোগাযোগ সাধন। দুই গাজনের ঢং প্রায়ই একরকম। (শিবস্বারূপ্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)। লৌকিক বিবিধ চণ্ডীর সঙ্গেও ধর্মঠাকুর বিরাজ করেন। লৌকিক

চণ্ডীগুলি সবই শস্যের দেবী। ("বাঘরায় চণ্ডী" দ্রঃ)। ধর্মঠাকুরও তাই। এই কারণে সহজেই তাঁরা ধর্মকামিন্যায় পরিণত হয়েছেন।

(ট) ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা

ধর্মঠাকুরের আশেপাশে যে-সকল দেবতা বিরাজ করেন তাঁদের আবরণ দেবতা বলা হয়। এই আবরণ দেবতার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। স্থানবিশেষে দেবতার সংখ্যা বা দেবতার নানা বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে এই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা থেকেই বোঝা যাবে কত প্রকার ধর্মের স্রোত এবং কত ধর্মমত রাঢ় অঞ্চলের উপর দিয়ে গেছে। আদিবাসীদের ধর্মঠাকুরের কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে বুঝতে গেলে এই সকল আবরণ দেবতার পুরা হিসাব সংগ্রহের প্রয়োজন। বিচিত্র গ্রন্থ "ধর্মপুজাবিধানে" ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতাদের যে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে তা নিম্নরূপ—

গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষহরি, ভৈরব, বাশুলি, সরস্বতী, কুবের, ষষ্ঠী, ভগবতী, বসুমতী, বিশালাক্ষী, বটুকনাথ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি ভৈরবগণ; ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, ব্রহ্মা, গরুড়, বিশ্বকর্মা, দ্বারপালগণ, নন্দী, কামদেব, বাণেশ্বর, পণ্ডাসুর, দশদিকপাল, শ্বেতপণ্ডিত, নীলপণ্ডিত, কংসারিপণ্ডিত, রামাই-পণ্ডিত ও নব-অগ্নি। এ ছাড়াও মগরপণ্ডিত, কালুঘোষ, ভট্টধরাধর, ভাস্কর নৃপতি, সাধুপুর দত্ত, তাম্বুলি, উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, আশোয়াচাণ্ডাল, আদিনাথ, দীননাথ, চৌরাঙ্গনাথ, গোরনাথ, পঞ্চগৌড় ও রাজা গৌড়েশ্বরকে ফুল দেবার কথা আছে।

পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, ধর্মঠাকুর যেহেতু রাজদেবতা ছিলেন সেইহেতু সকল দেবতাই তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ পর্যায়ে দেখিয়েছি ধর্মঠাকুর কোনদিনই রাজদেবতা ছিলেন না। উচ্চবর্ণের পুজারীদের মহৎ কীর্তি এটি।

রাঢ় অঞ্চলে অনুসন্ধান ক্ষেত্রে যে সকল আবরণ দেবতা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। এখানে অবশিষ্ট কয়েকটির পরিচয় দিচ্ছি।

পুরন্দরপুর (সিউড়ী থানা) গ্রামে ধর্মঠাকুরের স্থানে ধবলধারী কন্যা নামে এক অপদেবী থাকেন বলে লোকবিশ্বাস। এঁর বাতাস গায়ে লাগলে নাকি ধবল হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য; ধর্মঠাকুর শ্বেতী রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখেন বলে বহু পুজাস্থানে বিশ্বাস করা হয়। এই ধবলধারী কন্যা ঐ বিশ্বাসের বিপরীত ক্রিয়ার ফল। অবশ্য এটি নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মপুজা-বিধানের "ধামাতকন্যা"র (ধর্মাধিকরণিক) পরিবর্তিত রূপ হওয়াও অসম্ভব নয়।

গাংমুড়ি (রাজনগর থানা) গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন চারিটি অপদেবতা। আ-ক্ষেণ, ঘেন ঘেন, উতরণ, সিচেন। বাউরী সম্প্রদায় ১লা মাঘ পুজা করে ছাগ, মুরগী বলিদান সহ (রাঢ়ের সংস্কৃতি অধ্যায়ে নববর্ষোৎসব দ্রষ্টব্য)।

(ঠ) ধর্মগাজনে আগুন-খেলা

ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসবে আগুন নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অগ্নিকুণ্ড পরিক্রমা, মশাল নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা, বন পরিক্রমা, আগুনের উপর হাঁটা, লাফানো, মাথায় আগুন বহন ; জলন্ত অঙ্গার নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করা, শ্মশান অঙ্গার নিয়ে এসে নানা কৃত্য, ছাই সংরক্ষণ ইত্যাদি বহু প্রকার কাণ্ড হয়ে থাকে। (গ্রামের বিবরণে বিশদ পরিচয় দ্রঃ)। এই আগুন নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ডের হেতু কেবল দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনই নয়, এর পিছনে বহু প্রাচীন আদিম সমাজের নানা যাদুবিশ্বাসও জড়িয়ে আছে। কেবলমাত্র ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠানেই নয়, ভারতে নানা জাতির মধ্যে নানা পূজা উৎসবে অগ্নি নিয়ে বহু প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড কাছে। দাক্ষিণাত্যের ধর্মপূজা উপলক্ষে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "With the Pandava cult, a fire walking ceremony is usually associated"। তার পরই তিনি বলেছেন: "In south India the Dharmaraj is definitely, Yudisthir who is referred to by this name in the Mahabharata"[৮১]। আর্যসমাজে অগ্নি হলেন বৈদিক দেবতা। মুণ্ডক-উপনিষদে অগ্নিশিখার সাতটি নাম পাওয়া যায়—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি। "এই অগ্নিশিখা পরে দেবতার রূপ ধারণ করেছে।"[৮২] আর্যসমাজে গোড়া থেকেই অগ্নিকে দেবতারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ড অগ্নির সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আর্যসমাজের বাইরে অগ্নিপূজার যত না নিদর্শন মেলে, তার চেয়ে বেশী নিদর্শন মেলে অদ্ভুত সব আচার-অনুষ্ঠানের যা কোনোদিক থেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে গণ্য করা চলে না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এই সব ক্রিয়াকাণ্ডগুলি আদিম সমাজের তুক্‌তাক্ ছাড়া আর কিছুই নয়। জেমস্ ফ্রেজার এ সম্পর্কে নানা গ্রন্থ ও নানা পণ্ডিতের মতবাদ জড় করেছেন তা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে :

ভারতের বাইরে প্রায় সব দেশেই May fire, Bon fire, Midsummer fire ইত্যাদি নামে অগ্নিপ্রজ্বালন ও তাকে কেন্দ্র করে বহুবিধ অনুষ্ঠান আদিকাল থেকে চলে আসছে। অনেক পণ্ডিত এইগুলিকে সূর্যসম্পর্কিত অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উপজাতিদের মধ্যে বছরের কোনো এক সময়ে অথবা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে, আগুন জেলে তার চারিপাশে নৃত্য করার প্রথা বিদ্যমান। আদিম সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে এর ফলে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি হবে, পশুপালন ও জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দতর হবে। সূর্যের উত্তাপ ও আলো যাতে কমে না যায় সেই উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালিয়ে সূর্যকে বাঁচিয়ে রাখার বিশ্বাসও এর মধ্যে ক্রিয়াশীল। Dr. Edward Westermark এবং Prof. Eugn Mogk বলেছেন যে ভূতপ্রেত, দানার ক্ষতিকারক অদৃশ্য প্রভাব এই অগ্নি প্রজ্বলনের দ্বারা দূরীভূত হয়। কোনো কোনো জায়গায় জলন্ত চাকাকে পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে ফেলে দেবার রীতি ছিল বা আছে। কোথাও বা আগুন ধরিয়ে একটি খুঁটির চারিপাশে ঘোরানো হয়

অথবা আগুনে-ঢাকা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এগুলি সূর্য-সম্পর্কিত ম্যাজিক। ফরাসীরা বিশ্বাস করে বর্ষাকালে জুন মাসে Bonfire জ্বালালে বৃষ্টি ধ'রে গিয়ে আবার সূর্য দেখা দেয়। ফসল ফলানোর কৃত্যের সঙ্গে আগুন জ্বালানোর সম্পর্ক আছে। যেমন Vosges পাহাড় অঞ্চলের লোকেরা মনে করে (Midsummer fire) আগুন জ্বালালে ফল শস্যাদি রক্ষা পায় এবং উত্তম ফসল হয়। Isles of Man-এর লোকেরা আগুন জ্বালিয়ে তাদের ক্ষেতের দিকে ধূমোকে যেতে দেয়। দঃ আফ্রিকার Matabeles-রা তাদের বাগানে ধূমো পাঠাবার জন্য বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালে। জুলুরা আগুনে নানারকম ওষুধপত্র নিক্ষেপ করে, যাতে শস্যাদি রক্ষা পায় (fumigation)। ইয়োরোপীয় চাষীরা বিশ্বাস করে, অগ্নিশিখা যতদূর থেকে পরিদৃষ্ট হবে ততদূর পর্যন্ত ফসল জন্মাবে। জলন্ত অঙ্গার নিয়ে গিয়ে ঐ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই শস্যক্ষেত্রে পুঁতে দেওয়া হয়ে থাকে। অগ্নিকাণ্ডগুলি আবার পশুপালন সংক্রান্ত যাদুবিশ্বাসেরও অন্তর্গত ছিল। যেমন আয়ার্ল্যাণ্ড ও ফরাসীদের বহু স্থানে বন্ধ্যা গোরু মহিষগুলিকে আগুনের উপর দিয়ে ছোটানো হত, যাতে তারা দুগ্ধবতী হয়। সার্বিয়ার লোকেরা মনে করত আগুনের স্ফুলিঙ্গ সংখ্যা অনুযায়ী মুরগী, গোরু, ছাগল ইত্যাদির প্রসব হবে। মরক্কোর অধিবাসীরা মনে করে যে, সন্তানহীন স্বামী স্ত্রী আগুনে লাফ দিলে অচিরেই সন্তানলাভ করতে পারে। আইরিশ লোকবিশ্বাসে আছে যে, কোনো বালিকা তিনবার আগুনে লাফালে তার শীঘ্রই বিবাহ ও বহু সন্তান লাভ হবে। ফ্লেম দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সহজ প্রসবের জন্য আগুনে লাফ দেয়। Lechrain-এর লোকেরা ভাবে যে কোন যুবক যুবতী আগুনে লাফ দেওয়ার ফলে যদি আঁচ গায়ে না লাগে, তবে তাদের এক বছরের মধ্যে সন্তান হয় না। জলন্ত মশাল হাতে নিয়ে শস্যক্ষেত্রে, চারণভূমি ও পশুদের দলের মধ্যে বিচরণ (Bonfire) আগুন জ্বালিয়ে ক্রিয়াকাণ্ডগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলির মূলে প্রজনন সম্পর্কে বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আগুন (Bonfire) শস্যক্ষেত্রকে শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে বলেও বিশ্বাস করা হয়। নানা জায়গায় এমন বিশ্বাস করাও হয় যে, যুবকদের আগুনে লাফানোর ফলে শস্যকর্তনের সময় (ডাইনীর প্রভাব বশে) কোমরে ব্যথা ধরে যায় না। দক্ষিণ Salvonian কৃষকদের বিশ্বাস যে, ডাইনীরা শিলাপূর্ণ মেঘে চড়ে বিচরণ করে। ওদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে তারা জলন্ত অঙ্গারের উপর তৈল ও নানারূপ দ্রব্য নিক্ষেপ করে ধূমো তৈরী করে। সেই ধূমো মেঘের কাছে পৌঁছে ডাইনীদের নিপাত ক'রে থাকে।

আদিম সমাজে এই রকম আগুন নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড হাজার রকমের আছে। আমাদের বোঝার পক্ষে এই দৃষ্টান্তগুলিই যথেষ্ট। তাহলে ব্যাপার দাঁড়ালো কি? আগুন নিয়ে খেলা, আগুনে লাফানো, মশাল নিয়ে ছোটাছুটি, এগুলি ধর্মরাজের সামনে ভক্ত্যাদের আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধনের উদাহরণ হতে পারে না। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি থেকে এই ধারণা স্পষ্ট হবে যে, sun-charm, প্রজনন, ফসল ফলানো এবং ভূত বিতাড়ন—এই সংক্রান্ত আদিম বিশ্বাসগুলিই অগ্নিসংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডগুলির মধ্যে অনিবার্যভাবে বিদ্যমান। এর সঙ্গে ধর্মচর্যা বা বৈদিক অগ্নি-দেবতার কোনোও সংস্রব নেই।

(ঙ) ধর্মঠাকুরের বলি

ধর্মপূজায় পশুবলি একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঘরভরা উৎসবের সময় 'লুয়া' বধ করা হয়। (লুয়া শব্দটি লোহা শব্দেরই অপভ্রংশ বলে মনে হয়) লুয়াছাগের অঙ্গে লোহার বেড়ি পরানো থাকে। কোনো অপুত্রক নারী পুত্র কামনায় লুয়ার মুণ্ড শুদ্ধ হাঁড়ি কোলে নিয়ে সারারাত্রি বসে থাকেন। এই প্রথাটি নিঃসন্দেহে আদিম যাদুবিশ্বাস পর্যায়েই পড়ে। রাঢ় অঞ্চলে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে ধর্মঠাকুরের নিকট বলিদানের বহু বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব প্রভাবের দরুণ বলিদান বন্ধও হয়ে গেছে বহুস্থানে। একটু পুরাতন পূজাস্থানে সাদা ছাগল বলি দেওয়া হয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, শ্বেত ছাগ সূর্যের প্রতীক।

বলি দেবার নানারকম রীতি আছে। যথা, দেবতাকে আড়াল করে বলি, ভৈরবের সামনে বলি, মনসার সামনে বলি, পিছন ফিরে বলি, বলির সঙ্গে ভাঁড় ভাঙ্গা, মুরগী বলি, বিজয়া দশমীর দিন বা নবমীর দিন বলি, ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে দেওয়া হয়। বীরভূমে খুজুটিপাড়া গ্রামে ধর্মপূজার পর শ্বেতছাগ বলি পড়ে সামনে, তারপর দুই পাশে বহু ছাগ ও মেষ বলি পড়ে। মানসিক যারা করে তারা শ্বেত ছাগই বলি দেয়। যে সমস্ত জায়গায় ধর্মপূজা তপশীল সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মুরগী, মোরগ ও শূকর বলি হয়ে থাকে। অনুমান করি ধর্মঠাকুরের বলিদানের আসল তথ্য এই মোরগ এবং শূকর বলিদানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠানে মোরগ অপাংক্তেয় হলেও মনে রাখা দরকার যে হিন্দু ও জৈন ঐতিহ্যে মনসা, কার্তিক এবং চণ্ডী কুক্কুট সম্পৃক্ত দেবদেবী। রাঢ় অঞ্চলে গ্রামদেশে অনুসন্ধান করলে সহজেই নজরে পড়ে যে কোন পূজানুষ্ঠানে তপশীল সম্প্রদায় মোরগ, মুরগী, শূকর বলি দেয়। বীরভূমে "মুরগী ঠাকরুণ" নামে এক দেবীও আছেন। ওঁরাও, সাঁওতাল, খোন্দরা যে কোনো অনুষ্ঠানেই মুরগী বলি দেয়। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মনে করেন যে, ওঁরাওদের মধ্যে মোরগ-ঝাঁপ (বিষনাশন) পদ্ধতি থেকে মোরগ বলি প্রথা এসেছে। পক্ষান্তরে তিনি লিখেছেন, "কুক্কুটরক্তে তুষ্ট হইয়া ওদেশের দেবতা উপাসককে প্রচুর ফসল ও সর্বমঙ্গল দান করিয়া থাকেন।" (পুঁথি পরিচয় ৩য় খণ্ড ভূমিকা অংশ)। তাঁর এই শেষ উক্তিটির মধ্যেই আসল তত্ত্ব নিহিত আছে। অপর প্রবন্ধে দেখিয়েছি, ধর্মঠাকুর বৃষ্টিপাতের তথা শস্য-দেবতা। সুতরাং এ পূজায় মোরগ বা শূকর বধ হবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। বহির্ভারতীয় আদিম সমাজের প্রথা এই প্রসঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে তত্ত্বটি আরও পরিস্ফুট হবে। জেমস্ ফ্রেজার কিছু তথ্য আমাদের দিয়েছেন। পৃথিবীর বহু জায়গায় অনুন্নত সমাজের কৃষিজীবীরা ফসল ফলাবার আশায় মাঠে মুরগী, শূকর ইত্যাদির রক্ত ছড়িয়ে থাকে। Rev. White head তাঁর the village gods of South India গ্রন্থে বলেছেন, "Since in ancient Greece the pig was sacred to agricultural deities" (P. 59)। রাঢ় অঞ্চলে আজও বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রে নানারকম পশু পাখী বলি দেওয়া হয়ে থাকে। তুলনা মূলক বিচারে আমরা স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারি ফসল ফলানো সংক্রান্ত যাদুবিশ্বাস, ধর্ম-

ঠাকুরের বলিদান অনুষ্ঠানে এসে স্থান লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি তুক্-এর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত (প্রাচীন বীরভূম) শুকজোড়া গ্রামে পাঁঠা বলিদানের সঙ্গে সঙ্গে একটি মাটির ভাঁড় ভেঙ্গে ফেলা হয়। এটি বিছিন্ন একক ঘটনার নিদর্শন হলেও আদিম সমাজের কোনো না কোনো পর্যায়ের যাতুবিশ্বাস-এর মধ্যে নিহিত আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটি অভিনব তাণ্ডব বলিদানের প্রথা পাওয়া যায় বর্ধমান জেলার ভাতার থানায়, রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে। এই গ্রামে, একটি খুঁটায় একসঙ্গে নয়টি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, তারপর পাঁচ, তিন, দুই এবং একটি। এই ভয়াবহ বলিদান শেষ করে ঘাতক সংজ্ঞাহীন ভাবে লুটিয়ে পড়ে। এই বলিদান দেখবার জন্য বৈশাখী পূর্ণিমায় বেলা দুইটার সময় হাজার হাজার দর্শক সমবেত হয়। একটি কিংবদন্তী দিয়ে এই বলিদানকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু আসল বস্তুটি তলিয়ে গেছে তুচ্ছতার মধ্যে। তুচ্ছতাটুকু এই যে তপশীল জাতিরা (মুচি) এই দেবতার পূজা করে পৌষ সংক্রান্তির দিন। পৌষ সংক্রান্তিতে এবং পয়লা মাঘে রাঢ় অঞ্চলে হাজার হাজার লৌকিক দেবদেবীর পূজা এবং বলি হয়। নিঃসন্দেহে এই দেবদেবীগুলি ফসল ফলানো এবং শস্য কর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং ঐ তাণ্ডব বলিদানের রহস্য এখানেই নিহিত। মূল পুজা ব্রাহ্মণ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় সেইটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, "যে অজ শিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করা হয় সেটি প্রাচীন নরবলিরই আর্য ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর মাত্র" (বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃঃ ৫৮৬)। তাঁর এই মন্তব্য যথার্থ। প্রমাণস্বরূপ জেম্‌স্ ফ্রেজারের সংগ্রহ থেকে কয়েকটি কৌতুহলপ্রদ তথ্য এখানে দেওয়া গেল—রেড ইণ্ডিয়ানরা ফসল বুনবার সময় মানুষের রক্ত ও হৃৎপিণ্ড ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিত। ইকুয়েডরের অধিবাসীরা একশত শিশুকে প্রতি বৎসর মাঠে উৎসর্গ করত। মেক্সিকোতে ফসল কাটা পর্বের সময় এবং সূর্য বন্দনা কালে একজন মানুষকে দুটো পাথরে পিষে মারার রীতি ছিল। আফ্রিকার এক রাণীর আদেশে প্রতি বৎসর মার্চ মাসে একজন পুরুষ ও নারীকে কোদাল দিয়ে মেরে শস্য ক্ষেত্রের মাঝে পুঁতে দেওয়া হত। গায়েনার লাগোসে শস্য ক্ষেত্রে একজন যুবতীকে বসন্তকালে শূলে চড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেড়া ও ছাগল উৎসর্গ করা হত। বেচুয়ানাল্যাণ্ডেও উত্তম শস্যের জন্য নরহত্যার বিধি পালিত হত। ফিলিপাইন দ্বীপের মানুষরা ধান পোঁতার আগে নরহত্যা করত। লোহোটা নাগাদের মধ্যে রীতি ছিল এই যে উত্তম ফসলের জন্য একজন লোকের হাত, পা এবং মাথা শস্য ক্ষেত্রে কাটা হত। ভারতের গোণ্ডা উপজাতিরা ব্রাহ্মণ সন্তান চুরি করে হত্যা করত। ধান কাটা এবং ধান পোঁতার সময় শোভাযাত্রাসহ নিয়ে গিয়ে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে প্রথমে হত্যা করে তার রক্ত শস্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিত। ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা তাদের দেবতার উপাসনার সময় মানুষ বলি দিত। খোন্দ উপজাতিরা হলুদ চাষের সময় মাঠে নররক্ত ছড়িয়ে দিত। তাদের ধারণা ছিল যে নররক্ত না দিলে হলুদের যথাযথ বর্ণ পাওয়া যাবে না। চীনে শস্য ক্ষেত্রে জীবন্ত নরদেহ সারা শস্য ক্ষেত্রে টেনে বেড়ানোর নিয়ম ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জনতা যে যেমন পারত ছুরি দিয়ে মাংস কেটে নিয়ে নিজের নিজের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিত। এই রকম সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অনুন্নত

সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। আশা করি তুলনামূলক বিচারের জন্য এই কয়টি উদাহরণই

(চ) ধর্মঠাকুরের নামতত্ত্ব

রাঢ়ে পূজিত ধর্মঠাকুরের নানা সমস্যার সঙ্গে "ধর্ম" নামটিকে নিয়েও বহু গবেষণা হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গোলমেলে ও বিবদমান বস্তু হয়ে রয়েছে আজও।

ধর্মপূজা সম্পর্কে সবিস্তর প্রথম আলোচনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলে বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মপূজা এবং বুদ্ধদেবের অন্যতম নাম "ধর্মরাজ"—এই দুটি তথ্যের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। শাস্ত্রীমশাই-এর এই পথ অনুসরণ করে শূন্যপুরাণের সম্পাদকগণ ঐ মতের পোষকতা করেছেন। "ধর্মপূজা-বিধানে"র ভূমিকায় সম্পাদক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ তত্ত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতামত নিম্নরূপ—ধর্মরাজ হিন্দুর চারিবেদের বাইরে; ধর্মরাজ শূন্য মূর্তি; রামাই পণ্ডিতের বুদ্ধরূপে ভগবান বলে উল্লেখ, ত্রিরত্নের অন্যতম হলেন ধর্ম; ইত্যাদি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাছাড়া তিনি লিখেছেন, "বাঙ্গালা দেশেই অনার্য সঙ্গমে বুদ্ধদেবের চরম অধোগতি হয়। এইখানেই বুদ্ধদেব নৈরাত্মা দেবীর সহিত শূন্যে ঝাঁপ দিয়া করুণায় দ্রব হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ সনাতন ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহারা দল গ্রাস করিতে লাগিল। সত্য সত্যই এইবার বুদ্ধদেব শূন্যসাগরে ঝাঁপ দিলেন। তিনি কোথায় মিশিয়া গেলেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার করুণা রহিয়া গেল। শূন্যতা করুণাভিন্না-শূন্যতারও শেষ নাই, তাঁহার করুণারও শেষ নাই[৮৩]।"

ধর্মঠাকুরের পূজা যে একদা বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল তার প্রমাণ রাঢ় অঞ্চলে আজও পাওয়া যায়। বীরভূম অঞ্চলের কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করছি—

(ক) কুড়মিঠা (ইলামবাজার থানা), কেন্দ্রগড়িয়া, মামুদপুর (খয়রাশোল) প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে বৌদ্ধ স্তূপের অনুরূপ ধর্মপীঠ বর্তমান। তবে এগুলির বয়স খুব বেশী নয়।

(খ) কামারহাটি (ময়ূরেশ্বর থানা) গ্রামে ধর্মশিলার ভূপ্রোথিত অঙ্গে চারিটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি খোদাই করা আছে। (মূর্তিগুলি ২" পরিমাণ হবে, মাটি খুঁড়িয়ে দেখেছি।)

(গ) দাঁড়কা গ্রামের (লাবপুর থানা) বিবরণী থেকে জানা যায় যে সেখানে পূর্বে একটি বুদ্ধমূর্তি ধর্মঠাকুর বলে পূজিত হতেন। সেটিকে অপসারণ করে ধর্মশিলা স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) ভাণ্ডীরবন গ্রামে (সিউড়ী থানা) জানা যায় যে সেখানে পাঁচজন বৌদ্ধ স্তূপাধিকারী ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল চাঁদ রায়, কালা রায় প্রভৃতি। তাঁদেরই নামে ধর্মপূজা চলছে। বস্তুতঃ চাঁদ রায়, কালা রায় প্রভৃতি নামের ধর্মঠাকুর অজস্র বিদ্যমান।

(ঙ) গুলালগাছি (রাজনগর থানা) গ্রামে প্রবাদ আছে যে বুদ্ধদেব অথবা তাঁর কোনো অনুগত শিষ্য পাল্কীযোগে এতদঞ্চলে পরিভ্রমণ কালে তাঁর শিবিকাবাহকদের এক এক জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে যান। তারাই বিভিন্ন নামে ধর্মঠাকুর বলে পূজিত হচ্ছেন।

(চ) বুদ্ধ পূর্ণিমাতে রাঢ়ের অধিকাংশ স্থানেই ধর্মপূজা হয়ে থাকে। সুতরাং এটিও বৌদ্ধ প্রভাব বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। অবশ্য বুদ্ধ পূর্ণিমায় অন্য দেবদেবীর পূজাও হয়। হাওড়ার আমতায় মালাই চণ্ডীর পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়।

কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠান তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করলে সম্পূর্ণ বৌদ্ধ পূজা বলে মনে করার কোনো কারণ থাকে না। "ধর্মপূজাবিধান" বইটি অতি অর্বাচীন এবং অপ্রামাণিক। ওটির উপর কোনোদিক থেকেই নির্ভর করা চলে না। প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে রাঢ় অঞ্চলে এককালে বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। তারই ছিটেফোঁটা ছাপ রেখে গেছে ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠানে। ধর্মঠাকুরই যে বুদ্ধদেব, তা কোনো মতেই প্রমাণ করা চলে না। "ধর্ম" নামের অন্য ব্যাখ্যা খোঁজা দরকার। এ সম্পর্কে আগে কে কি বলেছেন তা উল্লেখ করছি—

যম ও ধর্ম : ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যমরাজা কম সম্পর্কশূন্য নন। মহাভারতে যমকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে। ধর্মঠাকুর ও মনসার সম্পর্কে ঋগ্বেদের যম-যমীর প্রভাব আছে। ধর্মের সঙ্গে যমের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও আলোচনা করেছেন[৮৪]। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ্য দত্ত সম্পাদিত গিলগিট পুঁথিতে (ষষ্ঠ শতাব্দী) পাই 'যমস্য ধর্ম-রাজস্য' 'যমোঽপি ধর্মরাজ'। ধর্মরাজ নামের সূত্র এবং তাঁর গ্রাম দেবত্বের ইঙ্গিত রয়েছে, ঋগ্বেদের একছত্রে। ধর্ম হয়েছেন গ্রামবাসীর রাজা। 'ধর্মাভুবদ বৃজনস্য রাজা'[৮৫]।"

রাঢ় অঞ্চলে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায় বহু জায়গায় (যেমন সিউড়ী থানায়, ইন্দ্রগাছা, ছোড়া, ভগবানবাটি ; সাঁইথিয়া থানায়, অজয়কোপা ; বোলপুর থানায়, সুপুর, মীর্জাপুর, রজতপুর এবং বর্ধমানে রামচন্দ্রপুর গ্রামে) ধর্মঠাকুরকে যমের ধ্যানে, যমদেবতা মনে করে পূজা করা হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পূজারী ব্রাহ্মণ। পুরোহিত দর্পণে ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি নেই এবং ধর্মপূজাবিধান গ্রন্থও সাধারণ্যে প্রচলিত নেই। সেকারণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পক্ষে ধর্মরাজকে যমরাজা বলে পূজা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তপশীল সম্প্রদায়, যারা এই পূজাটিকে বয়ে নিয়ে আসছে, তারা কোনোদিনই ধর্মকে যম বলে মনে করে না। ঋগ্বেদের পুর্বোক্ত শ্লোকে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে নিশ্চিত কোনো গোলমাল আছে। কারণ গ্রামীন জনসাধারণের মধ্যে ঋগ্বেদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মপূজার ধারা-বাহিক কোনো ঐতিহাসিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আসল কথা হল, "ধর্ম" নামটিই যত গোলমালের মূল। এই সর্বজনীন অতি পরিচিত ও অতি ব্যবহৃত নামটি ধরে সূত্র সন্ধান করা দুষ্কর। অধ্যাপক ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "দাক্ষিণাত্যে, ধর্মরাজ হলেন যুধিষ্ঠির[৮৬]।" বসন্ত রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (জাল) ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় লিখেছেন, "শতপথ ব্রাহ্মণের যুগে "ধর্ম" শব্দ ব্যক্তিত্ববাচক এবং দেবতাবাচক হইয়াছে। ধর্মদেবতার আসন দেবগণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। কৃষিপ্রধান আর্যগণের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র। সেই ইন্দ্র দেবতা ধর্ম দেবতায় বিলীন হইলেন। ইনি আবার জলদেবতারূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে জল বা বৃষ্টি জলকেই ধর্ম বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

অপর এক ধর্ম ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ হইতে উদ্ভূত। ইঁহার তিন পুত্র শম, কাম ও হর্ষ। পৌরাণিক যুগে ধর্ম বহুস্থানে বহু অর্থে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।...অন্যত্র ধর্ম প্রজাপতি এবং দক্ষ জামাতা। অপর এক ধর্ম ঘৃত নামক পুত্রের পিতা এবং অণু নামক পিতার সন্তান। আর এক ধর্ম হৈহয় বংশীয় নেত্রের পিতা। বিদুরও ধর্মপুত্র। ইহা ছাড়া বহু স্থানে ধর্ম নামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে।...মহাভারতের উদ্যোগপর্বে আর এক অজ্ঞাত ধর্মদেবতাকে দেখিতে পাই। এই ধর্ম-দেবতার সহিত গালব ঋষির সম্পর্ক আছে।"

ধর্মঠাকুর কমঠাসুরও, উপরন্তু দেখা যায় একাধিক জিন গুরুর নাম ধর্মনাথ এবং আর্য ধর্মে কাশ্যপ গোত্রে।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ করে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত বাঙ্গালীর ধর্মঘট ব্রত করার বিধান আছে। প্রতিদিন এক একটি জলপূর্ণ ঘট ব্রতকারিণী রমণী ব্রাহ্মণকে দান করে থাকেন[৮৭]।

সূর্যের চারিদিকে নানা রঙের যে চক্র সৃষ্টি হয়ে থাকে তার নাম ধর্মসভা। কারণ সূর্যকে ধর্ম মনে করা হয়। এখন দেখা যাক আর্যেতর ভাষায় ও সংস্কৃতিতে "ধর্ম" শব্দটি পাওয়া যায় কি না। মুণ্ডাদের মধ্যে ধর্মদেবতাকে ঈশ্বর মনে করা হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কূর্মবাচক কোনো অষ্ট্রিক শব্দ "দড়ম" থেকে "ধর্ম" শব্দটি এসে থাকবে[৮৮]। কিন্তু ঠিক এরকম শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় নি। মুণ্ডারি ভাষায় "হারো" হল কাছিমের নাম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য "ডোমরায়" শব্দ থেকে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হতে পারে বলে অনুমান করেছেন[৮৯]। বিচার বিশ্লেষণ করলে এটিকে গ্রাহ্য করা চলে না। পুরাতাত্ত্বিক শ্রীসুধাংশু কুমার রায় মিশরীয় ভাষা "দো-অহোম-রা" থেকে ধর্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন[৯০]।

ভাববাদী তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে ধর্মঠাকুরের নামরহস্য কোনোদিনই পরিষ্কার হবে না। সেকারণে মনে হয় আচার্য সুনীতিকুমার এবং শ্রীসুধাংশু রায়ের অভিমত অনেকটা বাস্তব ঘেঁষা। আমি অষ্ট্রিক ভাষার মধ্যে একটি শব্দের সন্ধান পেয়েছি যা এই মতের পোষকতা করে। শব্দটি হল Dharam dak (দরম দাঃ)। এর অর্থ, সাঁওতালি ভাষায়, বরযাত্রীদের নিয়ে আসা অথবা বিবাহের অনুষ্ঠান বিশেষ। ধর্মঠাকুরের সংস্কৃতিতে পাওয়া যায় শিব অথবা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে নীলাবতীর বিয়ের কথা। গাজনে এ অনুষ্ঠান বহু জায়গায় আজও পালিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটিকে ভাষার বিচারে সাঁওতালি শব্দের অনুপ্রবেশ বলে অনুমান করা যেতে পারে। (ধর্মঠাকুরের গাজনে "ধর্মডাক" বা জাঁক বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে।) আবার করম শব্দটি থেকে ধরম<ধর্ম শব্দটি আসতে পারে। হেমন্তকালে সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের মধ্যে করম পরব অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দী ভাষায় "শ্রীকর্মা একাদশী ব্রতকথা"-ও পাওয়া যায়। এই ব্রতকথা হিন্দুদের সাধারণ ব্রতেরই অনুরূপ। আদিবাসীদের মধ্যে করম পর্বের আদিরূপের যা পরিচয় মেলে তা ধর্মঠাকুরের গাজন অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষের সঙ্গে মিল রাখে। পর্বটি এই—পুরুষরা অন্ধকার রাত্রে করম গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে গ্রামের

রাস্তায় পুঁতে ভোর বেলা পর্যন্ত সেখানে নাচগান করে। তারপর করম গাছটি জলে ফেলে দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের গাজন অনুষ্ঠানেও রাত্রিবেলা বাবলা বা গামার গাছের ডাল অথবা ঝাড়ের বাঁশ জাগানো এবং কেটে আনার রীতি আছে। চড়কগাছ পুঁতে নৃত্য গীত করার পর সেটিকে জলে নিক্ষেপ করা হয়।

সিউড়ী থানায় বোলপুরের পথে দশম মাইলে সেকমপুর নামে একটি সাঁওতাল পল্লী আছে। (সেকম অর্থে পাতা)। এখানে ধর্মঠাকুরের পূজারী বা দেয়াশীকে এরা বলে "মাঝি দড়ম"। এই ধর্মস্থানেই বিবাহের সময় "দরম ডাক" হয়। বর কনে, বরযাত্রীরা যাওয়া আসার আগে এখানে অভ্যর্থনা লাভ করে ও গুড়-জল খায়। বলা যায় না আচার্য সুনীতি কুমারের "দড়ম" এইখান থেকেই পাওয়া গেল কি না[৯১]।

তাহলে বলতে পারি যে আদিম মানুষের যাদুবিশ্বাস ও বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি যদি ধর্মের গাজনের মধ্যে টিঁকে থাকে, তবে শুধুমাত্র "ধর্ম" নামটি আর্যধর্ম থেকে আসবে কেন? খুবই সঙ্গত কারণে ধর্ম নামটি কোনো অবৈদিক শব্দের পরিবর্তিত রূপ। আর্য শব্দই যদি হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হস্তক্ষেপের দরুণ প্রক্ষেপ ঘটেছে ধরতে হবে।

ধর্মঠাকুরের স্থানীয় নাম

ধর্মঠাকুরের নাম স্থান বিশেষে এক একরকম। এ পর্যন্ত অনেকগুলি নাম প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি উল্লেখ করছি। বসন্ত রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল অপ্রমাণিক গ্রন্থ। কিন্তু উক্ত পুস্তকের মধ্যে আমরা ৫২টি ধর্মশিলার নাম ও রূপ বর্ণনা পাই—(১) যাত্রাসিদ্ধি (২) স্বরূপনারায়ণ (৩) ক্ষুদিরায় (৪) জগৎরায় (৫) কৌতুকরায় (৬) বুদ্ধরায় (৭) রাজা সাহেব (৮) সুন্দর রায় (৯) দলু রায় (১০) কালু রায় (১১) শ্যাম রায় (১২) খেলা রায় (১৩) দলমাদল (১৪) বংশীধারী (১৫) লক্ষ্মীনাথ (১৬) শঙ্খাসুর (৯৭) মোহন রায় (১৮) লক্ষ্মী-নারায়ণ (১৯) শীতল সিংহ (২০) গন্ধরায় (২১) মনোহর রায় (২২) শীতল নারায়ণ (২৩) রাজেশ্বর (২৪) ধিয়ান রায় (২৫) ফতু সিংহ (২৬) চন্দ্ররায় (২৭) বাঁকুড়া রায় (২৮) কালস্বর্ণশিলা (২৯) কর্কট বৃশ্চিক (৩০) রাম রায় (৩১) চূড়ামণি (৩২) রণজয় (৩৩) নারায়ণ রায় (৩৩) ব্রাহ্মণ নাথ (৩৫) নবযৌবনচক্রশিলা (৩৬) নিমিক নাথ (৩৭) ঝগড় রায় (৩৮) কালসার (৩৯) সর্বেশ্বর (৪০) আঁধার কলি (৪১) দেবেশ্বর (৪২) শীতলনাথ (৪৩) মদনরায় (৪৪) রসিক রায় (৪৫) গঙ্গাধর (৪৬) সিদ্ধিরায় (৪৭) কালাচাঁদ (৪৮) রূপরায় (৪৯) দশন রায় (৫০) পরম নাথ (৫১) অনন্ত রায় (৫২) ঝর্ঝরী রায়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে অধিকাংশ নামই বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত। শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-এ-এস, নবজীবন, রণ্টক রায় ও পঞ্চানন নামে তিনটি ধর্মশিলার উল্লেখ করেছেন[৯২]। অধ্যাপক ক্ষিতিশ প্রসাদ, বৃহদ্ধাক্ষ নামে একটি ধর্মশিলার উল্লেখ করেছেন। এটিও বাঁকুড়ায়[৯৩]।

বীরভূম ও আশপাশ স্থান থেকে যে সকল ধর্মশিলার নাম সংগ্রহ করেছি, তা এই রকম—(১) অনাদি নাথ (২) আউলা ধরম (৩) আদিড়ে ধরম (৪) আদিরাক্ষ্য (৫) আষিড়ে

ধরম (৬) এলো রায় (৭) কটা রায় ও কট রায় (৮) কণ্ঠ রায় (৯) কাণারায় (১০) কামার বুড়ো রায় (১১) কালা রায় ও কেলে রায় (১২) কালুরায় (১৩) কাঁটা রায় (১৪) কেদার রায় (১৫) কোদালে কাটা (১৬) কোঁড়া পাড়ার ধরম (১৭) কূর্মদেব (১৮) খণ্ডরায় (১৯) খোঁড়া রায় (২০) খুজুটেশ্বর (২১) খেলা রায় (২২) খেলারাম (২৩) গিরিধরম (২৪) চাঁদ রায় (২৫) চন্দ্রেশ্বর (২৬) ছেলে ধরম (২৭) জুবুটেশ্বর (২৮) তুলোরায় (২৯) দর্পনারায়ণ (৩০) দামোদর রায় (৩১) দুধকমল (৩২) ধর্মরায় (৩৩) ধরম (৩৪) ধরমশিলা (৩৫) নীল রায় (৩৬) নীলকণ্ঠ (৩৭) পঞ্চানন (৩৮) পঞ্চারায় (৩৯) পাদুকা রায় (৪০) পোড়া রায় (৪১) পুরন্দর (৪২) পৈঠদেব (৪৩) পচা ধরম (৪৪) ফটিক রায় (৪৫) ফুলচাঁদ (৪৬) বাঘরায় (৪৭) বাংড়ো রায় (৪৮) বুড়ো ঠাকুর (৪৯) বৃদ্ধরায় (৫০) বুড়ো রায় (৫১) বালক রায় (৫২) বিজলী রায় (৫৩) বহড়া ডিহি ধর্মরাজ (৫৪) বিধায়ক রাজ (৫৫) বাঁকড়ো রায় (৫৬) বাথান রায় (৫৭) বাঁকা রায় (৫৮) বাঁকা শ্যাম (৫৯) বিনোদ রায় (৬০) বেণুদেব (৬১) ভুলো রায় (৬২) মনোহর রায় (৬৩) মানিকলাল (৬৪) ময়না রায় (৬৫) মেঘ রায় (৬৬) মৎস্য রাজ (৬৭) রঘুনাথ (৬৮) রাজরাজ্যেশ্বর (৬৯) রামঘুঘু (৭০) রসিক রায় (৭১) লীলা রায় (৭২) লীলা ধরম (৭৩) লালচাঁদ (৭৪) হাতি রায় (৭৫) শিরে ধর্মরাজ (৭৬) শ্বেতচাঁদ (৭৭) শ্যামরায় (৭৮) শ্রীধর রায় (৭৯) সিঁদুর রায় (৮০) সুন্দর রায় (৮১) সিন্ধু রায় (৮২) সুগণ রায় (৮৩) সুহ্মরায় (৮৪) সুচাঁদ (৮৫) সেঙ্গুরাজ (৮৬) সোন্দল রাজ (৮৭) সিদ্ধেশ্বর (৮৮) স্বরূপনারায়ণ (৮৯) শশী রায় (৯০) গরীব রায় (৯১) চম্পক রায়।

এই নামগুলির উৎপত্তি রহস্য নির্ণয় করতে গেলে আমাদের সামাজিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করা দরকার। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে এটুকু বলা যায় যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভাব এগুলির মধ্যে রয়েছে। স্থানীয় মাহাত্ম্য ও বিখ্যাত ব্যক্তির স্মরণার্থেও কিছু নামকরণ করা হয়েছে। যেমন চাঁদ রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেদার রায় নাম। বারো ভুঁইয়া, চাঁদ-কেদারকে স্মরণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কেদার নামে একটা জাতি আছে। তারা শোলাঙ্কি (হাড়ি)। কৌটিল্যে আছে কেদার ক্ষেত্র অর্থ, আনূপভূমি (জলা)। সেই জলাভূমিরও দেবতা হতে পারেন। (সাঁওতালি ভাষায়, কেদার মানে চারাগাছ। আদিম বৃক্ষপূজার ইঙ্গিত বর্তমান থাকাও অসম্ভব নয়।)

সুপুরের সুহ্ম রায় প্রাচীন সুহ্মদেশের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও গরুড় পুরাণে অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম, এই পঞ্চপ্রদেশের নামোল্লেখ আছে।

কতকগুলি নামকরণ যে আনুষ্ঠানিক নাম নয় তা সহজেই বোঝা যায়। যেমন কোদালে কাটা, কোঁড়াপাড়ার ধরম, আদিড়ে ধরম, আষিড়ে ধরম, ছেলে ধরম ইত্যাদি। কিছু নাম লোকশ্রুতির ফলে উদ্ভূত। যেমন "রামঘুঘু" নামে ধর্মরাজ। এই নাম কিভাবে সৃষ্ট হয়েছে হদিস করা শক্ত। তবে "ধর্মপুজাবিধানে" "রাম ঘুড়াইত" নামে একটি শব্দ-ব্রহ্ম বিরাজ করছে। সেটিরও অর্থ রহস্যাবৃত। তাছাড়া কিছু নাম পাওয়া গেছে যা আর্যভাষা বহির্ভূত শব্দ বলে মনে হয় যেমন, সেঙ্গু (রাজ), বাংড়ো (রায়) ইত্যাদি। মৎস্যদেব নামে একটি ধর্মশিলার উল্লেখ করেছি। কিন্তু ঐ শিলার আকৃতি মৎস্যতুল্য নয়। তাহলে মৎস্যদেব নামকরণ হল

কেন? মৎস্য সম্পর্কে অদ্ভুত বিশ্বাস ও ক্রিয়াকাণ্ড পৃথিবী জুড়ে আদিম মানুষের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং আছে। পেরুর আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে জগতে প্রথম মাছই সৃষ্টি হয়েছিল। মাছকে দেবতা হিসাবে গণ্য করার রীতি বহু অনগ্রসর জাতির মধ্যেই আছে। মৎস্যপুজার উদ্দেশ্য একটিই, তা হল 'ফার্টিলিটি কাল্ট'। ভারতেও মৎস্য নিয়ে বহু প্রকার লোকবিশ্বাস আছে। পুরাণ বা তন্ত্রে মৎস্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এত গভীর তত্ত্বে প্রবেশের দরকার নেই। কারণ মালাবেড়িয়া (সাঁইথিয়া থানা) গ্রামে প্রাপ্ত ঐ ধর্মশিলার সঙ্গে রয়েছেন পৈঠদেব, বেণুদেব, কূর্মদেব, আরো অনেকে। সোজা বিচারে ঘাটের পৈঠা থেকে পৈঠদেব, শ্রীকৃষ্ণের বংশী থেকে বেণুদেব এবং মৎস্য ও কূর্মদেব, মৎস্যাবতার ও কূর্মাবতারকে স্মরণ করে রাখা হয়েছে বলেই ধরা উচিত। এই দৃষ্টান্তগুলি ধর্মপুজার বিবর্তনে বৈষ্ণব প্রভাব আরোপের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(গ) ধর্মঠাকুরের বাহন প্রসঙ্গে

হিন্দুদের পূজিত দেবদেবীর মূর্তি সংস্থাপনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাহনের পরিকল্পনা। বাহন ছাড়া কোনো দেবতা অসম্পূর্ণ। এখানে রাঢ় অঞ্চলের বিশিষ্ট গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুরের বাহন সংক্রান্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব—

ধর্মঠাকুরের বাহন সাধারণতঃ ঘোড়া। অথচ ধর্মপুরাণে উলূককে ধর্মের বাহন বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই উক্তির কোনো প্রামাণিকতা নেই। লৌকিক দেবতার বাহন সৃষ্টি করা হয়েছে অশিক্ষিত লোকদের দ্বারা। তাই ধর্মঠাকুরের বাহন ঘোড়া কিভাবে এবং কখন হল তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে ধর্মের বাহন বলতে প্রধানতঃ ঘোড়াকেই পাই। হাতিও আছে। তেমনি হাতি রায় নামে ধর্মঠাকুরও আছেন। মাটির ও কাঠের বিভিন্ন আকৃতির ঘোড়া নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড বা বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ধর্মঠাকুর ছাড়া অন্যান্য গ্রাম্য দেবদেবীর স্থানে মাটির ঘোড়া মানত করা হয় কিন্তু বিভিন্ন আকৃতির ঘোড়াকে সম্বল করে ক্রিয়াকাণ্ডের বৈচিত্র্য একমাত্র ধর্মঠাকুর ছাড়া আর কোনো দেবতার নেই। শিবের গাজনে ঘোড়া ব্যবহার হয় না। এইখানেই শিবের গাজনের সঙ্গে ধর্মগাজনের বড় রকমের পার্থক্য। সাধারণ লোকবিশ্বাস এই যে ধর্মঠাকুর সাদা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান। কেউ আবার মনে করেন ঘোড়া মানত করলে শিশুপুত্র ঘোড়ার মত খট্ খট্ করে চলে বেড়াবে। দাক্ষিণাত্যেও ধর্মঠাকুরের মত ঘোড়া-বাহন এক দেবতার পরিচয় পাই Rev. Whitehead-এর রচনায়। তিনি লিখেছেন—"The deity that is most Universally worshipped among the Tamils is Iyner, who is regarded as watchman of the Village and is supposed to patrol it every night, mounted on a ghostly steed, a terrible sight to behold scaring away the evil spirits....His shrines may be known by the clay or concreet figures of horses ranged either side of the image....The horses are offered by devotees and represent the steeds

on which he rides in his nightly rounds." এর থেকে বোঝা যায় ঘোড়া সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় লোকবিশ্বাস বিশেষ একটি স্তরে বিরাজ করছে। বীরভূমে নান্নুর থানার খুজুটিপাড়া গ্রামের ধর্মের পুরোহিতের কাছ থেকে একটি তত্ত্ব সংগ্রহ করেছি, তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"ধর্মঠাকুর শ্বেত অশ্বে বিচরণ করেন। কৌমুদীস্নাত শুভ্র রজনীতে পূজা। মানসিক যাঁরা করেন তাঁরা শ্বেতবর্ণের ছাগ সংগ্রহ করে আনেন। কেকানিনাদের সঙ্গে শ্বেতবর্ণের পালক আন্দোলিত হয়। বাইরের এই দৃশ্যে অন্তরেও অনুভূতি আসে ঠাকুরের শুভ্র শ্বেত নির্মলরূপের।" ঐ থানার অন্তর্গত ব্যাঙচাতরা গ্রামে একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। সেটি এই রকম—কোনো এক দেয়াশীপুত্রের কুষ্ঠব্যাধি হয়। তার যন্ত্রণা দেখে দেয়াশী ধর্মঠাকুরের কাছে রাতদিন প্রার্থনা জানাতে থাকেন। একদিন স্বপ্নাদেশ হল, পুর্ণিমার রাত্রে চৌমাথায় ব্যাধিগ্রস্তকে প্রতীক্ষা করতে হবে সজাগ থেকে। দেবতা ঔষধ দিয়ে যাবেন। কথিত রাত্রে, নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমান ব্যক্তির দিকে শ্বেতশুভ্র তুরঙ্গ পৃষ্ঠে এক আলোকমূর্তি ধাবিত হচ্ছে দেখে সে সভয়ে পলায়ন করে। তার পরদিন স্বপ্নে দেয়াশীকে ধর্মঠাকুর জানান, "তোর ছেলের রোগ ভাল হবে না।" (এই প্রবাদটির মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে তেমাথা, চৌমাথার মোড়ে রাত্রিবেলা, দোষ ছাড়ানোর যাদুবিশ্বাসও এর মধ্যে বর্তমান। বলাবাহুল্য এই বিশ্বাস আমরা আদিবাসীদের কাছে পেয়েছি।) এখন বীরভূম অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের বাহন ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত কিছু উদাহরণ তুলে দেওয়া গেল—

সিউড়ী থানায় ইন্দ্রগাছা গ্রামে ষষ্ঠীতলায় ধর্মের ঘোড়া নিক্ষেপ করে পরবছর পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে অপর একটি কাঠের ঘোড়া এনে পুজা করা হয়। কালিপুর ও করিধ্যা গ্রামের মালপাড়ায় ধর্মঠাকুরকে একটি কাঠের হাতির পিঠে চড়িয়ে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। ইন্দ্রগাছা গ্রামে কাঠের ঘোড়া কাঁধে ধর্মপুজার সময় দেয়াশী ভক্ত্যাদের বুকে পা রেখে হাঁটেন। সাঁইথিয়ায় ফলভাঙ্গা অনুষ্ঠানের সময় কাঠের ঘোড়া সঙ্গে নেওয়া হয়। মহম্মদবাজার থানায় সুগুণপুর গ্রামেও তাই। সাঁইথিয়া থানায় মালাবেড়িয়া গ্রামে আখ পেষণের শালে কাঠের ঘোড়া নিয়ে ধর্মঠাকুরের পুজা হয় এবং যতদিন আখ পেষণ চলে ততদিন ঐ ধর্মরূপী ঘোড়াটি আখের শালে অথবা আখবাড়ীতে অবস্থান করে। তাছাড়া সকল গ্রামেই আখের শালে মাটির ঘোড়া রেখে পুজা করা এবং আখের রস ও গুড় ঢালা হয়। সিউড়ী থানায় মল্লিকপুর গ্রামে ধর্মপুজার দ্বিতীয় দিনে (পুর্ণিমা) একটি ছোট মাটির ঘোড়া ও মদের ভাঁড়াল নিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরায়। তৃতীয় দিনেও ভক্ত্যারা ঘোড়া নিয়ে স্নান করে আসে। শ্রীকণ্ঠপুর গ্রামে পুজার পরদিন ধর্মঘোড়াকে প্রতি ঘরে ঘরে বাদ্যসহ নিয়ে যাওয়া হয়। বেলিয়া (সাঁইথিয়া), বড়রা (খয়রাশোল) প্রভৃতি গ্রামে চড়কের দিন কাঠের ঘোড়ার পিঠে ধর্মঠাকুরকে নাচানো হয়। ইলামবাজার থানায় ঘুরিষা গ্রামে তিনটি ধর্মস্থানে কতকগুলি মাটি ও কাঠের হাতি ঘোড়া আছে। লাউসেনের সিদ্ধিলাভের স্থান বলে খ্যাত বারুইপুর ও নিকটবর্তী পায়ের এবং দেবীপুরের ধর্মস্থানে পাঁচ ফুট উঁচু কাঠের ঘোড়া বর্তমান। এতবড় কাঠের ঘোড়া বীরভূম অঞ্চলে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। (বর্ধমানে অনেক আছে)। পায়ের গ্রামের ঘোড়াটির আকৃতি টিক্-

টিকির মত অদ্ভুত ধরণের। ঐ গ্রামের ধর্মস্থানে মাটির ছোট হাতিও আছে। ময়ূরেশ্বর থানার রাতমা গ্রামে দেয়াশী ধর্মশিলা স্কন্ধে ও অন্যান্য ভক্ত্যারা অসংখ্য কাঠের ঘোড়া কাঁধে নিয়ে মুক্তস্নান করতে যায়। বহু জায়গায় ধর্মপুজায় ঘোড়ার সাজ পরে ঘোড়া-নাচও হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সাঁওতালদের বিবাহ উৎসবে অনুরূপ ঘোড়ার সাজ পরে নৃত্য করার প্রথা আছে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের মত দিয়ে প্রতিপন্ন করা যায় যে হস্তীকে বাহনরূপে ব্যবহার করা হয়, ঘোড়ার বিকল্পে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বাহন হস্তী। ঋগ্বেদে (৮।২৭।২) বিশ্বকর্মা ইন্দ্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১০৭।১১) সূর্য, শুক্ল যজুর্বেদে (১২।৬১) প্রজাপতি, শিব ও লিঙ্গ পুরাণে বিষ্ণুরূপে কথিত। ঋগ্বেদে (১০।৮১-৮২) বিশ্বকর্মাকে ভুবনের পুত্রও বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের (৮-৩৩-৮) শ্লোকে হস্তী ও ইন্দ্রকে অভিন্ন রূপেও দেখানো আছে।

এখন ঘোড়ার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে ঘোড়ার ব্যবহার ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ "ভারতের জাতি পরিচয়" পুস্তিকায় লিখেছেন, "নর্ডিক জাতি বোধ হয় ঘোড়া ও লোহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়।" আর্যভাবনায় ঘোড়া নিয়ে যে সকল কৃত্য আছে তা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা-অশ্বের কথা সুবিদিত। সূর্যের সপ্তাশ্ব বাহিত রথও সুপরিচিত তথ্য। সূর্যমন্দির গাত্রে সূর্যমূর্তির পাদদেশে ঘোড়ার মূর্তি খোদাই-এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৭-৭৭-৩) সূর্যকেই অশ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (ধর্মঠাকুরকে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখানো হয়ে থাকে সে কথা স্মর্তব্য) আবার বিষ্ণুর নব্বুইটি ঘোড়া। তার প্রত্যেকের চারিটি করে ভিন্ন ভিন্ন নাম। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য "বৈদিক দেবতা" পুস্তিকায় বলেছেন, "এর দ্বারা সম্ভবতঃ বৎসরের তিনশ যাট দিন ও চারটি প্রধান ঋতুকে বোঝানো হয়েছে।" পৌরাণিক যুগের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আমরা জানি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (অধ্যক্ষ প্রচার অধ্যায়) অশ্বের নিয়মিত স্নান, গন্ধমাল্য প্রদান, কৃষ্ণপক্ষে ভূতবলি, শুক্লপক্ষে স্বস্তিবাচন এবং আশ্বিন মাসের নবম দিনে নীরাজনা ও আরত্রিকের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে আর্যভাবনায় অশ্ব একটি বিশিষ্ট মর্যাদার স্থান অধিকার করেছিল।

আদিম অনুন্নত স্তরের মানুষের বস্তুতান্ত্রিক ভাবনার কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

ধর্মঠাকুর একাধারে শস্য তথা বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে পুজিত দেবতা এবং কতকগুলি যাদুবিশ্বাসের ভিতর দিয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের রূপলাভ করেছেন। সুতরাং অনুন্নত কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের ভাবনা এখানে তুলনামূলক ভাবে বিচার করা দরকার। প্রথম হল, ধর্মঠাকুরের কাছে মাটির ঘোড়া মানত করা। ঘোড়া বাহন এবং ঘোড়া মানত দুটি স্বতন্ত্র জিনিষ বলে আমার বিশ্বাস। দুটিকে এক করলে কোনোমতেই চলবে না। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "লোকায়ত দর্শনে" লিখেছেন, "গ্রীসে গোরু, ভেড়ার রোগ হলে চাষীরা মাটির

ষাঁড় গড়ে মন্দিরে দিয়ে আসত। দেবী ডিমিটর যাতে মাটির ষাঁড় পেয়ে আসল ষাঁড়কে বাঁচিয়ে দেন। এর মূলে আছে আদিম পর্যায়ের এক জাতীয় যাদুবিশ্বাস।" আমরা স্বচ্ছন্দে ধর্মঠাকুরের কাছে ঘোড়া মানতের সঙ্গে এটির তুলনা করতে পারি। শুধু ধর্মঠাকুর নয়, যাবতীয় লৌকিক দেবদেবীর কাছে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকরা মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করে মানত রাখে। মুসলমান সম্প্রদায়ও পীর-স্থানে এই রকম মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করে। বলা বাহুল্য ধর্মঠাকুরের অনুকরণে এই রকম বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের "ঘোড়া" উপাধিও আছে। এটি টোটেম বিশ্বাসের পরিণতি কিনা বলা শক্ত।

প্রাচীন গ্রীস সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে রথসহ চারিটি ঘোড়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করত। স্পার্টা পারস্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি দেশ ঘোড়া উৎসর্গের রীতি পালন করত। জেমস ফ্রেজার ঘোড়া সম্পর্কে কতকগুলি আশ্চর্যজনক তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিছু অংশ উল্লেখ করছি—

Kalw এবং stuttgart-এ বাতাসে শস্য দুলতে থাকলে বলা হত, ঐ ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। Hertfordshire-এ শস্য কর্তনের পর একটি অনুষ্ঠান হয়। তার নাম Crying of Mare। মাঠের প্রান্তে কতকগুলি শস্যের পাতা একত্র বেঁধে বলা হয় Mare। দূর থেকে কাস্তে ছুঁড়ে সেটিকে কেটে ফেলার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। Lille-র লোকেরা যখন কোনো ফসল কর্তনকারী শ্রান্ত হয়ে পড়ে, বলে, He has the fatigue of the Horse. The first sheaf called the, "cross of the Horse", is placed on a cross of boxwood in the barn and the youngest horse on the farm must tread on it. The reapers dance round the best blades of the corn crying, "See the remains of the Horse." ফ্রেজারের মতে Aricia-র প্রাচীন রাজদেবতা Virbius ঘোড়া দ্বারা হত হয়েছিলেন বলে ঘোড়াকে শস্যের অপদেবতা মনে করা হয়। এজন্য একটি ঘোড়াকে প্রতি বৎসর কবরখানায় নিয়ে গিয়ে Virbius-এর প্রতীক মনে করে বধ করা হত। প্রাচীন রোমে রথের দৌড় হত ১৫ই অক্টোবর। বিজেতা রথের ডানদিকের ঘোড়াটিকে Mars দেবতার কাছে বলি দেবার নিয়ম ছিল। বলির পর ঘোড়ার লেজ এবং রক্ত রাজ-প্রাসাদের একটি কক্ষে রক্ষা করা হত। ফ্রেজার আরও বলেছেন: "The horse would represent the fructifying spirit both of the tree and of the corn for the two ideas melt into each other, as we see in customs like the Harvest May."

তাহলে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ঘোড়ার সম্পর্কের প্রকৃত তাৎপর্য কি দাঁড়াল! প্রকৃতপক্ষে এর তাৎপর্য উদ্ধার করা আপাততঃ সম্ভব নয়। আদিম সমাজে যাদুকার্যের জন্য ব্যবহৃত sun-stone বিবর্তনের মাধ্যমে, আর্যভাবনায় পরবর্তীকালে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন এক দেবতারূপে প্রতিপন্ন করার দরুণ ঘোড়া বাহন এবং তার থেকে ঘোড়া মানত করার রীতি প্রচলিত হতে পারে; আবার অনুন্নত সমাজের টোটেমবিশ্বাস বা কৃষিভিত্তিক কোনো যাদুবিশ্বাস হওয়াও

অসম্ভব নয়। তবে অশ্বের ঐতিহ্য ভারতে সুপ্রাচীন নয় বলে পণ্ডিতরা যখন সিদ্ধান্ত করেছেন তখন সূর্য-অশ্ব সম্পর্কিত আর্যভাবনাই ধর্মঠাকুরের ঘোড়ার মধ্যে এসে স্থানলাভ করেছে বলে ধরে রাখতে হবে।

(ত) ধর্মঠাকুর ও বেতের ছড়ি

বেতের ছড়ির সঙ্গে ধর্মঠাকুর সম্পর্ক আছে শুনলে আশ্চর্য লাগবে। কিন্তু শুধু ধর্মঠাকুরই নন, শিবঠাকুরের সঙ্গেও বেতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ধর্ম এবং শিবের গাজনে ভক্ত্যারা একগাছা করে বেতের ছড়ি ধারণ করে। প্রায় প্রত্যেক ধর্মপূজাস্থানে ধর্মশিলার সঙ্গে একগাছা লতানে বেত পরিদৃষ্ট হয়। ধর্মঠাকুরের গাজনে রাত্রিবেলা ঢাক ঢোল শিঙ্গা সহ যে শোভাযাত্রা বের হয় সেই সময় ভক্ত্যারা বেতের ছড়ি ধারণ করে চীৎকার করে ধর্মরাজের নাম উচ্চারণ করে এবং ছুটে বেড়ায়। বেতের ছড়ি ধারণের উদ্দেশ্য কি তা সবাই ভুলে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় অবশ্য বলা হয়, এর জন্য কেউ বাণ মারতে পারবে না। হঠাৎ কে এবং কাকে বাণ মারবে তার কোনো সদুত্তর মেলে না। এখন এই বেত্রধারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুঁথিপত্তরের তত্ত্ব থেকে কিছুই উদ্ধার হয় না। যেমন ধর্মপূজা বিধানে বেত্র সম্পর্কে একটি শ্লোক আছে—

> ভূমৌ বিন্দুঃ পতংস্তত্র বেত্রবৃক্ষসমুদ্ভবঃ
> ক্রমে তিষ্ঠন্তি বেত্রে চ ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। (পৃষ্ঠা—২০)

বলা বাহুল্য, এই ভাববাদী তত্ত্বের কোনো ভিত্তি নেই। তবে আদিম মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়াকাণ্ডের কথা পর্যালোচনা করলে বেত্রধারণের বস্তুতান্ত্রিক অর্থ খানিকটা বোধগম্য হয়। দাক্ষিণাত্যের গ্রামদেবতার পূজাপদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে রেঃ হোয়াইট হেড লিখেছেন—During the procession the people flourish sticks and swords and spears to keep off the evil spirits. (Village Gods of South India—p. 49)। ভূততাড়নের উদ্দেশ্যে বেত্রব্যবহার করা হচ্ছে তা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। তাঁর এই মত সম্পূর্ণ বস্তুমুখীন এবং অর্থবহ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আদিম পর্যায়ের মানুষের মধ্যে বেত্র বা অনুরূপ ছড়ি ধারণের ক্রিয়াকাণ্ড আছে। তবে প্রশ্ন এই যে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বেত্র-ধারণের অর্থাৎ ভূতবিতাড়নের সম্পর্ক কি? আপাতঃদৃষ্টিতে সম্পর্ক কিছু নেই, তবে একথা জোর করেই বলা চলে যে বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায় ধর্মপূজানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ফলেই ভূতবিতাড়নের যাদুবিশ্বাসও ধর্মের গাজনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এবং তার থেকে গেছে শিবের গাজনে।

আদিম সমাজে এই ধরণের যাদুবিশ্বাসের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছি—হো জাতিরা গ্রাম্যদেবতার বার্ষিক পূজানুষ্ঠানের সময় গৃহশান্তি, উত্তম বৃষ্টি, উত্তম ফসল এবং শিশুদের মঙ্গলের জন্য ভূত তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ধর্মের গাজনের মতোই শোভাযাত্রা বের করে। সেই সময় তাদের হাতে থাকে একগাছা ছড়ি। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সামনে তারা যায় ও

চীৎকার করে। মুণ্ডারাও অনুরূপ বোঙ্গাতাড়ানো অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত। খোন্দরা বীজবপনের সময় এবং হিন্দুকুশ অঞ্চলের উপজাতিরা শস্য কর্তনের পর এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কার্তিক সংক্রান্তির সময় খড় কুটা দিয়ে মানুষের একটি মূর্তি তৈরী করে ধূপ, সরিষা, পাটপাতা ও কয়েকটা মশামাছি রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর একজন লোক সেই জলন্ত মূর্তিটিকে নিয়ে দৌড়ে বেড়ায় আর চীৎকার করে। শ্রীকামিনীকুমার রায় লিখেছেন : তারা বলে "ভালা আয়রে বুড়া যায়, মশা মাছির মুখ পোড়া যায়। দো! দো! দো!' ঐ সময় কয়েকজন কুলা পিটাইতে পিটাইতে তাহার পিছন পিছন ছোটে এবং দো, দো বলিতে থাকে। ঐরূপে পথে প্রান্তরে আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ ছুটিয়া দগ্ধপ্রায় মূর্তিটি মাঠে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়" (লৌকিক শব্দকোষ) এই অনুষ্ঠানকে বলে ভুলা পোড়ানো। পূর্ব ও পঃ বঙ্গ সর্বত্রই এই অনুষ্ঠান আছে। রাঢ়ে নিশির ডাককে বলে "ভুলো লাগা।"। জেমস্ ফ্রেজার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Golden Bough-এ এই সম্পর্কে বহু বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন—'It comes to be thought desirable to have a general riddance of evil spirits at fixed times, usually once a year in order that the people may make a fresh start in life freed from all the malignant influences which have been long accumulating about them.' (p. 722) তাঁর সংগ্রহ থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এখানে প্রদান করছি—

ইরাকের লোকেরা ভূততাড়ানোর উদ্দেশ্যে বন্যজন্তুর ছাল পরে মুখোশ এঁটে হাতে কাছিমের খোলা ধারণ করে বাড়ি বাড়ি চীৎকার করে বেড়ায় (ধর্মগাজনেও নানা রকম মুখোশ পরে লম্ফঝম্ফ করার রীতি আছে)। গোল্ডকোষ্টে এই বার্ষিক উৎসব আট দিন ধরে ভোজসহ শুরু হয়। শেষ দিনে শোভাযাত্রীরা ছড়ি, পাথর ইত্যাদি হাতে নিয়ে ভয়ানক সোরগোল তুলে ভূত তাড়িয়ে বেড়ায়। (ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসবও বহুস্থানে আট দিন আগে থেকে শুরু করা হয়)। Tonquin প্রদেশে গোরু ঘোড়া হাতির মড়ক উপস্থিত হলে অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কাম্বোডিয়াতে হয় মার্চ মাসে। শ্যামদেশে বছরের শেষ দিনে ভূত-তাড়ানো হয়।

রাশিয়ার Kasan প্রদেশের Wotyak-রা প্রথমে দুপুরের দিকে ভূতের উদ্দেশ্যে একটি বলি প্রদান করে। তারপর সন্ধ্যার সময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে গ্রামের মধ্যস্থলে সমবেত হয়। তাদের হাতে থাকে বেত, লাঠি, জলন্ত মশাল (ধর্মঠাকুরের নৈশ শোভাযাত্রায় বেত ও মশাল থাকে)। তারপর সকলে একসঙ্গে ঘোড়া হাঁকিয়ে গ্রামে প্রতি বাড়ির সামনে যায় এবং ছড়ি ঘুরিয়ে ভয়ানক চীৎকার করতে থাকে। শেষকালে গ্রামের বাইরে গিয়ে ছড়িগুলো ফেলে ভূতের উদ্দেশ্যে থুথু নিক্ষেপ করে ফিরে আসে। পূর্ব রাশিয়ায় Cheremiss-রা ভূততাড়নের সময় অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে আগুনের উপর লাফায় (তুলনীয়—ধর্মগাজনে রাত্রিবেলা আগুনের ফুলখেলা, আগুনে লাফ ইত্যাদি)। মধ্য ইউরোপে বেতের লুপ তৈরি করে ছেলেমেয়েরা হাতে নেয় এবং তারপর বাড়ির ও গ্রামের চারিপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। (ধর্ম শোভা-

যাত্রীরা ধর্মমন্দিরকে সাতবার বেষ্টন করে।) জার্মানীতে বোহোমিয়ানরা সূর্যাস্তের পর কোনো চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বেত ঘুরিয়ে আস্ফালন এবং চীৎকার করে। Lake Lucerne এ Brunnanরা উৎসবের দ্বাদশ রাত্রিতে শোভাযাত্রা নিয়ে বের হয়। সঙ্গে থাকে শিঙ্গা, ঘণ্টা ও বেত। তাদের ধারণা এর ফলে ভূতশান্তি হয়। ভূতশান্তি না হলে ফসলের অনিষ্ট হয়। দক্ষিণ ফ্রান্সে Labranguier-এ দ্বাদশ রাত্রিতে ভূতবিতাড়নের উদ্দেশ্যে—'the people run through the streets, jangling bells, clattering Kettles and doing everything to make a discordant noise. Then by the light of torches and blazing faggots they set up a prodigious hue and cry···, (p. 561).

এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে আদিম ভূতবিতাড়নের ক্রিয়াকাণ্ডগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ধর্মগাজনে এসে প্রবিষ্ট হয়েছে। বেত্রধারণের হেতু দ্বিতীয় কিছু হতে পারে না। আদি মানবের ভীতি থেকে তুকতাক্ ও যাদুবিশ্বাসের জন্ম। তারই বিচিত্র প্রকাশ নানারূপে ও নানাভাবে। অনুন্নত সমাজের বিভিন্ন যাদুবিশ্বাস ধর্মঠাকুরের পূজায় জট পাকিয়ে এবং কিম্ভূত বস্তুতে পরিণত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ভূতবিতাড়ন বা রোগশান্তির জন্য আদিম সমাজের তুক-তাক্ আজও বাংলাদেশের বহু ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পাওয়া যায়। যাদুবিশ্বাসের ধর্মীয় পরিণতিরও দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন পৃথক প্রবন্ধে ধর্মঠাকুরের কামিনী মনসার বিশদ পরিচয় দিয়েছি। সেই মনসা পূজায় রাঢ় অঞ্চলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল পণ্যদ্রব্য সাজানো একটি কাঠের নৌকা টেনে বেড়ানো। ঐ নৌকা টানা অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দিতে গেলে কয়েকটি (আদিম সমাজের) অনুরূপ অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করলে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মেলে। যেমন মার্চ মাসে Leti, Moa এবং Lakorএর (Indian Archipelago) লোকেরা রোগবিতাড়নের উদ্দেশ্যে একটি নৌকায় পণ্যসম্ভার সাজিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য, তার সঙ্গে রোগকেও বিতাড়ন করা। নিকোবর দ্বীপের আর একটি উদাহরণ—Every year at the beginning of the dry season the Nicober Islanders carry the model of a ship through villages (The Golden Bough-Frazer) উদ্দেশ্য ঐ এক, রোগশান্তি। দক্ষিণ ইয়োরোপের জিপসীদের মধ্যেও আরও প্রাচীন পন্থায় অনুরূপ অনুষ্ঠান পালনের রীতি আছে।

খোঁজ করলে এমন অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে শত শত মিলবে—যার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক যাদুবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে পূজানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়ে ধর্মীয়রূপ লাভ করেছে। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলির সম্যক বিশ্লেষণ আবশ্যক।

(থ) ধর্মঠাকুরের ভাঁড়াল

রাঢ়ের ধর্মপূজার ভাঁড়াল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অপর প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছি যে ভাঁড়ালের ক্রিয়াকাণ্ডটি আদিম সমাজের যাদুবিশ্বাস, rain charm ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধর্মের ঘট আর ভাঁড়াল এক বস্তু নয়। ধর্মঘটের নাম 'কামিনীকুণ্ড'। ইনিই বারুণী। কিন্তু ভাঁড়াল ধর্মভক্ত্যাদের মস্তকে বাহিত হয় সাধারণতঃ। এই ব্যাপারে বহুবিধ বৈচিত্র্য আছে। এই ধর্মভাঁড়ালের বিবর্তন কিভাবে হয়েছে তা আজও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি তন্ন তন্ন করে তল্লাস না করা পর্যন্ত শেষ কথা বলা যাবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে (Annals of Rural Bengal—Birbhum) সাঁওতালী ধর্মবিশ্বাসে দেবতা মারাং বুরু কর্তৃক মদ্যের হাণ্ডা তৈরি করার কথা বিবৃত হয়েছে। ঐ খাদ্য তৈরি হবার পর মারাং বুরুর আদেশে তাঁকে পুজা করে পাতার ঠোঙায় ঐ মদ্য পান করা হয়েছিল।

এখন রাঢ় অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধানে ধর্মভাঁড়ালের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রদান করছি—

ভাঁড়াল আনা : ধর্মভক্ত্যারা ধর্মপূজার দিন উপবাসী অবস্থায় নগ্ন গাত্রে মাথায় একটি করে ছোট ছোট ভাঁড় বা কলসী নিয়ে নানা পদ্ধতিতে মদ অথবা দুধ গঙ্গাজল বা ফুল নিয়ে দাঁড়ায়। তাদের নাকের কাছে পর্যাপ্ত ধূনা দেওয়া হয় ও শত শত ঢাক বাজে। দেখতে দেখতে লোকটি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে। এই রকম ভাবে গোটা গ্রামে ভক্ত্যাদের অনুরূপ ক্রিয়া দেখানো হয়।

ভাঁড়ার খেলা ও নাচ : এই ধরণের খেলাকে ভাঁড়ার খেলাও বলা হয়। ভাঁড়াল মাথায় নাচও হয়ে থাকে। মদ্য ভাঁড়াল নিয়ে কাড়াকাড়ি ও মারামারি করারও বিধি আছে নানা স্থানে (যেমন বীরভূমে কামারহাটি, ঈশ্বরপুর, নবেলেড়া, রাতমা প্রভৃতি গ্রামে)।

মাণিক ভাঁড়াল : একটি বড় ভাঁড়াল দেয়াশীর বাড়ি থেকে আনা হয়। একে বলা হয় মাণিক ভাঁড়াল। এই ভাঁড়ালে থাকে বাথর, এলাচ, লবঙ্গ, আতপ, পাকাকলা, পান, সুপারি ইত্যাদি। এটি ধর্মতলায় আনার পর ধর্মঠাকুরকে ডাক দিতে দিতে মদ্য তৈরি হয়ে গাঁজিয়ে উঠে উপ্‌চে মাটিতে পড়তে থাকে (গ্রাম কালীপুর, ছিনপাই, কচুজোড়)।

ভাঁড়াল নড়ানো এবং ভাঁড়াল জাগানো : একটি জায়গা পরিষ্কার করে আলপনা দেওয়া হয়। আলপনার উপর পিটুলী মাখানো ছোট বড় মাটির নূতন ভাঁড় রাখা হয়। পরে ভাঁড়গুলি দুধ, মদ, জল ইত্যাদি দ্বারা পুর্ণ করা হয়। পরিপূর্ণ ভাঁড়গুলিকে মাঝখানে রেখে দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। তখন দেয়াশী একটি শ্লোক বলেন—

ধবলখাট ধবলপাট ধবল সিংহাসন
ধবলে বসিয়া আছেন দেব নারায়ণ
সরস্বতীর গাজে বামে বীর হনুমান
গাজনে যে ধামাৎকন্যা আছেন তার চরণে প্রণাম···

(বলা বাহুল্য মাত্র অনুষ্ঠান এবং শ্লোক সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অনুষ্ঠান বস্তুমুখীন আর শ্লোকটি হল পরবর্তীকালের ভাববাদী চিন্তার যোজনা।) ভক্ত্যারা সকলে একপায়ে ভর দিয়ে গালবাদ্য দিয়ে বৃত্তাকারে নাচতে থাকে। এরপর তারা নিজ নিজ ভাঁড়াল মাথায় নিয়ে দাঁড়ায়। তখন তাদের নাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে (পুর্ববৎ) অজ্ঞান করা হয়।

ভিন্নপ্রকার ভাঁড়াল জাগানো : পূর্ণিমার পূর্বদিন আগুন খেলার পর নয় পোয়া চাল, একটি পয়সা, একটি সুপারী ভাঁড়ালে পুরে মদের দোকানে সেটিকে রেখে ফুলমালা ও দীপ দিয়ে জাগানো হয়। তুলনীয় অনুষ্ঠান দেখিয়েছেন রেভাঃ হোয়াইট হেড—"The toddy drawer worships the pot and the bottle।[৯৪]

ভরপেটে ভাঁড়াল আনা : সাধারণতঃ উপবাসী ভক্ত্যারা মদ্য ভাঁড়াল আনতে যায়। কিন্তু সিউড়ী থানার রাইপুর নামে মাত্র একটি গ্রামে, ছেলেধরমের ভক্ত্যারা উপবাস করার পরিবর্তে ভরপেট খেয়ে ভাঁড়াল আনতে যায়। তবে সেই ভাঁড়াল দুধের।

স্নানজলে ভাঁড়াল পূর্ণ করা : (বীরভূমের বেলিয়া গ্রামে) পুজার চতুর্থ দিনে বাণেশ্বরকে জলে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি ঘট-ভাঁড়াল নিয়ে একজন ভক্ত্যা জলে বসে। তারপর বাণেশ্বরের মাথায় জল দিয়ে সেই ঘটটিকে পূর্ণ করা হয়। এর পর বাণেশ্বর বা বাণগোঁসাই-এর উপর একটি লোক চড়ে ফিরে আসে। এ সময় তার কোনো চেতনা বা জ্ঞান থাকে না।

পূজার পর স্নান ও ভাঁড়ালে স্নানজল বহন : (কালিপুর গ্রামে) পূর্ণিমার দিন পুজার পর সন্ধ্যাবেলা ধর্মঠাকুরকে স্নান করানো হয় ; তখন একজন ভক্ত্যা এক কলসী বারি নিয়ে পিছন পিছন যায়। স্নানের পর সে ধর্মরাজের সঙ্গে ফিরে আসে না। আলাদা পথে বারি কাঁখে আবিষ্ট অবস্থায় ধর্মতলায় ফিরে আসে। মদ্যভাঁড়ালের ব্যবস্থা এখানেও আছে। তবে সেটা দিনের বেলা হয়।

ভাঁড়াল ছুট : (লখীন্দরপুর গ্রামে) ভক্ত্যারা মদের দোকান থেকে মাথায় ভাঁড়াল নিয়ে ছুটে আসে ও ধর্মরাজতলায় পড়ে।

শুঁড়ীবাড়িতে পূজা ও ভাঁড়াল : (কালুহা ও জগদীশপুর গ্রামে) পুজার পর বেলা দুটার সময় ধর্মশিলাগুলিকে পুকুরে স্নান করিয়ে ঐখানেই একবার পুজা হয় ; তারপর শুঁড়ী-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আর একবার পুজা করা হয়। তারপর শুঁড়ী ঐ দেবতাদের কোনো ভক্ত্যার মাথায় তুলে দেয় ও প্রতিটি ভক্ত্যার মাথায় একভাঁড় করে মদ দেয়। তুলনীয় রেঃ হোয়াইট হেড লিখেছেন—When the idol has been duly deposited under the canopy another procession is made to the house of toddy drawer.[৯৫]

মাঠভাঙ্গা : পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে শোভাযাত্রা সহকারে পচুই মদ আনাকে মাঠ ভাঙ্গা বলে।

ভাঁড়াল ভাসানো : (খুজুটিপাড়া গ্রামে) ধর্মপুজায় পুর্ণিমার দিন বেলা ৯।১০টা নাগাদ একটি ভাঁড়াল ভাসিয়ে দিতে হয় ভাঁড়ালভাসা নামে একটি পুকুরে। ভাঁড়াল ভাসিয়ে মন্দিরে ফিরে এসে পুনরায় দেখে আসতে হয়। (আদিত্যপুর গ্রামে) উত্তরীয় খোলার দিন ভাঁড়ালগুলি জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। (বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে আদিম যাদুবিশ্বাস ছাড়া এ প্রথার আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না)।

দুধ ভাঁড়াল : কোনো কোনো স্থানে ভাঁড়ালে মদ ব্যবহার করা হয় না। ভাঁড়ে শুধু দুধ থাকে। (ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ)।

পিটুলী ভাঁড়াল : কোনো কোনো জায়গায় মদের পরিবর্তে গঙ্গাজল এবং পিটুলী গোলা ব্যবহৃত হয়। (মন্তব্য অনুরূপ)।

ভাঁড়ালে পুকুরের জল : কোনো কোনো স্থানে মদের পরিবর্তে পুকুরের জল ভাঁড়ালে গ্রহণ করে গামছায় বাঁধা ভাঁড়ে গ্রহণ করে মাথায় চড়ায় ও প্রথামত আবিষ্ট হয় (Rain-charm)।

মদের জালা : (ভবানীপুর গ্রামে) পুজার আগের দিন ভক্ত্যারা রাত্রে বাদ্যভাণ্ড সহ নাচতে নাচতে গ্রামান্তরে পচাই মদের দোকানে উপস্থিত হয়ে একটি মদের জালাকে পূজা করে ফিরে আসে।

ভৈরবের নিকট ভাঁড়াল : পরদিন ঐ জালা থেকে ভাঁড়াল নিয়ে আসে ভৈরবের কাছে, ধর্মঠাকুরের কাছে নয়। (শিব সাজুয্য)

দক্ষিণেশ্বরীর ভাঁড়াল : (ন'বেলেড়া গ্রামে) ধর্মপূজায় মদের ভাঁড়াল আনা হয় গোয়ালশাহী গ্রামের গ্রামদেবতা দক্ষিণেশ্বর কালীর নিকট হতে। ('ধর্মকামিল্যা কালী' প্রসঙ্গে আলোচ্য)।

ভাঁড়ালে বিবাহ মন্ত্র : (খুজুটিপাড়া গ্রামে) পূজার দিন বৈকালে ভাঁড়ালের উপর বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ করা হয় (একদা ধর্মঠাকুরের বিবাহ দেওয়ার প্রথা বিদ্যমান ছিল। সেই প্রথার অবশেষ চিহ্ন)।

শুঁড়ীদের ভাঁড়াল প্রেরণ : (সুগুনপুর) গ্রামে ভাঁড়াল আনা হয় না। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শুঁড়ীরা এক ভাঁড় মদ পাঠিয়ে দেয়। ঐ ভাঁড়ালের গলায় ফুলের মালা দিয়ে ধর্মস্থানে রক্ষা করা হয়।

ভারায় মদ্যকলস সহ ভর : (ছিনপাই ও নারায়ণপুর গ্রামে) দুজন ভক্ত্যা বাঁশের বাঁকের মাঝখানে পচুই মদের বড় কলসী বেঁধে দু'জন কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। তারপর মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে বাদ্য, ধূপ সহযোগে ভর-নামা অবস্থায় গ্রাম পরিক্রমা করে। এখানে প্রত্যেক ভক্ত্যা মাথায় করে ভাঁড়াল বয় না।

রাজভাঁড়ালে শূকরমস্তক : মদ্যপূর্ণ বৃহৎ ভাঁড়কে রাজভাঁড়াল বলে। (গোয়াল-পাড়া গ্রামে) উৎসর্গীকৃত শূকরমস্তকটি রাজভাঁড়ালে পুরে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়।

ফুলভাঁড়াল : বহুস্থানে মদের পরিবর্তে ধর্মঠাকুরের মস্তকবিচ্যুত পদ্মফুল ভাঁড়ালে পুরে মাথায় নিতে হয়। একেই বলে ফুলভাঁড়াল।

মুক্ত ভাঁড়াল : ধর্মঠাকুরের মুক্তস্নানের জল যে ভাঁড়ালে ধরা হয় তাকে বলে মুক্ত ভাঁড়াল।

ভর নামা : পুজার দিন ভক্ত্যারা ভাঁড়াল মাথায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে এসে দাঁড়ায়। তাদের নাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধূপের ধোঁয়া ও কানের কাছে শতাধিক ঢাক বাজানো হয়। দেখতে দেখতে ভক্ত্যাটি আবিষ্ট হয়ে ঢলে পড়ে। তারপর তারা দেবস্থানে ফিরে এলে তাদের মুখে ধর্মরাজের স্নানজল অথবা মদ ছিটিয়ে চেতন করা হয়।

মাঠ নিয়ে মারামারি : মন্ত্র ভাঁড়াল নিয়ে কাড়াকাড়ি ও মারামারি করারও বিধি আছে নানাস্থানে। একে বলে মাঠ নিয়ে মারামারি। (কামারহাটি, ঈশ্বরপুর, নবেলেড়া, রাতমা ইত্যাদি গ্রামে)।

(দ) গাজনের সন্ন্যাসী

ধর্মঠাকুরের গাজন ও শিবের গাজন প্রায় একই রকম। ধর্মগাজনে ঘোড়া অপরিহার্য কিন্তু শিবের গাজনে ঘোড়ার ব্যবহার নেই। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে শিবের গাজনই প্রাচীনতর বলে মনে হয়। ধর্মগাজনে অনুরূপ আচার-অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকাণ্ড পরবর্তী-কালে গৃহীত হয়ে থাকবে। ধর্মপুরাণের কাহিনীতে ধর্মঠাকুরকে আদিদেব নিরঞ্জন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের স্রষ্টা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য তা ঐতিহাসিক নয়। নিছক কবি-কল্পনামাত্র। নিঃসন্দেহে বলা চলে শিবের পূজা ধর্মঠাকুরের বহু আগে চালু হয়েছে। ধর্মঠাকুর অবশ্যই প্রাচীনতম ; কিন্তু অন্য রূপে। অধুনা যে রূপে দেখি সে রূপে নয়। তবে ধর্মপূজা কেবলমাত্র রাঢ় দেশেই সীমাবদ্ধ। এর সঙ্গত কারণ খুঁজে এখনও পাওয়া যায়নি।

গাজনের সন্ন্যাসীদের ভক্ত্যা বা ভক্তিয়া বলা হয়। এই সন্ন্যাসীরা সকল সম্প্রদায় থেকেই আসে। ব্রত, সংযম, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য, চুলদাড়ি না কাটা ইত্যাদি নিয়ম, অনেকটা অশৌচ পালনের মত, ভক্ত্যারা পালন করে থাকে। গাজন পর্ব শুরু হলে স্নানান্তে উপবীত ধারণ করে বাণেশ্বর কাঁধে নিয়ে ভক্ত্যারা দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই অশৌচ পালনের হেতু কি ? যোগেশ রায় বিদ্যানিধি বলেছেন, "শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু 'গাজন' শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন।" (পূজাপার্বণ পৃঃ ৫৬)। ধর্মের গাজনে ধর্মের সঙ্গে নীলাবতীর বিয়ে দেবার রীতি আছে রাঢ় অঞ্চলে। কিন্তু এরই জন্য ভক্ত্যা সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি, তা মনে করার সঙ্গত যুক্তি নেই। বিবাহের বরযাত্রীরা অশৌচ পালনই বা করবে কেন ? মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, জাতে পতিত ব্রাত্য আর্যদের একটি দল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন জাতে উঠেছিলেন তারই স্মৃতি উদ্‌যাপিত হয় চৈতি শিবের গাজনের সন্ন্যাসীদের দ্বারা। পূর্বে বলা হয়েছে শ্রীসুধাংশু রায় মনে করেন ; কোন ফারাও রাজা বিতাড়িত হয়ে প্রাচীন মিশর থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে আসেন এদেশে এবং তাঁর মৃতদেহ রাজমহল অঞ্চলের পাহাড়ে কোথাও মমি করে রাখা আছে। সেই রাজারই মৃত্যু দিবসের শোক পালন করে থাকে গাজনের সন্ন্যাসীরা। (Prehistoric India & Ancient Egypt. page 35)। এই তত্ত্বের পশ্চাতে তিনি যা যুক্তি দেখিয়েছেন, তার সবটাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজমহল পাহাড় অঞ্চল বিস্তৃত এলাকা। এখন সাঁওতাল পরগণায়। এইসব অঞ্চলের দুই হাজার বছর আগেকার অবস্থা যে কি তা জানা যায় না। তবে একথা ঠিক যে এই অঞ্চল অষ্ট্রিক জাতির অধ্যুষিত এলাকা ছিল সেকালে এবং আজও তাদের বংশধরেরা বিপুল সংখ্যায় বাস করছে। ধর্মের

গাজন সম্পর্কে অনুসন্ধানকালে বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চলে দুটি পাঁচালীর সন্ধান পেয়েছি। সে দুটিতে কিছু কৌতূহল সৃষ্টি হতে পারে। প্রসঙ্গ স্বরূপ দুটি ছড়া থেকেই দুটি লাইন তুলে দিচ্ছি—

(১) 'কাঠির সন্ধানে যাও সাঁওতাল পরগণে'…

(২) 'সাঁতালি পর্বতে আছে কড়ারের গাছি'…

এখন সাঁওতাল পরগণায় কাঠির সন্ধানে যাবার হেতু কি? অনুমান করা যেতে পারে 'সাঁতালি' শব্দটিই প্রথম ছড়ায়, সাঁওতাল পরগণা বলে লোকমুখে পরিবর্তিত হয়েছে। সাঁতালি পর্বত লক্ষ্মীন্দরের বাসরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত নাম। প্রকৃতপক্ষে এই পর্বতের কোন অস্তিত্ব নেই। নিতান্তই কাল্পনিক পাহাড়। কিন্তু ধর্মঠাকুরের গাজনের গানে সাঁতালি পর্বতের অনুপ্রবেশ কেন? কী সম্পর্ক আছে? ছড়ার ভাষা আধুনিক। একমাত্র "সাঁতালি" শব্দটি ছাড়া। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় "সা-তা-লি" কথার অর্থ হল রাজার বাসগৃহ অর্থাৎ রাজমহল। মিশরীয় ভাষার বহু শব্দ আমাদের চলিত বাংলায় পাওয়া যায় এবং মিশরীয় সংস্কৃতির চিহ্ন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আবিষ্কার করেছেন। (পাণ্ডু রাজার ঢিবি, দেউলপোতা ইত্যাদি)। তাছাড়া মৃতদেহ নিয়ে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে মিশরীয়দের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভূত মিল পাওয়া যায়, আদি-বাসীদের বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে এবং বহুলাংশে আমাদের মধ্যেও। সুতরাং কোনো মিশরীয় রাজার মৃত্যুদিবস হিসাবে গাজনের সন্ন্যাসীরা অশৌচ পালন করে থাকেন, এ ধারণাকে অলীক স্বপ্নবিলাস বলে অগ্রাহ্য করা চলে না। এ সম্পর্কে অবশ্যই প্রভূত অনুসন্ধান এখনও প্রয়োজন। শিবের সঙ্গে ধর্মের গাজনের ভক্ত্যাদের মিল হল কেন, তার সদুত্তর এখনও দেওয়া যায় না। শৈবতান্ত্রিক যুগে ধর্মঠাকুরকে শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল তার প্রমাণ রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনে হয় এই কারণেই শিবের গাজনের সঙ্গে ধর্মের মিল পরিদৃষ্ট হয়। ওসাইরিসের মৃত্যুদিবস পালন হিসাবেও প্রাচীন মিশরের সঙ্গে ধর্মগাজনকে সম্পর্কিত করা যায়। ওসাইরিসের মৃত্যুদিবসে প্রাচীন মিশরে যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও যেভাবে শোক পালন করা হত তার সঙ্গে আশ্চর্যজনক মিল আছে (বিশদ আলোচনা—মনসা প্রসঙ্গে দ্রঃ)। ভারতের কাংড়া জেলায় মেয়েদের শিবপার্বতীর বিবাহ ব্রত এবং জলে মূর্তি বিসর্জন দেওয়ার প্রথা লক্ষ্য করে জেমস্ ফ্রেজার এই প্রসঙ্গে বলেন: "The marriage of Indian deities in spring corresponds to the European ceremonies in which the marriage of the Vernal spirits of vegetation is represented by the King and Queen of May, the May bride, Bridegroom of the May & so forth. The throwing of the images into the water and the mourning for them are the equivalents of the European customs of throwing the dead spirit of vegetation under the name of Death, Yarils, Kostroma and the rest, into the water

and lamenting over it." ওসাইরিসের মতই শস্য দেবতা Adonis-এর তিরোধান দিবসে গাজনের সন্ন্যাসীদের মত শোভাযাত্রা বের করে বিলাপ করা হত এবং তারা মাথাও কামাত যেমন মিশরের লোকরা স্বর্গীয় ষাঁড় Apis-এর মৃত্যুদিবস পালন করত। আটদিন শোকোৎসবের পর Adonis-এর প্রতীক বয়ে নিয়ে গিয়ে জলে বিসর্জন দেবার নিয়ম ছিল। গাজনের সন্ন্যাসীরাও দেবতার প্রতীক বাণেশ্বর বয়ে নিয়ে গিয়ে পুকুরে বা নদীতে স্নান করিয়ে থাকে। সঙ্গতভাবেই এই দুটি অনুষ্ঠানের চমৎকার মিল দেখা যায়। তাহলে গাজনের ব্যাপারটি কি ঐ সবেরই পরিবর্তিত রূপ ?

এখন অশৌচ পালনের বিধি ও বিবিধ কারণ নিয়ে আরও পর্যালোচনা ও বিচারের চেষ্টা করা যেতে পারে, ভিন্নমুখী কোনো হেতু বা সূত্র পাওয়া যায় কিনা।

অশৌচ পালনের বহুবিধ দৃষ্টান্ত অনগ্রসর সমাজের মধ্যে সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের ঐ বিশ্বাসের মূল ও "কেন" এই প্রসঙ্গে জানার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ যখন ছিল এক, তখনকার মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা বিশ্বাস পৃথিবী জুড়ে প্রায় এক রকমই ছিল অথবা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী যখন পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন একরকম বিশ্বাস ও চিন্তার বাহক হয়েছিল তারা। সুতরাং গাজনপর্বে যখন অনুন্নত পশ্চাৎপদ বিভিন্ন জাতি অংশ গ্রহণ করে থাকে, তখন আদিম বিশ্বাসের টুকরা টুকরা স্মৃতি এই পর্বের মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত ব্যাপার হবে না। এখন বহির্ভারতীয় অশৌচ পালনের দৃষ্টান্ত ও হেতু সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

পলিনেশীয় লোকবিশ্বাসে মৃত্যুর পর অশৌচ পালনের বিধান আছে। বহু অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের রজঃকালে, সন্তানজন্মের পর, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়। মাউরী জাতির মধ্যে মৃতদেহ বা মড়ার হাড় স্পর্শ করলে অস্পৃশ্য হতে হয়। কোনো বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না, কোনো জিনিস ছুঁতে পারে না, এমন কি নিজের হাতে খাবার পর্যন্ত ছোঁয় না। ফিজিয়ানরা কোনো জীবন্ত লোককে সমাহিত করবার পর রাত্রিবেলা বাঁশ, ঘণ্টা, বাজনা, ইত্যাদির সাহায্যে তুমুল সোরগোল তুলে সমাহিত ব্যক্তির প্রেতকে বিতাড়ন করে বেড়াত। (গাজনের সন্ন্যাসীদের রাত্রিবেলা হৈ-হৈ করে বেড়ানো তুলনীয়)। আফ্রিকার বাণ্টু ও ওয়াজিয়া উপজাতির মধ্যে শত্রুবধের পর হন্তাকে মাথা কামাতে হত এবং গ্রামে ঢোকার আগে নিজের গলায় একটি জীবন্ত মোরগকে ঝুলিয়ে মাথা কেটে ফেলত। তখন শুধু মাথাটিই তার গলায় ঝুলতে থাকত। পেল্লু দ্বীপের লোকেরাও শত্রুহত্যার পর নানাভাবে অশৌচ পালন করে থাকে এবং তিনদিন পর যেখানে শত্রুকে মারা হয়েছে সেখানে গিয়ে স্নান করে (ভক্ত্যাদের তিন-চারবার স্নান স্মর্তব্য)। উত্তর আমেরিকার Natchez Indian-দের মধ্যেও নরহত্যার পর ব্রহ্মচর্য ও নানাপ্রকার নিয়ম পালনের বিধি আছে। Choctaw-রা নরহত্যার পর এক মাস শোকপালন করে। সেই সময় তারা চুল পর্যন্ত আঁচড়ায় না। ঐদেশের Omaha জাতির মধ্যে যদি কেউ আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে ফেলত তবে সে (সমাজের মার্জনা পেলে) দুই থেকে চার বছর অশৌচ

পালন করত। খালি পায়ে থাকা, গরম খাবার না খাওয়া, উচ্চকণ্ঠে কথা না বলা, সকল ঋতুতে গলাবদ্ধ কাপড় পরে থাকা, চুল না আঁচড়ানো ইত্যাদি ছিল অবশ্য পালনীয়। দলের লোকেরা শিকারে বেরুলে লোকটিকে দল থেকে আধমাইল দূরে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে হত। প্রাচীন গ্রীসের লোকেরাও প্রেতাত্মার ক্ষতিকারক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিল।

ট্রাইবাল সমাজের শিকারজীবী জাতির মধ্যেও নানাধরণের অশৌচ পালনের প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। হিংস্র জীবজন্তু শিকারের পর তাদের আত্মাকেও দুষ্ট-প্রেত বলে মনে করা হত। শিকারে বেরুবার আগেও নানা নিয়ম মানার বিধান ছিল। যেমন Nootka sound-এর Indian-রা তিমি শিকারে বেরুবার আগে এক সপ্তাহ ধরে ব্রহ্মচর্য ও আহার-বিহারে সংযম পালন করত। পৃথিবীর বহু আদিম শিকারজীবী সমাজে এই প্রথা বজায় ছিল। ডুগং বা কাছিম শিকারের আগে কেউ স্ত্রী সহবাস করলে বিশ্বাস করা হত যে সেই ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কলম্বিয়ার ইণ্ডিয়ানদের ভালুক শিকারে বেরুবার আগে এক মাস স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য হয়ে বাস করতে হত। এস্কিমোরা ডিসেম্বর মাসে শিলমাছ, তিমি, সিন্ধুঘোটক, শ্বেতভল্লুক ইত্যাদি শিকারের পর পৃথক জায়গায় কয়দিন বাস করে। সে কয়দিন তাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য ও নানা নিয়ম মানার বিধি। এতে ত্রুটি ঘটলে আশঙ্কা করা হয়, নিহত জীবগুলির প্রেতাত্মা রুষ্ট হয়ে ক্ষতি করে বেড়াবে। অনুরূপ নিয়ম পালনের প্রথা ভারতের নানা অনগ্রসর সমাজে বিভিন্ন জীবিকার তাগিদে পরিলক্ষিত হয়। কোল ও ভুঁইয়ারা রেশম পোকা চাষের সময় কঠোর নিয়ম পালন করে থাকে। স্ত্রী সহবাস, শয্যায় শয়ন, দাড়িচুল কামানো, নখকাটা, তেলমাখা, তেল-ঘি-এ রান্না, মিথ্যা কথা বলা, অন্যায় কাজ করা ইত্যাদি চলে না। বোর্নিয়োর Kayan উপজাতি চিতাবাঘ শিকারের পর নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিবিধানের উপায় হিসাবে তারা করে কি, আটবার মৃত বাঘটির উপর পা রাখে এবং বলে 'চিতা, তোমার প্রেতাত্মা আমার অধীন।' বাড়ি ফিরে তারা নিজেদের দেহে, কুকুরের গায়ে এবং অস্ত্রশস্ত্রের উপর মোরগের রক্ত মাখায়। তাদের বিশ্বাস এতে মৃত জন্তুটির আত্মা শান্তিলাভ করবে। এর আটদিন পর দিনে এবং রাত্রিতে স্নান করে আবার তারা শিকারে বের হয়। মাদ্রাজ অঞ্চলে কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে কেউটে সাপ হত্যাকে পাপ কাজ বলে গণ্য করা হয়। মৃত মানুষের মতই তারা সাপটিকে দাহ করে থাকে এবং সর্প হত্যাকারীকে তিন দিন অশৌচ পালন করতে হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং ভারতের অনেক জায়গায় বানর মারা গেলে অনুরূপ কৃত্য পালিত হয়ে থাকে। স্বজনের মৃত্যুর পর হিন্দুজাতির মধ্যে অশৌচ পালন ও পালনান্তে ক্ষৌরকর্ম ও স্নানের বিধানও স্মরণ করা যেতে পারে।

এখন এই সকল তথ্য থেকে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে এইটুকুই বোধগম্য হয় যে অশৌচ পালন ব্যাপারটিই আদিম সমাজের—তা সে শিকার, নরহত্যা, মৃত্যু, শস্য সংক্রান্ত ইত্যাদি যে কোনো বিষয়কে অবলম্বন করেই হোক না কেন। অশৌচ পালনের বিধি আমরা পেয়েছি অষ্ট্রিক জাতির কাছ থেকে। আচার্য সুনীতিকুমার এই প্রসঙ্গে বলেন, "ইহারা

(অষ্ট্রিক) মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত—মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে অথবা অন্য জীবজন্তুর ভিতর প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণা ইহাদের ছিল। এই ধারণাই পরবর্তীকালে ইহাদের লইয়া হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য-দান—ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়।" (ভারত সংস্কৃতি পৃঃ ৯৪)। এই অষ্ট্রিক জাতি ভারতে আর্যদের বহু পূর্বে এসেছিল। তাদের মধ্যে প্রচলিত তুক্‌তাক্, যাদুবিদ্যা, ম্যাজিকে বিশ্বাসই ছিল প্রবল।

তাহলে গাজনের সন্ন্যাসীরা কিসের অশৌচ পালন করে? কেন তারা শোকপালনের অনুরূপ কৃত্যাদি কয়দিন ধরে মেনে স্নান করে? এর অর্থ কী? সত্যই কি এই অনুষ্ঠান কোনো শোকের স্মৃতি? অসম্ভব নয়। তবে সে শোক কিসের? হত্যাকাণ্ডের, না ওসাইরিস বা এডোনিস-এর শোকপালনের মত কোনো আদিম দেবতা বা রাজার তিরোধান দিবসের? বলা বাহুল্য এর কোনো উত্তর নেই। আরও অনেক অনুসন্ধান করা দরকার। তন্ন তন্ন করে নানা জায়গার গাজন অনুষ্ঠানের বিবরণ সংগ্রহ করে মেলাতে হবে; তবে একদিন না একদিন এর উত্তর পাবার আশা করা যেতে পারে। এখন এইটুকু বলা চলে, আদিম ট্রাইবাল সমাজের চিহ্নবাহী হয়ে ধারাবাহিকভাবে গাজন উৎসব চলে আসছে ভোল বদলাতে বদলাতে কাল থেকে কালে, দেশ থেকে দেশে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী) পৃঃ ৪২।
২. পঃ বঙ্গের সংস্কৃতির পরিশিষ্টে প্রবন্ধ, পৃঃ ৭৫১।
৩. Ancient India & Prehistoric Egypt.
৪. রূপরামের ভূমিকা।
৫. Golden Bough.
৬. Frazer, p. 75.
৭. গ্রামদেবতা—সাঃ পঃ পত্রিকা ১৩১৪ (১ম সংখ্যা)।
৮. Encyclopaedia of Religion ethics, vol. 5, p. 79,
৯. লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ৪২৩।
১০. যাদুনাথের ধর্মপুরাণের ভূমিকা (বিশ্বভারতী), পৃঃ ৪৬।
১১. E. R. E., vol. V, p. 829.
১২. ডঃ মতিলাল দাশের অনুবাদ…"ঋগ্বেদ"। ১ম অষ্টম, পৃঃ ৯১, ১১০, সূক্ত ৫০।
১৩. ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ২১।

১৪. ঐ, পৃঃ ৫৩।

১৫. ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ৮৯।

১৬. রূপরামের ভূমিকা (২য় সং, পৃঃ ৯)।

১৭. Oran Religion and Customs—S. C. Roy (1928)

১৮. বীরভূম-বিবরণ।

১৯. "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল", পৃঃ ১৩৬।

২০. "শ্রীদুর্গা", পৃঃ ৫৯-৬০।

২১. রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা (২য় সং), পৃঃ ৪, ডাঃ সেন।

২২. ঐ, পৃঃ ১০।

২৩. প্রাচীন ভারতে নারী—ক্ষিতিমোহন সেন, পৃঃ ৩০।

২৪. লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ৫৫১-৫২, ৫৫৩-৫৪।

২৫. ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ৯০।

২৬. ঐ, পৃঃ ৯৪।

২৭. রূপরামের ভূমিকা, পৃঃ ৪ (২য় সং)।

২৮. যাদুনাথের ভূমিকা—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ৫৩।

২৯. Annals of Rural Bengal (Birbhum), 1st vol , p. 450.

৩০. "কূর্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ…সর্বনর্থায় কল্পতে"—পুরোহিত দর্পণ-কূর্মচক্র বিচার।

৩১. "আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ-সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ"—পুরোহিত দর্পণ।

৩২. "আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ"—পুরোহিত দর্পণ।

৩৩ পুরোহিত দর্পণ।

৩৪. "বশিষ্ঠঃ কূর্মনাথশ্চ মীননাথো মহেশ্বর"—তন্ত্রসার।

৩৫. লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ১৩২।

৩৬. ঐ।

৩৭. The Golden Bough, p. 504.

৩৮. পঃ বঙ্গের সংস্কৃতি।

৩৯. "হিন্দু সমাজের গড়ন"।

৪০. রূপরামের ভূমিকা।

৪১. ঐ।

৪২. ঐ।

৪৩. পঃ বঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৩৯৩ এবং পৃঃ ২৫৬।

৪৪. Obscure Religious Cult—Dr. S. B. Das Gupta, p. 342.

৪৫. রূপরামের ভূমিকা।

৪৬. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪৭. "A view of the History, Literature and Religion of Hindoos" by W. Ward, 2nd edition (1815), vol. II, page 184.

৪৮. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৪৯ক. "There is a tendendy in Midnapur to equate Dharma to Siva by making him

husband of a Sakti" (Vide Dharma Worship—Journal of Royal Asiatic Society, vol. VIII, 1942, by Prof. K. P. Chatterjee.

খ. "এই ঝোঁক বীরভূমের বাইরে খুব প্রবলভাবে দেখা যায়, বিশেষ করে বিষ্ণুপুর, ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলে", পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৩৯৫, শ্রীবিনয় ঘোষ। বলা বাহুল্য, শ্রীঘোষের এই মন্তব্য তথ্যনির্ভর ও যুক্তিনিষ্ঠ নয়।

৫০. ধর্মরাজের 'পাতাভরা' বা 'পাতাপরব' বিখ্যাত। পাতা শব্দের অর্থ সাঁওতালি ভাষায় চড়ক। কালীর পরবের সময়ও পাতাপরব হয়ে থাকে।

৫১. দেলো শিব কথাটি শিবদোল থেকে এসেছে বলে মনে হয়। শুদ্রাক্ষিপুরে "শিবদোল"-কে "দোল-শিব" বলা হয়।

৫২ক. "এখনকার শিবলিঙ্গের গৌরী পট্টই একদা ছিল শিবলিঙ্গের পীঠ নীল, যেমন ধর্মপাদুকার পীঠ কূর্ম। লিঙ্গের আধাররূপে খুব স্বাভাবিকভাবেই নীল কোথাও নীলাবতী রূপে স্ত্রীদেবতায় পরিণত হয়েছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল নীলা' চণ্ডীরই নামান্তর। কালকেতুর চৌতিশাস্তবে পাই—"নিশুম্ভ নাশিনী নীলা নীল"। পতাকিনী নীলতারা, নীলসরস্বতী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীর নামও স্মরণীয়।—রূপরামের ভূমিকা, ডঃ সুকুমার সেন।

খ. "চৈত্রমাসে শিবঘরে সন্ন্যাসী সন্ন্যাস করে
যত নারী নীলার ব্রত করে
শুন সভে একমতে আর যত ব্রত হইতে
ধর্মঘরে ব্রত একাকার"—যাদুনাথের ধর্ম পুরাণ, পৃঃ ৪০।

গ. "নীলকে শিবের আবরণ দেবতা এবং ধর্মের কামিন্তা মনে করা সঙ্গত"—রূপরামের ভূমিকা, ডঃ সুকুমার সেন।

৫৩. এই ধর্মের ভক্ত্যারা "ডোমজাতি"। একটি গাছের গোড়ায় সাতটি মাটির ঢিবি তৈরী করে "সাতভাই" বলে ১লা মাঘ পুজা করে।

৫৪ক. তুঃ—প্রস্তুত গ্রন্থের সংগ্রহ, সিঙ্গুর গ্রামে ধর্মরাজের ভাঁড়াল নড়ানোর শ্লোকাংশ:

হাট ঘাট লাঠি বন্ধন, ডাইনে দামোদর বন্ধন
বাবা বীর হনুমান।...

খ. মেটেল্যার ধর্মরাজের চড়ককে নিমন্ত্রণ:

দেববন্ধন দেয়াশী বন্ধন আড় বন্ধন সরস্বতীর বাণ
ডাইনে ডাকিনী বন্ধন বাঁধেন হনুমান...

গ. কৃষ্ণপুর গ্রামে ধর্মরাজের গাজন বন্ধনের শ্লোক:

দেববন্ধ দেয়াশী বন্ধ ঘাট পাট লাঠি বন্ধ
আর বন্ধ সরস্বতীর গান,
ডাইনে ডাকুর বন্ধ বামে বীর হনুমান।
পশ্চিমে গদাধর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম
দক্ষিণে জগন্নাথদেব পাতালে বাসুকি নাগ স্বর্গে নারায়ণ।
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

৫৫. তুঃ প্রস্তুত গ্রন্থের সংগ্রহ গোয়ালপাড়া ধর্মরাজের ঘাটবন্ধনার গান:

জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ শুদ্ধ তামার ঘাটি
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ শুদ্ধ ঢাকের কাঠি

জল শুদ্ধ্ স্থল শুদ্ধ্ শুদ্ধ্ তামার কুঁড়ে
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ্
শুদ্ধ্ চন্দ্র সূর্য জুড়ে।

৫৬. তুঃ— ভোদেব কোট কপাট
পূর্বদ্বারে সূর্য প্রহরি
দক্ষিণদ্বারে হনুমন্ত পহরি
উত্তরদ্বারে গড়ড়ে পহরি। ধর্মপূজা বিধান—পাত্র ভোগ, ১—৪।

৫৭. পশ্চিম বঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (২য় খণ্ড) পঃ বঙ্গ সরকার প্রকাশিত গ্রন্থে মুর্শিদাবাদ জেলার মণ্ডলপুর গ্রামের গম্ভীরা উৎসবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাণব্রত উৎসবের সঙ্গে এর কিছুটা মিল আছে।

৫৮. রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা (২য় সং), পৃঃ ১।

৫৯. ঐ, পৃঃ ১৪।

৬০. শ্রাবণ থেকে শাওন = শাঁওডালি অর্থাৎ শ্রাবণে পূজা হয়। বগা পঞ্চমীতে ভাদ্রে যে পূজা হয় তাকে বলে ভাদ্রলে। তাছাড়া আষাঢ়ে হোরা পঞ্চমীর দিন মনসা পূজা হয়।

৬১. অর্থহীন সাপ খেলানোর মন্ত্রবিশেষ।

৬২. শীতলার সাত বোন: সাম্য, যোগিন, বিগিন, কালী, কঙ্কালী, শীতলা (জ্বালামুখী) ও ফুলমতী (শ্রীভারতী), পুঁথি পরিচয় ৩য় খণ্ড, ভূঃ পৃঃ ৩০, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত (বিশ্বভারতী)।

৬৩. বসন্তকুমারী, মা-কমলা, চিন্তামণি, মড়কচণ্ডী, শীতলা, ওলাইচণ্ডী। এগুলি ছাড়াও ঝেঁটেনি বুড়ি, বাঁদরী ভূত ইত্যাদি অপদেবী আছেন। তুলনীয়, "In Tanjore district the chief goddess of the large tribes of village deities are seven sisters who are regarded as emanating from Parvati the wife of Siva." (The village Gods of South India—Rev. Whitehead, p. 126).

৬৪. দাহুড় ঘাটা ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ। পুকুরের জলে এই ক্রিয়া হয়। ধর্মঠাকুর ও কূর্ম অধ্যায় দ্রঃ।

৬৫. সম্ভবতঃ মুদ্রিত থেকে মুদ নিষ্পন্ন হয়েছে।

৬৬. দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা, পৃঃ ৮৯।

৬৭. ভারতের জাতি পরিচয়, পৃঃ ২৮। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন, "বাঠোউ" সিজ মনসার গাছকে বলে মেচরা। এই গাছ তাদের প্রধান দেবতা। দশ হাজার বছর আগে নেগ্রিটো উপজাতি গাছের পূজা করত।

৬৮. দ্রঃ "ঢেলাই চণ্ডী" প্রসঙ্গে বৃক্ষপূজা, বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৮০-৮৩।

৬৯. The Golden Bough.

৭০. Ibid.

৭১. Ibid.

৭২. Ibid.

৭৩. ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ১৭০।

৭৪. শ্রীপীযূষ মহাপাত্র সম্পাদিত, পৃঃ ৫৭৮-৭৯।

৭৫. সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬ (বিশ্বভারতী)।

৭৬. বীরভূমের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০-৭১।

৭৭. বাংলার লৌকিক দেবতা।

৭৮. The Village Gods of South India, p. 126.

৭৯. পশ্চিম বঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (২য় খণ্ড) গ্রন্থের (পঃ বঙ্গ সরকারের) ৪৮ পৃষ্ঠায় মাঘীব্রত নামে একটি

ব্রতের কথা আছে। সরস্বতী পূজার পরদিন ষষ্ঠী তিথিতে উদযাপিত হত। ধর্মঠাকুরের গাজনের সঙ্গে এই উৎসবের যথেষ্ট মিল আছে। ব্রত, নিয়ম, হবিষ্যান্ন, কাঁটা ঝাঁপ সবই হত।

৮০. চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৯০-৯২, (বিশ্বভারতী)।

৮১. "Journal of Royal Asiatic Society"—Dharma-Worship, 1942, vol. I, p. 130.

৮২. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—"শ্রীদুর্গা", পৃঃ ৪০।

৮৩. ধর্মপূজাবিধানের ভূমিকা।

৮৪. The Obscure Religions Cult, p. 311.

৮৫. রূপরামের ধর্মমঙ্গল (২য় সং) ভূমিকা, পৃঃ ৪।

৮৬. Dharma Worship—The Journal of Royal Asiatic Society, 1942.

৮৭. "তৃষ্ণাসাগর সুখসন্তবরণকামা ইমং সভোজ্যাচ্ছদন শীতলোদকং পূরিতং ধর্মঘটং ধর্ম, দবতং গন্ধ্যাদ্যর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়হং সম্প্রদাদে"—পুরোহিত দর্পণ (৩৪ সং), ৪১৩ পৃঃ।

৮৮. Buddhist survival in Bengal—B. C. Law, vol. (part I), p. 77-78.

৮৯. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।

৯০. Pre-historic India & Ancient Egypt.

৯১. স্নেহাস্পদা শ্রীমতী গায়ত্রী দে সিংহের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য।

৯২. বাঁকুড়ার মন্দির।

৯৩. J. R. A. S. (1942).

৯৪. The Village Gods of South India, p. 49-50.

৯৫. Ibid, p. 49.

তৃতীয় অধ্যায়

(ক) বীরভূমে ধর্মঠাকুরের পীঠ

বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ স্থানের তপশীল সম্প্রদায় প্রধানতঃ যে দেবতার বাৎসরিক গাজন মহাসমারোহে পালন করে থাকেন, তা হল ধর্মঠাকুরের। এই দেবতাটির স্বরূপ নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার। শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভাব যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া যাবে সূর্য, বরুণ, যমরাজ প্রভৃতি দেবতার মিশ্রণ। আদিম সমাজের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ, যাদুবিশ্বাস ও তুকতাকও অপর্যাপ্তভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ফসল ফলানো, বার্ষিক ভূত বিতাড়ন, রোগমুক্তি, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ের, ভারতীয় ও বর্হিভারতীয় আদিম লোক বিশ্বাসের প্রতিটি পর্যায় এসে স্থান লাভ করেছে, এই দেবতার গাজন পর্বে। কেবলমাত্র অন্-আর্য প্রভাবটুকু বিশ্লেষণ করলে এই সত্যে পৌছানো সম্ভব হয় যে, এই দেবতা কোনোকালেই দেবতা ছিলেন না—ছিলেন তুকতাক্ কার্যকর করার প্রস্তর খণ্ডমাত্র। আদিম মানুষের ক্রিয়াকলাপ ধারাবাহিকভাবে বয়ে চলে এসেছে প্রায় অবিকৃতভাবে। বদলেছে শুধু বাইরের খোলস। এখন ব্রাহ্মণ-পুজারী নিজের মনোমত অভিপ্রায়ে পুজা সমাধা করে থাকেন। মধ্যযুগে কালে কালে উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ভাববাদীরা ধর্মঠাকুর সৃষ্টি করেছেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে ; শৈবরা শিবরূপে, সূর্যোপাসকরা সূর্যরূপে, বৈষ্ণবরা বিষ্ণুরূপে এঁকে স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। ফলে, ধর্মঠাকুরের কোনো পৃথক সত্তা টিঁকে থাকেনি। তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন এক প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন। আর কোনো দেবদেবী, গবেষকদের এত ভাবিয়ে তোলেননি। বর্ণিত মিশ্র-রূপের জন্য ধর্মঠাকুরের রহস্য সমাধানে কত যে জল্পনা, কল্পনা এবং কাঠ খড় পোড়ানো হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নানা জটিল এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এই দেবতার স্বরূপ আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। যাই হোক, আমি আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। এখানে প্রধানত বীরভূম অঞ্চলে কয়েকটি ধর্মঠাকুরের পুজাস্থানে গেলে কি দেখা যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব দেবার চেষ্টা করব। এর থেকে এই দেবতাটির জটিল স্বরূপের খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। (এই বিবরণটি ইংরাজীতে অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ২১।৬।৬৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।) ধর্মপীঠ বা পুজাস্থান কেমন হওয়া উচিত তার কোনো পরিষ্কার বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে

হনুমান মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি, শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্টের উপর ধর্মশিলা, বৌদ্ধ স্তূপাকৃতি পীঠ, শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, কূর্মমূর্তি কিছুরই অভাব ঘটে না। এই সমস্ত তথ্য আরও বিস্তারিত ভাবে সংগ্রহ করলে বিভিন্ন সংস্কৃতি সংঘাতের পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজ হবে—

ধর্মপীঠ পরিচয় : বেলিয়া বা বেলে (সাঁইথিয়া) গ্রামের সুবিখ্যাত ধর্মশিলা একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তর, কিন্তু সেটি একটি মুণ্ডহীন মনুষ্যদেহের উপর স্থাপিত। আদিত্যপুর (বোলপুর থানা) গ্রামের চাঁদরায় নামক ধর্মঠাকুরের আকৃতি মস্তকহীন মনুষ্যদেহের মত। রাইপুর (সিউড়ী), বড়া (নান্নুর), শালদহ (মহম্মদ বাজার), মারকোলা, মালাবেড়িয়া (সাঁইথিয়া), গোয়ালপাড়া (বোলপুর) এবং বড়রা (খয়রাশোল) প্রভৃতি গ্রামের ধর্মশিলা কূর্মাকৃতি। এদের কোনো কোনোটির উপর পাদুকালাঞ্ছনের চিহ্ন আছে। মুড়োমাঠ (সিউড়ী) গ্রামের ধর্মঠাকুর ক্ষুদ্র কূর্মাকৃতি, কিন্তু একটি শ্বেতশৃঙ্গবিশিষ্ট। সেটি সম্ভবতঃ হাতির দাঁত কিম্বা স্ফটিক নির্মিত। কামারহাটি (ময়ূরেশ্বর) গ্রামে খোলা জায়গায় গাছতলায় একটি বড় শিলা ভূ-প্রোথিত আছে। কথিত হয় সেটি একটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্তির শিরোভাগ। চূড়ার ইঞ্চি চারেক বেরিয়ে আছে মাত্র। মাটি খুঁড়িয়ে দেখেছি চূড়াটির চারিধারে চারটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি খোদাই করা আছে। তেল সিঁদুরে ও মাটির ঘর্ষণে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবে মূল শিলাটি বড় মূর্তির চূড়া কিনা নির্ণয় করতে পারিনি। এটি সব সময়ই মালসা ঢাকা থাকে। নিকটে একটি ভগ্ন অজানা মূর্তি পড়ে আছে। কারও মতে প্রোথিত মূর্তিটি অনাদিলিঙ্গ শিবের। বলা বাহুল্য একথা যথার্থ নয়। তবে এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে শৈবতান্ত্রিকতার প্রাধান্যে বৌদ্ধধর্ম অপসারিত হওয়ার এটি একটি নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে দাঁড়কা গ্রামের (লাবপুর) বাবুপাড়ার ধর্মঠাকুরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লোকে বলে, বর্তমান বাগ্দী জাতীয় দেয়াশীর পুর্বপুরুষ বুদ্ধ-ধর্ম পরিত্যাগান্তে-বুদ্ধমূর্তি অপসারণ করে বর্তমানের এই পূজা প্রতিষ্ঠা করেন। (মুর্শিদাবাদের কান্দী থানার অন্তর্গত রূপপুর গ্রামে একটি কালো পাথরের উঁচু বুদ্ধ মূর্তিকে শিব মনে করে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের পূজা গাজনাদি হয়ে থাকে।) বাঁকুড়ার বহুস্থানে বুদ্ধ মূর্তিকে ধর্মঠাকুর বলে পুজা করা হয়।

বাতিকার (ইলামবাজার) গ্রামে গাছতলায় ধর্মঠাকুরের পুজাস্থানে নব্য প্রস্তর যুগের ডজনখানেক হাতকুঠার বর্তমান। সাধারণ লোকে সেগুলি চেনে না। বর্ধমান জেলায় চিঁচুড়িয়া গ্রামে ধর্মঠাকুরের মন্দিরের মধ্যে পাতালস্থ অবস্থায় দেবতা থাকেন। (তুলনীয়—জামথলি (দুবরাজপুর) গ্রামের ধর্মমন্দিরে "পাতালস্থ মা" নামে মনসা) গোয়ালপাড়া (বোলপুর) গ্রামে আদি ধর্মঠাকুরকে অনাদিলিঙ্গ বলা হয়। মুর্শিদাবাদের হেতিয়া গ্রামে ধর্মবেদীতে বর্তমান দেয়াশীর পুর্বপুরুষ যিনি ধর্মঠাকুরকে স্বপ্নে পেয়েছিলেন তাঁর মুণ্ডটি রক্ষিত আছে। (তুলনীয়—সিউড়ী থানার বড়মহুলা গ্রামে কালীর স্থানে রক্ষিত দেয়াশীর মুণ্ড পুজা। এই কালীর সামনে ধর্ম-ভক্তেরা নানা রকম ক্রিয়া প্রদর্শন করে যায় গাজনপর্বে।) পাতাডাঙ্গা (রাজনগর) গ্রামেও ধর্মবেদীতে নর-কপাল রক্ষিত আছে। (ভারতীয় ও বর্হিভারতীয়, মুণ্ড পুজার একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য পৃথক প্রবন্ধে আলোচ্য।)

কুড়মিঠা (ইলামবাজার) গ্রামে বুড়ো রায় ধর্মঠাকুরের পীঠটি একটি সমচতুষ্কোণ পোড়ামাটির ফলকের উপর অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি সমতল চতুষ্কোণ ফলক। তার উপর পর পর অনুরূপ কয়েকটি। এটি ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ স্তূপের অনুকরণ হতে পারে। কুহুড়ি (সাঁইথিয়া) গ্রামে আউল গোঁসাই-এর পীঠও ঐ একই আকৃতির। তবে বাঁধানো। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কুহুড়ির তিন চার মাইল দক্ষিণে হাতোড়া গ্রামে একজন ধর্মমকুরের নাম আউল ধরম)। বহু ব্রহ্মচারী ও গোঁসাই পীঠ ঐ রকম আকৃতির পাওয়া যায়। কেন্দ্রগড়িয়া ও মামুদপুর (খয়রাশোল) গ্রামেও ধর্মপীঠ থাকে থাকে সাজানো প্রস্তরফলক।

কোমা (সিউড়ী) গ্রামের ধর্মতলায় বেদীর বামপার্শ্বে ১´ ফুট উঁচু একটি প্রস্তরখোদিত প্রাচীনকালের হনুমান মূর্তি আছে। এই ধরণের মূর্তি সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না।

তাঁতিপাড়া (রাজনগর) গ্রামে ধর্মশিলাগুলির মাঝখানে ধাতু নির্মিত কৌটা আছে। ঐ কৌটাটি নাকি, ধর্ম-শিলাগুলির এককালে কতকগুলি সোনা ও রূপার চিক্ বসানো ছিল, সেগুলি গালিয়ে তৈরী করা হয়েছে। কৌটার ভিতর ছোট মারবেল আকৃতির শ্বেতবর্ণ স্ফটিক জাতীয় স্বচ্ছ একটি বস্তু আছে। যেরকম ফুল বা পাতা দেওয়া হোক না কেন, সব রঙে মিশে এক হয়ে যায়। অনেক সময় নির্মাল্যের সঙ্গে সেটি চলে যায়। প্রবাদ, পরে আবার স্বপ্নাদেশ হলে ফিরিয়ে আনা হয়। কথিত হয়, এইটিই আসল ধর্মঠাকুর। দেবীপুর (ইলামবাজার) গ্রামেও অনুরূপ বস্তু একটি কৌটায় রক্ষিত এবং একটি প্রস্তরনির্মিত গৌরীপট্টের উপর স্থাপিত। মুর্শিদাবাদের হেতিয়া গ্রামে এবং শ্রীকণ্ঠপুর (সিউড়ী) ও গুলালগাছি (রাজনগর) গ্রামেও অনুরূপ বস্তু ধর্মঠাকুর বলে পূজিত হন (শুনেছি বর্ধমান শহরে সর্বমঙ্গলা দেবীর স্থানেও ঐরকম একটি বস্তু আছে।) লায়েকপুর (লাবপুর) গ্রামে পুকুরপাড়ে একটি বেলতলায় কতকগুলি গোলাকার সিঁদুররঞ্জিত শিলাখণ্ড উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। পাথরগুলিকে ধরম বলা হয় এবং সংলগ্ন পুষ্করিণীর নামও ধরম পুকুর। ঐ গ্রামে পৃথক একটি ধর্ম পূজার স্থান আছে। (বাঁকুড়ার ওঁদা থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম ধর্মঘাট। সেখানে লোহার জাতির ধর্মপূজা আছে।) জোল্ল (সাঁইথিয়া) গ্রামের বেলতলায় অনুরূপ ধরম আছেন। বড়রা (খয়রাশোল) গ্রামের পশ্চিমে অর্জুনগুলি মৌজায় দুটি পতিত ডাঙ্গার নাম ধরমডাঙ্গা ও চড়কডাঙ্গা। চড়কডাঙ্গার বহুলাংশ এখন চাষের জমিতে পরিণত। এই স্থানে পূর্ববসতির চিহ্নস্বরূপ বহু মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। দরবারডাঙ্গা গ্রামে (খয়রাশোল সন্নিহিত বর্ধমান জেলায়) ধরমশিলার মেলা হয় ২রা মাঘ। এই সম্পর্কে একটি শ্লোক আছে—"যতসব ছেলেপিলে, চলে যা ধরমশিলে।"

অমৃতপুর গ্রামে (সিউড়ী) ধরমগড়ে নামে একটি ছোট পুকুর বিদ্যমান। রাতমা (ময়ূরেশ্বর) এবং কেন্দ্রগড়িয়া (খয়রাশোল) গ্রামের ধর্মাপুকুরও উল্লেখযোগ্য। তাঁতিপাড়া গ্রামের বাইরে দক্ষিণদিকে গিরিধরম নামে একটি বাঁধানো জায়গায় কয়েকটি শিলাখণ্ড রক্ষিত আছে। এখানে নানা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে থাকে বলে জনশ্রুতি। কথিত হয়, একবার একজন অপকর্ম করতে বসায় তার ঘাড়টি নাকি মুচড়ে গিয়েছিল। (তুলনীয়—ময়ূরেশ্বর

থানায় শেখপুর গ্রামের ঘাড়মোচড়া নামে অপদেবতা। এই নামে অপদেবতা বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলাতেও আছে।) পূর্বোক্ত লায়েকপুর গ্রামের ৮।১০টি ধর্মশিলাকে একটি পিতলের গামলায় পুরে গ্রামের বড়ী দীঘির জলে সারাবছর ডুবিয়ে রাখা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় এই শিলাগুলিকে তোলা হয়। (তুলনীয়—মহুরাপুর গ্রামের মৌড়েশ্বর শিব আদিত্যপুরের কাঞ্চীশ্বর শিব এবং শীর্ষা গ্রামের শিব, সারাবছর জলের মধ্যে ডোবানো থাকেন। (কোমা গ্রামের শিবের নামই হল জলেশ্বর। (নান্নুর থানার) পরোটা গ্রামের বুড়ো শিব—বৃহদায়তন একখণ্ড শিলা ও অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলা নিয়ে গঠিত। এগুলি সারাবছর জলে ডোবানো থাকে। প্রবল লোকশ্রুতি এই যে প্রতি বৎসর ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড একটি করে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।) ঐ একটি বৃহৎ শিলা থেকে নাকি বর্তমানে শতাধিক শিলাখণ্ড সৃষ্টি হয়েছে।) গুলালগাছি গ্রামেও ধর্মঠাকুরকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়।

ঘুরষে (ইলামবাজার) গ্রামের ইছাপুর মৌজায় বুড়ো রায়ের স্থানে একটি ইঞ্চি পাঁচ ছয় পালযুগের ক্ষয়িষ্ণু দুর্গামূর্তি, একটি জৈনমূর্তি (দণ্ডায়মান উলঙ্গ পুরুষ), একটি ক্রিষ্টা-লাইজড প্রস্তরখণ্ড (শীতলা) এবং স্তূপের মত তিন থাক্ পাথরের একটি ব্লক আছে। বেদীর নীচে বাঁ পাশে একটি বড় কঙ্কর প্রস্তর। উপরে খোদাই কার্য অথবা সংযোজিত কিছু। এঁর নাম খঞ্জ রায়। লোকে বলে, ইনি বুড়ো রায় নামক ধর্মঠাকুরের মামা। ঐ গ্রামেই তিনোড় পাড়ায় বাংড়ো রায়ের স্থানে আটটি শিলাখণ্ড। মধ্যস্থলে গোলাকার শিলা। তিনটি ক্ষয়িষ্ণু দুর্বোধ্য শিলামূর্তি। একটি শিবলিঙ্গ সদৃশ শিলা, অপর একটি তবলা বা কামরাঙা আকৃতির, গভীর খাঁজকাটা লম্বাটে শিলাখণ্ড।

গোহালিআড়া (দুবরাজপুর) গ্রামে ধর্মশিলার নিকট ইঞ্চি পাঁচেক উচ্চতার একটি গণেশ মূর্তি আছে। গোবরা (সিউড়ী) গ্রামে খোলা জায়গায় ধর্মবেদীর উপর একটি ক্ষয় পাওয়া চার ইঞ্চির মত লম্বা মূর্তি বিদ্যমান। খুব সম্ভব এটিও গণেশমূর্তি ছিল।

গাংমুড়ি (রাজনগর) গ্রামে ধর্মবেদীতে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে আছেন কালাপাহাড় নামে এক অপদেবতা। কালিপুর (সিউড়ী) গ্রামে গাছের কোটরে এক ধর্মঠাকুর আছেন। পাহুড়ে (সিউড়ী) গ্রামে ধর্মমন্দিরে বাণেশ্বরের মত একটি কাষ্ঠখণ্ডে একটি মূর্তি খোদাই করা আছে। খুব সম্ভবতঃ মূর্তিটি শ্রীকৃষ্ণের। এটিকে ভৈরব বলে পুজা করা হয়। লাঙ্গুলিয়া (সিউড়ী) গ্রামের ধর্মমন্দিরে দুটি ধর্মঠাকুর। পুজার সময় তাঁদের বের করে একটি আঁকড় গাছের নীচে গাদিতে ও অপরটি গ্রামের বাইরে চড়কডাঙ্গার বেদীতে স্থাপন করে পুজাদি হয়। কুমুড়ি, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি গ্রামেও এই ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ বহু পূর্বে ঐ স্থানগুলি ধর্মের পুজাস্থান ছিল। তাই এখনও সকল প্রকার কৃত্য ঐ সকল আটনে হয়ে থাকে। ছিনপাই (দুবরাজপুর) গ্রামে পাঁচ জায়গায় ধর্মরাজের আটন আছে। পুজার দুদিন আগে সমস্ত ভক্ত বাদ্যাদি সহ ঐ আটনগুলি পরিক্রমা করে। জামথলি (দুবরাজপুর), হাজরাপুর, পাহুড়িয়া, মুড়োমাঠ (সিউড়ী) প্রভৃতি গ্রামে ধর্মঠাকুরের একাধিক আটন আছে।

বারুইপুর (ইলামবাজার) গ্রামে শ্রুত হয়, রাজা লাউসেন সেখানে যজ্ঞ করে সিদ্ধিলাভ

করেছিলেন। তাই ঐ স্থানে ধর্মঠাকুরের নাম সিদ্ধেশ্বর। কথিত হয়, লাউসেনের যজ্ঞাবশেষ ভস্ম মৃত্তিকালেপিত বেদীর নিম্নে রক্ষিত। প্রবাদ, এই ছাই যেদিন উড়ে যাবে সেদিন বারুইপুরের কিছু থাকবে না। ঐ সিদ্ধেশ্বরের বেদীতে একখণ্ড শিলা মাত্র। শ্রুত হয়—আসল ধর্মঠাকুর অপ্রকাশিত। তিনি গাজনের সময় দেখা দেন। তাঁর নাম কৃপা বাণেশ্বর। গোলাপগঞ্জে (রাজনগর) ধর্মরাজের সঙ্গে আছেন এক গ্রাম্যদেবতা।

বীরভূমের সদর মহকুমার প্রায় সকল গ্রামেই আখের শালে উনুনের পাশে ক্ষুদ্র লিঙ্গ বা ঢিবির আকৃতির ধর্মঠাকুর মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়। সেখানে আখের রস, গুড় ইত্যাদি ঢেলে পুজা করার বিধি। ধর্মঠাকুরের শিব স্বারূপ্য লাভের এটি একটি উদাহরণ।

সুগুণপুর (মহম্মদবাজার) ধর্মঠাকুরের শিলাখণ্ড অনাদিলিঙ্গ। নিকটে একটি কুণ্ড তৈরী করা আছে। পুর্বে ধর্মতলার দহ নামে একটি দহ ছিল। সেই দহে নাকি বারোমাস পদ্মফুল ফুটত। সেই ফুলে পুজা হত ধর্মঠাকুরের। ঐ দহটি বিনষ্ট হওয়ায় কুণ্ডটি নির্মিত হয়েছে। জামথলি গ্রামে ধর্মরাজ, সিংহাসনের পরিবর্তে একটি ছোট রথের উপর স্থাপিত। সঙ্গে মনসা, শিব ও সিংহবাহিনী আছেন। (তুলনীয়—বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত সিয়াস গ্রামে স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজকে মস্ত রথে চড়িয়ে ঘোরানো হয় রথযাত্রার দিন। ক্ষৌরকার সম্প্রদায়ের লোক দেয়াশী। তিনিও রথে চড়েন। বলা বাহুল্য এই আচারানুষ্ঠানে ধর্মরাজকে নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন করার প্রয়াস পরিস্ফুট।) তেঁতুলবাঁধ (রাজনগর) গ্রামে ধর্মশিলা শ্বেত প্রস্তরের। খটঙ্গা (সিউড়ী) গ্রামে তিনটি ধর্মঠাকুরের (বিনোদ, চাঁদ ও খোঁড়া রায়) মূর্তি ত্রিশূলের মত। একটি ভেঙ্গে গেছে। কুলেড়া (সিউড়ী) গ্রামে একজন হাড়ির গৃহে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে তেত্রিশ-কোটি দেবতা আছেন। মনপুর (সিউড়ী) গ্রামে ডোমরা উন্মুক্ত জমিতে বৃহৎ একটি ব্যাসাল্ট জাতীয় স্বাভাবিক প্রস্তর খণ্ডকে ধর্মঠাকুর বলে পুজা করে।

কড্ডাং বা কল্যাণপুর (দুবরাজপুর) গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যুক্তভাবে সাতজন অনামী ধর্মঠাকুর আছেন। একজনকে আনা হয় খয়রাশোলের লাউবেড়ে গ্রাম থেকে, একজনকে ইলামবাজার থানার হাঁসড়া থেকে, আদিতে একজন ঐ খানেই ছিলেন। দেয়াশীর বাড়ীতে আছেন অপর একজন। আর একজনকে পাওয়া যায় লাঙ্গলের ফলায়।

এই রকম বিচিত্র দৃষ্টান্ত প্রতিটি ধর্মপুজাস্থানে দেখা যেতে পারে। সাধারণ ভাবে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যুক্তভাবে মনসা, শীতলা, শিব প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। আবরণ দেবতা প্রসঙ্গে এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) রাঢ়ে ধর্মপূজার সূচনা ও তারিখ

ধর্মঠাকুরের পুজা গাজনোৎসব বৈশাখী পুর্ণিমায় সচরাচর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বলে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই দেবতাকে বৌদ্ধ-দেবতা মনে করেছিলেন। বলা বাহুল্য সেকালের বিচারে তিনি এতটুকু ভুল করেন নি। কারণ বৈশাখী পুর্ণিমাই হ'ল বুদ্ধ পুর্ণিমা। সুতরাং ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধদেবতারূপে স্থাপন করবার পথে এইটিই ছিল অন্যতম এক প্রধান

যুক্তি। বস্তুতঃ বৈশাখী পুর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পুজা শুরু হবার আর কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব হস্তক্ষেপণও হতে পারে। (পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) এমন হতে পারে, বৌদ্ধদের হস্তক্ষেপণে এই দিনটি নির্ধারিত হয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনে অনুষ্ঠিত অনুরূপ পর্বই ধর্মগাজনে সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে ধর্ম-গাজনের ক্রিয়াকাণ্ডগুলি একটু ব্যাপক এবং বিচিত্র রূপারোপে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কোনো গ্রামে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড হয়, হয়ত পাশের গ্রামেই তার থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলছে। জেলায় জেলায় আচারের পার্থক্যের তো কথাই নেই। কোথায় বা এর শুরু, কোথায় বা এর শেষ, এত পরিবর্তনের হেতুই বা কি তার সঠিক কারণ নির্ণয়, সহসা করা চলে না। তবে এইটুকুই বলা যেতে পারে যে রাঢ় বাংলায় যত প্রকার অনুন্নত জাতি আছে তারা সকলেই এই গাজনে অংশগ্রহণ ক'রে থাকে বলেই এই ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে—যা তারা বয়ে নিয়ে আস্‌ছে কোন্ ইতিহাস পুর্ব যুগ থেকে যার জড় হয়ত আদিম যুগে, যখন যাদু আর ম্যাজিকে ছিল অসহায় মানুষ আস্থাবান। এসবের সঠিক হিসাব করা শক্ত। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন অংশ গ্রহণ করছে তখন তারা নিজেদের আচার, সংস্কার, বিশ্বাস, ক্রিয়াকাণ্ড সব মিলিয়ে দিয়েছে ধর্মঠাকুরের গাজনপর্বে। উচ্চবর্ণের হস্তাবলেপে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনাও কম হয় নি। প্রত্যুত ধর্মগাজন ক্ষেত্রের মতো এমন একটি dumping ground বাংলাদেশের আর কোনো সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিরল। বাঙালীর যাবতীয় জাতিপুঞ্জের পুঙ্খানুপুঙ্খ নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। এ কাজ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের প্রকৃত রহস্য সম্যক উদ্ঘাটন হওয়া অসম্ভব। স্থানভেদে রূপান্তর ঘটার জন্য এ দেবতার পুজা ও গাজনে পালিত আচার অনুষ্ঠানের সংখ্যা অগণিত, বললে খুব একটা অত্যুক্তি করা হবে না। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করলেই খেই হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—'ধর্মঠাকুরের যে রূপ ধর্মপুজার পুঁথি এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় সেই পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার মিশে গেছে। (রূপরামের ভূমিকা)।

ধর্মপুজার বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রবন্ধে ধর্মঠাকুরের পুজার সুচনাপর্ব ও পুজার তারিখ (প্রধানতঃ বীরভূম অঞ্চলের) কিভাবে পালিত হয় কিছু নমুনা দেখিয়ে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা গেল—

সুচনায় বৈচিত্র্য : উচ্চবর্ণের হাতে পড়ে ধর্মঠাকুরকে কিভাবে বিষ্ণু, সূর্য, শিব, যম প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থা থেকে। এখানে মনে রাখা দরকার হিন্দু পুরাণ থেকে শুরু ক'রে পুরোহিতদর্পণ পর্যন্ত কোনো গ্রন্থেই ধর্মঠাকুরের স্থান নেই—

বড়াগ্রামে (নানুর থানা) বিল্বপত্র ও তুলসী একত্রে ধর্মপুজায় ব্যবহার করা হয়। (তুলনীয়, মুরারই থানায় পাইকোড় গ্রামে তুলসী মঞ্জরী দিয়ে শিবপুজা হয়)। কেন্দ্রগড়িয়া গ্রামে (খয়রাশোল) পুজানুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে এবং শূদ্রাক্ষিপুরে (বীরভূম সীমান্তে সাঁওতাল

পরগনায়) পুর্ণিমার আগের দিন সূর্যার্ঘ্য দেওয়ার বিধি। লায়েকপুর গ্রামে (লাবপুর) বৈদিক পদ্ধতিতে ধর্মঠাকুরের হোম হয়। কোটাসুরে (ময়ূরেশ্বর) বৈশাখী পুর্ণিমায় পুজা হয় কিন্তু পুণিমার আগের দিন স্নান ও উত্তরীয় নেওয়ার দিন ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পুজা ও ভোগ হয়। কোটাসুর ও রামচন্দ্রপুরে (ময়ূরেশ্বর) ধর্মপূজার তৃতীয় দিনে ধর্মঠাকুরকে স্নান করিয়ে সন্ধ্যাবেলা অভিষেক করা হয়। খুজুটিপাড়ায় (নানুর) নারায়ণ বা শালগ্রামের ধ্যানে তুলসী পাতায় পুজা করা হয়। (ওঁ ধ্যেয় সদা সাবিত্রীমণ্ডল···ইত্যাদি)।

ভবানীপুর (রাজনগর) গ্রামে ধর্মপূজা শেষ হওয়ার পর সাধারণ কুশণ্ডিকা সহকারে হোম ও নারায়ণ, শিব, দুর্গা ও বিভিন্ন ধর্মরাজের নামে ঘৃতযুক্ত করবী ও বিল্বপত্র আহুতি দেওয়া হয়।

ছোড়া (সিউড়ী), ভগবানবাটি (সিউড়ী), অজয় কোপা (সাঁইথিয়া), সুপুর (বোলপুর) প্রভৃতি বহু গ্রামে যমের ধ্যানে ধর্মরাজের পুজা করা হয়। জামথলি (দুবরাজপুর) গ্রামে ধর্মপুজায় সিঁদুর ও রক্তচন্দন চলে না। সাঙ্গুঁলডিহা (সাঁইথিয়া) গ্রামে আগুনের ফুল খেলার সময় পদ্মফুল দিয়ে ব্রহ্মাপুজার বিধি আছে। (বহুকাল থেকে রাঢ়ে ব্রহ্মাপুজা প্রচলিত আছে। এখানে অনেক হিন্দুপ্রধান গ্রামে অগ্নিভয়াদি নিবারণের জন্য চতুর্মুখের পুজা হয়)।

লখীন্দরপুর (সিউড়ি) গ্রামে সদ্‌গোপ দেয়াশী ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত উভয়েই ঘট আনেন। পুরোহিতের ঘটে পুজা হয়। দেয়াশীর ঘট পাশে থাকে। বেজুরী গ্রামে (রামপুরহাট) ধর্মপুজার পুর্বদিন যজ্ঞ হয়। পালিগ্রাম (বর্ধমান) ও কাগাস (সাঁইথিয়া) গ্রামে পুর্ণিমার আগের দিন প্রতি ঘরে ঘরে বাণেশ্বরকে নিয়ে গিয়ে পুজা করা হয়। রসা (খয়রাশোল) গ্রামের বাথান রায়ের পুজায় বেলপাতা ও তুলসী একত্র ব্যবহার হয়। মেদিনীপুরের কোনো কোনো জায়গায় রামনবমীর দিন ধর্মঠাকুরকে রথে চড়িয়ে ঘোরানো হয়। কোথাও ভাদ্র সংক্রান্তিতে (ধর্ম সংক্রান্তি) মুক্ত স্নান হয়ে থাকে।

তারিখের বৈচিত্র্য : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ সংক্রান্তি, মাঘ ও চৈত্র মাসে ধর্মপুজার হিসাব সংগ্রহ করেছি। তারিখের এই বৈচিত্র্য চিন্তার যথেষ্ট খোরাক যোগায়। কলহ ও বিবাদের ফলে এবং এক পুর্ণিমার পুজা অপর পুর্ণিমায় স্থানান্তরিত হয়েছে নানাস্থানে তা জানতে পেরেছি। কিছু হয়েছে স্বপ্নাদেশবশতঃ। কিছু পয়লা মাঘের মহাপুণ্য দিনে (আক্ষান যাত্রার দিনে) স্বভাবতঃই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে কিছু নমুনা দিচ্ছি—

কড্ডাং গ্রামে (দুবরাজপুর) দেয়াশীর বাড়িতে যে বিখ্যাত ধর্মঠাকুর আছেন তাঁর পুজা হয় বিজয়া দশমীর দিন। কুবীরপুর (সিউড়ি) গ্রামের ধর্মঠাকুরের দ্বিতীয়বার পুজা হয় আশ্বিনে দুর্গা পুজার সময়। ভগবানবাটি (সিউড়ি) গ্রামে ধর্মঠাকুরের পুজা বৈশাখী পুর্ণিমা ও বিজয়া দশমীর দিন হয়ে থাকে। দরবার ডাঙ্গা (বর্ধমান জেলা, বীরভূম সন্নিহিত) গ্রামে ধর্মঠাকুরের পুজা হয় পয়লা মাঘ এবং বিখ্যাত মেলা বসে দোসরা মাঘ। এই মেলার নাম "ধরমশিলার মেলা"। গোয়ালপাড়ায় (বোলপুর) ধর্মঠাকুর চৈত্র পুর্ণিমায় পুজিত হন। রাউতাড়া (রাজনগর)

গ্রামে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন ধর্মঠাকুরকে স্নান করিয়ে পূজা করতে হয়; (অর্থাৎ আষাঢ় মাসে)। তারাপুর (রামপুরহাট) গ্রামেও এই ব্যবস্থা। কালিপুর (সিউড়ি) গ্রামেও তাই। চিঁচুড়িয়ায় (বর্ধমান) কানা রায় ও বুড়ো রায় নামে ধর্মঠাকুর বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজিত হন কিন্তু আখবাড়িতে উঁচু জায়গায় বাউরীরা কালা রায় ধর্মঠাকুরের এবং নিমতলায় জেলেরা বুড়ো রায়ের পূজা করে গাছ বলি সহ, ফুলদোল পূর্ণিমায়। (অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায়—এদিন বিষ্ণুর চন্দনযাত্রারও দিন)। লখীন্দরপুরে (সিউড়ি) বৈশাখী পূর্ণিমা ছাড়া প্রতি পূর্ণিমা এবং বিজয়া দশমীর দিন ধর্মঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। ভাসতর (মুর্শিদাবাদ) গ্রামের ধর্মঠাকুরের প্রতিমাসের পূর্ণিমায় পূজা হয় ঢাক ঢোল বাজিয়ে। নিত্য সেবায় পাঁচ ছটাক আতপ ও দুই আনার মিষ্টান্ন লাগে। বৎসরের চারিটি পূর্ণিমায় ভোগ দেওয়া হয়। প্রতিটি ভোগের খরচ চার টাকা। বৈশাখী পূর্ণিমার মূল পূজায়ও ভোগ লাগে। বড়জোল (রামপুরহাট) গ্রামে আষাঢ় সংক্রান্তি ও পৌষ সংক্রান্তির সময় ধর্মঠাকুরের বেশ ধুমধামের সঙ্গে পূজা হয়[১]। হিজলগড়া (বর্ধমান), শিরা (খয়রাশোল) প্রভৃতি গ্রামে বৈশাখ মাসের নৃসিংহ চতুর্দশীতে পূজা হয়। পূর্ণিমার দিন কোনো পূজা হয় না—দেবতাকে স্নান করানো হয় শুধু। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জয়দেব কেন্দুবিল্বের (ইলামবাজার) পূর্বদিকে 'লাউসেন-তলায়' ডোমজাতি তেরোই বৈশাখ ধর্মমঙ্গল-কাহিনী-খ্যাত কালুবীরের পূজা দিয়ে থাকে। কালুবীরের পূজা বাঁকুড়া জেলাতেও প্রচলিত আছে। পাতাডাঙ্গা (রাজনগর) গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের মূল পূজা হয়। তা ছাড়া পয়লা মাঘ 'আক্ষেণ' দিনে অন্যান্য বহু গ্রামদেবতার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের আর-একবার পূজা ও বলি হয়। সিউড়ি শহরের মালিপাড়ার ধর্মঠাকুর পূজিত হন শ্রাবণ পূর্ণিমায়। নির্ভয়পুর (সিউড়ি) গ্রামে ছেলে ধরমের বৈশাখী পূর্ণিমা ও পয়লা মাঘ পূজা হয়ে থাকে[২]। নদীয়া জেলার ঘেঁটুগাছি গ্রাম ও গোটরা গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ শনিবার ধর্মরাজের পূজা হয়। হাওড়া জেলার নাউল গ্রামে ভাদ্র সংক্রান্তিতে ধর্মপূজা হয়ে থাকে। হুগলী জেলার তিলডাঙ্গা ও মুণ্ডুখোলা গ্রামে মাঘী শুক্লা প্রতিপদ থেকে তৃতীয়া তিথি পর্যন্ত ধর্মঠাকুরের জাত এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে ধর্মের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) ধর্মঠাকুরের কিংবদন্তী, প্রবাদ ও কাহিনী

মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার যুগে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য আরও বেশী করে কীর্তিত হতে থাকে এবং তিনি আদিদেব নিরঞ্জনে পরিণত হন। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে লাউসেন ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী সুবিদিত এবং বহুল প্রচারিত ও আলোচিত বস্তু; যদিও এই কাহিনীদ্বয়ের ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়নি। নিছক কাহিনী স্তরেই এই প্রবাদগুলির স্থান। তবে এগুলির সাহিত্য মূল্য নিশ্চয়ই আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ব্যাপক প্রচার ও ব্যাপক হারে বিভিন্ন কবির কাব্য রচনার দরুণ এককালে বাংলাদেশে ধর্মঠাকুর বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। পাঁচশো থেকে দুশো বছর আগে পর্যন্ত এই পূজার পর্যাপ্ত প্রসার ঘটেছিল বলে

মনে করা যেতে পারে। এর আগে ধর্মঠাকুরের পীঠ বা মন্দির নির্মাণ করে পূজা হত তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজের হাতে ধর্মপূজা গৃহীত হওয়ার পর থেকে বহুবিধ কিংবদন্তী ও কাহিনী ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে জন্মলাভ করেছে। এই সব কিংবদন্তী সংগ্রহ ও প্রকাশ হয়নি। আমি রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি সংগ্রহ সম্পর্কে পর্যটনকালে কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করেছি। তার কয়েকটা প্রকাশ করছি—

সুরথ রাজা ও ধর্মঠাকুর : (গ্রাম ভাদুলিয়া, থানা খয়রাশোল, জেলা বীরভূম) বর্তমান বোলপুর গ্রামের পূর্বনাম ছিল বলিপুর। এই গ্রামে রাজা সুরথ দেবী দুর্গার পূজা করেন লক্ষ ছাগ বলিদান সহ। সুরথের প্রাসাদ ছিল নিকটস্থ সুপুর গ্রামে। (এই গ্রাম এখনও আছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুরথেশ্বর শিবমন্দির এবং সুভিক্ষা দেবীর মন্দির বর্তমান। দুইটি মন্দিরই সুউচ্চ ঢিবির উপর অবস্থিত। অনুমান করা যেতে পারে প্রত্নতত্ত্বগত দিক থেকে স্থানগুলি মূল্যবান) সপ্তমী থেকে অষ্টমীর দিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ঘাতক নিযুক্ত করে তিনি ছাগ বলি দেন। ঠিক অষ্টমীর মহাক্ষণে ছাগ, খুঁটা, খাঁড়া, স্বর্ণময় হয়ে ওঠে এবং দেবী দুর্গা সশরীরে আবির্ভূতা হন। তিনি রাজার উপর তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। রাজা এই বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যখনই দেবীকে স্মরণ করবেন তখনই যেন দেবী প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে রাজার কর্ম সিদ্ধ করে যান। দেবী, "তথাস্তু" বলে অন্তর্হিতা হলেন। সেইদিন রাত্রে রাজা নিদ্রিতবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন যে লক্ষ ছাগ লক্ষ খড়্গ নিয়ে তাঁকে বধ করবার জন্য ছুটে আসছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে মা, মা, বলে চীৎকার করতে থাকেন। দেবী আবির্ভূতা হয়ে স্মরণের কারণ জানতে চাইলে রাজা বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। দেবী বলেন, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু লক্ষ ছাগ হত্যার জন্য লক্ষ জন্ম তোমাকে ছাগলের হাতে বধ হতে হবে। কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তবে আমার বরে এক জন্মেই তুমি মুক্তি পেতে পার যদি আমার আদেশমত কর্ম কর। রাজা সম্মত হলেন। দেবীর ইচ্ছায় রাজা লক্ষ হাত দীর্ঘ হলেন। একলক্ষ ছাগ একহাত অন্তর তাঁকে বলি দিয়ে রাজাকে পাপমুক্ত করল। এই লক্ষ বলির জন্য বলিপুর বা বোলপুর নাম হয়েছে। বোলপুরের সন্নিকটে অজয় নদীর তীরে দেওলি নামক স্থানে অদ্যাবধি দুর্গাদেবীর ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি বর্তমান। কিংবদন্তী এই যে কালাপাহাড় এই দেবী মূর্তি ধ্বংস করেন। সুরথ নাকি এই দেবীরই পুজা করেছিলেন। (বর্তমান দেওলির দুর্গামূর্তি, প্রায় ছয়ফুট; দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে আরও কতকগুলি মূর্তি তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত মশাই নিয়ে গেছেন। দেওলিতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন। উক্ত দুর্গামূর্তিটির বয়স অবশ্য হাজার বছর।)

এখন সুরথ রাজার আটজন ঘাতক মায়ের কাছে করজোড়ে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করে, আমরা আট ভাই ঘাতকের কর্ম করেছি, আমাদের মুক্তির উপায় কি? "এই আট ভাই-এর নাম—ধর্মরায়, কালো রায়, চাঁদরায়, সিন্দুর রায়, রাজ রাজেশ্বর রায়, বুড়ো রায়, বাঁকা রায় ও শ্যাম রায়। দেবী তাদের বর প্রদান করেন যে কলিযুগে তোমরা নীচ লোকদের

দ্বারা পূজিত হবে এবং মদ্যমাংস ও অনার্য জাতির ভোজ্যবস্তু তোমাদের আহার হবে।" কেননা অনুমন্তা (অনুমোদন দেয় যে), নিহন্তা, "ক্রয় বিক্রয়া", সংস্কর্তা (ছোলাছুলি করে যে) "উপকর্তা" (রাঁধুনী), "খাদকশতে" (ভক্ষণকারী) ও ঘাতকা সকলেই সমান পাপভাগী হয়। কাজেই কর্মের ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে। দেবী দয়া করে ঐ ৮ জন ঘাতককে ঐরূপ ভাবে পূজিত হবার আদেশ দিলেন। সেই অবধি নাকি নীচ লোক তাদের পূজা করে আস্‌ছে। ঐ আটজন ঘাতক রায় বংশসম্ভূত এবং তারা নানাস্থানে নিজ নিজ নামে পরিচিত এবং পূজিত। সুপুর গ্রামে সুরথ রাজা সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রবাদ চলতি আছে—রাজা সুরথ নিজ রাজ্য বিস্তারকল্পে বহু লোক হত্যা করেন। পরে একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, কে তাঁকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাচ্ছে এবং পথিমধ্যে সহস্র সহস্র নরকঙ্কাল তাঁকে একযোগে তাড়া করছে। এইরূপ স্বপ্ন দর্শনে তিনি বড়ই ভীত হন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুর্গাপূজা করে লক্ষবলি দেন। এরপর তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি সশরীরে স্বর্গযাত্রা করছেন ; কিন্তু মধ্যপথে লক্ষ লক্ষ বলি প্রদত্ত জীব, প্রাণবন্ত হয়ে তাঁর পথ অবরোধ করে তরবারির আঘাতে তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্যুত করছে। শেষ পর্যন্ত তিনি দেবীর অনুগ্রহে স্বর্গযাত্রা করেন। (আটজন ঘাতকের কথা আর কোনো প্রবাদে পাওয়া যায় না।)

খুজুটিপাড়ার খুজুটেশ্বর : (নানুর থানা) খুজুটিপাড়ার অধিকাংশ স্থানই প্রাচীনকালে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একটি সুপ্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই জঙ্গলের শেষ চিহ্নস্বরূপ এখনও বিদ্যমান আছে। নিকটেই ধর্মঠাকুরের পুজার সাবেক আটন। তার চিহ্ন এখন নেই। সেখানে একটি নিমগাছ ও অন্যান্য লতাগুল্ম জড়াজড়িভাবে বিদ্যমান। কিংবদন্তী আছে যে বর্তমান দেয়াশীর পূর্বপুরুষ একজন বণিক নূন-মশলা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিক্রী করতেন। একদিন সেই জঙ্গলের পথ অতিক্রমকালে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁকে কলা ও চিঁড়ের জন্য অনুনয় করেন। বণিক কলাকে অযাত্রা জ্ঞান করে রুষ্ট হয়ে ওঠেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ জানান যে তাঁকে তুষ্ট করলে বণিক লাভবান হবেন। বণিক পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করতে বলেন। সেদিন প্রচুর বিক্রী হওয়া সত্ত্বেও বণিকের মাল পূর্ববৎ মজুত রয়েছে দেখে বণিক কলা চিঁড়ে এনে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করেন। কলা চিঁড়ের সঙ্গে মিষ্টান্ন আনা হয়নি। ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নের ইচ্ছা প্রকাশ করায় বণিক কিছুটা লবণ চিঁড়ায় দিয়ে সেবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণ বললেন ; "নূন দিয়ে আমাকে বন্দী করলি।" দিন কয়েক পর ব্রাহ্মণের উপর স্বপ্নাদেশ হয়, "আমি ধর্মরাজ। এখানে আবির্ভূত হলাম, তুই আমাকে সেবা কর।" তারপর বণিক ঐ স্থান থেকে পেলেন একটি কূর্মমূর্তি ও একটি শালগ্রাম শিলা।

এরপর একটি ঘটনা ঘটে। নিকটবর্তী নবস্তা গ্রামের কোনো প্রভাবশালী মুসলমানের একটি কপিলা গাভী প্রত্যহ দেবতার কাছে ক্ষীর ধারায় শিলাদুটিকে নিষেক করত। একদিন মুসলমান ব্যক্তি সেই সংবাদ পেয়ে গাভীটিকে ঐ স্থানেই হত্যা করে। ফলে শিলাখণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। স্বপ্নাদেশে দেবাংশী জানতে পারেন 'বড়া' গ্রামে এক মোড়লের বাড়ীতে দেবতা খুদের হাঁড়িতে অবস্থান করছেন। সেখানে এসে শত আবেদন নিষ্ফল হওয়ায় সেখান-

কার জমিদারের শরণাপন্ন হন। জমিদার প্রমাণ চান যে ধর্মঠাকুর প্রকৃতই তাঁর। দেবাংশী স্নানান্তে আঁচল পেতে ঠাকুরকে আহ্বান করায় ধর্মঠাকুরের শিলা হাঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠে আঁচলে আসেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে জমিদার চমকিত হয়ে ওঠেন এবং তিনি দেয়াশীকে বলেন যে তাঁর কুষ্ঠ ব্যাধি যদি আরোগ্যলাভ করে এবং স্বহস্তে লিখবার শক্তি পান তবে একরাত্রিতে তপশীল চৌহদ্দীর যত বিঘা ভূসম্পত্তি লিখতে পারবেন, তাই দান করবেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় জমিদার রোগমুক্ত হন এবং ১০৮ বিঘা জমি লিখে দেন। তখন থেকে বড়া গ্রামে উক্ত দেবোত্তর আয় থেকে পূজাদির ব্যয় নির্বাহ হয়।

বড়া গ্রাম থেকে জানতে পারা যায় যে মুসলমান রাজত্বের প্রথমদিকে ধর্মঠাকুর নিজেই খুজুটিপাড়াস্থ পাট ছেড়ে এসে উপস্থিত হন এবং এক সদ্গোপের বাড়ীতে খুদের হাঁড়িতে লুকিয়ে থাকেন। এরপর খুজুটিপাড়ার দেবাংশীরা সংবাদ পেয়ে তাঁদের ঠাকুর নিয়ে গেলেও মূল পূজা বৈশাখী পূর্ণিমা ও নবান্নের সময় বড়ায় আসেন।

ঐসময় বড়া গ্রামের জমিদার ছিলের এরুয়ালির (মুর্শিদাবাদ) রায়চৌধুরী বাবুদের পূর্বপুরুষ। তাঁর কাছে ধর্মপূজার সুষ্ঠু বন্দোবস্তের জন্য চাটুয্যেরা আবেদন করলে জমিদার ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য বলেন, এক কলম কালিতে খাসের যত চৌহদ্দী সম্পত্তি লিখতে পারবে, তাই পাবে। শতাধিক বিঘা চৌহদ্দী লেখা হওয়ার পর জমিদারবাবু লেখকের হাত চেপে ধরেন।

রায় রামচন্দ্রপুরের কাহিনী : (বর্ধমান জেলা) বহুকাল পূর্বে ঐ গ্রামে মুচিপাড়ায় ছেলেরা মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রবালের মত রক্তবর্ণ একটি শিলাখণ্ড পায়। তারা এক দোকানে ঐ পাথরটির পরিবর্তে মিষ্টান্ন প্রার্থনা করে। দোকানীও পাথরের ওজনের অনুরূপ মিষ্টি দেবার জন্য পাল্লায় মিষ্টি চড়াতে থাকে। কিন্তু ঐ পাথরটির ওজন এত বেশী ছিল যে প্রচুর মিষ্টান্ন চড়িয়েও পাল্লা সমান করা গেল না। তখন দোকানী গ্রামের প্রধানদের নিকট গিয়ে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে এসে ঐ অভিনব প্রস্তরখণ্ডটির অলৌকিক মহিমা দর্শন করে বিস্মিত হন এবং ঐ স্থানেই ধর্ণা দেন। ভোররাত্রে সকলে স্বপ্ন দেখেন বিগ্রহের মধ্য হতে অশ্বারূঢ় এক অমিততেজা দেবমূর্তি নির্গত হয়ে তাঁদের বলছেন, অভিনব বলিদানে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।

সেই থেকে রায়রামচন্দ্রপুরে একটি খুঁটায় একসঙ্গে নয়টি, তারপর আটটি, তারপর সাত এইভাবে ক্রমান্বয়ে বলি দেওয়া হয়। বলিদানের এই তাণ্ডবতা দেখবার জন্য ধর্মপূজার সময় বহু দূর দূরান্তর থেকে শত শত দর্শক সমবেত হয়ে থাকেন।

গোয়ালপাড়া (বোলপুর) : গ্রামের বহড়াডিহি ধর্মরাজ, বুড়ো রায়, মেঘ রায় ও চাঁদ রায় খুব জাগ্রত দেবতা বলে কথিত। রাত্রে তাঁর যাতায়াত প্রত্যক্ষ করেছে অনেকে, বলে লোকবিশ্বাস। এই ধর্মপূজার প্রচলন সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক কিংবদন্তী বিদ্যমান।

সে বহুকাল আগের কথা। একজন নাপিতের গোরু কোপাই নদীর ধারে চরাতে নিয়ে যেত এক রাখাল বালক। ধর্মঠাকুর সেখানে মানুষের বেশ ধরে তার সঙ্গে খেলা করতেন।

রাখালকে ধরে নদীর জলে চোবাতেন, ওঠাতেন। গোরু দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়ে তাকে খেতে পাঠাতেন। একদিন মনিব তাকে জিজ্ঞাসা করে, গোরুগুলি কার হেপাজতে রেখে এসেছে। রাখাল তার কথা প্রকাশ করলে নাপিত লোকটির পরিচয় জানতে চায়। রাখাল পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলে, আমি ধর্মরাজ! তোর মনিবকে বল আমাকে পূজা করতে। রাখাল সে কথা বলার পর নাপিত তার অক্ষমতা ও দৈন্যের কথা প্রকাশ করে। এতে ধর্মরাজ বলেন, এর জন্য ভাবনা নেই, আমি নিজের সেবাপূজার ও ঢাকবাদ্যির ব্যবস্থা করব। এ অঞ্চলে যত ধর্মপূজা হয়, সবার আগে আমার পূজা চাই। এই বলে ঠাকুর ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে নিজেই ঘুরতে লাগলেন বায়েনদের বাড়ী বাড়ী। ক্রমে ক্রমে বায়েনরা রাজী হতে লাগল। শিয়ান শুকবাজার গ্রামে ব্রাহ্মণ গিয়ে হাজির হন মুক্তস্নানের দিন এবং সেখানকার বায়েনদের বাজাতে আসার জন্য অনুরোধ জানান। ব্রাহ্মণ নিজেই কয়েকজন ঢাকী নিয়ে ফিরলেন। গ্রামে প্রবেশ মুখে চট্ট পুকুরের কাছে এসে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি। কিন্তু ঠাকুর আর ফিরলেন না।—ঢাকগুলি আপনা আপনিই বেজে উঠল্। বায়েনরা অবাক হয়ে খুঁজতে গিয়ে তার অনাদিলিঙ্গ রূপ দেখতে পেল।

সেইদিন থেকে সকল গ্রামের বাদ্যভাণ্ড বিনা পারিশ্রমিকে চৈত্র পুর্ণিমায় গোয়ালপাড়া গ্রামে এসে ঢাক বাজিয়ে যায়। ঢাকের সংখ্যা দাঁড়ায় চার-পাঁচ শত। ঢাকবাদ্যের এমন সমারোহ বীরভূমে আর কোথাও হয় না। এই বুড়োরায়তলা এখন জঙ্গলাকীর্ণ। স্বাভাবিক লিঙ্গাকৃতি ভূগর্ভ প্রোথিত একটি শিলা ও মাটির কয়েকটি ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। পূজার সময় ধর্মরাজদের এখানে আনা হয়। ঐ বুড়ো রায়ের মাথায় একটা কাটা দাগ আছে। (আমার নজরে পড়েনি গ্রামের মাতব্বররা জানিয়েছেন পূজার কয়দিন নাকি সেটি দৃষ্টিগোচর হয়)। ঐ কাটা দাগ সম্পর্কে আর একটি কিংবদন্তী আছে। এক গোহালার একটি কপিলাগাভী ঐ বুড়ো রায়ের মস্তকে স্বতঃই ক্ষীরধারা বর্ষণ করত। গোহালা ঐ দৃশ্য দেখে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বুড়ো রায়ের মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করে। ফলে লিঙ্গের মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এই পাপের ফলে গোয়ালপাড়ার সমস্ত গোহালারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বর্তমানে একঘর মাত্র গোহালার বাস। আর একটি প্রবাদও শ্রুত হল। একদা এক মাতাল ঐ লিঙ্গ সদৃশ শিলার উৎস খুঁজে বের করবার জন্য মাটি খুঁড়তে সুরু করে কিন্তু কোনো হদিসই সে পায় না। বরং প্রবল একটা নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ বোধ করায় সে ঐ কর্ম পরিত্যাগ করে।

তুলনীয়: "A cow, the story runs, had a calf. She would give no milk, however for her master, but ran off to a forest close by his house. He followed her one day and watched to see why she went there, and saw her go to a stone image and pour milk over it from her udders. He then went and fetched a spade and tried to dig the image up, but could not reach the bottom of it and whenever the spade touched the stone it drew blood. He went and told the story in the village. So the villagers

built a shrine over the image." ("The Village Gods of South India"— R. Whitehead. Page 126).

বড়া (নান্নুর) : গ্রামের শ্রীকালীচরণ সরকার মশাই একজন অতিবৃদ্ধ পণ্ডিত ৺গোলাপ লাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পুর্বে একটি উপকথা শ্রবণ করেন। উপকথার সারমর্ম এই—লাউসেন যখন স্বর্গে গমন করতে উদ্যত সেই সময় তাঁর বারোজন বাহক ও কুকুর তাঁর সঙ্গে স্বর্গে যেতে প্রস্তুত হন। ইন্দ্রদেব আপত্তি করলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মত, লাউসেন কাউকে সঙ্গছাড়া করতে চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত দুষ্টা সরস্বতীর ছলনায় ঐ দ্বাদশজন স্বর্গগমনে রাজী না হয়ে মর্ত্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠা কামনা করলেন। লাউসেন সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন তথাস্তু! যাও তোমাদের ধর্মরাজের সঙ্গে সমানভাবে পূজা হবে। উক্ত বারোজনের যে নাম তিনি শুনেছিলেন তাঁর দুটি মাত্র তাঁর স্মরণে আছে। সে দুটি নাম, দুটি কুকুরের। লাটু আর বেটুয়া। ঐ লাটু এবং বেটুয়া হয়েছেন "খুজুটেশ্বর" এবং "জুবুটেশ্বর"। (বলা বাহুল্য জুবুটিয়া গ্রামে ধর্মঠাকুর নেই—জুবুটেশ্বর নামে শিব আছেন)।

কেন্দ্রগড়িয়া (খয়রাশোল) : গ্রামে যে পুকুরে ধর্মরাজকে পাওয়া যায় সেটির নাম ধর্মাপুকুর। কথিত হয় পাঁচশত বৎসর আগে মালজাতির এক স্ত্রীলোক মাছ ধরতে গিয়ে ঐ পুকুরে ডুবে যায়। বাড়ীর লোকের উপর স্বপ্নাদেশ হয়। তখন ঢাকঢোল নিয়ে গিয়ে ধর্মরাজের আরাধনা করা হলে তিনদিন পর ঐ স্ত্রীলোকটি ধর্মরাজ মাথায় নিয়ে উঠে আসে। কথিত হয় ঐ পুকুরটির সঙ্গে সিকি মাইল উত্তরে অবস্থিত হিংলো নদীর যোগ ছিল এককালে। ভক্ত্যারা ডুবে যাওয়া আসা করত। পরে মাছ চাষের জন্য পুকুরের মালিকরা পাথর দিয়ে সে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। অনুরূপ প্রবাদ গুলালগাছি (রাজনগর থানায়) গ্রামের ধর্মপুকুর সম্পর্কে বর্তমান।

কৃষ্ণপুর এবং বড়রা (খয়রাশোল) : প্রবাদ আছে আনুমানিক পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ধীবরদের উপর স্বপ্নাদেশ হওয়ায় নিকটস্থ অজয় নদীর গর্ভ থেকে ধর্মরাজ আনীত হন।

তুম্কুটি (খয়রাশোল) : প্রবাদ এই যে এই গ্রামে বহু পূর্বে জনৈক গোহালা গ্রামের সীমানাস্থ একটি জোড়ের পাড়ে গাছতলায় অধিষ্ঠিত ধর্মরাজের সেবার জন্য প্রত্যহ কিছু দুধ ভোগের জন্য দিয়ে আসত। একদিন জোড়ে প্রবল বন্যা হওয়ায় গোহালা জোড় পার হতে না পারায় জোড়ের কিনারায় বসে ধর্মরাজকে স্মরণ করতে লাগল। ঐ দুধ ধর্মরাজকে না দিয়ে সে ফিরবে না। বাঘে ধরলেও সে এক পা নড়তে প্রস্তুত নয়। রাত্রিবেলা গোহালা দেখল একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র এসে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত। কিন্তু এতে গোহালা বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে ধর্মরাজকে স্মরণ করতে লাগল। বাঘটি গোহালাকে আক্রমণ না করে আপনা আপনিই চলে যায়। তারপর সেই গোহালা জোড় পার হয়ে দেবতাকে দুগ্ধ নিবেদন করতে সমর্থ হয়। স্বপ্নাদেশ পেয়ে গোহালা পরদিন ধর্মরাজকে নিয়ে এসে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করে।

চিঁচুড়িয়া (বর্ধমান) : গ্রামে ধর্মরাজ পাতালস্থ অবস্থায় আছেন। কথিত হয় মন্দির থেকে কিছু দূরে পালের পুকুরের সঙ্গে সুড়ঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ ছিল। সেই পথে ধর্মরাজ নাকি যাওয়া আসা করতেন।

মেটেল্যা (দুবরাজপুর): এই গ্রামে ধর্মরাজ পুজায় আজও আঙ্গুলের মত মোটা মোটা বাণ কাঁচা জিভ্ ছিঁড়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। কোমরের দু'পাশের চামড়া ফুটো করে বাণ পরানো হয় এবং অন্য কোনো রকম সাহায্য না দিয়ে দুটি আঁকশী কোমরের দুপাশে ফুটো করে পরিয়ে ৬০ ফুট উঁচু চড়ক গাছে চড়িয়ে ঘোরানো হয়। তার জন্য নাকি রক্তক্ষরণও হয় না। চড়ক দেওয়ার এ দৃশ্য বীরভূমে সম্ভবতঃ আর কোথাও নেই। এ সম্পর্কে অলৌকিক জনশ্রুতি এই যে চড়কের সময় ধর্মরাজদের শরীর দারুণভাবে ঘামতে থাকে। তিন জন লোক সমানে হাওয়া করেও সে ঘাম নিবারণ করতে পারে না। গ্রামের বহু লোককে জিজ্ঞাসা করেছি তাঁরা সকলেই প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঐ অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানিয়েছেন। বীরভূম সীমান্তে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত শূদ্রাক্ষিপুর গ্রামেও অনুরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকার সংবাদ পেয়েছি।

চড়কের পরদিন চড়ক গাছটিকে পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। শ্রুত হয়, ধীবররা জাল ফেলে সে চড়ক গাছের কোনো সন্ধান আর পায় না। পুজার সময় চড়ক গাছকে নিমন্ত্রণ করে জলে নামলেই সেটিকে নাকি পাওয়া যায়।

ছিনপাই (দুবরাজপুর): প্রবাদ, রাজা লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ধর্মপুজার অনুকরণে ছিনপাই ও নারায়ণপুরে কোনো মহাপুরুষ "সুন্দর রায়" প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন রাজা লাউসেন ও ইছাই ঘোষ তপশীল জাতিকে করায়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে মদ্য মাংস ও আমোদ-প্রমোদের দ্বারা মাতিয়ে তুলবার জন্য মদ্য ভাঁড়ালের প্রচলন করেছিলেন।

মোহনপুর (নানুর): গ্রামে প্রায় চারশো বছর আগে বর্তমান দেয়াশীর পুর্বপুরুষের একজন মহিলাকে স্বপ্নাদেশ হওয়ার লোকশ্রুতি আছে। মহিলাটির নাম "রেয়ে দেয়াশিনী"। উক্ত মহিলা ঐ রাত্রেই বাড়ী থেকে কাটোয়ায় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে ধর্মরাজকে মহাসমারোহে মোহনপুরে নিয়ে আসেন।

ঐ গ্রামে ধর্মপুজায় যে দিন দা-বাণ খেলার শোভাযাত্রা বের হয় সে দিন মূল দেবাংশী ধর্মশিলাগুলিকে কাপড়ের থলিতে পুরে গলায় ঝুলিয়ে নেন। দুজন ভক্ত্যা তাঁর দুহাত বগলের মধ্যে নিয়ে তীরবেগে খেলা করতে থাকে। তারা গ্রামে প্রবেশ করে যার বাড়ীতে ঢোকে সেখানে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি অথবা কোনো বিপদ ঘটলে সংজ্ঞাহীন দেবাংশী অথবা দা-বাণারোহী তার নিদান বা নিরাময়ের উপায় যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করে থাকেন বলে প্রবল লোকবিশ্বাস বর্তমান।

মোহনপুর, কামারহাটি (ময়ুরেশ্বর): প্রভৃতি বহু গ্রামেই দা-বাণ খেলা হয় কিন্তু দাবাণরোহীকে সম্পূর্ণ অক্ষত দেহেই দেখা যায় নাকি।

মোহনপুরে ধর্মপুজার পুর্বরাত্রে পচাই মদ তৈরী করার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রুত হয় যে মদ ৩।৪ দিনের পুর্বে তৈরী করা যায় তা দেবকৃপায় এক রাত্রেই তৈরী হয় এবং অত্যুৎকৃষ্ট হয়ে থাকে।

চৌহাট্টা (লাবপুর): গ্রামে একজন লোক সারের গাদা থেকে ধর্মরাজ শিলা প্রাপ্ত হয় এবং স্বপ্নাদেশ পায় বলে জনশ্রুতি আছে। পরে ঐ সুদৃশ্য ধর্মশিলা চুরি হওয়ায় ধর্মতলার

নিমগাছ চিরে বর্তমান "শিরে" ধর্মরাজ প্রকাশিত হন। এই মূর্তি ডিম্বাকৃতি।

পুরন্দরপুর (সিউড়ী) : গ্রামে পুরন্দরনাথ ধর্মরাজ পূর্বে জঙ্গলে অপ্রকাশিত ছিলেন। বর্তমান সেবাইত শ্রীপুরন্দর দাস সাহার আনুমানিক ত্রয়োদশ পূর্বপুরুষ নিধিরাম সাহার একটি দুগ্ধবতী গাভী বাড়ীতে দুধ না দিয়ে বনের এক জায়গায় দুগ্ধ বর্ষণ করত। এই দৃশ্য দর্শনের পর নিধিরামের উপর স্বপ্নাদেশ হয় এবং তারপর থেকে ধর্মশিলা উঠিয়ে এনে পুজার প্রবর্তন হয়েছে।

ঐ গ্রামে বর্তমান ধর্মরাজের পুজারী শ্রীগঙ্গারাম চক্রবর্তীর পূর্ব পুরুষরা মায়া ঘোড়ায় চড়ে নিত্য পুজা করতে আসতেন নাকি, দূরবর্তী এক গ্রাম থেকে। বাড়ী পৌছানোর পর ঘোড়াটি মিলিয়ে যেত। আবার হাজির হত যথাসময়ে।

কোদাইপুর (সিউড়ী) : গ্রামে ধর্মরাজের পাশেই যে শিবলিঙ্গটি আছে সেটি পাওয়া যায় বহুকাল পূর্বে একটি অশ্বত্থ গাছ কাটতে গিয়ে তার ভিতর থেকে।

হাড়াইপুর (সিউড়ী) : প্রবাদ, হেতিয়া গ্রামের ধর্মরাজ স্বপ্নে হাড়াইপুরে আবির্ভূত হন। তারপর একটি দীঘি থেকে দেবতার শিলা পাওয়া যায়।

পার্বতীপুর (সিউড়ী) : গ্রামে ধর্মরাজ স্ব-ইচ্ছায় আবির্ভূত হয়েছেন চট্টোপাধ্যায় বংশে বলে জনশ্রুতি বর্তমান। যাঁর উপর স্বপ্নাদেশ হয়েছিল তিনি এখনও জীবিত। নাম শ্রীমণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বারুইপুর (ইলামবাজার) : গ্রামে লাউসেনের যজ্ঞস্থান বলে কথিত সিদ্ধেশ্বর ধর্মরাজ আছেন। জনশ্রুতি এই যে বেদীর নীচে যজ্ঞভস্ম চাপা দেওয়া আছে। ঐ ছাই যেদিন উড়ে যাবে সেদিন বারুইপুরের কিছু অবশেষ থাকবে না। দেবতাও নাকি আত্মপ্রকাশ করেন না। পুজার সময় স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। তাঁর নাম কৃপা বাণেশ্বর।

কুড়মিঠা (ইলামবাজার) : গ্রামের বুড়ো রায় ধর্মরাজকে বহুকাল পূর্বে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোপাই নদীর তীরে গোরুর জন্য ঘাস আনতে গিয়ে ঘাসের ঝুড়ির মধ্যে অজানা অবস্থায় নিয়ে আসেন।

খুজুটিপাড়া গ্রামের ধর্মরাজের নাম খুজুটেশ্বর ঠিকই তবে জুবুটেশ্বরের সন্ধান পাইনি। জুবুটিয়া নামে যে গ্রাম আছে সেখানে ধর্মরাজ নেই। আছেন জপেশ্বর শিব। মন্দির ৮০০ শত বৎসরের প্রাচীন তা মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলক থেকে জানা যায় এবং ঐ শিবের পুজানুষ্ঠানাদি ধর্মপুজানুষ্ঠানের অনুরূপ।

এই বারোজন ধর্মরাজের সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে আর কিছু জানতে পারিনি তবে খয়রাশোল এবং সিউড়ী থানার কিছু কিছু গ্রামের দেয়াশী ও পুরোহিতরা বলেছেন "ধর্মরাজ বারোজন"। তাঁরা কে কে এবং বারো জন কি করে হলেন তার কোনো হদিস আর কেউ দিতে পারেন নি। এর দ্বারা এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে কোনো একটা সত্য ঘটনা অথবা উপকথা এককালে চলিত ছিল যা আজ বিস্মৃতির গর্ভে চলে গেছে।

গুলালগাছি (রাজনগর থানা) : গ্রামের প্রবাদ এই প্রসঙ্গে দ্রঃ।

ভাণ্ডীরবন (সিউড়ী): ভাণ্ডীরবন নিবাসী ৺গোলোক দাসের (হস্তলিখিত) প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে লিখিত একটি দেড়শত পৃষ্ঠা প্রায়, ভাণ্ডীরবন সংক্রান্ত পুঁথি থেকে উদ্ধৃতি—

"এই জেলায় সিউড়ী থানার অধীন খটঙ্গা ইউনিয়নের অন্তর্গত জে এল ২০১ নং মৌজা সিধুলী, ২০২ নং মৌজা ভাণ্ডীরবন, ২০৪ নং মৌজা বড় চাতুরী, ১৯৯ নং মৌজা রাইপুর ও তৎসন্নিহিত কুস্তোড় মৌজার কতকাংশ, ২০৩ নং মৌজা খটঙ্গাডিহি ও তৎসন্নিহিত ধান্য গ্রাম, রাজনপুর, ঘোড়াতড়ি, নিমদাসপুর ও পাথরা মৌজার কতকাংশ এবং ময়ূরাক্ষী নদীর বর্তমান প্রস্থের প্রায় অধিকাংশ স্থান লইয়া বৌদ্ধ যুগে পাঁচটি মঠ ছিল। উক্ত পাঁচটি মঠে "রায়" উপাধিধারী পাঁচজন মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারাই উক্ত পাঁচটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের নাম (১) সিধু রায় বা সিদুর রায়, (২) আদি রায়, (৩) বিনোদ রায়, (৪) খোঁড়া রায়, (৫) চাঁদ রায়, ছিল। উক্ত মঠাধ্যক্ষগণ প্রত্যেক বৎসর বুদ্ধ পুর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের পুজা করিতেন। এই স্থানের অধিকাংশ স্থান এক্ষণে তালুক বট ভাণ্ডীর বন দেবোত্তর মহাল নামে খ্যাত। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিয়া এদেশে তাঁহাদের নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া যেখানে যেখানে বৌদ্ধ কীর্তি ছিল, রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধরা যে এক সময় এদেশে ছিলেন তাহার স্মৃতি পর্যন্ত লোপ করিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং বুদ্ধদেব হিন্দুর ভগবান বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে এবং বৌদ্ধ পুর্ণিমায় মঠাধ্যক্ষগণ কর্তৃক পুজিত বুদ্ধ হিন্দুর ধর্মঠাকুর রূপে কল্পিত বা পরিবর্তিত হইয়া উক্ত ধর্মঠাকুর মদ ও পাঁঠা বলির দ্বারা পুজিত হইতেছেন এবং সেইজন্যই এই জেলার বহুস্থান পৌরাণিক যুগের মুনিঋষি, দেবদেবী ও বহু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির লীলানিকেতন হইয়াছে।"

কচুজোড়, ভুরকুনা (সিউড়ী), **পাতাডাং** (রাজনগর), **ছিনপাই** (দুবরাজপুর): গ্রামগুলিতে ধর্মস্থানে ভক্ত্যারা একটি ভাঁড়ে মদ নিয়ে এসে ফুলমালা দীপ দিয়ে নিকানো জায়গায় রেখে ধর্মরাজকে তারস্বরে আহ্বান করতে থাকে। শ্রুত হয় ঐ মদ্য কিছুক্ষণ পর উথলে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন বোঝা যায় দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন বহু জনে তা আমাকে জানিয়েছেন। কচুজোড় গ্রামের শ্রীআশুতোষ সরকার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা যা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তা আমার কাছে বিবৃত করেছেন—

একবার একটি ধর্মশিলাকে দোলায় তুলতে ভুল হয়ে যায়। দেয়াশী ৺ধ্বজাধারী মালের মাথায় ধর্মরাজ ছিলেন। সে ডাঙ্গাতে এসে সহসা আবিষ্ট হয়ে পড়ে এবং সকলকে নির্বংশ করব বলে শাসাতে থাকে। তারপর শুকনা খট্‌খটে কঙ্করময় ডাঙ্গায় উপুড় হয়ে পড়ে থুতনীর সাহায্যে লাঙল চষার মত ডাঙ্গা চষতে লাগল হু-হু করে। বহু কাকুতি মিনতি ও পুজা আরাধনার পর দেবতার দয়া হয় এবং উক্ত দেয়াশীর মুখ দিয়ে তাঁর একটি মূর্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কথা প্রকাশ করেন। তখন ধর্মঘর ও বেদী খুঁজে দেখা গেল অনেকগুলি শিলাখণ্ড থেকে কিভাবে একটি পাশে গড়িয়ে গিয়ে মাটি এবং চালের পচা খড় চাপা পড়ে গেছে।

আবিষ্ট দেয়াশীর থুতনী পরীক্ষা করে পরে শ্রীসরকার দেখেছিলেন যে, তা সম্পূর্ণ অক্ষতই ছিল।

তাঁতিপাড়া (রাজনগর) : গ্রামের এক জায়গায় গ্রামের নৈঋতে (দুবরাজপুর থানায় পড়েছে জায়গাটি) গিরিধরম আছেন। স্থানটিতে একটি বেদীর উপর তিনটি ধর্মশিলা। সেই বেদীটির তিন দিক বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে পুকুর ঘাটের চাতালের মত বাঁধানো। দূর থেকে দেখলে পুকুর ঘাট বলে ভ্রম হয়। এখানে নাকি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। স্বভাবকবি শ্রীসুবল সেন বলেছেন, তিনি নিজে শুনেছেন অদৃশ্য ঘোড়ার খট্ খট্ শব্দ। পায়ের দাপাদাপি, অনেকগুলি ইঁট হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ার মত শব্দ ইত্যাদি। বছর ৫০ পূর্বে একজন লোক ঐ স্থানে প্রস্রাব ত্যাগ করেছিল ফলে তার মুণ্ডটি সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে ঘুরে যায়। (তুলনীয়—"ঘাড়মোচড়া" দেবতা, শেখপুর (ময়ূরেশ্বর) । বর্ণহিন্দুদের পুজো বৈশাখ মাসে।)

তাঁতিপাড়া (রাজনগর) গ্রামে ধর্মশিলাগুলির মধ্যস্থলে স্ফটিক বা হীরক জাতীয় বস্তু আছে। যে কোনো নির্মাল্য বা পাতা পড়লে তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। পরে আবার স্বপ্নাদেশ হলে ফিরিয়ে আনা হয়। এইটিই নাকি আসল ধর্মরাজ। বস্তুটি একটি কৌটার মধ্যে রক্ষিত। আকার ছোট মারবেলের মত। কৌটাটি ধর্মশিলার গায়ের চাঁচ গলিয়ে প্রস্তুত। ধর্মস্থানে আর একটি আশ্চর্য বস্তু দৃষ্ট হয় নাকি। সন্ধ্যাবেলা একবার মাত্র সলিতা ভিজিয়ে জ্বালিয়ে দিলে সারারাত সে সলতে জ্বলতে থাকে এবং নেভে।

জামথলি (দুবরাজপুর থানা) : অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীপশুপতি সাহানা উক্ত প্রবাদ—এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম হাজরাপুরে হটু সাহানার বাড়ী। এঁরা জাতিতে তাঁতি। পশুপতি সাহানার পূর্বপুরুষ। বহুকাল আগে তার বাড়ীতে ধর্মরাজ খুদের হাঁড়িতে আবির্ভূত হন। (তুলনীয় খুজুটিপাড়া ও বড়া)। হটুর উপর স্বপ্নাদেশ হয়, "আমি ধর্মরাজ, আমাকে পুজো করলে তোদের দারিদ্র্য দূর হবে ও সব দিক থেকে ভালো হবে"। ধর্মরাজ পার্শ্ববর্তী গ্রাম জামথলিতে অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপর ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠা ও পুজা করে সাহানাদের খুব উন্নতি হয়। তারা ১৮।২০ বিঘা জমি ধর্মরাজের নামে দেবোত্তর করে দেয়। তখন তারা সেবাপূজা নিজেরাই করত। দেবতা ভোগ প্রার্থনা করায়, পায়সের ভোগ দেওয়া হত। কালে ব্রাহ্মণের হাতে পূজা করাবার ব্যবস্থা হয়। সাহানাদের বাড়ীতে অকালমৃত্যু নেই এবং সকলেই দীর্ঘজীবী হয়ে থাকেন। পশুপতি সাহানা আরও জানালেন, ধর্মরাজ নানাভাবে নানারকম অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়েছেন, বনের পথে অপ্রাকৃত আলো দেখিয়ে ভক্তজনকে পথ বাৎলেছেন। ভীত পথিকের সঙ্গে হেঁটে ভয় দূর করেছেন। পূর্বে পর পর সাতটি হাঁড়ি একই উনুনে চড়িয়ে ভোগ রান্না হত। দেবতার মাহাত্ম্যে উনুন সংলগ্ন প্রথম যে হাঁড়িটি থাকত, তারই অন্ন সবার শেষে সিদ্ধ হত নাকি !

দুবরাজপুর (দুবরাজপুর থানা) : গ্রামে অনেকগুলি ধর্মশিলা আছেন। প্রবাদ যে তাঁদের একজন মুসলমানের লাঙলের ফলায় সিঁদুর মাখা অবস্থায় উঠে আসেন। প্রায় ৫ পুরুষ আগে শ্যাম ঘোষকে স্বপ্ন হয়। তিনি ঠাকুরকে তুলে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করেন।

বড়া (নান্নুর): গ্রামে শ্রুত প্রবাদ—(ক) মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে ধর্মরাজ নিজেই খুজুটিপাড়াস্থ পাট ছেড়ে এসে উপস্থিত হন এবং এক সদ্‌গোপের বাড়ীতে খুদের হাঁড়িতে লুকিয়ে থাকেন। এর পর খুজুটিপাড়ার দেবাংশীরা সংবাদ পেয়ে তাঁদের ঠাকুর নিয়ে গেলেও মূল পুজা বৈশাখী পুর্ণিমা ও নবান্নের সময় বড়ায় আসেন। (খ) মুসলমান রাজত্বের সময় বড়া গ্রামের জমিদার ছিলেন এরুয়ালির (মুর্শিদাবাদ) রায় চৌধুরী বাবুদের পূর্বপুরুষ। তাঁর কাছে ধর্মপুজার সুষ্ঠু বন্দোবস্তের জন্য চাটুয্যেরা আবেদন করলে জমিদার ধর্মরাজের মাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য বলেন; এক কলম কালিতে খাসের যত চৌহদ্দী সম্পত্তি লিখতে পারবে, তাই পাবে। শতাধিক বিঘা চৌহদ্দী লেখা হওয়ার পর জমিদার বাবু লেখকের হাত চেপে ধরেন।

অলৌকিক তত্ত্ব

খুজুটিপাড়া (নান্নুর): ধর্মরাজের পুরোহিত উক্ত: ধর্মরাজ শ্বেত অশ্বে বিচরণ করেন। কৌমুদি স্নাত শুভ্র রজনীতে পূজা। মানসিক যাঁরা করেন তাঁরা শ্বেতবর্ণের ছাগ সংগ্রহ করে আনেন। কেকানিনাদের সঙ্গে শ্বেতবর্ণের পালক আন্দোলিত হয়। বাইরের এই দৃশ্যে অন্তরেও অনুভূতি আসে ঠাকুরের শুভ্র শ্বেত নির্মল রূপের।

ব্যাণ্ড চাতরা (নান্নুর): গ্রামের প্রবাদ, এই গ্রামে কোনো এক দেয়াশী পুত্রের কুষ্ঠ-ব্যাধি হয়। তার যন্ত্রণা দেখে পিতৃপ্রাণ ব্যথিত হয়ে ধর্মরাজের কাছে দিবারাত্রি প্রার্থনা জানাতে থাকেন। একদিন স্বপ্নাদেশ হয়, পুর্ণিমার রাত্রে চৌমাথায় ব্যাধিগ্রস্তকে প্রতীক্ষা করতে হবে সজাগ আঁখি নিয়ে। দেবতা ঔষধ দিয়ে যাবেন। তাই সে ভক্তিভরে মাথায় তুলে নেবে। কথিত রাত্রে নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমান ব্যক্তির পানে শ্বেতশুভ্র তুরঙ্গ পৃষ্ঠে এক আলোকমূর্তি ধাবিত হচ্ছে দেখে সভয়ে রোগী পলায়ন করে। তার পরদিন স্বপ্নে দেয়াশীকে ধর্মরাজ জানান, তোর ছেলের রোগ ভাল হবে না।

সুগুণপুর (মহম্মদবাজার থানা): প্রবাদ, গ্রামের বর্তমান দেয়াশী শ্রীদাম পালের পুর্ব-পুরুষদের কোনো একজনকে প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পুর্বে ধর্মরাজ স্বপ্নে পুজা প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। পুনরায় স্বপ্ন হয় যে পুজা করতে রাজী না হলে ডোমের হাতে ধর্মরাজ ফুলজল নেবেন এবং ডোম দেয়াশীর পুর্বপুরুষকে পুজা করার জন্য স্বপ্নাদেশ হয়। তখন পাল মশাই পুজা করতে রাজী হন। তারপর থেকে ডোম ও পালরা বছরে একদিন পুজা করত আর বারোমাস পুজো করতেন ব্রাহ্মণে। এইভাবে চলে আসছে আজ পর্যন্ত। শোনা যায় ময়ূরাক্ষী নদী তখন খুবই সংকীর্ণ ছিল এবং এই স্থানে একটা ধর্মতলার দহ নামে গভীর দহ ছিল। ঐ দহে বারোমাস পদ্ম ফুটত। প্রত্যহ ঐ ফুলে পুজা হত। এখন এই দহের কোনো চিহ্ন নেই। পরে একটি কুণ্ড নির্মাণ করা হয়।

ভাসতর (মুর্শিদাবাদ): গ্রামেও প্রবাদ যে পুরাকালে ময়ূরাক্ষীর এক দহ থেকে ধর্মরাজ জনৈক ধীবরের হাতে উঠে আসেন। সেই দহ এখন চড়ায় পরিণত হয়েছে।

গুলালগাছি (রাজনগর থানা) : শ্রীভক্তিপদ মণ্ডল বহুকাল পূর্বে পণ্ডিত পূর্ণানন্দ মালের নিকট ধর্মপুজার উৎপত্তি সম্পর্কে যে কিংবদন্তী শুনেছিলেন তা নিম্নরূপ :

বুদ্ধদেব অথবা তাঁর প্রভাবশালী শিষ্যদের মধ্যে কেউ শিবিকারোহণে ধর্ম প্রচারে বহির্গত হন। তাঁর বাহকদের মধ্যে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ত তাকে তিনি সেইখানে প্রতিষ্ঠা করে যান। এইভাবে দেশব্যাপী ধর্মরাজ পূজার প্রতিষ্ঠা হয়। বাহকগণ নিম্নবর্ণের লোক হত সেজন্য তারা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল বলেই ধর্মরাজ পুজায় মদ্য ভাঁড়ালের প্রচলন।

মালাবেড়িয়া (সাঁইথিয়া) : শ্রুত প্রবাদ : বর্ষণমুখর এক দিবাবসানে জনৈক শ্রান্ত কৃষক নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখে চারিদিকে শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হচ্ছে। তারপর সে দেখে একজন জটা-জুটধারী সৌম্যকান্তি সাধক গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তার শিওরে এসে জলদগম্ভীর স্বরে বলছেন, শুনতে পাচ্ছিস ! আমি তোদের গ্রামের উত্তর সীমান্তে অপরিষ্কৃত পুকুরের ঈশানে আছি। তুই আমাকে তুলে এনে সেবা কর। আমি তোর হাতে পুজা পেতে চাই। কৃষক জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কে ?" সৌম্যকান্তি সাধক জবাব দিয়েছিলেন, "আমি ধর্মরাজ।" এই বলে তিনি অদৃশ্য হলেন। কৃষক পরের দিন এই কথা সকলকে জানিয়ে ধর্মরাজকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করে।

কালুহা ও জগদীশপুর (রামপুরহাট) : শ্রুত প্রবাদ : ঐ গ্রামে আমগাছি বলে একটি মাঠ আছে। ঐ মাঠের পূর্বে একটি কয়েৎবেলের গাছ ছিল। সেখানে কেবলমাত্র তিনটি শিলা উপেক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল। একজন শুঁড়ি ঘাস কাটতে গিয়ে ঐ শিলাখণ্ডগুলিকে ঐখানে দেখতে পায়। সে একবার তুলে দেখেই রেখে দেয়। সেই রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে দেখে যে সেই শিলাখণ্ডগুলি তার বিছানায়। তার আগে সে স্বপ্ন দেখেছিল যে, "আমাকে নেড়েচেড়ে দেখে আসার পর, কেন তুই আমার পুজা করলি না। এখন হয় তুই আমার পুজা কর, না হলে আমি তোকে নির্বংশ করব। আমি ধর্মরাজ ঠাকুর।" উক্ত শুঁড়ী তখনই জেগে উঠে বিছানায় সেই শিলাখণ্ডগুলিকে দেখতে পায়। তখন সে ভয় পেয়ে জমিদারের বাড়ীতে গিয়ে সকল কথা প্রকাশ করে। ঐ জমিদার তখন ঐ ঠাকুরের নামে সাতবিঘা জমি দান করেন। পরদিন সকালে আষাঢ় পূর্ণিমা। শুঁড়ি সেই পূর্ণিমা তিথিতে ঐ শিলামূর্তি তিনটিকে গ্রামের একটি নিমগাছের গোড়ায় প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে দেবতা ঐ নিমগাছের নীচেই আছেন।

(ঘ) প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ধর্মসাহিত্যের নমুনা
শ্লোক, পাঁচালী, ছড়া ইত্যাদি

কতকগুলি শ্লোক, পাঁচালী, ছড়া, চালান গান ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করেছি। এগুলি পূর্বে সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয় নি। ধর্মঠাকুর গ্রামবাসীর প্রিয় দেবতা। তাই তাঁর পুজাকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ গ্রামবাসীর মনে উৎসারিত হয়ে থাকে। এই সকল শ্লোক পাঁচালীগুলি তারই অভিব্যক্তি। এগুলির সাহিত্য মূল্যও কিঞ্চিৎ আছে।

গাজনের গানগুলির কিয়দংশ মঙ্গলকাব্য থেকে গৃহীত ও বিকৃত। ঘাটবন্ধনের শ্লোকগুলি চিত্তাকর্ষক। ঘনরামের কিছু পদ ঘুরিষা গ্রাম থেকে মিলেছে। মুদ্রিত পুস্তক থেকে কতটুকু অমিল আছে তাও যথাযথভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি। মামুদপুর থেকে প্রাপ্ত গাজনের গান ও চালান গানে লোকসঙ্গীতের সুর লেগেছে। পাতাভরা গান কিছু পাওয়া গেছে। ঐ গানের অনুরূপ গান অন্য নামে যা চলিত আছে তাও দেখিয়েছি। গানে এক জায়গায় উল্লেখ আছে "সাঁতালি পর্বতে আছে কড়ারের গাছি।" অকস্মাৎ সাঁতালি পর্বতের অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়।[৩] ঐ গানেরই একটু পরিবর্তিত রূপ চিঁচুড়িয়া গ্রামে পাওয়া গেছে। তাতে কাঠির সন্ধানে সাঁওতাল পরগণা যাওয়ার উল্লেখ আছে। এগুলি সম্ভবতঃ বিচিত্র ভাবধারার সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষার বিচারে এই গানগুলি আধুনিক।

গাজনের গান, পাঁচালী, শ্লোক, ছড়া

১। **কুড়মিঠা** (ইলামবাজার) : গ্রামে পূজার দিন সকালে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করার সময় ভক্ত্যারা আবৃত্তি করে—

ধবল খাট, ধবলপাট ধবল সিংহাসন
ধবলে বসিয়া আছেন দেব নারায়ণ
সরস্বতীর গাঙ্গে বামে বীর হনুমান
গাজনে যে ধামাৎকন্যা আছেন তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

২। **ঘুরিষা** (ইলামবাজার) : কবিরত্ন ঘনরামের গান গাওয়া হয়। একটি অতি প্রাচীন পাতড়া নকল করেছি। সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে ঘনরামের মুদ্রিত পুস্তকের (শ্রীপীযূষ মহাপাত্র সম্পাদিত) সঙ্গে মিলে গেছে। যা মেলেনি তা এই—

ধুয়ো : আমি সরিচার নাই কদায় (??)
নিসকলঙ্ক নামের পাছে জাহাজ ডুবে যায়।
পয়ার : তব নাম করে যদি প্রাণে মরি আমি হে।
নিষ্কলঙ্ক ধর্মনামে কলঙ্ক তুমি পাবে হে।
তব নাম করে যদি মরে রঞ্জার নন্দন হে।
তবে বল তোমার কে পুজিবে চরণ হে ॥
ত্রাহি মা পুণ্ডারিকাক্ষ রক্ষ ভগবান হে
পশ্চিমে উদয় দেহ নইলে ত্যজি প্রাণ হে।
অবশেষে উজ্জ্বল করি যজ্ঞ বল।
আরম্ভিল মহাআদ্য লব হে ॥
ধর্মটায় ধ্যান (?) উঠে উচ্চৈস্বরে।
অকাতরে নৃপতি কাটারি নেন করে ॥

অগ্নির সারা কিবা ডাকি কন হে।
রাজা ডাকে পরিত্রাহি ভকত বৎসল।
কোথা আছ এবার দেখা দাও দয়াময় হে।
শ্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরামে গায় হে ॥

নবখণ্ড আরম্ভ ধুয় — আমারে তাই বল গো মাসি
সতদল কোমল কোথা পাব গো—

প্রাপ্ত পদ	মুদ্রিত পুস্তকে পাঠান্তর
হাকন্দে যখন হইল প্রথম দণ্ড রাত্রি	
বামপদে লাউসেন রাজা বসাইল কাটি।	হাকণ্ডে যখন হলো গত একদণ্ডে
বামপদের মাংস কাটি যজ্ঞকুণ্ডে দিল,	দক্ষিণ উরুর মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে ॥
জাতিপুষ্প হয়ে ধর্মের চরণে পড়িল।	
হাকণ্ডে যখন হইল দুই দণ্ড রাতি	হাকন্দে যখন হইল দুই দণ্ড রাতি
দক্ষিণপদে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি।	বামউরে বসাইল হীরাধার কাতি ॥
দক্ষিণপদের মাংস কাটি যজ্ঞকুণ্ডে দিল।	তাহাতে জন্মিল পুষ্প জাতি আর যুথী
যুথি পুষ্প হয়ে ধর্মের চরণে পড়িল।	প্রভু পাদপদ্মে পড়ে তিন দণ্ড রাতি।
যখন হইল তিন দণ্ড রাতি	
বামপাসে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি।	
বাম মাংস কাটি যজ্ঞকুণ্ডে দিল।	
কুসুমপুষ্প হয়ে ধর্মের চরণে পড়িল।	
হাকন্দে যখন হইল চারিদণ্ড রাত্রি	
দক্ষিণ পার্শ্বে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি	
দক্ষিণ পার্শ্বে মাংস কাটি যজ্ঞকুণ্ডে দিল।	উপজিল কুসুম কমল শতদলে
করবি পুষ্প হয়ে ধর্মের চরণে পড়িল ॥	অমনি পড়িল যেয়ে প্রভু পদতলে ॥
যখন হাকন্দে হইল পাঁচদণ্ড রাত্রি	
বামস্কন্ধে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি।	বামপাশে বসাইল হীরাধার কাতি
কাটি জজ্ঞকুণ্ডে দিল।	রক্তমাংসে কুসুম হইল কোকনদ।
টগর পুষ্প হয়ে ধর্মের চরণে পড়িল ॥	পড়ে যেয়ে যেখানে প্রভুর রাঙ্গাপদ ॥
হাকন্দে যখন হইল ছয় দণ্ড রাত্রি	ঘৃতকাষ্ঠে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলে দুরদুর
দক্ষিণ স্কন্ধে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি।	ছয় দণ্ডে বসাইল হীরাধার ক্ষুর।
ঐ মাংস কাটি জজ্ঞকুণ্ডে দিল।	
আকিন্দা হইয়ে ধর্মের চরণে পড়িল ॥	
হাকন্দে যখন হইল সাত দণ্ড রাত্রি ॥	হাকন্দে যখন হল নিশাসাত দণ্ডে

প্রাপ্ত পদ

পৃষ্ঠদেসে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি।
ঐ মাংস কাটি যজ্ঞকুণ্ডে দিল।
বিল্বদল হয়ে ধর্মের চরণে পড়িল।
হাকন্দে যখন হইল আট দণ্ড রাত্রি
বক্ষদেসে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি
ঐ মাংস কাটি রাজা যজ্ঞকুণ্ডে দিল।
জবাপুষ্প হয়ে ধর্মের চরণে পড়িল ॥
হাকন্দে যখন হইল নয় দণ্ড রাত্রি
গলদেসে লাউসেন রাজা বসাইল কাতি।
ঐ মাংস কাটি যজ্ঞকুণ্ডে দিল।
কোমল শতদলে ধর্মের চরণে পড়িল ॥

ধুয় : ওকি হলরে হায় হায় হাকন্দে নব
খণ্ড হইল মহাশয়

ধুয় : ভক্তমোল ভাল হল।
এ নামের মহিমা গেল ॥

ধুয় : রইতে নারলে তাইতে প্রাণে তবে কেন
দুঃখ দিলে
হায়গো তোমার নামের জাহাজ ডুবে
যাবে বনে।

মুদ্রিত পুস্তকে পাঠান্তর

ভুজদণ্ডদ্বয় মাংস কেটে দিল কুণ্ডে ॥
করবী কাঞ্চন কুন্দ হল সেই ক্ষণে।
অমনি পড়ি যেয়ে প্রভুর চরণে ॥
হাকণ্ডে যখন নিশাগত অর্ধদণ্ডে
কাটিয়া পৃষ্ঠের মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে
চাঁপা পুষ্প হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে ॥
তবে রাজা স্তব করে প্রভু নিরঞ্জনে ॥

গলায় বসায়ে কাতি করেন মিনতি
ত্রাহি মাম্ পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ ভগবান
পশ্চিম উদয় দেহ নহে লহ প্রাণ
একঠাঁই মুণ্ড পড়ে আর ঠাঁই কায়া
নবখণ্ড হাকন্দে হইল মহাশয়।

৩। **কেন্দ্রগড়িয়া** (খয়রাশোল) : ধর্মের গাজেনে পূর্বে ডোমরা এই গীত গাইত—

ঢাক'ত পেলাম প্রভু কাঠি কোথায় পাই
সাঁতালি পর্বতে আছে কড়ারের গাছি,
আগা গোড়া কেটে মধ্যে কড় কাঠি···

৪। **কৃষ্ণপুর** (খয়রাশোল) : গ্রাম বিবরণী দ্রষ্টব্য।

৫। **বড়রা** (খয়রশোল) : গাজনের শ্লোক

জলবন্দ স্থলবন্দ, দেবেন্দ্র দেয়াশী বন্দ
খাট পাট, লাঠি বন্দ পাতালে পা দুর্গাবন্দ
সরস্বতীর গান
ডাইনে ঠাকুর বন্দ, বামে হনুমান···।

এরপর ভক্ত্যারা শুয়ে শুয়ে সর্ব দেবতাকে আহ্বান জানয়।

৬। **মামুদপুর** (খয়রাশোল) : গ্রাম বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৭। **জামথলি** (দুবরাজপুর): বাণেশ্বরকে স্নান করাবার সময় চারিদিকের ধর্মরাজদের নাম ধরে ডাকা হয় ও একটি শ্লোক আবৃত্তি করা হয়। শ্লোকটি লুপ্তপ্রায়—

…ডাইনে ডাকু, বামে বীর হনুমান
জামথলিতে যে ধর্মরাজ আছেন তাঁর চরণে
কোটি কোটি প্রণাম।

৮। **মেটেল্যা** (দুবরাজপুর): চড়ককে নিমন্ত্রণ জানাবার পর গলবস্ত্র হয়ে ভক্ত্যারা সমস্বরে চারিদিকের ধর্মরাজদের আহ্বান জানায় এবং বলে—

দেববন্দন দেয়াশী বন্দন আড়বন্দন
সরস্বতীর বাণ
ডাইনে ডাকিনী বন্দন বাঁধেন হনুমান
মেটেল্যার ধর্মরাজ তাঁর চরণে প্রণাম…

৯। **গোয়ালপাড়া** (বোলপুর): গ্রাম বিবরণী দ্রষ্টব্য।

১১। **কালুহা ও জগদীশপুর** (রামপুর হাট): ধর্মপূজায় যে সমস্ত গান হয়—

ক। আম ধরে থোকা থোকা
তেঁতুল ধরে বাঁকা
আর পাড়া পড়শীর মাথা খেয়ে
ভাঁড়ের হাতে শাঁখা
হায় কি মজা হায়, হায় গো।

খ। ওরে ভক্ত মরে রক্ত খেয়ে
ঢুকে মরে জরে
ঢাক কাঠিখানি বাজিয়ে দাও
দেয়াশিন ঘরে।
মরি হায় হায় গো

গ। ব্যোম ব্যোম ভোলা হর
আজকের রাতটা পুরণ কর
ওরে সোনা নয় রূপো নয় ধুধুরা ফুটি
ব্যোম ব্যোম ব্যোম হর
আজকের রাতটা পুরণ কর।

১২। **লায়েকপুর** (লাবপুর): বোলান গানের নমুনা—

মোলাম মোলাম মোলাম সখি
জল বিনে প্রাণ বাঁচে না,
জল হয় কেবল রথের দিনে
এই কি বাবার মহিমা।

১৩। **কুন্দুড়ি** (সাঁইথিয়া):

কাশীর বিশ্বেশ্বর রাজরাজেশ্বর মৌলেশ্বর
পুরন্দরপুরে পুরন্দর আছেন। দক্ষিণে যত দেবতা আছেন
দ্বাদশ প্রণাম।
উত্তরে স্বগুণপুর বাবা খেলারাম আছেন জাজল্যমান
বাবা বীর হনুমান।
উত্তরে যত দেবতা আছে দ্বাদশ প্রণাম।
পুর্বদিকে যত দেবতা আছে……ইত্যাদি।

১৪। **মালাবেড়িয়া** (সাঁইথিয়া): গ্রাম বিবরণী দ্রষ্টব্য।

১৫। **অবিনাশপুর** (সিউড়ী):

ঘাট বন্দন লাঠি বন্দন
আখলে ভকত বন্দন
বামে বীর হনুমান, ডাইনে দামোদর
বাবা অবিনাশপুরের ধর্মরাজ চরণে প্রণাম।

১৬। **জীবধরপুর** (সিউড়ী): অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে ভক্ত্যারা গায়—

ধরম পাট, ধরম খাট ধরম সিংহাসন
সেই পাটে বসে আছেন দেব নিরঞ্জন
ঘাট, পাট, লাঠি বন্দ, এসো ভাই ভগবন্দ
ডাইনে দামোদর বাঁয়ে বীর হনুমান
সম্মুখে জয় জয় করে অধর্মের স্থান
সিজেকডাং-এর গাদিতে যে ধর্মরাজ বসে আছেন
তাঁর চরণে প্রণাম……ইত্যাদি।

১৭। **পুরন্দরপুর** (সিউড়ী): দাদুড়ঘাটার শ্লোক—

জলবন্দন, স্থলবন্দন, দেববন্দন, দেবাংশী বন্দন
ডাইনে হনুমান।
বামে যোগিনী, শিরে তুলি লইলাম বাবার জয়জয়ন্তী বাণ॥

১৮। **লম্বোদরপুর** (সিউড়ী): দ্বাদশঘাটার শ্লোক—

আড়ি বন্দন, বারিবন্দন সরস্বতীর বাণ
ডাইনে দামোদর বাঁয়ে বীর হনুমান……ইত্যাদি।

তারপর উত্তরে শিববন্দনা, পুর্বে গঙ্গাবন্দনা, পরে বৈদ্যনাথ বন্দনা, দক্ষিণে জগন্নাথ বন্দনা, পরে সকল দেবতার বন্দনা।

১৯। **ছাড়াইপুর** (সিউড়ী): বাণগোঁসাইকে স্নান করবার সময় যে শ্লোক আবৃত্তি করা হয়—

ঘাট বন্দন, পাট বন্দন, এদের ভকত্ বন্দন
বামে বীর হনুমান…… ।

২০। **চিঁচুড়িয়া** (বর্ধমান) : পাতাভরা উৎসবের শ্লোক—

ক। আশপাশে লাঠি বন্দন, ডাইনে ঠাকুর বন্দন, বামে বীর হনুমান

খ। ঢাকতো পেলামরে ভাই কাঠি কোথা পাব, অরণ্যের বনে।
কাঠির সন্ধানে যাও সাঁওতাল পরগণে।

গ। কেমনে জানিব প্রভু চিরল পাতা তার রক্তবর্ণ জ্যোতি,
আগা পিছা ফেনাইয়া তার মধ্যখানে কাঠি।

ঘ। ঢাক সে-জন হল যে এবার উতরি সে-জন এসো
ধামাৎ কন্যা তুলে দিল পাটভক্ত্যার হাতে।
পাটভক্ত্যা তুলে দিল ভক্ত্যার গলাতে।

২১। **সিঙ্গুর** : ভাঁড়াল নড়ানোর শ্লোক—

ধবলখাট, ধবলপাট ধবল সিংহাসন
তাতে বসে বিরাজ করেন বাবা ধর্মনিরঞ্জন
হাট ঘাট, লাঠি বন্দন, ডাইনে দামোদর বন্দন
বাবা বীর হনুমান। পূর্বদিকে বেলেতে যে বাবা
ধর্মনিরঞ্জন আছেন তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম……ইত্যাদি।

২২। **ঘাসিয়াড়া** (মুর্শিদাবাদ) : ধর্মপূজার সময় গীত পাঁচালীর নমুনা—

ক। রাবণ রামকে জাননা
পূর্ণ ব্রহ্ম রাম করলে যাহার নাম, ভব ভয় রবে না।
রামেরও মহিষী সেই পূর্ণ শশী জনক নন্দিনী সীতা,
করলি তাঁরে চুরি করিয়ে বড় চাতুরী বাহাদুরী খাটবে না।

খ। আসিতে বসিয়ে বাঁশীতে ভুলিয়ে দেখেছি পাখাইয়ে
মনে কি পড়ে না ?
শোন হে প্রাণকান্ত মদনে কর শান্ত বিরহ যাতনা
দিও না দিও না
শোন হে প্রাণবন্ধু নিশি যায় শুধু শুধু মরমে বেদনা
দিও না দিও না…… ।

(ঙ) ধর্মঠাকুরের ধ্যানমন্ত্র

ধর্ম পূজাবিধানে ধর্মঠাকুরের যে ধ্যানমন্ত্র যা পাওয়া যায় তা এই—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ কর চরণৌ নাস্তি কায়া ন নাদঃ
নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয় মরণে নাস্তি জন্মান যস্য।

যোগেন্দ্রৈধ্যান গম্যং সকল জন ময়ং সর্বলোকৈক নাথম্
ভক্ত্যানাম কামপুরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্য মূর্তিং"

এই ধ্যানমন্ত্র অর্ধশিক্ষিত পুরোহিতের মুখে কিভাবে বিকৃতি লাভ করেছে তা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু সংগ্রহ করে দিলাম। ধর্মঠাকুরকে যমরাজা বলেও পুজা করা হয়। তারও যা মন্ত্রাদি পেয়েছি এখানে দেওয়া গেল। একটি মাত্র প্রণামের শ্লোক পাওয়া গেছে কড্ডাং গ্রামে। এক শ্লোকটি একটু পরিবর্তিত রূপে "ধর্মপুজা বিধানে" বর্তমান।

সংগৃহীত ধ্যানমন্ত্রাদি

১। কেন্দ্রগড়িয়া

"ধূং ধর্মরাজায় নমঃ (বীজ)
যস্যান্তং নাদিমধ্যম্ নাস্তি কায়ৈ নিনাদং
ন চ কর চরণং ন চ ভয় মরণং যোগীন্দ্রং
ধ্যানং গম্যং সকল পুণময়ং পাতুনঃ শূন্যমূর্তি।"

২। কৃষ্ণপুর

বীজঃ-ধাং ধ্রং ধর্মরাজায় নমঃ
"যস্যান্তং···সর্বলোকৈকনাথং
তারপর—"ভক্তানাং কামদায়ী ত্রিভুবন বিজয়ী পাতু নঃ শূন্যমূর্তিং।"

৩। মামুদপুর

"নমঃ নমঃ পুষ্পায় নমঃ। ধাং ধূং ধর্মরাজায় নমঃ"

৪। কড্ডাং

"ওঁ ধর্মতবং ধর্মরূপোসি নির্ণোমসি নিরঞ্জন
প্রেতারিষ্টমিদং দেব নশেয়ত্বং সদা প্রভো ওঁ
ধর্মরাজায় নমঃ। ধাং ধীং ধূং।"

প্রণাম মন্ত্র : "রাজদ্বারে তথারণ্যে পৃথিবীতে সমাকুলে
সর্বত্র ত্রাহি রক্ষমমাম ধর্মরাজায় নমোস্ততে।"

(দ্রঃ—এই শ্লোকগুলি একটি পুরাতন কাগজে লিখিত ছিল অবিকল নকল নিয়েছি)

৫। ছিনপাই

"যস্মাতং নাদিমধ্যং ন চ কর চরণং
নাস্তিকায়াং নিনাদং নকারং নাস্তিরূপং যস্মান
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সর্বসং কলপ মিদং মেকং
সুরবরদং চিন্তয়েৎ ছন্নামুজং।"

৬। মেটেল্যা

"ধাং ধূং ধর্মরাজায় নমঃ।"
"যস্যান্তং……ইত্যাদি শুধু শেষ দুই চরণ এই রকম—
"ভক্ত্যানাং কামপূরণং ত্রিভুবন বিজয়ী নশূন্যমূর্তিং।"

৭। মোহনপুর

বাণেশ্বরের ধ্যান—

"ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণা সাগরায়
দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় শূন্য মূর্তয়ে
মে বরং দেহি ওঁ বাণেশ্বরায় নমঃ"

৮। নান্দড়া

"যস্যান্তং নাদিমধ্যং নাস্তিকায়া নিনাদং নচ
কর চরণম্ সকল জলময়ং সর্বজীবৈকনাথম
এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ ধর্মরাজায় নমঃ।"

৯। মহুলা

"ওঁ বিশ্বন্তং নাদিমধ্যং ন চ কর চরণং
নাস্তিকায়ং নিনাদং নাকারং নাস্তিরূপং
ন চ ভয় মরণং নাস্তি জন্মৈক যস্য যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং
কমল দলগতং সর্বসঙ্কলপ্ বীজং
এতদ দেবাদিদেব সুরগণ বরদাং চিন্তয়েৎ নাস্তিরূপং।"

১০। খয়রাকুঁড়ি

ওঁ যস্যাস্তং নাদিমধ্যং নকারং নৈতুলব্যং
নিনাদং যস্যাস্তং নাদিমধ্যং নকারং ধর্মরাজায় নমঃ।"

১১। তেঁতুলবাঁধ

"যস্তদং নাদিমধ্যং না করং নৈবরূপং মৃ ন চ
ভয় মরণং নাস্তিটক ধূং ধাং ধর্মরাজ
রাজ্যেশ্বরায় নমঃ।"

১২। জ্যোল্ল

বীজ: "ধাং ধর্মরাজায় নমঃ"
"নিরঞ্জনং নিরাকরং ব্যাপ্ত যেন চরাচরম
ধবলং বাহনং ছত্রং ধর্মরাজং নমোস্তুতে।"

১৩। কেন্দুয়া

"যস্যান্যং নাড়িকে মধ্যে ন চ কর মরণং নাস্তিকায়ং
নৈরাকারায় ধাং ধীং ধর্মরাজায় নমঃ।"

১৪। কোদাইপুর

"যস্তত্বং নাতিমধ্যং ন চ কর চরণং
নাস্তিকায়ং নিদামং নাকারং নাস্তিরূপং
নাস্তি জন্ম যস্য যোগীন্দ্রং
ধ্যানগম্যং সকল মনোরথং দেবাদিদেবং
ধাং ধিং ধর্মরাজায় মনঃ।"

১৫। ছোড়া

"নাভিমধ্যো নকারং নাস্তি জন্মে বহুযস্য
যোগীনাং গম্যকথং বরদাং সর্বসঙ্কল্পন্ত।"

১৬। পুরন্দরপুর

"যশ্চন্দনং অনাদিমধ্যং ন চ কর চরণং
নিনাদং, নস্তরূপং ধ্যান কূর্ম সৌম্য মূর্তি
নৈরাকারণং।"

১৭। বাতাসপুর

"নাভিমধ্যং নকারং নাস্তি জন্ম বহুযজ্ঞ
যোগী নং, গম্যকথং বরদং সর্বসঙ্কল্পমস্ত।"

১৮। ভগবানবাটি

"যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূত ক্ষমায় চ
ঔড়ুম্বরায় দধনায় নীলায় পরমেষ্টিনে
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ এতে গন্ধে
পুষ্পে, ধাং ধীং রঘুনাথ ধর্মরাজায় নমঃ।

১৯। লম্বোদরপুর

"নিরঞ্জনং নিরাকারং নৈরাকাং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতং"

২০। সিউড়ী

"যস্মস্তং নাদিমধ্যং ন চ কর চরণম্
নাকারং নৈবরূপং ন চ ভয় মরণং
নাস্তি জন্মৈব শেষম যোগীন্দ্র ধ্যানগম্যং
সকল জনগত সংকল্প হীনং
তত্রাপিক নিরঞ্জনং
অমর বরদ পাতু য যস্যাং শূন্য মূর্তিঃ।"

(চ) রোগমুক্তি

ধর্মঠাকুর রোগমুক্তিরও দেবতা। নানাবিধ ব্যাধি ধর্মঠাকুরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করে বলে লোকবিশ্বাস। নিঃসন্তান গ্রামবাসিগণ সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানায়। লোকের বিশ্বাস অনাবৃষ্টিকালে ধর্মঠাকুরের পুজা দিলে অবিলম্বে সুবৃষ্টি হয়। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হলে ধর্মঠাকুরের পুজা করতে হয়, তা তো ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকেই জানা যায়। চক্ষু রোগ এবং মৃতবৎসার সন্তান নাশ নিরোধ করবার উদ্দেশ্যেও ধর্মঠাকুরের পুজা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও নানবিধ তুকতাক ও মাতুলী ধারণের ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান থেকে ধর্মঠাকুরের রোগমুক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে লোক বিশ্বাস এখানে কিছু সংকলন করে দেওয়া গেল—

কড্ডাং (দুবরাজপুর) : গ্রামের আদিরাক্ষ্য ধর্মরাজের পুষ্প হাঁপানি রোগের বিখ্যাত ঔষধ। চাঁদ রায়ের নিকট রাতকাণার ঔষধ পাওয়া যায়।

গোয়ালপাড়া (বোলপুর) : গ্রামের ধর্মরাজের নিকট রাতকাণার ঔষধ পাওয়া যায়।

বেলিয়া (সাঁইথিয়া) : গ্রামের ধর্মরাজের স্বপ্নাদ্য তৈল ও পুকুরের মাটি বাত-ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ বলে প্রতি রবিবার দেওয়া হয়। নিকটবর্তী পুকুরে স্নানও করে রোগীরা। আষাঢ়ের প্রথম রবিবার ঔষধ নেবার শ্রেষ্ঠ দিন বলে কথিত।

মালাবেড়িয়া (সাঁইথিয়া) : গ্রামের ধর্মরাজের নিকটও বাত-ব্যাধির ঔষধ পাওয়া যায়। এখানেও বেলিয়ার মত আষাঢ়ের প্রথম রবিবারে পাঁচ ছয় হাজার রোগী আসেন।

দুবরাজপুর (থানা দুবরাজপুর) : গ্রামে এলোরায়ের যজ্ঞে আহুতি দেওয়া কদলী সেবনে বন্ধ্যা রমণীরা সন্তানবতী হবার আশা করেন।

উষগ্রামের (সিউড়ী) : ধর্মরাজ হাত-পা ভাঙ্গা ও স্ত্রী ব্যাধি নিরাময় করেন।

গাংটে (সিউড়ী) : গ্রামের ধর্মরাজের স্থানে চোখে ছানি পড়ার ঔষধ পাওয়া যায়।

হাটইকড়া (সিউড়ী) : গ্রামের ধর্মরাজ সান্নিপাতিক জ্বর, মুখে ঘা, হাঁপ বাধক, প্রদর, একশিরা প্রভৃতি রোগ সারাতে পারেন বলে প্রবাদ।

কোমা (সিউড়ী) : গ্রামের ধর্মরাজের নিকট আমাশয় ও অন্যান্য নানা রোগের ঔষধ পাওয়া যায়।

.**খুজুটিপাড়া** (নান্নুর) : ধর্মরাজের স্নানজল সেবনে দুরারোগ্য বহু ব্যাধি (সংযমের মধ্যে আবদ্ধ থেকে) হতে মুক্ত হওয়া যায় বলে প্রবাদ।

জ্যোল (সাঁইথিয়া) : গ্রামের ধর্মরাজের নিকট মূর্ছা রোগের ঔষধ পাওয়া যায়।

লাঙ্গুলিয়া (সিউড়ী) : গ্রামের খোঁড়া রায় ধর্মরাজের কাছে আয়না মানত করলে চোখ ভাল হয় বলে প্রবল লোকশ্রুতি।

সিতুলী (সিউড়ী) : গ্রামের ধর্মরাজের নিকট শ্বেতকুষ্ঠের ঔষধ পাওয়া যায়। আগুনের ফুলখেলার পর সেই ছাই প্রয়োগ করতে হয়।

বারুইপুর (ইলামবাজার) : গ্রামে লাউসেন প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরের পুষ্প ঘোড়ায়

চড়িয়ে গ্রাম ঘোরানো হয়। সেই ফুল বিবিধ অসুখ-বিসুখ ভালো করতে পারে সেই আশায় গ্রামবাসীরা গ্রহণ করেন।

সুগুণপুর (মহম্মদবাজার) গ্রামে শূকর রক্ত দিয়ে যে তেল ও ঔষধ তৈরী করা হয় তা ধবল, পদ্মকাঁটা, খুর্শেলাগার মহৌষধ মনে করে বহুলোক ঐ ঔষধ গ্রহণার্থে আসে।

জামথলি (দুবরাজপুর) গ্রামের ধর্মরাজের নিকট অর্শ, বাধক ও ধবলের ঔষধ পাওয়া যায়।

কালুরায়পুর (বোলপুর) গ্রামের ধর্মরাজ ধবল, বাত প্রভৃতি বহু অসুখে ঔষধ দেন।

লখীন্দরপুর (সিউড়ী) গ্রামের ধর্মরাজের নিকট হাত ভাঙ্গার তেল ও ঔষধ মেলে।

তেঁতুল বাঁধের (রাজনগর) ধর্মরাজ স্ত্রীরোগ ও অর্শের ঔষধ দেন।

চিঁচুড়িয়া (বর্ধমান) গ্রামে ধর্মরাজকে যেদিন স্নান করানো হয় সেদিন মহাব্যাধি-গ্রস্তরা ঠাকুরের কাছে মানসিক করে দণ্ডী কেটে পুকুরঘাট থেকে মন্দির পর্যন্ত যায়। ঐ সময় দেয়াশী ও পুরোহিত ধর্মরাজের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানাপ্রকার ছড়া কাটেন।

বাতব্যাধিগ্রস্তরাও দেবতার কাছে মানসিক করলে আরোগ্য লাভ করে বলে প্রবাদ।

পা দ টী কা

১. 'রামপুরহাট থানায় বড়জোলে বসুমতী দেবী আছেন। নাককাটি ঠাকুর ও বসুমতী দেবী এবং ধর্মরাজ ঠাকুরের বৎসরে দুইবার আষাঢ় সংক্রান্তি ও পৌষ সংক্রান্তিতে বেশ ধুমধামের সহিত পূজা হয়।' বীরভূম বিবরণ—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪।

২. অক্ষয় তৃতীয়া—বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ার দিন। বৈষ্ণবদের কাছে মহাপুণ্যের দিন। এই দিনেই সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছিল বলে কথিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—'খৃষ্ট পূর্ব ৩২৫০ অব্দে, সূর্য ও রোহিণী তারা এক সূত্রে আসিলে মহাবিষুব হইয়াছিল। সেদিন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইয়াছিল। সেই হেতু এই পূর্ণিমার নাম জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।' 'পূজাপার্বন'—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৃষ্ঠা ৬৪।

বৈশাখী পূর্ণিমা—বুদ্ধ পূর্ণিমা, বৈষ্ণবদের ফুলদোল উৎসব এবং বিষ্ণুর চন্দনযাত্রার দিন।

৩. "গাজনের সন্ন্যাসী" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

অনুষ্ঠানাদির পরিচয়

পূজার পূর্বের অনুষ্ঠানাদি

মাঠ তোলা, ঘটের মুখে সাতস্তর কাপড় রেখে জলপূর্ণ করা, রাখীবন্ধন, বারো কাঠি ধারণ, মহামিলা, আপাল গাজন, মাণিকধোয়া, মুকতোলা, মুক্তধোয়া, ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করানো, দধি মঙ্গল, বাণামো ছোট এবং বড়, থান ছাঁটা, লাখরাজ ভাঙ্গা, ফলভাঙ্গা, হাটবেড়া, গ্রাম বেড়া, বনবেড়া, গোরখেলা, দ্বাদশখাটা, দ্বাদশ দেওয়া, পাতাভরা, ভাঁড়াল জাগানো, মদে স্নান করানো, বিবিধ বাণ খেলা, দেয়াশীর মাথায় ভোগ রান্না, কলসী দিন, হটং টং টং, আঙ্গরা পুজা, উলঙ্গ দেয়াশীর কলাপাতা পরিধান, খুদের টোকায় ধর্মরাজ, বাণগোঁসাই-এ ফল বিদ্ধকরণ, বারো মুঠি ছোলার শীতল, গাজন বন্ধন, ধর্ম ডাক ও জাঁক, আলো উৎসর্গ, তালের গুঁড়ি জাগানো, ঘোড়ার ভরণ, কাঁচমাড়া।

পূজার দিন ও পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানাদি

চামুণ্ডার মুখোশ পরে নাচ, মাণিক ভাঁড়াল, দুধ ভাঁড়াল, মন্দির প্রদক্ষিণ, ভাঁড়াল ভাসানো, মদের জালু পুজা, ভৈরবের নিকট ভাঁড়াল, দক্ষিণা কালীর কাছ থেকে ভাঁড়াল আনা, হিন্দু বিবাহ প্রথায় ভাঁড়াল পুজা, রাজভাঁড়ালে শূকর মস্তক, ফুল ভাঁড়াল, গাছ মঙ্গলা, চড়ক গাছ তুলে পুজা, নিমপাতা চিবানো ও তিলক, জাঙ্গাল দেওয়া, ব্রাহ্মণের ধর্মশিলা বহন, ব্রাহ্মণ গৃহে গৃহে মাংস বিতরণ, ধীবর সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকাণ্ড, পুজার পুর্বেই চড়ক, বাটা পুজা, বাবুই খেলা, চতুর্থ দিনে উত্তরীয় ধারণ ও কানে তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরে প্রসাদ ভক্ষণ, মুদ, জলক্রীড়া, হরির লুঠ, ঘোড়াপুজা, ঘোড়া নৃত্য, মুণ্ড পুজা, ধর্ম যজ্ঞ, বলির বিবিধ বৈচিত্র্য।

(ক) পুজার পুর্ব দিনগুলি

"ধর্মপুজাবিধানের" মতে দ্বাদশ ভক্ত্যার ব্রতী হবার নিয়ম। কিন্তু বর্তমানে ভক্ত্যা সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। ২০।২৫ জন থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ জনও হয়। প্রায় সকল সম্প্রদায়ের।

১। **পূর্ণিমার ১৫ দিন পূর্বে সূচনা** : পূজার পক্ষকাল পূর্বে প্রতিপদের দিন ২ জন ভক্ত্যাকে কামাতে হয়। ছয়দিন সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় হবিষ্যান্ন গ্রহণ। ৯ দিন সারাদিন উপবাসের পর মাত্র ফল জল গ্রহণ করতে হয়। কেউ ৯ দিনের ভক্ত্যা কেউ ৫ দিনের ভক্ত্যা, কেউ ৭ দিনের ভক্ত্যা হয়। ৯ দিনের ভক্ত্যারা ৫ম দিনে এবং ৫ দিনের ভক্ত্যারা ২য় দিনে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। যারা তিন দিনের ভক্ত্যা তারা ১ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। এইটিই এতদঞ্চলের প্রচলিত নিয়ম, কিন্তু এর আবার নানারকম ব্যতিক্রমও আছে।

২। **আটদিন পূর্বে ঘটস্থাপনা ও মাঠতোলা** : পুরন্দরপুর ও তাঁতিপাড়া গ্রামে পূর্ণিমার আগের অষ্টমীর দিন ঘটস্থাপনা। ঢাকের ঢেমূল বসে তখন থেকেই। কৃষ্ণপুর গ্রামেও আটদিন আগে ঘটস্থাপনা করে বিশেষ পূজা হয়। ঘুরিষা গ্রামে আটদিন আগে থেকে মাঠ তোলা হয়। অর্থাৎ মঞ্চ তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়। কামারহাটি ও শ্রীকণ্ঠপুরেও তাই।

৩। **ঢেমূল** : ছিনপাই গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমার আটদিন পূর্ব হতে সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে ঢাকবাদ্য, সন্ধ্যা, ধূপদীপ ইত্যাদি বিশেষভাবে দেওয়ার রীতি আছে। কুড়ামিঠা গ্রামে উল্টোরথের দিন থেকে সকাল সন্ধ্যায় ঢাকের ঢেমূল বসে।

৪। **ঘটের মুখে সাতস্তর কাপড়** : বামুনডি (সাঁওতাল পরগণা) গ্রামে ঘটের মুখে লাল কাপড় সাতস্তর রেখে জলে চুবানো হয় যতক্ষণ না ঘটটি পূর্ণ হয়।

৫। **তিন দিন আগে বারি আনা** : শূদ্রাক্ষিপুরে (সাঁওতাল পরগণা) পূজার তিন দিন আগে পুকুর থেকে বারি আনা হয়।

৬। **নয় থেকে তেরো জন ভক্ত্যা হওয়ার প্রথা** : স্বপুর গ্রামে ন্যূনপক্ষে ৯ জন এবং ঊর্ধ্ব পক্ষে ১৩ জন ভক্ত্যা হয়। এর ব্যতিক্রম হলে চলবে না।

৭। **উত্তরীয় ধারণ** (উত্তরী বা উতুরী) : ধর্মভক্ত্যাদের পুর্ণিমার আগের দিন মুক্ত স্নানান্তে উত্তরীয় ধারণ করতে হয়। চলিত কথায় বলে উতোরী বা উত্তুরী। ভক্ত্যারা পৈতার মত কণ্ঠে সূত্রগুচ্ছ ধারণ করে। অদীর্ঘ মাল্যবৎ নয়গাছি সূত্র ভক্তকণ্ঠে ধারণ।

"নিবীতভাবে নিবীতং কণ্ঠলম্বিতং"—ইত্যমরঃ।

৮। **বাণগোঁসাই-এর উত্তরীয়** : পূজানুষ্ঠান শেষে ভক্ত্যারা হয় বাণেশ্বরের শলাকায় উত্তরীয়গুলি জড়িয়ে রাখে নয় জলে বিসর্জন দেয়। আবার অনেক স্থানে বাণগোঁসাইকেও ভক্ত্যাদের সঙ্গে উত্তরীয় পরানো হয়।

৯। **দেবগোত্র ধারণ** : এই উত্তরীয় ধারণের পর মনে করা হয়, ভক্ত্যারা স্বগোত্র ত্যাগ করে দেবগোত্র ধারণ করে[১]। রাতমা গ্রামে পুর্ণিমার পরের দিন ভক্ত্যারা উত্তরীয়গুলি উপবীত আকার থেকে পরিবর্তন করে গলদেশ মাল্যবৎ ধারণ করে। সেগুলি পঞ্চম দিনে অর্থাৎ তৃতীয়ায় বিসর্জন দিয়ে থাকে।

১০। **রাখীবন্ধন** : মহুগ্রামে ভক্ত্যাদের মধ্যে রাখীবন্ধন হয়। অবশ্য পুর্ণিমার দিন।

১১। **বারো কাঠি ধারণ** : কোনো কোনো গ্রামে ভক্ত্যারা গলায় উত্তরীয় নেবার সময় দ্বাদশ কাঠি ধারণ করে[২]। গ্রাম কুমারপুর।

১২। **মহামিলা** : গোখাদক ভিন্ন সর্ব সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষ যে ব্রত বা বারানুষ্ঠান করে ও উত্তরীয় ধারণ করে তাদের মহামিলা ভক্ত বলে। "মহান্তি উত্তরীয় ধৃত বৃহদভক্তগণৈঃ সহ মিলান্তি যে তে মহমিলা"—ইত্যমরঃ। মোহনপুর গ্রাম।

১৩। **বেত্রধারণ** : সিঙ্গুর গ্রামে ধর্মপুজার চতুর্থ দিনে দেয়াশী, বাণগোঁসাইকে কাঁধে নিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহকারে ভক্ত্যাদের সঙ্গে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী যান। এই সময় ভক্ত্যাদের হাতে এক প্রকার বেতের ছড়ি থাকে। কুবীরপুর, লায়েকপুর, সাঁইথিয়া, সুগুণপুর গ্রামেও তাই। গঙ্গালপুর গ্রামে ভক্ত্যারা উত্তরীয় ধারণের দিন বেতের ছড়ি ধারণ করে অবিরত ধর্মরাজের নাম করতে থাকে। প্রায় সকল ধর্মস্থানেই ধর্মশিলার সঙ্গে একগাছি লতানো বেত রক্ষিত থাকে[৩]। লাঙ্গুলিয়া গ্রামে শুনেছি হাতে বেত থাকার অর্থ হল, এর জন্য কেউ বাণ মারতে পারে না।

১৪। **আপাল গাজন** : নির্দিষ্ট দিনে গাজনাদি না হয়ে বৈশাখ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত যে কোনো পুর্ণিমায় গাজনাদি হলে তাকে বলা হয় আপাল গাজন। (এর বিপরীত কথা হল বাঁধা গাজন, গ্রাম সুপুর—সুন্ধ রায়ের গাজন হল আপাল গাজন)।

১৫। **মুক্তস্নান বা মুক্তিস্নান** : ধর্মপুজার পুর্বদিন ঘাটে সন্ধ্যার পর দেবাংশী ও ভক্ত্যারা মহাসমারোহে ধর্মরাজ ও বাণেশ্বরকে নিয়ে গ্রাম পরিবেষ্টন করে স্নানঘাটে উপনীত হয়। দেবাংশী সেখানে স্নানান্তে অধিবাস মন্ত্র বলেন। তারপর ভক্ত্যারা স্নানান্তে সমবেতভাবে ধর্মরাজকে ডালায় রেখে এক কোমর জলে গিয়ে স্নান করায়। সেই সময় উপবাসী কোনো ভক্ত্যা গব্যদুগ্ধ, কড়ি, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করে। এর নাম মুক্তস্নান। অর্থাৎ "স্নানেন মুক্ত"। এই অনুষ্ঠানকে বাণামো বা দাদুড়ী ঘাটাও বলা হয় বহুস্থানে। (অনুষ্ঠান নং ২৪ ও ২৬ দ্রষ্টব্য) পালিগ্রামে রথে চড়িয়ে ধর্মরাজকে মুক্তস্নানে নিয়ে যাওয়া হয়। রায় রামচন্দ্রপুরে পুর্ণিমার আগের দিন রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সুবৃহৎ কাঠের ঘোড়ার পিঠে দু'জন ব্রাহ্মণ রূপার সিংহাসনে বিগ্রহ নিয়ে বসেন। গ্রামবাসীরা ঘোড়াটি টেনে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে মন্দিরে ফিরে আসে।

১৬। **মাণিকধোয়া** : সিঙ্গুর, গঙ্গালপুর, মল্লিকপুর গ্রামে ধর্মশিলাদের স্নান ও ক্রিয়া-কাণ্ডগুলিকে মাণিকধোয়া বলে। (এ সম্পর্কে পাঁচালী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

১৭। **মুকতোলা** : হিজলগড়া, রসা, শিরে, মধুনগর প্রভৃতি গ্রামে পুজার পুর্বদিন গভীর রাত্রে হেটমুণ্ডে শিবপুজার পর একটি বাঁশকে জাগিয়ে আসতে হয়। সেই বাঁশটিকে সকালে কেটে টোকা তৈরী করে সেই টোকায় ধর্মশিলাদের পুরে স্নান করানোকে মুকতোলা বলে।

১৮। **মুক্তধোয়া** : এইরকম অনুষ্ঠানকে মুক্তধোয়াও বলা হয়। বড়ায় যে পুকুরে ধর্ম-রাজকে স্নান করানো হয়, তার নাম মুক্তধোয়া[৪]।

১৯। **১০৮ ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান** : কলগ্রাম, হেতিয়া (মুর্শিদাবাদ) প্রভৃতি গ্রামে মুক্তস্নানের পর ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজলে ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়। বলাবাহুল্য জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার প্রভাব এই অনুষ্ঠানে সুস্পষ্ট।

২০। **চারবার স্নান** : খড়গ্রামে পূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যায় একবার, পরদিন সকালে ও বিকালে দুবার এবং তার পরদিন একবার, ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়।

২১। **গন্ধাধিবাস** : কোমা গ্রামে মুক্তস্নানের সময় ধর্মরাজের গন্ধাধিবাস হয়।

২২। **টোকা ভাঙ্গা** : সিঙ্গুর, বাঁধের শোল, ছিনপাই, নারায়ণপুর, ভবানীপুর (দুবরাজপুর থানা) প্রভৃতি গ্রামে টোকা নিয়ে বিবিধ অনুষ্ঠানকে বলে টোকা ভাঙ্গা অনুষ্ঠান। পূর্ণিমার আগের দিন একজন ভক্ত্যা মাথায় টোকা নিয়ে ভর নামে এবং গ্রামের বাইরে তাকে নিয়ে গিয়ে ভর ছাড়ানো হয়। এরপর হয় বাণেশ্বরের স্নান। পরদিন সকালে আবার তার টোকা মাথায় ভর হয়। একেই বলা হয় টোকাভাঙ্গা। টোকাটি বাজার থেকে কেনা হয়। গায়ে সিঁদুর ছাড়া আর কিছু আঁকা থাকে না। ভিতরে থাকে মিষ্টি, আতপ, আসন অঙ্গুরী, মধুপর্ক প্রভৃতি[৫]।

২৩। **মুক্তস্নানের বিচিত্র শোভাযাত্রা** : সুপুর গ্রামের সুন্ধ রায়ের মুক্তস্নানের শোভাযাত্রা—প্রথমে মুখে বাণ পরে হাতে চামর দুলাতে দুলাতে একজন ভক্ত্যা যায়। তারপর দা-বাণারোহী, তারপর রামচন্দ্রপুর, মীর্জাপুর, রজতপুরের ধর্মরাজ সহ সুন্ধ রায় যান। চারটি ঘাটে দেবতাদের স্নান করানো হয়।

২৪। **দাদুড়ঘাটা, যাদুরঘাটা** : মোহনপুর[৬] গ্রামের পণ্ডিত শ্রীশম্ভুনাথ সরকার ধর্মরাজের পুজারী। তিনি জানিয়েছেন দাদুড়ঘাটার প্রকৃত অর্থ "দৈবিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ঘাট।"

মোহনপুর, পুরন্দরপুর, কুবীরপুর, বেলিয়া (২ দিন হয়), লম্বোদরপুর, আদিত্যপুর, ভগবানবাটি, গোবরা, খয়রাকুঁড়ি, রাইপুর প্রভৃতি গ্রামে দাদুড়ঘাটা বলে।

মহুগ্রাম ও লায়েকপুর গ্রামে বলা হয় যাদুরঘাটা। শেখপুর গ্রামে শিবের বাণেশ্বরকে স্নান করানোকে বলে যাদুরঘাটা। মুড়োমাঠ গ্রামে ধর্মশিলাকে স্নান করানোকে বলে দাদুরঘাটা আর বাণগোঁসাইকে স্নান করানোকে বলে বাণামো।

জুঁইথিয়া গ্রামে শিবকে স্নান করিয়ে চরণামৃত নিয়ে ভক্ত্যারা মনসাদেবীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য করে। একেই বলে দাদুড়ঘাটা।

২৫। **দধিমঙ্গলের ঘাট** : খড়গ্রামের পুজারী জানিয়েছেন, দাদুড়ঘাটা অর্থ, "দধিমঙ্গল অনুষ্ঠানের ঘাট।" ধর্মরাজ এবং বাণেশ্বরের দধিমঙ্গল অনুষ্ঠান হয় সেদিন।

২৬। **বাণামো, বাণামো করানো, বাণামো ঘাটা** : (ক) বাণগোঁসাইকে নিয়ে স্নান ইত্যাদি করানো গ্রাম ঘোরানো হল বাণামো। (খ) বাঁণফোড়াকে বাণামো বলা হয়।

এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মতটিরই সংখ্যাধিক্য। কড্ডাং, নাকাশ, নির্ভয়পুর, বেলিয়া, খয়রাকুঁড়ি, ইকড়া, কেন্দুয়া, সিঙ্গুর, ভগবানবাটি, গোবরা, ইন্দ্রগাছা, কচুজোড় মল্লিকপুর, রাইপুর গ্রামে প্রথম মত চলিত আছে।

২৭। **বড় বাণামো ছোট বাণামো** : ঘুরিষা গ্রামে বাণেশ্বরকে স্নান করানোকে বলে ছোট বাণামো এবং ধর্মশিলাকে স্নান করানোকে বলে বড় বাণামো। পায়ের, ভগবতী বাজার, দেবীপুর গ্রামেও তাই।

২৮। **পাতাভরা** : চিঁচুড়িয়া গ্রামে একে পাতাভরা[৭] উৎসব বলে।

২৯। **গাড়ী বাণামো** : কৃষ্ণপুরে গাড়ীর উপর পা নীচু করে দুলতে দুলতে আগুনে ধূপ নিক্ষেপ করাকে গাড়ী বাণামো বলে। (দোলন সেবা দ্রষ্টব্য—অনুষ্ঠান নং ৬১)।

৩০। **বাণামো নৃত্য** : ছিনপাই, নারায়ণপুর গ্রামে বাণবিদ্ধ অবস্থায় ভক্ত্যাদের নৃত্যকে বাণামো নৃত্য বলে।

৩১। **হেঁটমুণ্ডে বাণামো** : কেন্দ্রগড়িয়া গ্রামে গোরুর গাড়ীর উপর ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে ধর্মরাজকে আরাধনা করতে করতে হিংলো নদী থেকে নিয়ে আসা হয়। একে বলে হেঁটমুণ্ডে বাণামো। কুড়মিঠা গ্রামে ভক্ত্যারা হেঁটমুণ্ডে আরাধনা করে।

৩২। **থান ছাঁটা** : সুগুণপুর ও গৌরনগরে ধর্মপুজার প্রথম দিনে ভক্ত্যারা দেবতার স্থান ছেঁটে যায়।

৩৩। **বাণেশ্বর** : বাণ বা শলাকা খচিত লম্বা একটি কাষ্ঠ খণ্ড। এইটি ধর্মরাজের প্রতীক যন্ত্র বলে ধরা হয়। শিবঠাকুরের নিকটও বাণেশ্বর দেখা যায়। বাণেশ্বরকে বাণগোঁসাই বা বাণেশ্বরীও বলা হয়[৮]।

৩৪। **বাণেশ্বরী** : পৃথক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৫। **রাধাচক্র বাণ** : হিজলগড়া, রসা, শিরে ও মধুনগরে বাণেশ্বরকে রাধাচক্রবাণ বলে[৯]।

৩৬। **বাণেশ্বর নড়ানো** : ভুরকুনা গ্রামে পূজার দিন সন্ধ্যায় বাণেশ্বরকে পুকুরঘাটে নিয়ে যাওয়াকে বাণেশ্বর নড়ানো বলে।

৩৭। **বাণেশ্বরকে প্রদক্ষিণ** : ভবানীপুর গ্রামে বাণেশ্বরকে স্নান করিয়ে ভক্ত্যারা তিনবার প্রদক্ষিণ করে।

৩৮। **বাণেশ্বরের পূজা** : বাণেশ্বরকে ধর্মরাজের মতই পুজা করা হয় সকল স্থানেই[১০]।

৩৯। **ল্যাগড়া ভাঙ্গা বা লাফড়া ভাঙ্গা** : কথাটি বিকৃত হয়েছে। লাখড়া ভাঙ্গা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ উচ্চারণ পেয়েছি (লখড়ি=হিন্দী ভাষায় শাখা)। ব্যাপারটি এইরকম—রাত্রি দ্বিপ্রহরান্তে ভক্ত্যারা সমবেতভাবে কণ্টকযুক্ত-কোনো বাবলা গাছের নিকট গেলে দেবাংশী ভৃঙ্গারস্থিত ধর্মরাজের স্নানজল বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করেন। ভক্ত্যারা সমবেতকণ্ঠে "বল বাবা ধর্মরাজ" ধ্বনি তুলে বৃক্ষ বা শাখা ধরলে অক্লেশে বৃক্ষোৎপাটন বা ডাল ভাঙ্গা হয়। সেই বৃক্ষ বা শাখা, পুজার স্থানে রাখে। পুজার দিনে সেই কাঠের অঙ্গারে শয়ন ও নৃত্যবাদ্য হয়। এই প্রথা প্রায় সকল স্থানের ধর্মপুজায় পালিত হয়। পাতাডাঙ্গা গ্রামে বাবলা কাঁটার পরিবর্তে কণ্টকারী কাঁটায় শুয়ে গড়াগড়ি দেওয়াকে ল্যাগড়া ভাঙ্গা বলে।

৪০। **নাবরা ভাঙ্গা** : পালিগ্রামে পূর্ণিমার আগে ধর্মরাজকে বের করার অনুষ্ঠানকে নাবরা ভাঙ্গা বলা হয়।

৪১। **কাঁটা খেলা** : কণ্টকারী কাঁটায় শুয়ে গড়াগড়ি দেওয়াকে বহু স্থানে কাঁটা খেলা

বলে। কুড়মিঠা গ্রামে বাবলার কাঁটা শুদ্ধ ডাল বাসক পাতার মধ্যে বেঁধে ভক্ত্যারা বুকে চেপে গড়াগড়ি দেয়।

৪২। **লাখরাজ ভাঙা** : পুরন্দরপুর গ্রামের দেয়াশী উক্ত :—ধর্মরাজ সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক। জমিও তাঁর অর্থাৎ লাখরাজ। ধর্মরাজের সব কিছুতে অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য ভক্ত্যারা চারিদিক থেকে জামগাছের ডাল ভেঙ্গে আনে। উষগ্রাম, হাটইকড়া, কোঁদাইপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী ৮টি গ্রামে এই প্রথা বিদ্যমান (ল্যাগড়া ভাঙ্গার পরিবর্তিত রূপ সম্ভবতঃ)।

৪৩। **ডালভাঙ্গা** : পায়ের, বারুইপুর, দেবীপুর প্রভৃতি অজয় তীরবর্তী কতকগুলি গ্রামে ডালভাঙ্গা অনুষ্ঠান পালিত হয়, ধর্মপুজার পূর্বদিন রাত্রে।

৪৪। **ফলভাঙ্গা** : ধর্মপুজার পূর্বদিন রাত্রে এই অনুষ্ঠান পালিত হয় প্রায় শতাধিক গ্রামে। ভক্ত্যারা কাউকে না জানিয়ে যেখানে সেখান থেকে যার বাগানে বা ক্ষেতে যা ফল পায় তাই তুলে নিয়ে আসে। এর কিছু কিছু বৈচিত্র্য আছে—

(ক) বাতাসপুর গ্রামে ফলভাঙ্গার সময় বাণেশ্বর সঙ্গে থাকেন।

(খ) লায়েকপুর গ্রামে কেবলমাত্র কাঁটাল চুরি করে এবং পুজার পরদিন সেগুলি বাড়ী বাড়ী বিতরিত হয়।

(গ) গৌরনগর, সুগুণপুর ও ঘুরিষা গ্রামে সংগৃহীত ফল নিয়ে ভক্ত্যারা মন্দিরের চারিদিকে বসে এবং পুরোহিত ধর্মরাজের উপর তিনটি পদ্মফুল চাপিয়ে দেন। ঢাক বাজলে একটি ফুল গড়িয়ে পড়ে।

৪৫। **ফল চাপানো** : তারপর ভক্ত্যারা ফলগুলি ধর্মরাজের উপর চাপায় ও চারিপাশে সাজিয়ে দেয়। একে ফল চাপানো বলে।

(ঙ) মহুগ্রামে ধর্মের ঘোড়া নিয়ে ফল ভাঙ্গতে যাওয়া হয়।

৪৬। **হাটবেড়া** : ধর্মরাজকে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অথবা তার আগে যেদিন পুরন্দরপুর গ্রামের হাট বসে সেইদিন দেবতাকে সেই হাটে নিয়ে এসে মহাধূমধামে ঘোরানো হয়। ঢাক, ঢোল বাজে। উষগ্রাম, হাটইকড়া, ধোবাগ্রাম, কুষ্টিকুড়ি, ভ্রমরকোল, গলগাঁ, জামথলি, হাজরাপুর, হাড়াইপুর ও কোঁদাইপুর গ্রামের ধর্মরাজও এই হাট পরিভ্রমণে আসেন।

৪৭। **গ্রামবেড়া** : ধর্মরাজকে কাঁধে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমার নাম গ্রামবেড়া। পুরন্দরপুর, জীবধরপুর, উষগ্রাম, হাটইকড়া, কোদাইপুর, ধোপাগ্রাম, কুষ্টিকুড়ি ইত্যাদি বহু গ্রামে এই অনুষ্ঠান আছে।

৪৮। **বনবেড়া** : পুরন্দরপুর গ্রামের ধর্মরাজ পূর্বে জঙ্গলে থাকতেন। কালক্রমে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে পুরন্দরনাথ ধর্মরাজের নামে পুরন্দরপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বন নেই। হাটবেড়া উৎসবের পরদিন যদি পূর্ণিমার দেরী থাকে তাহলে বনবেড়া উৎসব হয়। কালিয়ার ডাঙ্গা নামে একটি ডাঙ্গায় একটি মঞ্চ আছে। সেখানে উষগ্রাম, হাটইকড়া ধোবাগ্রাম, কুষ্টিকুড়ি ভ্রমরকাল, গলগাঁ, জামথলি, হাজরাপুর, হাড়াইপুর ও কোদাইপুর গ্রামের ধর্মরাজ এসে পুরন্দরপুরের ধর্মরাজের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে উৎসবাদি হয়। অতীতে

বনের মধ্যে ধর্মরাজকে নিয়ে ঘোরানো হত। তাই উৎসবটির নাম "বনবেড়া"। কাঁখুটে, বড় সাংড়া ও মালিগ্রামেও উভয় ধর্মরাজের একত্রে এই বনবেড়া উৎসব আছে।

৪৯। **দণ্ডী কাটা** : পুজার আগের দিন ভক্ত্যারা মুক্তস্নানের ঘাট থেকে ধর্মের স্থান পর্যন্ত দণ্ডী কাটে[১১]। কেন্দ্রগড়িয়া, হজরৎপুর, ভাতুলিয়া, হিজলগড়া, রসা, শিরে, মধুনগর, শূদ্রাক্ষিপুর, গোয়ালপাড়া গ্রামে মেয়েরা দণ্ডী কাটে।

৫০। **দেয়াশীর গড়াগড়ি** : গাংমুড়ি গ্রামে স্নানযাত্রার সময় দেয়াশী (আধমাইল) গড়াগড়ি দিয়ে পুকুরঘাট পর্যন্ত যায়। সে-সময় "ও বাবা নীলকণ্ঠ ধর্মরাজ হে" বলে চীৎকার করতে থাকে।

৫১। **গোরখেলা** : ধর্মপুজার যেদিন ভক্ত্যাদের উত্তরীয় তৈরী করে বাণেশ্বর ও ভক্ত্যাদের দেওয়া হয় সেদিন রাত্রি ৮।৯ টার সময় গোরখেলা হয়। অর্থাৎ ধর্মতলায় ভক্ত্যারা উপুড় হয়ে পড়ে। দেবতাকে ধূপ দিয়ে এসে প্রত্যেক ভক্ত্যাকে ধূপ দেওয়া হয়। তারপর দেয়াশীর ইসারায় তারা উঠে দাঁড়িয়ে 'ব্যোম, ব্যোম' শব্দ করতে করতে লাখেরাজ ভাঙতে যায়। পুরন্দরপুর, হাটইকড়া প্রভৃতি পাশাপাশি ৮।১০টি গ্রামে এই অনুষ্ঠান আছে।

৫২। **দ্বাদশখাটা**[১২] : (ক) লম্বোদপুরে ধর্মপুজার পূর্বদিনে দ্বাদশখাটা হয়। অর্থাৎ দ্বাদশ দেবতাকে স্মরণ করে প্রণাম করতে হয়। পূর্ণিমার দিন ভাঁড়াল আনবার জায়গায় আর একবার দ্বাদশখাটা হয়। (এ সম্পর্কে শ্লোক ও পাঁচালী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(খ) খয়রাকুঁড়ি গ্রামে দ্বাদশখাটা হবার পদ্ধতি ভিন্নরূপ, ভক্ত্যারা একপায়ে ভর করে দ্বাদশ দেবতার বন্দনা করতে করতে এগিয়ে যায় এবং ঐভাবে ফিরে আসে।

৫৩। **দ্বাদশ দেওয়া** : (গ) সুগুণপুরে বেতকাঠি নিয়ে ভক্ত্যারা "কাশী বিশ্বেশ্বর" ধ্বনি তুলে নাচগান করে। তাকেই বলে দ্বাদশ দেওয়া[১২] ভর। (ঘ) নিস্তিয়া গ্রামে ভর নামাকে দ্বাদশ দেওয়া বলে।

৫৪। **পাতাভরা** : চিঁচুড়িয়া ও পাতাডাং। পাতাডাং গ্রামের পুরোহিত শ্রীলক্ষ্মণ মুখোপাধ্যায় জানালেন, বাণেশ্বরকে ধরে ভক্ত্যাদের জলে ডুব দেওয়াকে পাতাভরা উৎসব বলে।

৫৫। **বাণেশ্বর ধরে জলে ডুব** : (সাঁওতালি ভাষায় পাতা অর্থে চড়ক) ধর্মপুজাকে তারা বলে ডুবু পাতা (পাতাভরার গান, শ্লোক, পাঁচালী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য[১৩])।

৫৬। **কালিকা পাতার নৃত্য** : কুমারপুর গ্রামে পুজার আগের দিন রাত্রে কালিকা পাতার মড়ার মাথা নিয়ে ভক্ত্যারা নাচে[১৪]।

৫৭। **শ্মশান খেলা** : ভক্ত্যারা শ্মশান থেকে অদীর্ঘ তিনমাস থেকে ১ বছর পুর্বের মৃত্তিকাপ্রোথিত শবমুণ্ড (চার থেকে ছয়টি) উঠিয়ে নিয়ে আসে। তারপর ভয়ঙ্করী কালিকা মূর্তি ধারণ করে বামহস্তে শবমুণ্ড ও দক্ষিণহস্তে তরবারি নিয়ে ঢাকবাদ্যের সঙ্গে তালে তালে পরস্পর (২ জন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে) নৃত্য করে সকাল বেলা পর্যন্ত[১৫]। গ্রাম মোহনপুর।

৫৮। **ভাঁড়াল জাগানো** : পূর্ণিমার পূর্বদিন রাত্রিতে ভাঁড়াল জাগানো হয়। নয়

পোয়া চাল, একটি পয়সা, একটি সুপারি হাঁড়িতে পুরে মদের দোকানে সেটিকে রেখে ফুলমালা ও দীপ দিয়ে জাগাতে হয়। (পাতাডাং, লম্বোদরপুর, কচুজোড় এবং গ্রাম ভুরকুনা।) গ্রাম ভবানীপুরে পূর্ণিমার পূর্বদিন গ্রামান্তরে একটি মদের জালাকে পুজা করা হয়।

৫৯। **ধুপবাণ খেলা বা বিলেবাণ** (অর্থাৎ ধূপ সন্তাপযুক্ত বাণ): (ক) ধর্মরাজ চৌকির উপর পূর্বমুখে থাকেন। সেখান থেকে একটু তফাতে ২টি ৫।৬ হাত লম্বা কাঁচা বাঁশ উত্তর দক্ষিণে পোঁতা থাকে। ৪।৫ হাত উঁচুতে আর একটি বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা হয়। তার মাঝে একটি দড়ি থাকে। কোনো ভক্ত্যাকে পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মধ্যস্থলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ধুনা নিক্ষেপ করলে আগুন জ্বলে ওঠে তীব্রভাবে। হেঁটমুণ্ডে দোদুল্যমান ভক্ত্যাটি অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করে দুলে এসে ধর্মরাজের মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। (মোহনপুর, কোদাইপুর এবং খড়গ্রাম দ্রষ্টব্য।)

(খ) কোনো কোনো গ্রামে মাথায় গামছা জড়িয়ে তার ভিতর দিয়ে লৌহশলাকা পার করে তার আগায় ন্যাকড়া বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে ধূপ পোড়ায়। এই অনুষ্ঠানকেও ধূপবাণ বলে, একে বিলেবাণও বলা হয়।

৬০। **দোলন সেবা**: এই অনুষ্ঠানটি ধূপবাণেরই অনুরূপ। এতে অগ্নিকুণ্ডে ধূপ নিক্ষেপের পরিবর্তে হেঁটমুণ্ডে দুলতে দুলতে ধর্মরাজের মস্তকে ফুল দিয়ে থাকে। নীচে থাকে অগ্নিকুণ্ড। ঐ কুণ্ডের একপাশে থাকেন ধর্মরাজ অপর পাশে ঐ লম্বমান ভক্ত্যা। (গ্রাম লম্বোদরপুর, কেন্দুয়া, কেন্দ্রগড়িয়া, হাটইকড়া, অমৃতপুর, মেটেল্যা গ্রাম দ্রষ্টব্য[১৬]।)

৬১। **শিবদোল, ধুনোসেবা, মইঝোলা বা হেদল পর্ব**: গ্রাম চিচুঁড়িয়ায় একে শিবদোল বলে। শূদ্রাক্ষিপুরে দেলোশিব বলা হয়। পালিগ্রামে এই অনুষ্ঠানকে ধুনোসেবা বা মইঝোলা বলে। কারণ দুটি মই দুপাশে পুঁতে তাতে দুলতে দুলতে আগুনে ধুনো ছড়াতে হয়। মুর্শিদাবাদে এই অনুষ্ঠানের নাম "হেদল" পর্ব। খুব সম্ভবতঃ দোলন থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

৬২। **গাড়ী বাণামো**: কৃষ্ণপুর গ্রামে গাড়ী বাণামো হয়। দুই জোড়া গো গাড়ীর কাঠামো দিয়ে মধ্যস্থলে দুটি খুঁটি পোতা হয়। খুঁটি দুটির মাঝের কাঠটিতে দুটি দড়ির ফাঁস তৈরী করা থাকে। গাড়ীটিতে চারটি চাকা যুক্ত করা হয়। ঐ দড়ির ফাঁসে পাট দেয়াশী পা গলিয়ে হেঁটমুণ্ডে ঝোলে। গাড়ীর প্রান্তে পুরোহিত ফুল বেলপাতা নিয়ে বসে থাকেন। অপর প্রান্তে থাকে অগ্নিকুণ্ড। ঝুলন্ত দেয়াশী ফুল বেলপাতা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। গাড়ীটিকে জনসাধারণ ঠেলা দিয়ে সারা গ্রাম ঘোরায়।

৬৩। **কাঁচা দুধে স্নান**: কোমা গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমার আগের দিন শেষ রাত্রে ধর্মরাজকে ঘাটে নিয়ে গিয়ে কাঁচা দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়।

৬৪। **মুক্ত ভাঁড়াল**: ঐ দুধ মুক্ত ভাঁড়ালে পড়ে।

৬৫। **পানসুপারি দিয়ে বাণেশ্বর বরণ**: মেটেল্যা গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্বদিন চড়ককে নিমন্ত্রণ জানাবার সময় পুকুরের ধারে বাণেশ্বরকে রেখে পানসুপারি দিয়ে বরণ করতে হয়।

৬৬। **উত্তরীয় নেবার দিন পূজা ও ভোগ** : কোটাসুর গ্রামে উত্তরীয় নেবার দিন একটা পূজা ও ভোগ হয়[১৭] এখানে উল্লেখ্য যে পুরন্দরপুর গ্রামে চতুর্দশীর দিন থেকে পূজা সুরু হয়।

৬৭। **পূজার পূর্বেই চড়ক** : কোমা গ্রামে বৈশাখী পুর্ণিমার পুর্বের ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যাবেলা মন্দির থেকে ছোট বড় নানারকম কাঠ ও মাটির ঘোড়া নিয়ে নিকটবর্তী চন্দ্রভাগা নদীর গর্ভে যায় ভক্ত্যারা। ঐখানে দেবতার সাবেক আটন ছিল। নিকটে একটি জামের গাছ আছে। সেখানে ভক্ত্যারা শুয়ে পড়ে "বাবা ধর্মনিরঞ্জন, রাজরাজেশ্বর" বলে ডাক দিতে থাকে। তারপর ঘোড়াগুলিকে কাঁধে নিয়ে নাচে। তারপর বাণগোঁসাইকে মাথায় নিয়ে দেয়াশী হাজরা পাড়ায় দুর্গাতলার সন্নিকটে একটি ঢিবির উপর বাঁধানো স্থানে বাণেশ্বরকে নামিয়ে দেয়। ভক্ত্যারা ঘোড়া কাঁধে নিয়ে নাচতে সুরু করে। এটাই চড়ক। মনে হয় এই স্থানটির সঙ্গে ধর্মরাজের কোনো পুর্ব সম্পর্ক ছিল।

৬৮। **কোঁকবাণ** : চতুর্দশীর দিন বাণগোঁসাই ও ধর্মরাজকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় তেঁতুলবনা পুকুরে বাণগোঁসাই-এর পূজা এবং স্নান হয়। মশাল জ্বালানো হয়। পেটের দুপাশে বাণ ফুঁড়ে গলার উত্তরীয়ের সঙ্গে বাণের আগা দুটি বাঁধা হয়। তারপর ভক্ত্যারা আসে জলেশ্বর শিব মন্দিরে। পর্যাপ্ত পরিমাণে তীক্ষ্ণধার শলাকাখচিত বাণেশ্বরের উপর দেয়াশী শুয়ে থাকেন। ভক্ত্যারা তাঁকে বহন করে শিবের নিকট আনেন। এর পর বাণবিদ্ধ দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বাণগুলি থেকে উত্তরীয়ের বাঁধন খুলে ফেলে বাণের আগায় সরষের তেল ভিজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানের পর বাণেশ্বরকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। ধর্মরাজের স্নানজল দেয়াশীর মুখে দিয়ে তাঁর চেতনা সম্পাদন করা হয়। এইদিন রাত্রি বারোটার পর ধর্মরাজকে কাঁধে নিয়ে ভক্ত্যারা গাংটে গ্রামে যান। সেখানে ধর্মের বিবাহ হয় (১০৩নং অনুষ্ঠান দ্রষ্টব্য)। ঐ দিন শেষরাত্রে ধর্মরাজকে তেঁতুল বনা ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুর্ব প্রথা অনুসারে কাঁচা দুধ দিয়ে স্নান করায়।

৬৯। **গন্ধাধিবাস** : ঐ দুধ মুক্তভাঁড়ালে পড়ে। ঐ স্থানে ধর্মরাজের গন্ধাধিবাস হয়[১৮]।

৭০। **দেয়াশীর মাথায় ভোগ রান্না** : সিঙ্গুর, গজালপুর ও আরো কয়েকটি গ্রামে বাণামোর পর গাজনের শ্লোক আবৃত্তির পর বাণগোঁসাইকে কাঁধে নিয়ে ধর্মরাজের ধামে ফিরে আসা হয়। তারপর দেয়াশী ধর্মরাজের প্রাঙ্গণে ধর্মরাজকে সামনে রেখে বসেন। তাঁকে অপরাপর ভক্ত্যারা নিজ নিজ গামছা ঢাকা দেন। তার উপর পুকুরের শ্যাওলা চাপা দেওয়া হয় এবং উপরে আগুন জ্বালানো হয়। তখন ব্রাহ্মণ পুজারী একটা নতুন বড় ভাঁড়ে ঘৃত, মধু, চিনি, দুধ, আতপ চাল নিয়ে দেয়াশীর মাথার উপর প্রজ্বলিত আগুণের উপর ভাঁড়টিকে একটি কাঁচা বাঁশে বেঁধে দূর থেকে তুলে ধরেন। এইভাবে কয়েকজন ব্রাহ্মণ সন্তান পাশে দাঁড়িয়ে জ্বালানী জোগাতে থাকেন। বাজনা বাজে। ভক্ত্যারা বলে "বল বাবা ধর্মনিরঞ্জন, বল বাবা রাজ রাজেশ্বর"। ১৫।২০ মিনিট পর ভোগ ভাণ্ড থেকে উথলে ওঠে। তখন ঐ পরমান্ন একটি কলা-

পাতায় ঢেলে তাতে পাকা কলা দিয়ে মন্ত্র পড়ে দেবতাকে ভোগ দেওয়া হয়। এরপর ভোগ ও ভোগ রান্নার পাত্রগুলি দীঘির জলে ফেলে দিতে হয়।

৭১। **ভর বা আগোসান** : (শব্দটি 'আকর্ষণ'-এর অপভ্রংশ কিনা বলা শক্ত। সাঁওতাল পরগণায় বলে 'চটিয়া'।) ভর বা আবেশ ধর্মপুজার দিনই অধিকাংশ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো জায়গায় পুজার আগের দিন ভর হয়ে থাকে। (আগোসান শব্দটির অর্থ নির্ণয় করতে পারিনি। সম্ভবতঃ এটি আর্যভাষা বহির্ভূত শব্দ।)

সাধারণতঃ মন্ত্য ভাঁড়াল মাথায় নিয়েই ভর হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামের বিবরণে দৃষ্ট হবে যে এই প্রক্রিয়ার নানারকম বৈচিত্র্যও আছে। যথা, ঘুরিষা গ্রামে পুর্ণিমার পুর্বদিন ধর্মশিলাদের স্নান করিয়ে শিলাখণ্ডগুলিতে ঘি এবং চন্দন মাখিয়ে একটি বড় নূতন ডালার মধ্যে রেখে চৌদলায় পুরে নূতন কাপড় ঢেকে চামর দিয়ে সাজিয়ে দুজন ভক্ত্যা কাঁধে নিয়ে আবিষ্ট হয়। এই অবস্থায় প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ফুল দিয়ে আসতে হয় (অনুষ্ঠান নং ৫৩ দ্রঃ)।

৭২। **পুরোহিতের কোলে বাণেশ্বর** : কৃষ্ণপুর গ্রামে মুক্তস্নানের পর বাণেশ্বরকে পুরোহিতের কোলে বসিয়ে তাকে কাঁধে নিয়ে নাচতে নাচতে ভক্ত্যারা ধর্মমন্দিরে আসে।

৭৩। **মাঠতোলা, মাঠ নাচানো** : (মাঠ তোলা সম্পর্কে এই অধ্যায়ের ২নং অনুষ্ঠান দ্রষ্টব্য) ধর্মরাজের বারি মাথায় নিয়ে নাচাকে মাঠ নাচানো বলে (মালাবেড়িয়া।)

৭৪। **পাদুকা স্নান** : চিঁচুড়িয়া গ্রামে পুজার চারদিন আগে বাণেশ্বরকে বের করে পর পর দুদিন স্নান করানো হয়। তারপর ধর্মের পাদুকাকে স্নান করানো হয়। পুজার পুর্বদিন ধর্মশিলাদের স্নান হয়।

৭৫। **কলসী দিন** : চিঁচুড়িয়া গ্রামে ধর্মপুজার পুর্বদিনকে কলসী দেওয়ার দিন বলে। ঐ দিন ধর্মরাজদের দোলায় ও দেয়াশীর মাথায় বাঁশের টোকায় নিয়ে গিয়ে পুকুরে স্নান করানো হয়। তখন অনেক ঢাক ঢোল নিয়ে বহু স্ত্রী পুরুষ মাটির বা পিতলের কলসী নিয়ে ঐ পুকুরে স্নান করে কলসী পূর্ণ জলসহ মন্দিরে আসে।

৭৬। **ধর্মরাজদের আগমন পদ্ধতি** : ঐ গ্রামে ধর্মরাজঠাকুর দোলায় আসেন। কাণা রায় ও বুড়ো রায় দুই জন মাটির ঘোড়ায় চড়ে (গাড়ীর উপর) আসেন।

৭৭। **হুটং টং টং** : হিজলগড়া, রসা, মধুনগর, শিরা প্রভৃতি গ্রামে বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রে হেঁটমুণ্ডে শিব পুজার পর হনুমান পুজা করা হয়। তারপর গভীররাত্রে ঝাড়ের একটি বাঁশকে জাগিয়ে একপায়ে লাফাতে লাফাতে গাজন পর্যন্ত ফিরে আসে একজন ভক্ত্যা। পরদিন ঐ বাঁশ কেটে টোকা তৈরী হয়[১৯]।

৭৮। **শ্মশান অঙ্গার** : পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে বিবৃত গ্রামগুলিতে ধর্মপুজার ভোর রাত্রে ভক্ত্যারা শ্মশান থেকে অঙ্গার নিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে ছোঁড়া ছুঁড়ি করে থাকে।

৭৯। **ফুল খেলা** : ধর্মপুজায় প্রায় সকল গ্রামেই আগুন জ্বালিয়ে প্রচুর অঙ্গার করা হয় এবং সেগুলি পা দিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলা করে। একে বলে ফুলখেলা। সঙ্গে নানা প্রকার বাদ্যভাণ্ডও থাকে[২০]।

৮০। **ধর্মের মাথায় আগুন চাপানো এবং আঙ্গরা পুজা** : খয়রাকুঁড়ি গ্রামে আগুনের ফুলখেলার পর জলন্ত আঙ্গরা নিয়ে ব্রাহ্মণ পুজা করেন। তারপর ধর্মরাজের মাথায় কলাপাতা রেখে সেই আঙ্গরা চড়ানো হয়। গাংটে গ্রামে ধর্মপুজার পুর্বদিন কুলের ডালের আগুন করে হাতে নিয়ে ধর্মের মাথায় চড়ানো হয়। শ্রীকণ্ঠপুরে জলন্ত অঙ্গার ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়। মোহনপুর এবং লায়েকপুর ও আরও বহু জায়গায় শুধুমাত্র বাবলার ডালে আগুন করার বিধি। সিউড়ীতে শালকাঠের আগুন করা হয়। অনেক স্থানে কুলের ডালে আগুন করার বিধি।

৮১। **ধর্মশিলা হাতে অগ্নিপরিক্রমা** : মহুলা গ্রামে ভক্ত্যারা ধর্মশিলা হাতে নিয়ে আগুনের উপর হাঁটে।

৮২। **এক পায়ে আগুনে লাফানো** : জগন্নাথপুর গ্রামে ভক্ত্যারা এক পায়ে লাফিয়ে আগুন খেলে।

৮৩। **গায়ে আগুন মাখা** : নাকাশ গ্রামে ফুলখেলার সময় ভক্ত্যারা সর্বাঙ্গে আগুন মাখে।

৮৪। **অগ্নিকুণ্ড পরিক্রমা** : প্রায় সকল স্থানেই আগুনের কুণ্ডকে ভক্ত্যারা প্রদক্ষিণ করে। জীবধরপুর গ্রামে পুজাশেষে বাণগোঁসাইকে স্নান করিয়ে চড়ক দেওয়ার পর দ্বিতীয় বার আগুনের ফুলখেলা হয়।

৮৫। **আগুনে ঝাঁপ** : পুরন্দরপুরে খেজুর পাতার ঘর করে দেয়াশী প্রবেশ করেন। তাতে আগুন লাগানো হয়।

৮৬। **বাণেশ্বরের উপর গড়াগড়ি** : চিঁচুড়িয়া গ্রামে আগুনে ঝাঁপ ও বাণেশ্বরের উপর গড়াগড়ি দেওয়ার বিধি আছে।

৮৭। **পাটভাঙ্গা** : লাউসেনের[২১] যজ্ঞস্থান বলে কথিত বারুইপুরে পাটভাঙ্গা অনুষ্ঠান আছে। (অর্থাৎ উঁচু মাচা করে কাঁটার উপর ঝাঁপ।)

৮৮। **ছাই সংরক্ষণ** : উচকরণ গ্রামে আগুনের ফুলখেলার পর ঐ ছাইগুলি ভক্ত্যারা মিলে ধর্মমন্দিরের ঈশান কোণে রক্ষা করে।

৮৯। **উলঙ্গ দেয়াশীর আংট কলাপাতা পরিধান** : খুজুটিপাড়া[২২] গ্রামে পুর্ণিমার ভোর রাত্রে কয়েকখানা গ্রাম ঘোরানোর পর ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়। দেবাংশী সেদিন উলঙ্গ অবস্থায় আংট (অক্ষত শীর্ষ) কলার পাতা পরিধান করেন।

৯০। **সারারাত্রি পূজা ও দুধ গঙ্গাজলে স্নান** : ঐ গ্রামের ধর্মরাজকে গ্রামের প্রতিটি বাড়ী নিয়ে গিয়ে সারারাত ধরে পর্যায়ক্রমে পূজা করা হয়। তারপর ভোরবেলা একটি পুকুরে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয় দুধ গঙ্গাজলে। সেই জল ভক্ত্যারা পান করে।

৯১। **নিশাজাগরণ**[২৩] : কুড়মিঠা, রাতমা ও প্রায় সকল গ্রামেই পুজা কয়দিন সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত্যারা গাজনেই রাত্রিবাস করে। কৃষ্ণপুর গ্রামে চতুর্দশীর দিন ধর্মরাজকে মন্দিরের বাইরে স্থাপন করে সকল শ্রেণীর ভক্ত্যা চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে "চলো বাবা বুড়ো রায় হে"

"চলো বাবা ধর্মরাজ হে" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে সারারাত্রি নামডাক করে। (লায়েকপুর, বারুইপুর, দাদপুর, চৌহাট্টা, খড়গ্রাম, তারাপুর।)

৯২। **বোলান গান** : মহুগ্রাম, ভাসতর, কুমারপুর, কালুহা, দাঁড়কা, হেতিয়া (মুর্শি), রসুলপুর, ভগবতীপুর, ঘাসিয়াড়া প্রভৃতি বহু গ্রামে পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে বোলান গান শুনে নিশাজাগরণ হয়।

৯৩। **চূড়াজাগরণ** : খড়গ্রামে পূর্ণিমার পরদিনকে বলা হয় চূড়াজাগরণ। এই দিনে মাত্র একজন ব্রতের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং উত্তরীয় ধারণ করে দেবগোত্র গ্রহণ করেন এবং এই দিনও বোলান গান হয় সারারাত্রি ধরে।

৯৪। **ধর্মমঙ্গল গান** : খুজুটিপাড়া গ্রামে ধর্মপূজায় ধর্মমঙ্গলের গান হয়। ধর্মবীর লাউসেনের কাহিনীই প্রধানতঃ বর্ণনীয় বিষয়। তারপর হয় রামায়ণ গান। পূর্বে দশহরার দিন থেকে গান সুরু হত। ঘুরিষা গ্রামে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল গীত হয় (পাঁচালী অধ্যায় দ্রঃ), গাংমুড়ি গ্রামে ধর্মপূজায় রামায়ণের গান হয়।

৯৫। **রামায়ণ গান** : অজয়কোপা গ্রামে ধর্মপূজায় রামায়ণ গান হয়। পায়ের গ্রামেও তাই। কুলেড়া গ্রামেও রামায়ণ গান হয়। ছিনপাই, নারায়ণপুর শূদ্রাক্ষিপুর গ্রামেও তাই। শ্রীকণ্ঠপুরে পুজার পূর্বদিন যাত্রাগান করাতেই হয় নয়ত গ্রামের অমঙ্গল হয় বলে লোকশ্রুতি।

৯৬। **ঢাক ও মাটির ঘোড়া সহ নাচ** : গৌরনগর, সুগুণপুর ইত্যাদি গ্রামে পূজার আগের দিন ধর্মের ভক্ত্যারা মাটির ঘোড়া ও ঢাক নিয়ে সারা গ্রামে নেচে বেড়ায়। লোকে চাল ও পয়সা অর্ঘ্য দেয়।

৯৭। **নারী ভক্ত্যাদের মাথায় আগুন বহন**[২৪] : গোয়ালপাড়া গ্রামে নারী ভক্ত্যারা উপবাস করে কেউ পুকুরঘাট থেকে দণ্ডী কাটে কেউ আবার মাথায় আগুন চড়িয়ে হাত জোড় করে ঘাট থেকে ধর্মতলায় আসে।

৯৮। **মাথায় প্রদীপ** : মামুদপুর গ্রামে ভক্ত্যারা জিহ্বাবাণ ফুঁড়ে মাথায় প্রদীপ নিয়ে দেবতার ধামে হাজির হয় ও নাম ডাকে।

৯৯। **খুদের টোকায় ধর্মরাজ বহন** : বড়া গ্রামে ধর্মরাজকে নূতন টোকায় খুদ ভর্তি করে তার মধ্যে ধর্মরাজকে বসিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। ব্রাহ্মণে মাথায় করে বহন করেন। (উল্লেখ্য চারশো বছর আগে ধর্মশিলা একজন সদ্‌গোপের খুদের হাঁড়িতে খুজুটি-পাড়া থেকে এসে আবির্ভূত হন। প্রবাদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১০০। **বাণগোঁসাই-এ ফল বিদ্ধকরণ** : অনেক গ্রামে ধর্মরাজের নিকট দুটি বাণ গোঁসাই আছে। কামারহাটি গ্রামে পুজার সময় একটিতে আনারস ও অপরটিতে আমবিদ্ধ করা হয়। কাঁইজুলি ও লাঙুলিয়া গ্রামেও বাণগোঁসাই-এ ফল বিদ্ধ করার রীতি আছে।

১০১। **বারো মুঠি ছোলার শীতল** : মামুদপুর গ্রামে পুর্ণিমার আগের দিন বারো মুঠি ছোলা ভিজিয়ে দেবতার শীতল হয়।

১০২ (ক)। **গাজন বন্ধন ও ধর্মডাক** : প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই নানাপ্রকার শ্লোক আউড়ে গাজন বন্ধন করা হয় এবং চারিপাশের ধর্মরাজদের নাম ধরে ডাকা হয়। শতাধিক ধর্মরাজের নাম ধরে একদা ডাক হত বলে শুনেছি, এখন লুপ্ত প্রায় পুজানুষ্ঠানগুলি কোনক্রমে অতীত সংস্কার টিকিয়ে রেখেছে (শ্লোক ও পাঁচালী অধ্যায় দ্রঃ[২৫])।

১০২ (খ)। **ঝাঁক বা জাঁক** : ধর্মরাজদের নাম ধরে (যথা, "বাবা ধর্মনিরঞ্জন হে"…) সমবেত কণ্ঠে সকল ভক্ত্যাদের ডাক দেওয়াকে জাঁক বলে (এই শব্দটি রাতমা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত[২৬])।

১০৩। **ধর্মসম্মেলন ও বিবাহ** : কোমা গ্রামে চতুর্দশীর দিন রাত্রি বারোটার পর ধর্মরাজকে কাঁধে নিয়ে ভক্ত্যারা ঢাকঢোল সহ পার্শ্ববর্তী গাংটে গ্রামে যায়। সেখানকার ঢাকের সঙ্গে বাদ্য প্রতিযোগিতা হয় তারপর কোমার ধর্মরাজের সঙ্গে গাংটের ধর্মরাজের বিবাহ হয়। যেভাবে কন্যা সম্প্রদান করা হয়, ঠিক সেই ভাবেই গাংটের ধর্মরাজ সমর্পিত হন কোমার ধর্মরাজের নিকট[২৭]।

বারুইপুর গ্রামের ধর্মদেয়াশী দেবীপুরের দেয়াশীর মাথা থেকে ধর্মরাজকে নামান। লোকশ্রুতি এই যে উভয় গ্রামের ধর্মরাজের সম্পর্ক মামা-ভাগ্নে। ঘুরিষা গ্রামেও দুই পাড়ার দুটি ধর্মরাজের মামা-ভাগ্নে সম্পর্ক আছে।

ভুরকুনা গ্রামে পার্শ্ববর্তী গ্রাম মহুবোনা থেকে ধর্মরাজকে এক মাসের জন্য এনে রেখে দেওয়া হয়। কালিপুর গ্রামে ধর্মপূজার সময় করিধ্যা মালপাড়া থেকে ধর্মরাজকে এনে রাখা হয়। সুপুর গ্রামে সুরথ রায়ের মুক্তস্নানের শোভাযাত্রায় বিভিন্ন গ্রামের ধর্মরাজ এসে যোগ দেন।

১০৪। **সূর্যার্ঘ্য** : কেন্দ্রগড়িয়া গ্রামে চতুর্দশীর দিন বাণেশ্বরকে স্নান করিয়ে সূর্যার্ঘ্য দেওয়া হয়। শূদ্রাক্ষিপুরে পূর্ণিমার আগের দিন ভক্ত্যারা উপবাসী থেকে বিকালবেলা পুকুরে বাণেশ্বরের পুজা এবং সূর্যার্ঘ্য দেয়[২৮]। মেদিনীপুর ধর্মগাজনে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সূর্যার্ঘ্য দেবার বিধি আছে[২৯]।

১০৫। **গোরুর গাড়ীতে বাণেশ্বর** : বাণেশ্বরকে গোরুর গাড়ীতে চড়িয়ে মানুষে ঠেলে নিয়ে যায় নির্ভয়পুর গ্রামে।

১০৬। **আলো উৎসর্গ** : কৃষ্ণপুর, মামুদপুর ও ভাদুলিয়া গ্রামে সন্ধ্যায় ধর্মরাজকে আলো উৎসর্গ করে গ্রামবাসীরা।

১০৭। **বাণ আনা** : তারপর বাণ আনা হয়। শক্তিশেল, সুতোবাণ, গাড়ীবাণ।

১০৮। **নিয়মজল** : এরপর নিয়মজল আনা হয়।

১০৯। **মস্তকে স্নানজল বহন** : ছিনপাই গ্রামে একজন ভক্ত্যা ধর্মরাজের স্নানজল (দুগ্ধ মিশ্রিত) কলসীতে পুরে মাথায় নেয় এবং দেবাংশী মাথায় টোকা নিয়ে এবং অন্যান্য ভক্ত্যারা কাঁধে বাণেশ্বর নিয়ে ঘাট থেকে অনতিদূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। ঐ সময় বহুলোক সমাগম হয়। গীত, বাদ্য, ধূপদীপ সহকারে দেবাংশীকে আবিষ্ট করা হয় এবং শোভাযাত্রা সহ

মন্দিরাভিমুখে যাত্রা। মন্দিরে পৌছানোর পর দেয়াশীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যেক ভক্ত্যা ধর্মরাজের স্নানজল পান করে ফলাদি আহার করে। সমস্ত ভক্ত্যা সেদিনের মত ধর্ম-রাজের নিকট রাত্রি যাপন করে।

১১০। **ফুল চাপানো**[৩০] : সিউড়ী, ছোড়া, কচুজোড় ও আরও বহুস্থানে ধর্মরাজের মাথায় পদ্মফুল চড়ানো হয়। জোরে ঢাক বাজে এবং ভক্ত্যারা তারস্বরে "ধর্মডাক" দেয়। একটি মাত্র ফুল গড়িয়ে পড়ে এসময়। (দ্রঃ অলৌকিক ঘটনা অধ্যায়) কালিপুর গ্রামে ধর্মরাজের সঙ্গে মনসার মাথাতেও পদ্মফুল চড়ানো হয়।

১১১। **পাটকাঠি হাতে গান** : মালাবেড়িয়া গ্রামে ভক্ত্যারা পাটকাঠি হাতে নিয়ে গান করতে করতে পুকুরঘাটে মুক্তস্নানে যায় (পাঁচালী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১১২। **তালের গুঁড়ি জাগানো** : ঐ গ্রামে ভক্ত্যারা পুকুরে গিয়ে দশ হাত লম্বা একটি তালগাছের গুঁড়িকে ধর্মরাজের রথ মনে করে পুকুরে লক্ষ্য রেখে সকলে চীৎকার করতে থাকে 'ঐ আসছেন, ঐ আসছেন' বলে। গুঁড়িটি কিন্তু যেখানকার সেখানেই থাকে। ভক্ত্যারা ঐ গুঁড়ির উপর বসে সমানে চীৎকার করে চলে। তারপর হঠাৎ 'এই এসেছে' বলে উঠে পড়ে এবং গুঁড়িটি সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে। তারপর দোলাতে করে ধর্মরাজকে মন্দিরে আনা হয়। ভাদুলিয়া গ্রামেও তাই।

১১৩। **মুক্তস্নানের পরবর্তী কৃত্য** : ছিনপাই গ্রামে মুক্তস্নানের পর উত্তরীয় ধারণ তারপর একজন ভক্ত্যা ধর্মরাজের দুগ্ধ মিশ্রিত স্নানজল কলসীতে পুরে মাথায় নেয় এবং দেবাংশী মাথায় টোকা নিয়ে ও অন্যান্য ভক্ত্যারা কাঁধে বাণেশ্বর নিয়ে ঘাট থেকে অনতিদূরে সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড়ায়। মূল দেবাংশী এ সময় আবিষ্ট হয়ে পড়ে। তারপর শোভাযাত্রা সহ মন্দিরাভি-মুখে যাত্রা করা হয়। মন্দিরে পৌছানোর পর দেবাংশীর চেতনা সম্পাদন করা হয়।

১১৪। **ঘোড়ার ভরণ** : কুমারপুর গ্রামে পুর্ণিমার পুর্বদিন রাত্রে ধর্মরাজের ঘোড়া বাণেশ্বর প্রভৃতি নিয়ে দেবাংশী ও ভক্ত্যারা মুক্তস্নানে যায়। মুক্তস্নান হওয়ার পর রামকৃষ্ণপুর, শোলাহাট, কেউহাট, কুমারপুর গ্রাম ভ্রমণ করে ঘোড়ার ভরণ করে নাচতে নাচতে ঠাকুরের স্থানে আসে। মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি থানার চড়ক গাজনের বিবরণে আছে, "কাঁটাতে গড়াগড়ি দিবার পুর্বে শিবের অনুমতি লাভের আশায় তাঁহারা সারিবদ্ধভাবে ঘাড় দোলাইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকেন। ইহাকে ভরণ দেওয়া বলে।*"

১১৫। **কাঁচমাড়া**[৩১] : কালুহা ও জগদীশপুর গ্রামে পুর্ণিমার আগের দিনও পুজার শেষ দিন ভক্ত্যারা গ্রামের একুশ জায়গায় বিভিন্ন দেবতার স্থানে জলদান করে। একে বলে কাচমাড়া।

* পশ্চিমবঙ্গের পুজাপার্বণ ও মেলা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭

(খ) পূর্ণিমা ও পরের দিনগুলির অনুষ্ঠান

১১৬। **চামুণ্ডার মুখোশ পরে নাচ ও ভর** : পুরন্দরপুর ধর্মরাজের নিকট চামুণ্ডার মুখোশ ছিল। বৈশাখী পূর্ণিমার পুজোর সময় একটি হাড়ি জাতীয় লোক চামুণ্ডার ঐ মুখোশটি পরে ধর্মরাজের সামনে মাত্র আড়াই-পা গিয়ে ফিরে আসত। তারপর সে সাজ খুলে ফেলত। বর্তমানে তার বংশ লোপ হওয়ার পর এ প্রথা রহিত হয়ে গেছে।

রাতমা, কামারহাটি, নবেলেড়া, রাউতাড়া প্রভৃতি গ্রামে একজন ভক্ত্যার মুখে কাষ্ঠ-নির্মিত চামুণ্ডার মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হয়। ডান হাতে বেতের কাঠি এবং বাঁ হাতে মড়ার মাথা থাকে। তার মুখের কাছে ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয়। সে বাদ্যের তালে তালে নাচে। তারপর সে আবিষ্ট হয়ে পড়লে তাকে ধরে ফেলা হয়।

খড়গ্রামেও বৃহৎ একটি কাষ্ঠনির্মিত চামুণ্ডার মুখোশ পরে ধর্মরাজের সামনে নাচ হয়।

দাঁড়কা গ্রামে পূজার পূর্বদিন অর্থাৎ নিশাজাগরণের শেষ রাত্রে দক্ষিণাকালীর চামুণ্ডা মূর্তি ধারণ করে নৃত্য দেখাতে হয় ধর্মরাজের সামনে।

এই খেলাকে মুখোস খেলা বা মোহাস খেলাও বলা হয়। মুখোশ শব্দের অপভ্রংশ*। (মুখোশের চিত্র দ্রঃ)।

১১৭। **পরমান্নের ভোগ** : বড়া ও তাঁতিপাড়া গ্রামে ধর্মরাজ পূজায় পরমান্নের ভোগ হয়।

১১৮। **চিঁড়ে ভোগ** : বাতাসপুর, ভবানীপুর (রাজনগর) গ্রামে পাঁচ পাই (আড়াই সের) চিঁড়ের ভোগ হয়।

১১৯। **মন্দির প্রদক্ষিণ** : লায়েকপুর, গঙ্গালপুর, ঘুরিষা, জ্যোল্ল, বড়রা, লাঙ্গুলিয়া, লখীন্দরপুর প্রভৃতি গ্রামে ধর্মরাজ নিয়ে ভক্ত্যারা সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে[৩২]।

১২০। **মদে স্নান করানো** : লাঙ্গুলিয়া গ্রামে ধর্মশিলাকে পূর্ণিমার দিন মদের দোকানে নিয়ে গিয়ে মদ দিয়ে স্নান করানো হয়। জলে স্নান করানোর বিধি নাই।

১২১। **চালান গান** : কৃষ্ণপুর গ্রামে বাণেশ্বরকে স্নান করানোর পর মূল দেয়াশী অন্যান্য ভক্ত্যাসহ চামর ঢুলিয়ে চালান গান গাইতে গাইতে খোল করতাল সহ বাদ্য বাজিয়ে স্নানের ঘাট থেকে পূজা মণ্ডপে নিয়ে আসেন। (চালান গান—পাঁচালী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১২২। **ভক্ত্যাদের আট নয়টা পুকুরে স্নান** : পালিগ্রামে পূজার দিন সকাল বেলা মন্দির থেকে ঠাকুরকে বাইরে আটচালায় বের করা হয়। পরে গ্রামে যতগুলি পুকুর আছে (আট-নয়টা) সবগুলিতে ভক্ত্যারা ডুবে আসে। তারপর ফিরে এসে ধর্মরাজের মাথায় ফুল চড়ায়।

*তুলনীয় : …"and in the shrine is kept a large painted mask for the pujari to wear at festivals, as he dances round the image of Potu-Razu." (The Village Gods of South India, 2nd ed., p. 40, R. Whitehead).

১২৩। **কোঁখবাণ :** দু টুকরা সরু বাঁশের দণ্ডের প্রত্যেকটির এক মাথায় একটি করে ছোট ত্রিশূল লাগানো থাকে। অপর মাথায় দুটি মোটা সূচের মত লাগানো থাকে। এই সূচ দুটি একটি ভক্ত্যার দুই কোখের চামড়া টেনে ধরে এপার ওপার ফুঁড়ে দেওয়া হয়। অপর প্রান্তের ত্রিশূল দুটি চাপাচাপি রেখে সরিষার তেলে ভিজানো কাপড়ের টুকরা জড়িয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ঐ ভক্ত্যা বাদ্যের তালে তালে নাচে। পাশাপাশি আর এক ভক্ত্যা নাচে এবং ঐ আগুনে ধূপের গুঁড়া ছড়িয়ে দেয়। (কামাররহাটি, মেটেল্যা, সুগুণপুর, জামথলি।)

১২৪। **নবরম্ভবাণ** : এই কোঁখবাণকে মেটেল্যা গ্রামে নবরম্ভবাণও বলা হয়। নব-রম্ভবাণের নয়টি মুখ থাকে।

১২৫। **সগড়বাণ** : দোলনসেবার অনুরূপ।

১২৬। **শক্তিশেল বাণ** : ভাদুলিয়া, হিজলগড়া।

১২৭। **জিহ্বাবাণ** : বহু জায়গায় জিভে লৌহ শলাকা ভক্ত্যারা বিদ্ধ করে[৩৩]।

১২৮। **পাঞ্জর বাণ** : বড় সাংড়া গ্রামে জিহ্বাবাণ ও পাঞ্জর বাণের দুই প্রান্তে কাপড় জড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হাওড়া জেলায় কল্যাণপুর গ্রামে, একটি লোহার পাত্রে আগুন রেখে পাত্রটি ভক্ত্যার বুকে পাঞ্জরে একটি লোহার বঁড়শী দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম দশলকি।

১২৯। **জ্বলন্ত ত্রিশূল** : ইন্দ্রগাছায় মাথায় গামছার সঙ্গে বেঁধে একটি ত্রিশূলের মুখে আগুন জ্বালিয়ে বার বার ধূপ ছিটিয়ে আগুনের ভয়াবহ রূপ দেখানো হয়।

১৩০। **নটরাজ নাচ** : ঐ সময় ভক্ত্যাটি নটরাজের নৃত্য ছন্দে নাচ দেখায়।

১৩১। **সুতোবাণ** : ভাদুলিয়া।

১৩২। **গাড়ী বাণ** : গাড়ী বাণামোর অনুরূপ। ভাদুলিয়া।

১৩৩। **দা-বাণ খেলা** : (বংশনির্মিত চারজনের বয়ে নিয়ে যাবার মত ছোট খাটের মত বস্তু।) চারটি কলাগাছের কাণ্ড চতুষ্কোণ আকারে বেঁধে কয়টি ধারালো রামদা খাড়াভাবে (কলাগাছে খাঁজ কেটে) রাখলে তার নাম দা-বাণ। যাকে দা-বাণে চড়ানো হবে সে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে বসবে। দেবাংশী ভক্ত্যাদের সঙ্গে বাবার নামগান করে ক্ষীরজল (স্নানজল) ছিটিয়ে দেন। তখন আরোহীর আবেশ হবে এবং সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। ভক্ত্যারা তাকে সেই দায়ের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার উপর বাণেশ্বরকে চাপিয়ে দেবে। তারপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। চারজন বাহক তাকে বহন করে। এদের বলা হয় 'অসিপত্র ব্রতী'। প্রশস্ত এক ময়দানে এবং এক বুক সমান জলে তাকে নিয়ে গিয়ে নানারকম খেলা করা হয়। রণবাদ্য সহ ক্রীড়া হয়। এই সময় দেবাংশী ন্যাকড়ার ঝোলার ভিতর ধর্মরাজকে পুরে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। তিনিও আবিষ্ট হয়ে পড়েন। দু'জন ভক্ত্যা তাঁর বগলে হাত পুরে তাঁর সঙ্গে চলতে থাকে ও প্রবলবেগে নানারকম খেলা করতে থাকে। এরা গ্রামে প্রবেশ করে যাদের বাড়ীতে ঢোকে তাদের বাড়ীতে যদি কারো দুরারোগ্য ব্যাধি থাকে তার কারণ ও নিরাময়ের উপায় সংজ্ঞাহীন দেবাংশী প্রকাশ করে। সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণের পর ধর্মরাজতলায়

ফিরে এলে দাবাণারোহীকে অক্ষত দেহে মুক্ত করা হয়। (মোহনপুর, বড়া, আদিত্যপুর, তাঁতিপাড়া।)

কামারহাটি, নবেলেড়া ও রাতমা গ্রামে চার হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া একটি পাটাতনের উপর একটি মানুষের ধড়ের সমান অংশ কয়েকটি লোহার পাতলা পাত খাড়াভাবে প্রায় প্রস্থ বরাবর বসানো থাকে। একটি লোক উপুড় হয়ে ঐ লোহার পাতের উপর বুক ও পেট রেখে শুয়ে থাকে। এই অবস্থায় একটি ভক্ত্যা দু'পাশে পা রেখে লোকটির উপর বসে থাকে। এই অবস্থায় তাদের দু খানি বাঁশের উপর চাপিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। দাবাণারোহী অজ্ঞান হয়ে থাকে। পরে ক্ষীরজল (শান্তিজল) ছিটিয়ে তার জ্ঞান ফেরানো হয়।

(দ্রষ্টব্য—পাইকড় গ্রামে ক্ষ্যাপাকালী ও বুড়ো শিবের কাছে সরস্বতী পুজোর সময় বাণ-ব্রত উৎসবে দাবাণ খেলা হয় (শিবসাযুজ্য অধ্যায় দ্রঃ)।)

১৩৪। **চরকী বাণ** : চার হাত দীর্ঘ এক হাতের কিছু বেশী প্রশস্ত একটি পাটাতনের মাথায় এক টুকরা কাঠ দিয়ে মাথা রাখবার জায়গা করা থাকে। পায়ের দিকে এক টুকরা কাঠ থাকে। যার উপর একটি লোক শুয়ে পড়লে একটু ঢালু অবস্থাতেও স্থির থাকে। পড়ে যায় না। পাটাতনের উপর লোকটির পিঠ বরাবর লোহার পেরেক খাড়াভাবে বসানো থাকে। ঐ পেরেক কামারের তৈরী। ঐগুলির মুখ নাতিতীক্ষ্ণ। পাটাতনের নীচে কাঠের চাকার মত লাগানো থাকে। এই পাটা সমেত চাকা একটি কাঠের দণ্ডের চারিপাশে ঘুরতে পারে। খাড়া এই কাঠের দণ্ডটি আর একটি পাটাতনে লাগানো থাকে। একটি লোক এর উপর বসে উপরের পাটাতনকে ইচ্ছামত দণ্ডটির চারিপাশে ঘোরাতে পারে। নীচের পাটাতনের তলে দুইটি বাঁশকে বেঁধে সবটা বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উপরের পাটাতনের পেরেকের উপর একজন ভক্ত্যা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। একখানি চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দেওয়া হয়। একজন ভক্ত্যা নীচের পাটাতনে বসে উপরের ভক্ত্যা সমেত পাটাতনকে ঘোরায়। এই অবস্থায় গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। আরোহী তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে। (কামারহাটি ও রাতমা।)

১৩৫। **হোলাবাণ** : হিজলগড়া, শিরা, রসা, মধুনগর। (হোলা শব্দের অর্থ মাটির পাত্র। পাতিল।)

১৩৬। **জিহ্বাবাণ সহ নাচ** : কামারহাটি গ্রামে ধর্মপুজার সময় একজন ভক্ত্যার জিহ্বাবাণ ফোঁড়া হয়। বাণের দুইদিকে দুই জন ভক্ত্যা ধরে। পায়ে নূপুর পরে বাদ্যের তালে তালে তারা তিনজনেই নাচতে থাকে। এইসব ভক্ত্যাদের বলা হয় দাঁড়বাণব্রতী।

১৩৭। **চৌকিদারের স্কন্ধারূঢ় হয়ে নৃত্য** : গৌরনগর ও সুগুণপুরে জিহ্বাবাণ ফোঁড়ার পর চৌকিদার কাঁধে নিয়ে এক এক করে ভক্ত্যাদের বেদীর চারিদিকে ঘোরায়।

১৩৮। **হাতবাণ** : বেলিয়া।

১৩৯। **আড়ালে বলি** : পুরন্দরপুর, কোদাইপুর, মাজিগ্রাম, উষগ্রাম, ধোবাগ্রাম, কোমা, বড়া, খুজুটিপাড়া, ভীমগড় প্রভৃতি বহু গ্রামে ধর্মরাজের সামনে বলি হয় না। একটু পাশে বা আড়ালে হয়।

১৪০। **ভৈরবের সামনে বলি** : কড্ডাং গ্রামে ধর্মরাজের সামনে বলি না হয়ে একটু তফাতে বটুকভৈরবের সামনে বলি হয়। (ঐ ভৈরবের পুজাও হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়)।

১৪১। **মনসার সামনে বলি** : শালদহে ধর্মরাজের সঙ্গে যুক্ত মনসার উদ্দেশ্যে বলি হয়। ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে বলি হয় না।

১৪২। **পিছন ফিরে বলি** : গাংটে গ্রামের ধর্মরাজের সামনে গাছ ও মেষ বলি হয়। তবে যিনি বলি দেন তাঁকে পিছন ফিরে বলি দিতে হয়।

১৪৩। **বলির সঙ্গে ভাঁড় ভাঙ্গা** : শুকজোড়া (বিহার) ধর্মপূজোয় পাঁঠা বলি-দানের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাঁড় ভাঙ্গা হয়।

১৪৪। **শ্বেতছাগ বলি** : খুজুটিপাড়া গ্রামে ধর্মপুজার পর সামনে বলি হয় তারপর দুই পাশে বহু ছাগ ও মেষ বলি হয়। যারা মানসিক করে তারা শ্বেতছাগ বলি দেয়[৩৪]।

১৪৫। **মুরগী বলি** : পান্নুড়ে গ্রামে ধর্মরাজের সামনে ছাগ বলি ও আড়ালে মুরগী বলি হয়। পাতাডাং গ্রামেও তাই। জামথলি গ্রামে মুলধর্মমন্দিরের পুর্বে আর একটি ধর্ম-রাজের আটন আছে। সেখানে ডোম জাতিরা মুরগী বলি দেয়।

১৪৬। **বিজয়া দশমীর দিন বলি** : বাজিতপুর গ্রামে ধর্মরাজের মুল পুজা বৈশাখী পুর্ণিমায় হলেও বিজয়া দশমীর গভীর রাত্রে ধর্মরাজের সামনে বলি হয়।

১৪৭। **নবমীর দিন বলি** : নবমীর দিন বলি হয় মোহনপুর গ্রামে।

১৪৮। **শূকর বলি**[৩৫] : গোয়ালপাড়া গ্রামে ধর্মতলার একটু পাশে মেঘরায়ের উদ্দেশ্যে শূকর বলি হয় তারপর ছিন্ন শীর্ষটি রাজভাঁড়ালে পুরে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সুগুণপুর গ্রামে ডোম জাতিরা শূকর বলি দেয়। তবে এই শূকর বলি দেওয়া হয় ঔষধের জন্য। ধবল, পদ্ম-কাঁটা, খুর্শেলাগা প্রভৃতির ঔষধ ও তেল তৈরী করবার জন্য শূকর রক্ত প্রয়োজন হয়।

১৪৯। **এক সঙ্গে নয়টি বলি** : রায়রামচন্দ্রপুরে (বর্ধমান) কটা রায়ের বৈশাখী পূর্ণিমায় পুজায় এক সঙ্গে ৯টি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বলি দেওয়ার পরই ঘাতক সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখবার জন্য শত শত দর্শক সেখানে সববেত হয়।

১৫০। **পুর্ণিমার আগের দিন বলি** : দাদপুরে পুর্ণিমার আগের দিন ছাগ বলি হয়।

১৫১। **গাঁজা ও মদ্যমাংস ভোজন** : মালাবেড়িয়া গ্রামে পুজার দিন সকাল থেকে গাঁজার আসর বসে। অপরাহ্ণে মদ্যমাংস সহযোগে ভুরিভোজন হয়।

১৫২। **জলে চুবে থাকা** : ঐ গ্রামে চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় বাণগোঁসাই-এর শলাকার উপর দু'জন ভক্ত্যা শুয়ে পড়ে এবং বাহকরা ধর্মরাজসহ তাদের পুকুরে নিয়ে যান। পুকুরের জলে আরোহীদ্বয় আধঘণ্টা চুবে থাকে।

১৫৩। **স্নানজলে প্রদীপ জ্বালানো** : মাজিগ্রামে ধর্মরাজের স্নানজলে প্রদীপ জ্বালানোর বিধি।

১৫৪। **গাছমঙ্গলা** : ঈশ্বরপুর গ্রামে ধর্মপূজার চতুর্থ দিনে গাছমঙ্গলা হয়। অর্থাৎ সুতো দিয়ে অশ্বত্থ গাছকে বেষ্টন করে ধর্মরাজকে মাথায় নিয়ে সেই গাছকে পরিক্রমা করবার

বিধি। মুর্শিদাবাদের ভাসতর ও ঘাসিয়াড়া গ্রামেও তৃতীয় দিনে গাছমঙ্গলা হয়। (তুলনীয়— জুইথিয়া ও নিমগড়ই গ্রামের মনসাদেবীকে নিয়ে অশ্বথ গাছ পরিক্রমা করে গাছমঙ্গলা হয়ে থাকে)।

১৫৫। **চড়ক গাছ তুলে আনা ও পূজা** : কালুহা ও জগদীশপুর গ্রামে পুর্ণিমার দিন একটি পুকুর থেকে চড়ক গাছ তুলে এনে পূজা করা হয়। মালাবেড়িয়া গ্রামের তালের গুঁড়ি জাগানো এবং মেটেল্যা গ্রামে চড়ক গাছকে নিমন্ত্রণ জানানোর প্রথাগুলি তুলনীয়।

১৫৬। **নিমপাতা চিবানো ও তিলক** : কুড়মিঠা গ্রামে ধর্মপূজায় যজ্ঞশেষে ভক্ত্যারা তিলক গ্রহণ করে না। তিলক রেখে দিতে হয়। পুজানুষ্ঠানের শেষে উত্তরীয় উন্মোচন ও স্নানান্তে ভক্ত্যারা গাজনে এসে (মৃত ব্যক্তিকে দাহ করার পর যেমন) নিমপাতা চিবিয়ে গঙ্গা জল মুখে দেয় এবং যজ্ঞশেষ তিলক যা তাদের জন্য রাখা ছিল সেই তিলক ধারণ করে।

ঘুরিষা গ্রামে ভক্ত্যারা ভাঁড়াল মাথায় নিয়ে আবিষ্ট হয়। তারপর মন্দির প্রদক্ষিণ করে বসলে ভাঁড়ালে ফুল চড়ানো হয়। একটি ফুল পড়ার পর দুধ মেশানো স্নানজল প্রত্যেককে দেওয়া হয়। একে বলে নিমজল (নিয়মজল ??)। যদিও নিমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক এর সঙ্গে বর্তমানে নেই। বড়রা গ্রামে নিমপাতা নিয়ে নিমজল তৈরী করা হয়।

১৫৭। **জলে নেমে প্রসাদ ভক্ষণ** : কালুহা ও জগদীশপুর গ্রামে পুজা হোম ও বলিদানের পর ভক্ত্যারা প্রসাদ গ্রহণ করে ও পুকুরের জলে নেমে ঐ প্রসাদ ভক্ষণ করে।

১৫৮। **ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিকট অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নতি স্বীকারের নিদর্শন** : ইন্দ্রগাছা গ্রামে[৩৬] অগ্নিবাণ খেলার পর জলন্ত ত্রিশূল মন্দিরের বাইরে রেখে ধর্মমন্দিরের চৌকাঠ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম শিওরে ভক্ত্যারা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। প্রথম ভক্ত্যা শুলে তার নাভিকুণ্ডের পাশে মাথা রেখে আর একজন তারপর আর একজন, এইভাবে শোয়। পুরোহিত বা দেয়াশী ঘোড়া কাঁধে নিয়ে প্রত্যেকের বুকে পা রেখে চলে যান ও বেদীর উপর ঘোড়াটি রক্ষা করেন। লম্বোদরপুর গ্রামে অনুরূপভাবে ভক্ত্যাদের বুকে পা দিয়ে ধর্মশিলা বহনের রীতি আছে।

১৫৯। **জাঙ্গাল দেওয়া** : কুড়মিঠা গ্রামে ভক্ত্যারা চিৎ হয়ে মাটিতে হাত রেখে হেঁটমুণ্ডে উঁচু হয়ে থাকে[৩৭]। ব্রাহ্মণ তাদের বুকে পা রেখে হাঁটেন। তারপর বিপরীতভাবে পিঠের উপর হাঁটেন। কড্ডাং গ্রামেও ভক্ত্যাদের বুকে পা রেখে দেবতার বাহক চলে যান। একে বলে জাঙ্গাল দেওয়া। শূদ্রাক্ষিপুরেও তাই।

১৬০। **ব্রাহ্মণের ধর্মশিলা বহন** : বড়া ও খুজুটিপাড়া গ্রামে ব্রাহ্মণে ধর্মশিলা মস্তকে বহন করেন।

১৬১। **ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পাঁঠা প্রদান** : হেতিয়া গ্রামের দেয়াশী কুম্ভকার কিন্তু পুজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে একটি বলির জন্য পাঁঠা দিতে হয় ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে।

১৬২। **ব্রাহ্মণ গৃহে মাংস বিতরণ** : নান্দড়া গ্রামে বলির মাংস পরিমাণ যতটুকুই হোক না কেন গ্রামের প্রত্যিটি ব্রাহ্মণ গৃহে ভাগ করে পাঠাবার বিধি আছে।

১৬৩। **অব্রাহ্মণ ভক্ত্যাদের গৃহে মাংস বিতরণ** : খটঙ্গা গ্রামে বলির মাংস ভক্ত্যাদের গৃহে বিতরণ করা হয়।

১৬৪। **গ্রাম পরিক্রমা** : ঘুরিষা গ্রামে ধর্মশিলাকে স্নান করানোর (বড় বাণামো) দিন ধর্মশিলাগুলিকে চন্দন ঘি মাখিয়ে একটি বড় নতুন ডালার মধ্যে রেখে চৌদোলায় পুরে নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে চামর দিয়ে সাজিয়ে দু'জনা কাঁধে নিয়ে আগোসান (ভর) নামে। প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ফুল দিয়ে আসতে হয় এ সময়। (বীরভূমে মনসা পূজার সময়েও অনুরূপ করা হয়)।

১৬৫। **ধীবর সম্পদায়ের ধর্মশিলা বহন**[৩৮] : লায়েকপুর গ্রামে ধর্মরাজের দেয়াশী-বাগ্দী, পুরোহিত সদ্ব্রাহ্মণ কিন্তু পূজার সময় সিংহাসন মাথায় নিয়ে বহন করে কেবলমাত্র ধীবর সম্প্রদায়।

১৬৬। **ধীবর দেয়াশী কিন্তু পূজারী কর্তৃক স্নান করানো** : ভাসতর গ্রামে পূজার দিনে ব্রাহ্মণ পূজারী দ্বারা ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়। দেয়াশী ধীবর।

১৬৭। **ঘোড়া সহ চড়ক, ঘোড়া প্রদক্ষিণ** : ইন্দ্রগাছা গ্রামে ধর্মরাজের চড়কের দিন একটি কাঠের ঘোড়াকে বাঁপাপুকুরের ঘাটে নিয়ে যায়। ঘোড়াটিকে ঐ জায়গায় রেখে হাত জোড় করে নতভাবে বৃত্তাকারে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে। ঐ সময় ভক্ত্যাদের নাকে ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয় প্রচুর পরিমাণে। তারপর তারা ফিরে এসে ঘোড়াটিকে মন্দিরে রেখে সেই বছরের মতো পূজা সমাপ্ত করে।

১৬৮। **পূজার পূর্বেই চড়ক** : কোমা গ্রামে পূজার পূর্বেই চড়ক হয়। বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন ভক্ত্যারা মন্দির থেকে ছোট বড় নানারকম কাঠ ও মাটির ঘোড়া নিয়ে উত্তরে চন্দ্রভাগা নদীগর্ভে যায়। ঐখানে দেবতার সাবেক আটন ছিল। সেখানে ভক্ত্যারা শুয়ে পড়ে "বাবা ধর্মনিরঞ্জন রাজরাজেশ্বর" বলে ডাক দিতে থাকে। তারপর ঘোড়াগুলিকে কাঁধে নিয়ে নাচে। এরপর মন্দিরে এসে বাণগোঁসাইকে মাথায় নিয়ে হাজরাপাড়ায় দুর্গাতলার সন্নিকটে একটি ঢিবির উপর বাঁধানো স্থানে বাণগোঁসাইকে নামিয়ে তারা ঘোড়া কাঁধে নাচতে সুরু করে।

১৬৯। **ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে স্নান** : বড়রা গ্রামে চড়কের দিন ধর্মরাজকে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে স্নান করাতে নিয়ে যেতে হয়। চড়কে আর কোনো অনুষ্ঠান হয় না।

১৭০। **চড়কডাঙ্গা** : বহু গ্রামে চড়ক লোপ পেয়েছে, কিন্তু চড়কডাঙ্গা নামে জায়গা প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বর্তমান। যথা, বড়রা এবং গ্রাম সুগুণপুর[৩৯]।

১৭১। **বাটাপূজা** : সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, ত্রিবিধ উপায়ে পূজা। পুরোহিত ধ্যান করেন নারায়ণের, উৎসবে ঢক্কা নিনাদ, পূজা সাঙ্গে বলি। (খুজুটিপাড়া, বড়া গ্রাম, কামারহাটি এবং পালিগ্রাম।)

১৭২। **বাবুই খেলা** : বাবুই-এর গুচ্ছ মোটা করে পাকিয়ে ধর্মের ভক্ত্যাদের চাবুক মারা হয়। (তাঁতিপাড়া, ভাদুলিয়া, ছিনপাই, ভবানীপুর (দুব)।)

১৭৩। **তৃতীয় দিনে মুক্তস্নান ও পরিক্রমা** : নিস্তিয়া গ্রামে তৃতীয় দিন অর্থাৎ নীলপুজার দিন ধর্মরাজের আবার মুক্তস্নান হয়। কুমারপুর গ্রামেও তাই।

ঘাসিয়াড়া গ্রামে তৃতীয় দিনে স্নান করিয়ে ধর্মরাজকে মাঠের মাঝখানে একটি পৃথক আটন আছে সেখানে একটি গাছকে প্রদক্ষিণ করিয়ে (দ্রষ্টব্য, অনুষ্ঠান গাছমঙ্গলা) ঘোড়া নিয়ে ঢাকঢোল সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়।

১৭৪। **বিবিধ অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি** : পূর্ণিমার পর একাদশীর দিন বহু স্থানে নীল পুজা, দেবতার পুনরায় মুক্তস্নান, চড়ক, গাছমঙ্গলা ও কাচমাড়া অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

১৭৫। **নবখণ্ড** : পালিগ্রামে একটি চৌকা একমানুষ পরিমাণ গর্ত করা হয় পুজার দিন। তারপর একটি ভক্তের জিভে ৭/৮ হাত পরিমাণ লম্বা বাণ ফুঁড়ে তার মধ্যে বসানো হয়। তার মাথায় ঘিয়ের প্রদীপ ও বাণের মুখে পদ্মফুল দেয়। এই সময় লাউসেনের দেহ নবখণ্ড করে অগ্নিতে আহুতি দেবার পালাটি গীত হয়। তারপর ভক্ত্যাটিকে গর্ত থেকে উঠিয়ে এনে বাণ খোলা হয়। একেই বলে নবখণ্ড[৪০]।

১৭৬। **ভক্ত্যাদের পায়ে জল** : মল্লিকপুর, বেলিয়া ও আর বহু গ্রামে ধর্মপুজার চতুর্থ দিনে গ্রামের বাড়ী বাড়ী বাণগোঁসাইকে নিয়ে ঘোরা হয়। গ্রামবাসীরা ভক্ত্যাদের পায়ে জল ও হাতে পয়সা দেয়।

১৭৭। **চতুর্থ দিনে উত্তরীয় ধারণ ও কানে তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরে প্রসাদ ভক্ষণ** : পালিগ্রামে চতুর্থ দিনে অর্থাৎ পুর্ণিমার একদিন পর ধর্মরাজের নিত্য পুজার পর বাণেশ্বর সহ গ্রামের ভক্ত্যারা পুকুরে গিয়ে উত্তরীয় ধারণ করে। পরে ভক্ত্যারা ফিরে এসে বাটা পুজা করিয়ে সারাদিন উপবাস করে রাত্রে কানে তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আতপ চালের অন্ন এবং দুধ মিষ্টি খায়।

১৭৮। **মুদ**[৪১] : মারকোলা গ্রামে ধর্মের ভক্ত্যারা "মুদ" নামে একটি অনুষ্ঠান করে। একটি লোককে মাটিতে পুঁতে রাখে তিন দিনের জন্য। সামান্য একটু ছিদ্র রেখে দেওয়া হয়। নিমগড়ই গ্রামের মনসা পুজায় একটি লোককে তিন দিন ধরে মনসা গৃহে আবদ্ধ রাখার অনুষ্ঠান লক্ষণীয়। ("ধর্মঠাকুর ও মনসা" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

১৭৯। **জলক্রীড়া**[৪২] : গজালপুর গ্রামে উত্তরীয় খেলার দিন ধর্মভক্ত্যারা জলক্রীড়া করে।

১৮০। **হরির লুঠ** : ঘুরিষা গ্রামে ভাঁড়াল মাথায় নিয়ে ভক্ত্যারা যখন ভর নামতে নামতে গ্রাম পরিক্রমা করে তখন গ্রামবাসীরা হরির লুঠ দেয়।

১৮১। **ঘোড়া পুজা** : কালুহা ও জগদীপুর গ্রামে ধর্মরাজের চারিটি ঘোড়াকে পুজা করা হয়। ইন্দ্রগাছা গ্রামে ধর্মশিলার পরিবর্তে একটি ঘোড়াকে ধর্ম বলে পুজা করা হয়। পালিগ্রামে পুর্ণিমার আগের দিন প্রতি গৃহে বাণেশ্বর ও ঘোড়া পুজা করা হয়।

১৮২। **ঘোড়া নৃত্য** : কাগজ দিয়ে কতকগুলি ঘোড়ার সাজ তৈরী করে সেগুলি পরে চড়ক টিবির চারিপাশে সমবেত ভক্ত্যারা উল্লাস ও নৃত্য করে। (লম্বোদরপুর, পুরন্দরপুর

তাঁতিপাড়া, সিউড়ী।) এখানে উল্লেখ্য, সাঁওতালি বিবাহ উৎসবে এতদঞ্চলে অনুরূপ ঘোড়ার সাজ পরে নৃত্য করার প্রথা বিদ্যমান।

১৮৩। **মুণ্ড পূজা**: হেতিয়া গ্রামে[৪৩] ধর্মরাজের নিকট বর্তমান দেয়াশীর প্রায় ২৫ পুরুষ আগে যিনি ধর্মরাজকে স্বপ্নে প্রাপ্ত হন তাঁর মুণ্ডটি রক্ষিত আছে। ধর্মপূজার পুর্বে সেই মুণ্ডটির আগে পুজা হয়ে থাকে।

পাতাডাং গ্রামেও ধর্মস্থানে একটি করোটি রক্ষিত আছে। বড়মহুলা গ্রামে ডাকাতে কালীর স্থানে দেয়াশী মাধব দেবাংশীর (সদ্গোপ) মুণ্ডটি রক্ষিত আছে। এটির নিত্য পূজা হয়। কুড়মিঠা (সিউড়ী) গ্রামেও তাই। (বড়মহুলার এই কালীর স্থানে নিকটবর্তী লখীন্দরপুর গ্রামের ধর্মভক্ত্যারা নৃত্য করে যায়।)

১৮৪। **দেয়াশী**: দেবাংশী অর্থাৎ দেবের অংশীদার এই অর্থে। ধর্মমন্দিরের দেখাশুনা যিনি করেন ও পুজানুষ্ঠানাদি পরিচালনা করেন তাঁকে দেয়াশী বলে চলিত কথায়। বীরভূমে দেবাংশী উপাধিও পর্যাপ্ত আছে।

১৮৫। **চড়ক দেয়াশী**: শূদ্রাক্ষিপুরে যে সকল ভক্ত্যারা গলায় মালা পরে চড়ক স্থানে গিয়ে ধর্মরাজের নাম ডেকে সেই জায়গাটি ও গ্রাম প্রদক্ষিণান্তে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে মালাগুলি খুলে রাখে তাদের চড়ক দেয়াশী বলে।

১৮৬। **পাট দেয়াশী**: প্রধান দেবাংশী[৪৪]।

১৮৭। **ফুল দেয়াশী**: সহকারী দেবাংশী।

১৮৮। **শিব দেয়াশী**: পূজা কয়দিনের জন্য যে ভক্ত্যা প্রধান হন এবং সকল কর্ম নির্বাহ করেন।

১৮৯। **ধর্মযজ্ঞ**: বাজিতপুর গ্রামে ধর্মপুজার পরদিন ভক্ত্যারা উত্তরীয় খুলে ভিক্ষালব্ধ চাউল পাক করে খায়, একে বলে ধর্মযজ্ঞ। এ ভোজন প্রায় সকল স্থানেই হয়ে থাকে। মুড়োমাঠ গ্রামে চাউল ভিজানো, ছোলা ও গুড় খেতে দেওয়া হয়, ভক্ত্যাগণ ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের। শ্রীকণ্ঠপুরেও চতুর্থ দিনে ধর্মযজ্ঞ হয়।

১৯০। **কোটক**: ধর্মঠাকুরের শোভাযাত্রার সময় যারা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে মনস্কামনা জানায়, তাদের কোটক বলে। কোনো ভক্ত্যা পুর্ন কলসীর জল তাদের গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ধর্মের দেয়াশীদের যে কয়টি গোত্র সংগ্রহ করেছি তা এই—

(ক) ডোমদের হংসগোত্র এবং কচ্ছপ গোত্র, মালদের পলাসী গোত্র (মেটেল্যা গ্রামে মালজাতি "পলাসী" নামে এক দেবীর পুজা দেয় ১লা মাঘ।) বাউরীদের "রী" গোত্র।

(খ) "নিজ গোত্রং পরিত্যজ্য সন্ন্যস্ত ব্রত সন্ন্যমে গৃহচিন্তাং পরিত্যাজ্য দেবকর্ম সুচিন্তয়েৎ", ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ২০।

২. দ্বাদশ আদিত্য স্মর্তব্য।

৩. (ক) "During the procession the people flourish sticks and swords and spears to keep off the evil spirits", p. 49.

"The father granted his request and gave him some water in a vessel and a *cane*, telling him to put his mother's head on her body, sprinkle the water on her and tap her with the cane". p. 116.

The Village Gods of South India, 2nd ed., by Rev. Whitehead.

(খ) "ভূমৌ বিন্দুঃ পতং স্তত্র বেত্রবৃক্ষসমুদ্ভবঃ
ক্রমে তিষ্ঠন্তি বেত্রে চ ব্রহ্মা বিষ্ণুমহেশ্বরা" ।—ধর্মপূজা বিধান, পৃঃ ২০।

৪. "On the first day the image is washed."—Village Gods of South India, by R. Whitehead, p. 102.

৫. ক্ষিতীশ প্রসাদের রচনায় এই অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রস্তুত গ্রন্থের পৃথক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬. (ক) গাজনের দাহুড়ঘাটা পর্ব জলোৎসবের মত। এখানেও বরুণের পূজার ইঙ্গিত। রূপরামের ভূমিকা, ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৭। (খ) সাঁওতালি অভিধানে 'দাহুর' শব্দের অর্থ 'অনেক পরিমাণে' এ. ক্যাম্পবেল, ১৮৯৯, পৃঃ ১১৩। (গ) সংস্কৃত 'দর্দ্দুর' অর্থে ব্যাঙ্।

৭. সাঁওতালি ভাষায় পাতা পরব অর্থে চড়ক।

৮. বাণেশ্বরকে নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ডাদি যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

৯. মহাভারতে যন্ত্রের ছিদ্রপথে পঞ্চশরে লক্ষ্যভেদের কথা আছে। ইহাতে বোধ হয় রাধাচক্রের 'রাধা',—'লক্ষ্য' এবং 'চক্র' লক্ষ্যের নিম্নস্থ যন্ত্র। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেও 'চক্র' নির্মাণ করিতে হয়। তুলনীয়, মণ্ডল চক্র, যোগিণী চক্র—চর্যাপদ, পৃঃ ২২। সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩ (বিশ্বভারতী), ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল।

১০. ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
জ্ঞান প্রদায় করুণাময় সাগরায়।
কর্পূর কুন্দধবলেন্দু জটাধরায়
দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়
ওঁ বাণেশ্বরায় নমঃ॥"—ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ৯০।

১১. জাঃ অবঃ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৪২ সালে, ক্ষিতীশপ্রসাদ 'ধর্মওয়ারশিপ' প্রবন্ধে দণ্ডীকে, সেবা করা আখ্যা দিয়েছেন।

১২. ধর্মপূজাবিধানে দ্বাদশ ভক্তের গৃহভরণ ব্রত করার কথা আছে। তার থেকেই 'দ্বাদশ দেওয়া' কথাটির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। ('দ্বাদশ' শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ শরীর) দ্রষ্টব্য—'মূলাধার পদ্ম হতে উঠি সহস্রারে, প্রাণপুরুষ যবে বসবাস করে'। তখন 'দ্বাদশে' হংস করে উল্টাগতি, তখনই প্রকাশ পায় অনুপম জ্যোতিঃ—'গোর্খবিজয়'। অথবা দ্বাদশ পিঙ্গলা মধ্যে সূর্যের বিকাশ—নাথগুরু বাণী। ধর্মপূজাবিধানে আছে 'দেখহ পণ্ডিত ভাই ধর্ম অবতার দ্বাদশ অঙ্গুল বটে হংসরাজের চার'—সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮, ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল।

১৩. সিউড়ী দুমকা রোডে সিউড়ী থেকে ৩২ মাইল উত্তর পশ্চিমে বিহারের শিকারী পাড়া থানায় পাতাবাড়ী গ্রাম। এই গ্রামটি সাঁওতাল প্রধান। এই গ্রামের পূর্বে ১ মাইল দূরে বারোমেসে কালী আছেন। তাঁর উৎসবে পাতা-পরব হয়। পাতাপরব সাঁওতালদের মধ্যে বিখ্যাত। রাণীশ্বর (বিহার) গ্রামেও পাতাপরব হয় কালীর নিকট।

"পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা" (২য় খণ্ড) গ্রন্থে ২১২ পৃষ্ঠায় মুর্শিদাবাদ জেলার কড়েয়া গ্রামের ধর্মঠাকুরের

গাজনের বিবরণে লেখা হয়েছে—"ত্রয়োদশী ও চতুর্দশীর রাত্রে ভক্তগণ মন্দির প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে শুইয়া 'পাতাবাটা' নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে পালন করেন।

১৪. কালিকা পাতার মড়ার মাথা নিয়ে নাচ, ঐ "পাতাবাড়ী" গ্রামের বারোমেসে কালীর চড়ক থেকে আসা সম্ভব। "কালিকার পাতারা আস্তমড়া মনুষ্যের শবদেহ—অনেক সময় গলিত শব আনিয়া মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় ও ঢাকের বাদ্য ও ধূপের ধোঁয়া সহ বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে।...শ্মশানবাসী মহাদেবের কালাগ্নিরুদ্র মূর্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু ইহার অনার্যত্বে সংশয় নাই।"—গ্রামদেবতা, সাঃ পঃ পত্রিকা ১৩১৪, ১ম সংখ্যা, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

১৫. (ক) এটি কালিকা পাতা নৃত্যের ভিন্ন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

(খ) কুড়মুনের গাজনে, ঈশানেশ্বর শিবের গাজনে, শ্মশান জাগানো ও নরমুণ্ড নিয়ে খেলা হয়।—পঃ বঃ সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৬৪।

১৬. (ক) গোপডিহি গ্রামের শিবের গাজনে দোলন সেবা দ্রষ্টব্য। হিজলগড়া, রসা, শিরে মধুনগর প্রভৃতি গ্রামে ধর্মপূজা উপলক্ষে শিবের নিকট দোলন সেবা হয়। (খ) অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ এই অনুষ্ঠানকে 'হিন্দোল' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৭. কোটাসুর সম্পর্কে "নদী তীরবর্তী সভ্যতা" অধ্যায়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৮. "আদৌ আচম্য ঘটস্থাপনং কৃত্বা স্বস্তিং বাচয়িত্বা অর্থ ধর্মদেবস্য
পাদযুগনির্মানার্থং দেবমৌক্তিকস্য শুভগন্ধাধি (দি) বাসনং কুর্য্যাৎ"—ধর্মপূজাবিধান, পৃঃ ১২১।

১৯. তুলনীয় ক্ষিতীশ প্রসাদের প্রদত্ত বিবরণের উদ্ধৃতি।

২০. (ক) তুলনীয়, "...amid the deafening din of trumpets tomtoms and cymbals and the clapping of hands, walk with bare feet slowly and deliberately over the glowing embers", p. 79.

...At Mysore City, where the fire walking ceremony is also performed, p. 79. Village Gods ot South India.

(খ) "...with the Pandava cult, a fire walking ceremony is usually associated". Journal of Royal Asiatic Society, vol. VIII, p. 130, (F. N. Gazetteer of the Salem dist. Madras 1918.), K. P. Chatterjee.

২১. "ধর্মের তপস্যা সুকঠিন। তাই শালে ভর অর্থাৎ শল্য শয্যা। শালে ভর সাধনায় ধর্মের সিংহাসন 'পাট' কণ্টকশয্যায় পরিণত তপস্বী উপাসকের জন্য"। ডাঃ সুকুমার সেন, পঃ বঙ্গের সং, পরিশিষ্ট পৃঃ ৭১৪।

২২. (ক) "It was also formerly the custom for women to come to the shrine clad only in twigs of the margosa tree." Village Gods of South India, R. Whitehead, p. 76.

(খ) সাঁওতালি অভিধানে 'আংগেট' অর্থ নিজের জন্য এক টুকরা রাখা এবং আঙট বাঙট অর্থ, কোনোক্রমে, লক্ষ্যহীন ভাবে। এ. ক্যাম্পবেলের অভিধান, ১৮৯৯, পৃঃ ১৫।

২৩. তুলনীয়: মেদিনীপুর বীরসিংহের গাজন, "Each night he recites a portion of Dharma-mangal from one of the recognised versions, increasing the duration of it on successive evenings. On the twelfth i.e. last night it lasts the whole of the night". Journal of Royal Asiatic Society, vol. VIII, 1942, Dharma Worship, K. P. Chatterjee, p. 113.

২৪. (ক) "...women walk over the red-hot embers with lighted aratis on their head"., p. 80, Village Gods of South India.

(খ) "গ্রামের অধিকাংশ স্ত্রীলোক এই দিন উপবাসী থাকিয়া ধর্মকে দীপদান করে। অনেক মেয়ে এই সময়ে মাথায় ও বক্ষে জ্বলন্ত ধুনার মালসা রাখিয়া ধুনা পোড়ায়।" (চতুর্দশী বা রাত্রি গাজনের কর্ম, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ, পৃঃ ৯।)

২৫. "রাজদ্বার খোলা হলে দিগ্‌দেশাগত দর্শন প্রার্থীদের ডাক দেওয়া হত রাজ দর্শনের জন্য সমবেত হতে। নাম ধর্মডাক। আধুনিক 'ধর্মের ডাকে' অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয়।" ডাঃ সুকুমার সেন, পঃ বঙ্গের সংস্কৃতির পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭৫৪।

২৬. সাঁওতালি অভিধানে জাঁক বা ঝাঁক শব্দের অর্থ হল, কঠোর আদেশ প্রদান। এ. ক্যাম্পবেলের অভিধান, পৃঃ ২৫১।

২৭. ধর্মরাজের সঙ্গে কোনো কামিন্যার বিবাহ দেবার রীতি গ্রামে প্রচলিত আছে শুনেছি, কিন্তু আমার অনুসন্ধানক্ষেত্রে এরকম দৃষ্টান্ত পাইনি। কোমার এই বিবাহ রীতি হাস্যকর হলেও হয়ত পূর্বে ঐ রীতি যথাযথভাবে পালিত হত।

"শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু 'গাজন' শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। এই দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন", (পূজাপার্বণ, পৃঃ ৫৬, যোগেশ বিদ্যানিধি।)

২৮. "পাল রাজগণের সময়েও এদেশে সূর্যোপাসনা প্রচলিত ছিল", বীরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬।

২৯. পূর্বোক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদের রচনা, পৃঃ ১১৬।

৩০. (ক) "বড়াম পুজোয় ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপানোর রীতি আছে", পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৬৪।

(খ) চব্বিশ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় মৎস্যজীবীদের দেবতা মাকাল ঠাকুর বা মাকাল চণ্ডীর পুজোয় ফুল চাপানোর বিধি আছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, আঃ বাঃ পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যা ২৯।১১।৬৪ ইং।

৩১. তুলনীয়, কালীকাচ নৃত্য। কাচমাড়া কথাটির অর্থ ভেদ করা যায়নি। পাইকোড়ে শিবের বাণব্রত উৎসব, যা "বীরভূম বিবরণী"-তে ছাপা হয়েছিল সেখানে এক 'কাচ' শব্দটি বিদ্যমান। যথা:—"তুলসীমঞ্জরী মন্ত্রপূতঃ করিয়া ভক্তগণ কটিদেশে বাঁধিয়া রাখে, তাহারই নাম কাচবন্ধন (কাছা ??)"। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় (২য় খণ্ড), মুর্শিদাবাদ জেলায় মণ্ডলপুর গ্রামের শিবের গম্ভীরা উৎসবে তুলসীমঞ্জরীকে কোমরে বাঁধার অনুষ্ঠানকে "কাচবাঁধা" বলা হয়েছে।

সাঁওতালি অভিধানে "কাচ" বলে কোনো শব্দ নেই।

৩২. "একং দেব্যাঃ রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে

চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধ প্রদক্ষিণম্।"

দেবীকে একবার, সূর্যকে সাতবার, বিনায়ককে তিনবার, বিষ্ণুকে চারিবার এবং শিবকে অর্ধপ্রদক্ষিণ করিতে হয়। (পুরোহিত দর্পণ, পৃঃ ২৫৪) সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মরাজ সূর্যদেবতা।

৩৩. "It is quite common, however, for devotees to come to the shrine with silver pins fastened through their cheeks". V. G. of S. India, p. 76.

৩৪. এ সম্পর্কে অলৌকিক তত্ত্ব, প্রবাদ প্রসঙ্গে খুজুটিপাড়া গ্রাম দ্রষ্টব্য।

৩৫. "Since in ancient Greece the pig was sacred to agricultural deities; e.g. Aphrodite, Adonis and Demeter". Village Gods of South India, p. 59.

৩৬. "It is curious little compromise between ancient custom and Brahmin prejudice", p. 107.

"Two systems of religion have existed side by side in the towns and villages for

many centuries, and the same people have largely taken part in both. Naturally therefore they have borrowed freely from one another" p. 141.

"It is more than probable that many ceremonies, which originally belonged to the village deities have been adopted by the Brahmin priests" p. 141., 'The Village Gods of South India' by R. Whitehead.

৩৭. (ক) জাঙ্গাল—সাঁওতালি ভাষায় 'জাঙ্গা' অর্থে পা। জংঘা, (সং)।

(খ) "ভক্ত্যাগণ সকলে সারি দিয়া বসিয়া থাকিবে তাহাদের উপর দিয়া স্কন্ধদেশে পদার্পণ পূর্বক একজন ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবে। এইরূপ সেবা দ্বারা দ্বাদশ সেবার অঙ্গহীনতা পূর্ণ হয়"। ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ, গৃহভরণ গাজন, পৃঃ ৭, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩৮. ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক পুরোহিত সহ দেবীকে বহন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে, "মস্তেশ্বরের চামুণ্ডা পূজা"। পঃ বঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২৬৩।

৩৯. বড়রা গ্রামে ধরমডাঙ্গা, চড়কডাঙ্গা, চড়কমারা ইত্যাদি নামে কয়েকটি জায়গা এবং ডাঙ্গা আছে। চড়কডাঙ্গার বহুলাংশ বর্তমানে চাষের জমি। এই স্থানগুলি গ্রামের প্রাচীনতম অংশ। এইখানে পূর্বে গ্রাম ছিল। তার প্রমাণস্বরূপ আমার ভ্রমণ সঙ্গী ও বন্ধু কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন এক্সপ্লোরেশন অফিসার শ্রীভাস্কর সেন, এম. এ. অনেকগুলি প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্ন নিদর্শন এখান থেকে সংগ্রহ করেছেন। চতুষ্কোণ একটি প্রস্তর নির্মিত খোদাইকার্য সমন্বিত ভগ্ন অংশও পেয়েছেন।

৪০. (ক) বীরভূমের একমাত্র ঘুরিষা গ্রামেই নবখণ্ড অনুষ্ঠান হয় বা হত বলে মনে হয়। কারণ ধর্মতলায় একটি চৌকা গর্ত আমি দেখেছি এবং পাঁচালী অধ্যায়ে প্রদত্ত যে গীতের নমুনা প্রদর্শন করেছি তা নবখণ্ডেরই।

(খ) "পূর্ণিমার দিন সকালবেলা বাণপূজা বা পাটপূজা করিয়া নবখণ্ড সেবা করিতে হয়।

পৌর্ণমাস্যাং প্রত্যুষে চ সংপূজ্যাস্ত্রং যথাবিধি
নবখণ্ডাদি সেবয়া সেবয়েৎ সর্বসাক্ষিণম্॥

এই নবখণ্ড সেবার জন্য ছাঁওলার একটু অন্তরে, ধর্মের সম্মুখ দিকে একটি চতুষ্কোণ কূপ খনন করাইয়া রাখিতে হয়। এই কূপের পরিমাণ চারিদিকেই প্রায় দুই হাত করিয়া প্রশস্ত এবং প্রায় দেড় হাত গভীর। ইহার চারিধারে চারিটি কদলীকাণ্ড থাকে। এই কূপটিকে হাকন্দ বলে।

ধর্মভক্ত লাউসেন হাকন্দ তীরে নিজ দেহ নবখণ্ড করিয়া, নবখণ্ড সেবা করিয়াছিলেন। এইজন্য কৃত্রিম হাকন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময় ভক্ত্যারা স্নান করিয়া নূতন, অভাবে পুরাতন শালবাণ, বাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকণ্টক ইত্যাদি লইয়া ছাঁওলায় উপস্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ গাজনের নিত্য পূজানুসারে সাবরণ ধর্মপূজা করিয়া বাণ, শালবাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকণ্টক, সূচীমুখ, খড়্গ, অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরধার ইত্যাদি অস্ত্রের যথাবিধি পূজা সমাপ্ত করিলে, পাটভক্ত্যা বা নবখণ্ডকারী ভক্ত্যা বাণ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেহের নয় স্থানে নয়টি বাণবিদ্ধ করে। সাংজাতে এই নয়টি স্থান নির্দিষ্ট আছে। নয়টি বাণ বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, কেবলমাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বাবিদ্ধ করা হয়। এই সময় ঐ ভক্ত্যাকে রক্তপুষ্পের মাল্য দ্বারা সাজাইতে হয়।

এইরূপে বাণবিদ্ধ হইয়া নবখণ্ডব্রতধারী ভক্ত্যা, পূর্বোক্ত হাকন্দ কূপের মধ্যে উপবেশন করিলে, চারিটি ঘাটে চারিটি ভক্ত্যা ও চারিধারে অন্যান্য ভক্ত্যারা শয়ন করিয়া থাকে। নবখণ্ড ব্রতধারীর দুইপাশে দুইখানি খড়্গ রাখিয়া দিয়া কূপের উপরিভাগ কদলী পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হয়। নবখণ্ড ব্রতধারীর মস্তকটি কেবল অনাচ্ছাদিত থাকে। কেহ ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া নবখণ্ড ব্রতধারীর মস্তকে বসাইয়া দেয়। কেহ আল্‌তা গুলিয়া রক্ত ছড়াইয়া দেয়। কেহ কালো কম্বল গায়ে দিয়া বাটুয়া কুকুর সাজিয়া সম্মুখে পড়িয়া থাকে।

যে গায়কদল রাত্রি অবধি আসরে গান গাহিতেছিল তাহারা সদলে এই সময় হাকন্দ কূপের নিকট আসিয়া,

লাউসেনের নবখণ্ড হইতে প্রাণ দান এবং পশ্চিমোদয় পর্যন্ত গান করে। এই পর্যন্ত গীত হইলেই অন্তকারমত গান শেষ হয় এবং যদি কেহ লাউসেন (চামর) কোলে লয়, গায়ক তাহার কোলে চামর দিয়া তাহাকে ব্যবস্থা বলিয়া দেয়। গান শেষ হইলে নবখণ্ড ব্রতধারী ও অন্যান্য সকলে সেখান হইতে গাজন মণ্ডপ প্রদক্ষিণ পূর্বক, ছাঁওলায় ধর্মের সাক্ষাতে আসিয়া বিদ্ধ বাণ খুলিয়া দেয়। ইহাকেই নবখণ্ড সেবা বলে।" শ্রীধর্মপুরাণ, ময়ূরভট্ট, সম্পাদনা বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গৃহভরণ ও গাজনের বিবরণ, পৃঃ ১২-১৩।

৪১. "মুদ" শব্দটি সংস্কৃত "মুদ্রিত" থেকে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব।

৪২. এই উৎসব দাদুড়ঘাটা হওয়া সম্ভব। তবে এটি শেষ দিনে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন জল ও কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে খেলা করা ও অশ্লীল গান গাওয়াকে শবরোৎসব বলে। কিন্তু এই ক্রীড়া শবরোৎসবের পরিণতি কিনা ধারণা করা শক্ত।

ধর্মপূজাবিধানে "জলসাপুট" নামে একটি ক্রীড়ার উল্লেখ আছে।

৪৩. (ক) "মস্তক সম্পর্কে দেবভাবনা ও তৎসম্পৃক্ত কৃত্যাবলী হেষ্টিংস সাহেবের 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়ান এণ্ড এথিক্স' গ্রন্থে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেই মুণ্ড পূজার বিধি, বিভিন্ন বিধানে, বিভিন্ন উপলক্ষে, কোথাও শস্য বৃদ্ধির কামনায়, কোথাও শত্রু বিজয়ীর সগৌরব জয়োল্লাসে, কোথাও প্রতিরোধের প্রত্যাশায়, কোথাও বা ধর্মচিন্তার বিবর্তনের ফলস্বরূপ মুকুটিত মুণ্ড, বহুমুণ্ড, নরপশু মুণ্ড (যথা স্ফিন্‌ক্স) দেবতারূপে এই মুণ্ড পূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ভারতবর্ষের বিধানের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্য রূপ হইতে ভাবে এবং ভাব হইতে রূপে আনাগোনা।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগের চ্যাং (ব্লক) বা মুণ্ডের পূজা ও নরবলি ঔপনিষদ ভাবারোপে শিরোব্রত ও হাকণ্ড সেবনে পরিণতি লাভ করিয়াছে"। (সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ১৩৬, ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল)।

(গ) তুলনীয়, (বাঁকুড়ায়) "এক কায়স্থ জমিদার বাড়ীতে বস্ত্রাচ্ছাদিত নবপত্রিকার উপর একটি মৃন্ময় নারীমুণ্ড বদ্ধ হয় এবং নবপত্রিকা দুর্গারূপে পূজিত হয়।...বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্যের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। ধাতু নির্মিত দশভুজা প্রতিমা আছে। তদুপরি একটি মৃন্ময় নারীমুণ্ড স্থাপিত হয়। প্রতিমা বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে। ইহার নাম মুণ্ড পূজা।" পূজাপার্বণ, পৃঃ ৮৩, (দুর্গোৎসব প্রশ্ন) যোগেশ বিদ্যানিধি।

(গ) তুলনীয়, "চব্বিশ পরগণার প্রায় সর্বত্র 'বারা' বা ঘটের আকৃতি একপ্রকার মুণ্ডমূর্তির পূজা হয়", কালুরায়, আঃ বাঃ পত্রিকা, রবিবাসরীয়, তাং ২৭।১২।৬৪ ইং, শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

৪৪. অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদের প্রবন্ধে প্রধান দেয়াশীর নাম দেউলভক্ত্যা বলে উল্লিখিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মপূজা ও গাজনের বিবরণ

গ্রামের বিবরণ

১। **কুড়ামিঠা** (ইলামবাজার থানা) : এই গ্রামে তিনটি ধর্মরাজ। উত্তর পাড়ায় সিন্ধু রায় বা সুন্দর রায় এবং শুঁড়িঘরে চাঁদ রায়। শেষোক্ত, ধর্মরাজ শুঁড়িদের প্রতিষ্ঠিত কিন্তু পূজার সময় দেবাংশী হন কলুজাতি। মূর্তি নোড়ার মত। আষাঢ় পুর্ণিমায় বাৎসরিক পুজা হয়।

দক্ষিণপাড়ায় আছেন বুড়ো রায়। মূর্তিটি বৌদ্ধস্তূপের অনুরূপ। ক্রমবিন্যস্ত সমচতুষ্কোণ পোড়ামাটির ফলকের সমাবেশ। নীচে বড় থেকে উপরে ছোট। পাশে একটি মুণ্ডপদহীন ঘোড়া। কোনো ধ্যান নেই। 'ধর্মরাজায় নমঃ' বলে পূজা হয়। পুজার কয়দিন দেবাংশীর কাজ করে তাঁতি জাতি।

আষাঢ়ের রথযাত্রা। উল্টোরথের দিন গাজনের ঢাক বসে। সকাল এবং সন্ধ্যায় ঢেমূল দিতে হয়। ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যায় বাণেশ্বরকে নবীন ভক্ত্যারা নায়েক পুকুরে স্নান করিয়ে আনে। মুচি, হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী, তাঁতি, শুঁড়ি, কলু, সদগোপ্ ইত্যাদি জাতির স্ত্রীপুরুষে ভক্ত্যা হয়। বালাভক্ত্যারা (নতুন) ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীর দিন ক্ষৌরকর্ম করে। শিবদেবাংশী বাগদী। তাকে ত্রয়োদশীর দিন কামাতেই হয়। মূল দেয়াশী তাঁতি। সেও ত্রয়োদশীতে কামায়। এইদিন এরা একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে সন্ধ্যার পর। চতুর্দশীতে ধর্মরাজকে একটি ছোট চোপাই-এর মধ্যে কাপড় ঢাকা দিয়ে উপরে চামর বেঁধে দুজনে কাঁধে নিয়ে ঢাকের বাজনার সঙ্গে নাচতে নাচতে কোপাই নদীতে স্নান করিয়ে নদীতীরবর্তী একটি বেলতলায় গিয়ে ধর্মরাজকে নামাতে হয়। স্নান হয় পলসা গ্রামের ঘাটে। পলসা গ্রামের পুর্বভাগে কিছু দূরে একখণ্ড পতিত জমি। সেখানে বেলগাছ ছিল। সেখান থেকে জানাবাজ গ্রামের ভিতর দিয়ে ধর্মরাজকে নিয়ে ভক্ত্যারা গ্রামে নাচতে নাচতে ফিরে আসে। উত্তরপাড়ার ধর্মরাজ নাচেন দক্ষিণপাড়ায়, দক্ষিণপাড়ার ধর্মরাজ নাচেন উত্তরপাড়ায়। তারপর ধর্মরাজকে নামিয়ে অগ্নিকুণ্ডের উপর দোল খায় এবং আগুনের অঞ্জলি দেয়। ভক্ত্যারা সেদিন রাত্রে ময়দা খায়। এ আগুন জ্বালানোই থাকে। পরদিন সকালে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে ভক্ত্যারা এক-একটা জলন্ত অঙ্গার হাতে লুফতে লুফতে বাগানের নিকট গিয়ে ফেলে দেয়। পরে কাঁটা ঝাঁপ। বাবলার কাঁটার ডাল বাসক পাতার মধ্যে বেঁধে রাখে। দুই দুইজন ভক্ত্যা তা বুকে

বেঁধে পরস্পর চেপে শুয়ে গড়াগড়ি দেয়। পরে সমস্ত ভক্ত্যা ডিগবাজী খেতে খেতে চিত হয়ে মাটিতে হাত রেখে হেঁটমুণ্ডে পায়ের ভারে খানিকটা উঁচু হয়ে থাকে। পুজারী ব্রাহ্মণ তার বুকে পা রেখে এদিক থেকে ওদিকে যান। তারপর পরস্পর কোমরে ধরে সকলে উঁচু হয়ে দাঁড়ালে পুজারী ব্রাহ্মণ তার বুকে পা দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যান। তারপর পরস্পর কোমর ধরে সকলে উঁচু হয়ে থাকলে পুজারী তাদের পিঠে উপর পা দিয়ে চলে যান। দুপুরে ভাঁড়ের মধ্যে মদ্য ভরে ভক্ত্যারা ঢাকের বাজনায় নাচতে নাচতে গাজনে আসে। একটা নির্দিষ্ট স্থানে ভাঁড়াল ভরে দেয় শুঁড়ি। মন্দির বা গাজন প্রদক্ষিণ করে ভাঁড়াল নামিয়ে দিলে পর বলিদান। তার পুর্বে হোম করে পুরোহিত পুর্ণাহুতির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন। বলিদানের পর পূর্ণাহুতি ও ভোগরাগ। ভক্ত্যাগণ কিন্তু যজ্ঞশেষে তিলক গ্রহণ করে না। তাদের জন্য তিলক রেখে দিতে হয়। ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যায় বাণেশ্বর স্নানের পুর্বেই ভক্ত্যারা উত্তরীয় গ্রহণ করে। এই কয়দিন সকলে মিলে গাজনেই রাত্রিবাস করে। যেন একই গোষ্ঠিভুক্ত ব্যক্তি।

পুজার দিন সন্ধ্যায় চড়ক। সে সময়ও বাণেশ্বরকে নিয়ে যেতে হয়। পুর্বে চড়কে বাণ ফুঁড়ে পিঠে দড়ি বেঁধে লোকে দোল খেত। এখন কেবল একবার ঘুরে আসে। পুর্বে নদী-স্নানের ঘাটে কয়েকজন ভক্ত্যা জিভে সূচ ফুটিয়ে এপারে ওপারে করে দিত। ভক্ত্যারা বেলপাতা চিবিয়ে রক্ত বন্ধ করত।

ভক্ত্যারা পরদিন সকালে গ্রামের বাড়ী বাড়ী চাল ভিক্ষা করে আনে। দুপুরে নায়ক-পুকুরে গিয়ে উত্তরীয় খুলে স্নান করে। গাজনে এসে ভক্ত্যারা নিমপাতা চিবিয়ে মুখে দেয় এবং যজ্ঞশেষে তিলক যা তাদের জন্য রক্ষিত ছিল, সেই তিলক কপালে দেয়। ত্রয়োদশীর দিন থেকে এরা তেল মাখে না, ব্রহ্মচর্য পালন করে। পুজার দিন পুর্ণাহুতির পর জল খায়। রাত্রে চড়কের পর ভাত খায়। অনেক স্থানে পুজার দিনই পুর্ণাহুতির পর নিমপাতা চিবিয়ে ভক্ত্যারা গঙ্গাজল স্পর্শ করে ও মিষ্টিজল খায়।

পুজার দিন সকালে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করবার সময় ভক্ত্যারা একটি শ্লোক আবৃত্তি করে—

"ধবল খাট···কোটি প্রণাম" (শ্লোক পাঁচালী অধ্যায় দ্রঃ)।

ধর্মরাজের সামনে পাঁঠা বলি হয়। বুড়ো রায় ধর্মরাজকে বহুকাল পুর্বে এক ব্রাহ্মণ কোপাই নদীর তীরবর্তী বেলতলা থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়ে আনেন। (প্রবাদ কিংবদন্তী অধ্যায় দ্রঃ) তদবধি এই দেবতা ভট্টাচার্যদের দ্বারা পুজিত হচ্ছেন।

২। **ঘুরিষা** (ঘুরষে একরকম মাছের নাম): অজয়ের তিন মাইল উত্তরে এই গ্রামে চারিটি ধর্মরাজ আছে। (ক) ইছাপুর মৌজায় 'বুড়ো রায়', (খ) তিনোর মৌজায় 'বাংড়ো' রায়, (গ) হরিহরপুর পাড়ায় 'বুড়ো রায়' ও (ঘ) কৈবর্ত পাড়ায় 'কালা রায়'।

(ক) ইছাপুরের বুড়ো রায়: পুজা ব্রাহ্মণের। টিনের চালা ঘর। সামনে ষষ্ঠীতলায় অনেকগুলি ভাঙ্গা প্রাচীন মূর্তি। মন্দিরে কাঠের সিংহাসনে একটি পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমিত সিংহবাহিনী শিলামূর্তি। মূর্তিটি এখনও স্পষ্ট আছে। সম্ভবত পালযুগের ভাস্কর্য। পাশে ঐ

মাপের একটি জৈনমূর্তি (পার্শ্বনাথের মত দেখতে)। মাঝের বড় শিলাটি পিণ্ডাকৃতি। নাম বৃদ্ধ রায়। উপরিভাগে কি একটা খোদিত রয়েছে যেন। বোঝা দুষ্কর। মন্দিরের পূর্বকোণে বেদীর নীচে একটি কাঁকর-পাথরের বড় পিণ্ড। নাম খণ্ড রায়। বুড়ো রায়ের মামা বলে কথিত। প্রস্তরখণ্ডের উপরিভাগে খোদাই করা আছে একটা মূর্তি। ক্ষয়ে গেছে। বোঝা যায় না। বেদীর উপর আর একটি "ক্রষ্টালাইজড" পাথর। শীতলা। আর একটি স্তূপের মত খাঁজ কাটা থাক্ থাক্ প্রস্তর। ঘরের মধ্যে কয়েকটি কাঠের ঘোড়া ও হাতি।

(খ) তিনোড় পাড়ার বাংড়ো রায়: পূজা ব্রাহ্মণদের। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় পূজা হয়। মন্দিরের মধ্যে দুটি বাণেশ্বর। অনেকগুলি মাটির ঘোড়া। দুইটি মাটির ছোট হাতি। মধ্যে সিংহাসনের ৮টি শিলাখণ্ড। অস্পষ্ট ছাপ। কি ছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ক্ষয়ে গেছে। লিঙ্গসদৃশ আর একটি শিলা। একটির রূপ তবলা বা কামরাঙার মত। নীচে টেনে টেনে সুগভীর খাঁজ কাটা। আরও দুটি ক্ষয় পাওয়া মূর্তি। পরিচয় উদ্ধার করা শক্ত।

(ঘ) কৈবর্ত পাড়ায় কালা রায়: গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পাকা মন্দিরে ধর্মরাজ আছেন। সামনে খড়ের চারচালা। মন্দির উত্তরমুখী। এই মন্দিরে হংসবাহিনী মনসা ও ধর্মরাজের যুক্ত অধিষ্ঠান। চারচালার সামনে একটি বেদী। তার সামনে খানিকটা গর্ত করা এবং খুঁটি পোঁতা। এতে দোলন সেবা হয়। ঘুরিষার দেড় মাইল পূর্বে পায়ের নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে বিশেষপুকুর নামে একটি পুকুর থেকে তিনটি মনসা এবং দুটি ধর্মরাজ পাওয়া যায়। ধর্মমন্দিরে বেদীতে সাতটি ফণা দ্বারা আচ্ছাদিত সুন্দর একটি মনসা মূর্তি। মনসা মূর্তির মাথার মুকুটে অনেকগুলি রূপার চাঁছ বসানো আছে। মনসার পাশেই ধর্মরাজ কালা রায়। এঁর সঙ্গে আছেন বিজলী রায়। কালা রায়ের পূজা হয় বৈশাখী-পূর্ণিমায়। পূজার আটদিন আগে বাবার মাঠ-তুলতে হয়। আতপান্ন পচানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেইদিন থেকেই ঢাকের ঢেমূল বসে। রাত্রে গান গাওয়া হয়। মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল গান।

ধর্মমঙ্গল গানের একটি অতি পুরাতন পাতড়া কৈবর্তকুল আমার হাতে দিয়েছিলেন। লিপিকার—নিবারণ ধীবর। আনুমানিক শতবর্ষের পুরাতন কাগজখানি। ভণিতায় কবিরত্নের নাম আছে। (এই পদের অনুলিপি পাঁচালী অধ্যায়ে দ্রঃ)। কালা রায়ের দেয়াশী ধীবর সম্প্রদায়। পূজারী তারাই। পূর্ণিমার চারদিন আগে সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত্যারা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে ও কামায়। তার পরদিন ছোট বাণামো অর্থাৎ বাণেশ্বরের স্নান। তারপর বড় বাণামো অর্থাৎ ধর্মশিলাদের স্নান। শিলাগুলিকে চন্দন, ঘি মাখিয়ে একটি বড় নূতন ডালার মধ্যে রেখে একটা চৌদলায় পুরে নূতন কাপড় দিয়ে ঢেকে চামড় দিয়ে সাজিয়ে দুজন ভক্ত্যা কাঁধে নিয়ে ভর নামে। একে বলে আগোসান। গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ফুল দিয়ে আসতে হয় এ সময়। ছোট বাণামোর সময় গ্রামের অন্যান্য ধর্মরাজরা এসে কালা রায়ের সঙ্গে যোগ দেন। বড় বাণামোর পর দোলন সেবা হয়। তারপর কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি ও আগুনের ফুল খেলা। ছোট বাণামোর দিন ভক্ত্যারা উত্তরীয় নেয়। পূজা হোম হয়। শুঁড়িবাড়ী থেকে মদ নিয়ে এসে "বারি" ভাঁড়াল আনা হয়। মদের দোকান থেকে ভাঁড়াল আনার পর বাড়ীতে যে

"মাঠ" করতে দেওয়া হয়েছে তা আনা হয়। ভক্ত্যারা ভাঁড়াল মাথায় সারা গ্রাম পরিক্রমা করে আবিষ্ট হতে হতে আসে। গ্রামের লোকেরা হরির লুঠ দেয় তাদের উদ্দেশ্যে। তারপর ধর্মস্থানে এসে একবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে। এরপব ভাঁড়ালে পদ্মফুল চড়ানো হয়। একটা ফুল নাকি গড়িয়ে পড়ে। ফুল পড়ার পর তিনটি পাঁঠা বলি পড়ে। তারপর ভক্ত্যাদের প্রসাদ ও নিমজল (দুধ দিয়ে স্নানজল) দিতে হয়। এরপর অন্নের ভোগ। পরদিন উত্তরীয় খুলতে হয়। এই ধর্ম-রাজের সঙ্গে যে মনসা আছেন তাঁর পূজা হয় দশহরার দিন।

(১) আখমাড়াই-এর শালে মাটির ধর্মরাজ তৈরী করে পুজা করা হয় রস ও গুড় ঢেলে।

(২) গাড়সে ষষ্ঠী আছে। ৩০শে আশ্বিন পূজা।

(৩) আখ বসাবার আগে কাজলী মায়ের পুজা হত।

(৪) বুড়ো রায়ের স্থানে নিমগাছতলায় ষষ্ঠী আছেন। বছরে দুবার পুজা হয়।

(৫) রঘুনাথের মন্দিরে বিগ্রহ নেই। ১৪৬৬ শকাব্দের। গায়ে অদ্ভুত সুন্দর টেরাকোটা।

(৬) বেণেপাড়ার গোপালের নবরত্ন মন্দিরে বিগ্রহ আছে। নিত্য পুজা হয়। নবরত্নের উচ্চ মন্দির। গায়ে টেরাকোটা অপুর্ব।

(৭) হাঁদারাম নামে (রামেশ্বর) শিব আছেন। উচ্চতা ৪ ফুট। স্বাভাবিক বৃক্ষকাণ্ড প্রস্তরীভূত।

(৮) অন্য একটি ভগ্ন শিবমন্দির ও ভগ্ন মনসা মন্দির আছে।

(৯) গ্রামদেবী তলায় অনেকগুলি ভগ্ন ভগ্ন শিলামূর্তি পড়ে আছে। বেশীর ভাগই সেন-রাজাদের প্রতিষ্ঠিত সেনকা নামক দীঘি থেকে পাওয়া। মূর্তিগুলি জৈনমূর্তি। (এই স্থান থেকে উপহার পাওয়া একটি বিচিত্র বাসুদেব মূর্তি বর্ধমান সাহিত্য সভাকে প্রদান করেছি।)

গ্রামে আর একটি সেন বাঁধ নামে দীঘি আছে। সেটির তলদেশে শান-বাঁধানো ছিল সেন রাজাদের দৌলতে। এখন প্রায় মজে আসছে।

(১০) গ্রামে তিনটি ব্রাহ্মণদের পুজিত ব্রহ্মচারী আছেন। ১লা মাঘ পুজা ও বলি দেওয়া হয়।

(১১) বুড়ো রায়ের সঙ্গে শীতলা একই বেদীতে আছেন।

(১২) গ্রামে কতকগুলি কালীর স্থানও আছে। সবই মূর্তি গড়ে পুজা করা হয়। স্থান-গুলি দেখে মনে হয় বহুকাল আগে ঐগুলি মন্দিররূপে বর্তমান ছিল।

ঘুরিষা গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন গ্রাম। বীরভূমের গ্রামাঞ্চলের এটি একটি বিশিষ্ট টাইপের গ্রাম। বহু যুগ ধরে এই গ্রামটি বজায় রয়েছে তা চারিপাশে ভাল করে নজর করলেই বোধগম্য হয়। লোকে মাটি কাটতে গিয়ে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও পেয়ে থাকে।

৩। **দেবীপুর** : অজয়ের উত্তর তীরে ইলামবাজার থানার অন্তর্গত এই গ্রামের অবস্থান। বারুইপুরের দক্ষিণে আধ মাইলের মধ্যেই এই গ্রাম। গ্রামের মধ্যে উত্তরমুখী ছোট মাটির ঘর। ধর্মতলার বারান্দায় বিরাট একটি কাঠের ঘোড়া। বেদীতে তিনটি শিলা। একটি মনসা। 'ফসিল'-জাতীয় প্রস্তরখণ্ড এটি। মাঝখানে একটি গোলাকৃতি শিলা। তাছাড়া একটি

পাথরের গৌরীপট্টের উপরে কৌটার ভিতর শ্বেত বর্ণের স্ফটিক জাতীয় বস্তু। এঁকে প্রকৃত ধর্মরাজ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই কৌটার ভিতরের ধর্মরাজের নাম দর্পনারায়ণ। (তুলনীয় তাঁতিপাড়া ও শ্রীকণ্ঠপর)। মনসার পুজো দশহরার দিন হয়। লোকশ্রুতি এই যে, দেবীপুরের ধর্মরাজ বারুইপুর-ধর্মরাজের ভাগ্নে। দেয়াশীর উপাধি পাল (সদ্‌গোপ)। পুজারী ব্রাহ্মণ। মুল পুজা বৈশাখী পূর্ণিমায়। আটদিন আগে ঘটস্থাপনা, চারদিন আগে থেকে উপবাস। পুজোর দুদিন আগে জোতালি পুকুরে দর্পনারায়ণের স্নান হয়। পুজোর আগের দিন রাত্রে খুব ধুমধাম করে আবার স্নান করানো হয়। একে বড় বাণামো বলে। ছোট বাণামোতে বাণগোঁসাইকে স্নান করানো হয়। ঘোড়ায় চড়িয়ে ধর্মরাজকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুর্ণিমার দিন পুজা ও পাঁঠা বলি হয়। ভাঁড়াল ভরার পর ভাঁড়াল জাগানো হয়। ধর্মস্থানে ভাঁড়াল রাখার পর ভাঁড়াল উথলে ওঠে। তারপর ভক্তরা মন্দির প্রদক্ষিণ করে। পূজার পর রাত্রে ধর্মরাজ ঘোড়ায় চড়ে বারুইপুরে যান। ওখানে বানামো হওয়ার পর ফিরে আসেন। পরদিন চড়ক। ঘোড়ায় চড়ে ধর্মরাজ চড়কতলায় যান। হেদো পুকুরের পাড়ে চড়কগাড়ী নিয়ে ঘোরা হয়। পরদিন ভক্তদের উত্তরীয়মোচন। ধর্মতলার দাওয়ায় বাইরেই সন্ন্যাসী গোঁসাই-এর আটন আছে। ওখানে একটি বাসুদেব মূর্তির মস্তক ও কয়েকটি ঘোড়া পড়ে আছে। এখানেও ধর্মরাজ আছেন বলে লোকশ্রুতি।

৪। **পায়ের** : এই গ্রামটি অজয় নদীর দেড় মাইলের মধ্যে উত্তর তীরবর্তী। ধর্মরাজের মন্দির পাকা। সামনে বড় আটচালা। মন্দির পূর্বমুখী। মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় একটি টিকটিকির মত দেখতে মস্তবড় কাঠের ঘোড়া। বেদীর উপর উত্তরে মনসামূর্তি। সপ্তফণা-বেষ্টিত, দেবীমূর্তি। সপ্তপুরের মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত। দক্ষিণে ঘট ও ফণাবেষ্টিত আর একটি মনসা। মাঝে বহু শিলাখণ্ড। সামনে ছোট ছোট মাটির ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি।

বাণেশ্বর তিনটি। ধর্মরাজের নাম কালা রায়, স্বরূপনারায়ণ, বিনোদ রায় এবং সুন্দর রায়। দেয়াশী, ধীবর সম্প্রদায়ের। পুজারী ব্রাহ্মণ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় মূল পূজা। পূজার দুদিন আগে বাণেশ্বরকে স্নান করিয়ে ছোট বাণামো হয়। পূজার আগের দিন বড বাণামো হয়। ভোর রাত্রে আগুন খেলা, কাঁটা খেলা হয়। ডাল ভাঙ্গা আছে, ফল ভাঙ্গা নেই। বেলা ১২টা নাগাদ ভাঁড়াল এনে পাঁঠা বলিদান হয়। পুজার দিনই বৈকালে চড়ক। নিকটস্থ বৈদ্যপুরের ডাঙ্গাতে নিয়ে যাওয়া হয়। পূজার চারদিন আগে থেকে রামায়ণ গান হয়ে থাকে। গাজনে চারিদিকের দেবতাদের ডাক-হাঁক করে গাজন বন্ধন করা হয়। যথা—ইলামবাজারের কালা রায়, উষুড্ডির সুন্দর রায়, বারুইপুরের সিদ্ধেশ্বর, দেবীপুরের দর্পনারায়ণ। শ্রীচন্দ্রপুরের স্বরূপনারায়ণ, ঘুরিষা, সিজেকড্ডাং পাইগড়া প্রভৃতি স্থানের ধর্মরাজদের ডাক দেওয়া হয়।

৫। **বারুইপুর** : অজয়ের উত্তর তীরে ১ মাইল। সিউড়ী পানাগড় রাস্তার ধারে এই গ্রাম। সিউড়ী থেকে ৩০ মাইল। এই গ্রামের ধর্মঠাকুরের নাম বিখ্যাত। রাজা লাউসেন এখানে ধর্মরাজের আরাধনা করেছিলেন বলে শ্রুত হয়। এবং তিনি এখানে নাকি সিদ্ধিলাভ করে দেবতার নাম রাখেন সিদ্ধেশ্বর। অজয়ের ওপারে শ্যামারূপার গড় ও দেউল। ইছাই

ঘোষের রাজধানী ছিল বলে জনশ্রুতি। সিদ্ধেশ্বরকে অনেকে আবার সিদ্ধেশ্বরীও বলে। একটি বট গাছ ও কয়েকটি পুষ্করিণীবেষ্টিত এই ধর্মমন্দির। দক্ষিণমুখী। সুউচ্চ দালান। পাকা বাড়ী। সামনে নাটশালার ধ্বংসাবশেষ। কথিত হয় রাজা লাউসেনের যজ্ঞাবশেষ ও ভস্মরাশি বাঁধানো বেদীর নীচে আছে। প্রবাদ, এই ছাই যেদিন উড়ে যাবে সেদিন বারুইপুরের কিছু থাকবে না। ধর্মমন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বৃহৎ একটি কাঠের ঘোড়া। বেদীতে একটি ছোট শিলাখণ্ড। কথিত হয় আসল ধর্মরাজ অপ্রকাশিত থাকেন। পূজার সময় স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর নাম রুপা-বাণেশ্বর। দেয়াশীর উপাধি কবিরাজ (বাগদী) পূজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। পূজার আগের দিন বাণামো ও উত্তরীয় ধারণ। এরপর ভক্ত্যারা নিকটবর্তী গ্রাম দেবীপুরে যায়। ওদের দেয়াশীর মাথা থেকে এখানকার দেয়াশী ঠাকুরকে ধরে নামান। তারপর ফিরে আসে ভক্ত্যারা। রাত্রে ফলভাঙ্গা এবং দেবস্থানে সারারাত্রি জাগরণ। পূর্ণিমার দিন বেলা ১০।১১টার মধ্যে শুঁড়ি বাড়ী থেকে ভাঁড়াল এনে ভাঁড়াল-ভরা বাগানে ভাঁড়ালগুলি ভরা হয়। তারপর দেবস্থানে নিয়ে আসে। এরপর হয় পাটভাঙ্গা উৎসব। তারপর পাঁঠা বলি হয়। এইদিন রাত্রে পূর্বকথিত রুপা-বাণেশ্বরকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোর রাত্রে আগুন খেলা। পরদিন চড়ক জাগানো ও চড়কডাঙ্গায় ধর্মরাজকে নিয়ে গিয়ে ফুল দিতে হয়। নাচ, গান, আতসবাজি হয়। বাবা সিদ্ধেশ্বরের নিকট উৎসর্গীকৃত ফুল বড় ঘোড়ায় চড়িয়ে গ্রাম ঘোরানো হয়। লোকে নানা রোগ নিরাময়ের কামনায় সেই পুষ্প গ্রহণ করে।

৬। **ভগবতীবাজার** : অজয়ের দুই মাইল উত্তরে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে জনশূন্য আগাছায় পরিপূর্ণ এক পতিত স্থানে জীর্ণ মৃন্ময় গৃহে ধর্মরাজ আছেন। ঘরটি উত্তরমুখী। উপরে টিনের ছাদন। বেদীর উপর একটি বড় শিলা ও ক্ষয় পাওয়া একটি অজানা মূর্তি। বেদীর নীচে আর একটি ক্ষয়ে যাওয়া মূর্তি। ধর্মরাজের নাম চাঁদ রায়, সুন্দর রায় এবং শ্রীধর রায়। সঙ্গে আছেন মড়কচণ্ডী। আষাঢ় পূর্ণিমায় মূল পূজা। সেবাইতের উপাধি সাঁই (তন্তুবায়)। পূজারী ব্রাহ্মণ। পূজানুষ্ঠান-পদ্ধতি গতানুগতিক। উপবাস, স্নান, উত্তরীয়, ছোট বাণামো, পূজার দিন দুপুরে পূজা, ভাঁড়াল আনা, গ্রাম-পরিক্রমা, হোম, বলিদান ইত্যাদি। রাত্রে বড় বাণামো হয়। অর্থাভাবে এই পূজা লুপ্তির পথে।

৭। **কদমডাঙ্গা** (থানা খয়রাশোল, পোঃ বড়রা) : এখানে ধর্মরাজ নেই। খোলা জায়গায় গাছতলায় এক দেবী আছেন। তাঁর নাম মালঞ্চ বুড়ি। বাহন তাঁর বাঘ। ১লা মাঘ পূজা। পূজায় পাঁঠা বলি হয়ে থাকে। হরির লুঠও হয়। গ্রামের প্রতি বাড়ী পিছু একজোড়া করে মাটির ঘোড়া লাগে পূজায়।

৮। **কেন্দ্রগড়িয়া** (খয়রাশোল থানার অন্তর্গত) : দক্ষিণে অজয় ও উত্তরে হিংলো নদী। জীর্ণ টিনের ছাদনযুক্ত পাকা ঘরে ধর্মরাজ আছেন। ধর্মরাজের নাম বুড়ো রায়। প্রস্তর ফলক থাক্ থাক্ ভাবে সাজানো (কুড়মিঠার অনুরূপ)। এই পূজা পূর্বে ছিল মাল জাতির। তারাই ছিল দেয়াশী। পাটদেয়াশী ছিল সাঁতরা (উগ্র ক্ষত্রিয়)। তাদের বংশ লোপ পাওয়ায় বর্তমানে ব্রাহ্মণের আয়ত্তে আসে। জনৈক চক্রবর্তী বর্তমানে সেবাইত ও পূজারী।

কথিত আছে ৫০০ বছর পূর্বে মালদের এক স্ত্রীলোক ধর্মা-পুষ্করিণীতে নিখোঁজ হয়। ঐ স্ত্রীলোক তিনদিন পর ধর্মরাজ নিয়ে উঠে আসে (প্রবাদ অধ্যায় দ্রঃ)। এই ধর্মরাজের পূজা হয় বৈশাখী-পূর্ণিমায়। পূজানুষ্ঠানের প্রথম দিন ক্ষৌরকর্ম ও হবিষ্যান্ন। দ্বিতীয় দিন বাণেশ্বরের স্নান ও সূর্যার্ঘ্য। তৃতীয় দিনে হিংলো নদীতে নিয়ে গিয়ে ধর্মরাজকে স্নান করিয়ে আনা হয়। ভক্তরা সেই সঙ্গে স্নান করে ঘট প্রভৃতি নিয়ে আসে। রাত্রিতে ফুলখেলা ও গাজন বাঁধা হয়। চতুর্দিকের হাঁক-ডাক করে প্রণামের মহড়া চলে। চতুর্থ দিনে পূজা ও হোম। ঢাক বাদ্যাদি সহ ভাঁড়াল নিয়ে এসে বলিদান হয়। বৈকালে চড়ক। ঢাক বাজে এবং ভক্ত্যারা 'চলো বাবা বুড়ো রায়' বলে হাঁক দেয় ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। ব্রাহ্মণেতর জাতি, যথা—বাগদী, বাউরী, উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, তন্তুবায়, গোপ প্রভৃতি জাতির লোকসংখ্যায় স্ত্রীলোক সহ শতাধিক ভক্ত্যা হত। এখন লুপ্তপ্রায়। পূর্বে, বাণানো—ঊর্ধ্বপদে হেটমুণ্ডে, গো-গাড়ীর উপর ধর্মরাজের আরাধনা এবং সমস্ত ভক্ত্যা 'চলো বাবা বুড়ো রায়' এই বলে নদী থেকে ডাক-হাঁক করে নিয়ে আসত। কোনো কোনো ভক্ত দণ্ডী দিয়ে নদী থেকে দেবতার স্থান পর্যন্ত আসত। বাণামো চলাকালীন দেহকে দুলিয়ে আগুনে পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি নিক্ষেপ করত ও পরে সেই অগ্নি নিয়ে বাবার স্থানে খেলা করত। বর্তমানে বাণফোঁড়া নেই। ধর্মরাজের সঙ্গে নাগচিহ্নিত ঘটে মনসা আছেন। হিংলো নদীর খল্‌পাদহ থেকে ধর্মা পুষ্করিণী পর্যন্ত মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গ ছিল। সেই পথ দিয়ে ভক্ত্যারা নদীতে ডুবে ধর্মা পুষ্করিণীতে আসত এবং পুষ্করিণী থেকে খল্‌পাদহে ডুবে যেত। পুকুর থেকে নদীর দূরত্ব সিকি মাইল। নদীতে বন্যা হলে ধর্মাপুকুরের জল বাণের জলের মত ঘোলা হত। বর্তমানে পুকুরের মালিকরা বড় বড় পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে পুষ্করিণীতে মাছ চাষ করেন। ধর্মের গাজনে ডোমরা যে গীত গাইত তার নমুনা—

'ঢাক ত পেলাম প্রভু কাঠি কোথায় পাই……কুড়কাঠি……' ইত্যাদি।

(পাঁচালী অধ্যায় দ্রঃ)

গ্রামের ধান মাঠে আছেন, বদন চক গোঁসাই বা ব্রহ্মচারী। প্রবাদ সেই মাঠে ধান কাটবার পূর্বে ভোগ না দিলে দেবতা নানারূপ মূর্তি ধারণ করে বিঘ্ন উপস্থিত করেন। চাষীরা কখনও কোনো সাপ, বীভৎস জন্তু ইত্যাদি দেখে ভয় পায় এবং ভোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধান কাটে। যেখানে গোঁসাই আছেন, সেখানে ধান চুরি যায় না। বাউরীরা ১লা মাঘ পূজা দেয়। মাঠের মধ্যে গেঁড়া পুকুরে আছেন অপর এক ব্রহ্মচারী। মাঘের প্রথমে ব্রাহ্মণে ভোগ দেন।

গ্রামে বাগানবুড়ী বলে একজন অপদেবী আছেন। বাউরীরা ১লা মাঘ পূজা দেয়। ঘোড়াপুকুরে মনসা ও গোঁসাই আছেন। শাঁওডালি বা শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে পূজা হয়। মুচিরা পূজা করে। গীত গায়। (নিকটবর্তী গ্রাম, পানসিউড়ী, খয়রাসোল, ময়নাডাল, রাণীপাথর প্রভৃতি গ্রামে ধর্মপূজা আছে)।

৯। **পলপাই** (খয়রাশোল থানা): এই গ্রামের ধর্মরাজের নাম চন্দ্রেশ্বর। সাধারণ একটি প্রস্তরখণ্ডে পূজা হয়। নিকটে একটি ষাঁড়ও রক্ষিত আছে। ধর্মরাজ একটি মাটির ড়াঙ্গাঘরে অবস্থান করছেন। পুজারী ব্রাহ্মণ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পূজা হয়, পুজাপদ্ধতি গতানু-

গতিক। ধ্যানমন্ত্র—"ঐঁ হ্রীং চন্দ্রেশ্বর ধর্মরাজায় নমঃ"। পূর্বে গাজন, আগুন খেলা, বাণফোঁড়া হত। এখন হয় না। সামনে পাঁঠাবলি হয়।

অন্যান্য—ধান মাঠে বাঘরায় চণ্ডী আছেন। তেঁতুলতলায় মন্দিরে শিব আছেন। নিমতলায় গোঁসাই এবং বটতলায় চণ্ডী আছেন।

১০। **বড়রা** : খয়রাশোল থানায় এই গ্রামের ধর্মরাজ গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত। মাটির চালাঘর। পূর্বমুখী দেয়াশী ধীবর। পুজারী ভট্টাচার্য। মূর্তি—সিংহাসনে দুটি বড় পিণ্ড। এগারটি কূর্মাকৃতি শিলা, দুপাশে অনেকগুলি ছোটবড় মাটির ঘোড়া। দুটি বাণেশ্বর। ধর্মরাজের নাম—ধর্ম রায়, চাঁদ রায়, বুড়ো রায়, কালা রায়, সুন্দর রায়, বাঁকুড়ো রায়, আদাড়ে ধর্মরাজ। দেয়াশীর বহু পুরুষ পুর্বে একজন পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে জালের সঙ্গে ধর্মরাজকে পান। কিন্তু বাকি ধর্মশিলাগুলি কোথা থেকে এলেন তার ইতিহাস কারও জানা নেই। তবে বড়রা গ্রামের বাইরে অর্জুনগুলী মৌজায় দুটি উঁচু পতিত ডাঙ্গা আছে—ধরমডাঙ্গা এবং চড়ডাঙ্গা বা চড়কমারা। চড়কডাঙ্গার বহুলাংশ বর্তমানে চাষের জমি। বড়রা গ্রামের তিন চার মাইল দক্ষিণে অজয় নদী। তার ওপারে দরবার ডাঙ্গা গ্রামে ধরমশিলার পুজা ও ২রা মাঘ মেলা বিখ্যাত।

বড়রার ধর্মরাজের পুজা হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়। পুর্ণিমার তিন দিন আগে সকল সম্প্রদায়ের ভক্তদের উত্তরীয় ও বার। ঐদিন থেকে প্রত্যহ স্নান করে এসে তারা ধর্মরাজের নাম ডাকতে থাকে। পূর্ণিমার আগের দিন ফলভাঙ্গা। বাবলা, সিঁয়াকুল ও কণ্টকারী কাঁটার গাছ ভাঙ্গা হয় (লাফড়া ভাঙ্গা)। পুর্ণিমার দিন সকাল থেকে ভক্তরা সারাদিন বাণেশ্বরকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় গোটা গ্রাম। এ সময় সকল দেবতার উদ্দেশ্যে ডাকহাঁক করতে হয়। সন্ধ্যাবেলা ভাঁড়াল নিয়ে পুকুরে যাওয়া। আদাড়ে ধর্মরাজকে শুধু স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাণেশ্বরও যান। অন্যান্য ধর্মরাজদের নিয়ে যাওয়া হয় না। একে বাণামো বা মুক্তস্নান বলে। ঘাট থেকে অসংখ্য তীক্ষ্ণধার শলাকাখচিত বাণেশ্বরের উপর দেয়াশীকে শুইয়ে বুকের উপর ধর্মরাজকে চাপিয়ে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ভক্তরা দণ্ডী কাটে। শক্তিশেল ফোঁড়ে। আগুন জ্বালায় বাণের মাথায়। তারপর মন্দিরে ফিরে এসে ভাঁড়াল আনতে যায়। পুর্ণাহুতির পর সামনে পাঁঠা বলি হয়। এরপর স্নানজল গ্রহণ করে ভক্ত্যারা উপবাসী থাকে। পুর্ণিমার পরদিন চড়ক। একটি কাঠের ঘোড়ায় ধর্মরাজকে নিয়ে যেতে হয়। সেদিন ধর্মরাজকে আবার স্নান করিয়ে পুজা করতে হয়। তারপর নিমপাতা দিয়ে নিয়ম জল ভক্ত্যাদের সেবন করাতে হয়। আগে চড়কে খুব ধুম হত। ধর্মরাজের পুজা কয়দিন ভক্ত্যারা গাজনের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে। (নির্দিষ্ট অধ্যায়ে লিখিত)। তারপর ভক্ত্যারা শুয়ে শুয়ে যেখানে যত দেবতা আছেন তাঁদের ডাক দেয়। যেমন, পার্শ্বতীর সুন্দর রায়, শিমুলডির চাঁদ রায়, মধুনগরের বুড়ো রায়, অবজরপুরের বুড়ো রায়, বাবুইজোরের বুড়ো রায়, সট্‌কীর (বিহার) সুন্দর রায়, নাগরা কোন্দার বুড়ো রায়, লা-গড়ের বুড়ো রায়, হজরত্‌পুরের বুড়ো রায়, চুড়রের বুড়ো রায়, কৃষ্ণপুরের বুড়ো রায় ইত্যাদি।

ধর্মরাজের সঙ্গে শীতলাচণ্ডী আছেন। চৈত্রে পুজা। পাঁঠা বলি হয়। আর আছেন

শাওড়ালি বা মনসা। শ্রাবণে পুজা। গ্রামে ছোটখাটো বহু দেবদেবীর পীঠ আছে। গোয়ালাদের পুজিত বাঘ রায় চণ্ডী (১লা মাঘ পুজো) আছেন। একজন ব্রহ্মচারীও আছেন। তাঁর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রটি বড়ই চমৎকার। একটা বটগাছের গোড়ায় রাশি রাশি পাথর জড়ো করে বাঁধানো হয়েছে এবং একটি বড় ত্রিশূল পোঁতা আছে।

১১। **ভাদুলিয়া** : (থানা ঐ) এই গ্রামের মধ্যস্থলে ধর্মরাজ মন্দিরে অবস্থান করছেন। নাম—চাঁদ রায়, কালা রায়, সিন্দুর রায়, বাঁকা রায়, ধর্ম রায়, পাদুকা রায় ও রাজরাজ্যেশ্বর। দেয়াশী বাগ্দী। পুজারী ব্রাহ্মণ। মূল পুজা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়। ভক্ত্যারা সদ্গোপ, কুম্ভকার, কর্মকার, তাঁতি, বাউরী, ডোম, গোয়ালা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের হয়। এখানে ধর্মরাজ পুজার প্রচলন হওয়ার প্রবাদ বড়ই বিচিত্র। (যথা নির্দিষ্ট স্থানে দ্রঃ)। পুজার আগের দিন ভোগ, নিয়মজল তৈরী। সন্ধ্যায় বাণ আনা। শক্তিশেল বাণ, সুতো বাণ, গাড়ী বাণ, নবরত্ন বাণ। পুজার দিন ভাঁড়াল আনা, খেজুর ঘরে আগুন লাগানো, দণ্ডীকাটা। সন্ধ্যায় আলো-উৎসর্গ। কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি দেওয়া, বাবুই খেলা, ফুল খেলা, তালগাছ উঠানো ও নিয়মজল আনা হয়। (পার্শ্ববর্তী লাউবেড়ে গ্রামে ধর্মপুজা আছে)।

১২। **ভীমগড়** (অজয় নদীর উত্তরবর্তী): (থানা ঐ) এখানকার ধর্মরাজ একখণ্ড শিলা। সঙ্গে আরও কয়েকটি শিলা আছে। নিকটে ভগ্ন ভৈরব শিলা। পূর্বে মাটির ঘরে অবস্থান করতেন। বর্তমানে ভীমেশ্বর শিবমন্দিরে রক্ষিত। এই শিব পৌরাণিক কালের বলে কথিত হয়। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে প্রবাদ। অজয়ের পরপারে পাণ্ডবেশ্বর। পঞ্চপাণ্ডবের নামে গ্রাম ও দীঘি ইত্যাদি চারপাশে আছে।

ধর্মরাজের দেয়াশী বাগ্দী। পুজারীর উপাধি আমুলী (ব্রাহ্মণ)। বৈশাখী-পূর্ণিমায় পুজো হয়। আতপ চাউল, সন্দেশ, চিড়ার ভোগ ও আড়ালে পাঁঠা বলি হয়। গাজন, চড়ক ইত্যাদি আগে হত, এখন হয় না। ভক্ত্যারা সকল সম্প্রদায়েরই হয়ে থাকে। গ্রামে (শ্রাবণ সংক্রান্তিতে একজন বাগ্দী পুজিত) বসন্ত বুড়ী নামে এক দেবী আছেন।

অপর এক বাগ্দী অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় কালীপুজা করে। তাছাড়া ১লা মাঘ বাঘরায় চণ্ডী এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পুজা হয়।

১৩। **গোয়ালপাড়া** : বোলপুর থানায় শান্তিনিকেতনের এক মাইল উত্তরে এই গ্রামে ধর্মমন্দির মাটির। পূর্বদুয়ারী। সামনে ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্র শিবমন্দির। ধর্মবেদীর উপর অনেকগুলি বিভিন্ন আকৃতির শিলা। একটি ক্ষয়ে যাওয়া কূর্ম। কূর্মের নীচে কোনো পাদপীঠ (Solid Block) নেই। বেদীর দুই পাশে অনেকগুলি ছোট বড় কাঠের ঘোড়া। মূল ধর্মরাজের নাম শ্রীশ্রীবহড়া—ডিহি ধর্মরাজ ঠাকুরজী। এঁর সঙ্গে আছেন, চাঁদ রায় এবং মেঘ রায়। তা ছাড়া গ্রামের বাইরে (দক্ষিণে) একটি বেলগাছের নীচে জঙ্গলের মধ্যে বুড়ো রায় নামে একটি পৃথক আসন আছে। সেখানে একখণ্ড স্বাভাবিক শিলাকে অনাদিলিঙ্গ বলা হয় এবং তিনিই বুড়ো রায়। এঁর মাথায় নাকি অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে। পুজার সময় কেবল দৃষ্ট হয়। এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের দেয়াশী বলে কিছু নাই। পূর্বে ক্ষৌরকার সম্প্রদায়ের ছিল। এখন জনৈক মুখো-

পাধ্যায় সেবাকার্য ও পৌরোহিত্য করেন। নিত্য পুজারও ব্যবস্থা আছে। ধর্মঠাকুর খুব জাগ্রত দেবতা বলে কথিত। রাত্রে তাঁর যাতায়াত প্রত্যক্ষ করেছে নাকি অনেকে। নানারূপেও তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে। এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের পুজা প্রচলন হওয়া সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী রয়েছে। (কিংবদন্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

পুর্ণিমার একদিন আগে সকল সম্প্রদায়ের বহু ভক্ত্যা উত্তরীয় গ্রহণ করে। এই 'উত্তরী' গ্রহণের ঘাটকে দাদুড়ীঘাটা বলে। বাণেশ্বরকে স্নান করানো হয় দুধ গঙ্গাজল দিয়ে। উত্তরী নেবার আগে দেবতাকে প্রণাম ও বন্দনার পর বাণেশ্বর বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই গানটি গাইতে গাইতে (গানটি বহু পুর্বকাল থেকে অনুলিপি করা হয়ে আসছে)। বর্তমান সেবাইতের অনুলিপির নকল এখানে দিলাম—

বলদেব গণপতি হরের তনয়,
স্মরণ করিলে সর্বকার্য সিদ্ধ হয়।
বন্দ মাগো সরস্বতী বীণাবাদিনী,
বন্দনা করিতে মাগো কিছুই না জানি।
কৃপা করে বসো মাগো আমার জিহ্বাতে,
বন্দনা করিব আমি সবার সাক্ষাতে।
ঘাট পাট লাঠি বন্দন সরস্বতীয় গান,
দক্ষিণে দামোদর বন্দ বীর হনুমান।
কোথা আছ নিরঞ্জন আটনে কর ভর,
কাতরে ডাকিছে প্রভু তোমার নকর।
ধবল খাট, ধবল পাট, ধবল সিংহাসন,
ধবল আসনে বস প্রভু নিরঞ্জন।
যোগনিদ্রা ভঙ্গ করে বসহ আসনে,
কাতরে ডাকিছে প্রভু তোমার ভক্তগণে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর।
তুমি রাত্র, তুমি দিবা, তুমি জলস্থল,
নির্ধনের ধন তুমি দুর্বলের বল।
তুমি অস্ত্র, তুমি শাস্ত্র, তুমি তন্ত্র মন্ত্র,
কে কহিতে পারে প্রভু তব গুণ অন্ত্র।
আমি কি কহিতে পারি তোমার মহিমা,
পঞ্চমুখে পঞ্চানন দিতে নারে সীমা।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা কিছু না পারেন কহিতে,
মোর নিবেদন প্রভু তোমার চরণেতে।

আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন,
নিজগুণে দয়া কর প্রভু নিরঞ্জন।
কৃপা করে হইল সর্ব গৃহ অবতার,
অসংখ্য প্রণাম করি চরণে সভার।
আগ্রের তুলসী বন্দ সরস্বতীর গান ;
প্রভু বহড়াডিহের চরণে করি কোটি কোটি প্রণাম।
মেঘরায় চাঁদরায় বন্দিব সাবধানে,
কোটি কোটি প্রণাম করি তাঁদের চরণে।
আদ্যাশক্তি ভগবতীর চরণ বন্দিব,
অসংখ্য প্রণাম তাঁর চরণে করিব।
সদাশিবের চরণ আমি করিব বন্দনা,
কৃপা কর প্রভু না দিও যন্ত্রণা।
জয় জয় মহাদেবের বন্দিব চরণ,
সর্বত্র করই জয় বাসনা পূরণ।
বন্দিব মনসা মাগো হয়ে সাবধান,
তোমায় করি কোটি কোটি প্রণাম।
এই যে আটনে আছে যত দেবগণ,
অসংখ্য প্রণাম করি সকলের চরণ।
আটনের পুরোহিতের চরণ বন্দিব,
লক্ষ প্রণাম তাঁর চরণে করিব।
(মুনি) মনিগণের চরণ বন্দিব সাবধানে,
কোটি কোটি প্রণাম করি বিপ্রের চরণে।
সত্যযুগে বন্দ প্রভু নৃসিংহ ঠাকুর।
ভক্তের লাগিয়া প্রভু বধিলে অসুর
তেতাযুগে বন্দ শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
সংগ্রামে বধিলে প্রভু লঙ্কার রাবণ।
দ্বাপর যুগেতে বন্দ যশোদা গোপাল,
কোলেতে করিল খেলা লইয়া রাখাল।
ধন্য কলিযুগে গৌরাঙ্গ অবতার,
হরিনাম দিয়ে নীচের করিলে উদ্ধার।
চারিযুগে চারিমূর্তি হইল যেই জন,
অসংখ্য প্রণাম করি তাঁহার চরণ।
পূর্বদিকে বন্দ গঙ্গার দেবী সুরেশ্বরী,

তাঁহার চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি।
অগ্রদ্বীপে গোপী নাম আছে বিরাজমান,
তাঁহার চরণে করি লক্ষ লক্ষ প্রণাম।
খিরগ্রামে যোগাগুার চরণ বন্দিব,
কোটি কোটি প্রণাম তাঁর চরণে করিব।
দক্ষিণে সমুদ্র কূলে বন্দ জগন্নাথ,
তাঁহার চরণে প্রণাম হয়ে প্রণিপাত।
বদ্দিনাথের চরণ বন্দিব সাবধানে,
কোটি কোটি প্রণাম করি তাঁহার চরণে।
পশ্চিমেতে গদাধরের চরণ বন্দিব,
কোটি কোটি প্রণাম তাঁর চরণে করিব।
গয়াসুরের চরণে প্রণাম করি শতবার,
যাঁহার মহিমাতে হইল পাতকী উদ্ধার।
উত্তরে উত্তরাচণ্ডী কামিক্ষা যাঁর নাম,
তাঁহার চরণে করি কোটি কোটি প্রণাম।
স্বর্গপুরে বন্দি যতেক দেবগণ
অসংখ্য প্রণাম করি সকলের চরণ।
সমনারে বন্দি সমনাধিকারী,
চিত্রগুপ্তের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।
পাতালে অনন্ত বন্দি ধরেছেন ধরণী,
তাঁহার চরণে লক্ষ লক্ষ প্রণাম করি আমি।
পূর্বে যেবা দেশী (দেয়াশী) ছিল এ যে আটনে,
কোটি কোটি প্রণাম করি তাঁহার চরণে।
এক্ষনেতে দেশী যেবা আছয়ে সাক্ষাৎ,
তাঁহার চরণে করি জোড় হাত।
আটনের বলভক্তের (বালাভক্ত) চরণ বন্দিব,
গলায় বসন দিয়ে প্রণাম করিব।
আপন আপন মাতা পিতার বন্দিব চরণ
যাহা হইতে দেখিলাম এ তিন ভুবন।
আপন আপন গুরু তবে সবে মনে মন,
মস্তকে তুলিয়া বন্দ প্রভুর চরণ।
বন্দনা করি মোর হবে অনেকক্ষণ,
একত্রে বন্দিব মুই সবার চরণ।

ত্রিভুবনের মধ্যে যত আছে দেবগণ,
অসংখ্য প্রণাম করি সকলের চরণ।
দেবগণের বন্দনা হইল সায়,
নিরঞ্জনে ডেকে ভক্ত গড়াগড়ি যায়।
দ্বারিকানাথ[১] ভনে প্রভু তোমার কৃপাতে
অন্তকালে স্থান দিও তব চরণেতে।

এর পর হয় ঘাটবন্দনা। এরও একটি ছড়া আছে। তা এই রকম—

"গঙ্গা গণপতি, গোবরে পবিত্র মাটি (৩ বার)
ঘাট বাট লাঠি বন্দন, আগ্গের তুলসী বন্দন,
দক্ষিণে দামোদর বন্দন, বীর হনুমান। জলে
আছেন জলকুমারী, তাঁর চরণে করি কোটি কোটি প্রণাম (৩ বার)*
জল শুদ্ধু, স্থল শুদ্ধু, শুদ্ধু তোমার বাটি,
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধু, শুদ্ধু ঢাকের কাঠি।
জল শুদ্ধু, স্থল শুদ্ধু, শুদ্ধু তোমার কুঁড়ে,
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধু, শুদ্ধু চন্দ্র সূর্য জুড়ে"। (৩ বার)

বাণেশ্বর স্নান করিয়ে ফেরার পর ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ভক্ত্যাদের ঘাড়ে পা রেখে চলে যান। পূর্ণিমার দিন মুক্তস্নান (মুক্তিস্নান)। ধর্মশিলাগুলিকে এদিন স্নান করানো হয়। মেয়ে ভক্ত্যারা এদিন ক্ষৌরকর্ম করে। তারা হাতজোড় করে, মাথায় আগুন চড়িয়ে ধর্মমন্দিরে আসে। কেউ বা দণ্ডী কাটে। সন্ধ্যাবেলা শোভাযাত্রা সহ ধর্মঠাকুরকে নিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়। মুক্তধোয়া পুকুরের পাড়ে বুড়ো ধর্মরাজ আছেন। সেখানে মন্দিরের ধর্মশিলা ও ঘোড়াকে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে হোম ও একটু আড়ালে মেঘরায়ের উদ্দেশ্যে শূকর বলি দেওয়া হয়। বলিদানের পর শূকরের ছিন্ন শীর্ষটি "রাজভাঁড়ালে" পুরে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। (বুড়ো ধর্মঠাকুর একটি স্বাভাবিক শিবলিঙ্গাকৃতি প্রস্তরখণ্ড)। গ্রামবাসীরা এঁকে অনাদিলিঙ্গ বলে মনে করেন। (একজন মাতাল নাকি সেটি খুঁড়ে দেখতে চায় ; অনেক কাল আগে। বহুদূর খুঁড়েও বুড়ো রায়ের দৈর্ঘ্যের কোনো হদিস তো পায়ই না বরং অজানা একটি শক্তির প্রবল নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ বোধ করায় সে ঐ কর্ম পরিত্যাগ করে)। পূর্ণিমার দিন সকালে ভাঁড়াল নড়ানোর দিন হাজার হাজার ঢাক একত্র বাজানো হয়। মেঘরায়ের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম

১. (ক) বীরভূমে দুবরাজপুর চৌকির কুখুটিয়া গ্রাম নিবাসী দ্বিজ দ্বারিকানাথ ১২০০ (বাং) সালে 'গোরার গান' রচনা করেন। "বীরভূমি" মাসিক পত্রিকায় ১৩০৮ সালে সেটি শিবরতন মিত্র মহাশয় সর্বপ্রথম প্রকাশ করে যান। তারপর বিভিন্ন স্থানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

(খ) "কুকুটা নিবাসী দ্বিজ দ্বারিকানাথের 'বানের কবিতা' স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া গেছে এবং মুদ্রিত হয়েছে। এই পুঁথিটিও গোয়ালপাড়ায় প্রাপ্ত"—পুঁথি পরিচয় বিশ্বভারতী ১ম খণ্ড ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত।

* "ওঁ শূলায় বজ্রহস্তায় স্বাহা জলকুমারায় নমঃ"—জ্বাতাপহারিণী পূজা (পুরোহিত দর্পণ)।

মেঘগর্জনের সৃষ্টি করাই হল এর উদ্দেশ্য। এর আগে আগুন খেলা, কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি ইত্যাদি অনুষ্ঠান যথারীতি হয়ে থাকে। পূর্ণিমার পরদিন বুড়ো রায়ের স্থান থেকে ধর্মশিলাদের বয়ে এনে চড়ক দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের নিকট নেত্র-রোগের বিখ্যাত অঞ্জন পাওয়া যায়।

ধর্মঠাকুর ছাড়া গ্রামে আছেন "বড়ঠাকুর" নামে শিব ও ধনীক্ষা চণ্ডী। ধনীক্ষা চণ্ডীর পূজা হয় ১লা মাঘ তারিখে।

১৪। **রসা** (থানা খয়রাশোল) : গ্রামে একটি খড়ের ঘরে ধর্মরাজ আছেন। একটি শিলাখণ্ড। নাম 'বাথান রায়'। গো-বাথানে ধর্মরাজকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় বলে প্রবাদ আছে। পূজারী ব্রাহ্মণ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পূজা হয়। বেলপাতা, ফুল, তুলসী পূজায় ব্যবহৃত হয়। একাদশীর দিন পূজার বার। সেইদিন ভক্ত্যারা স্নানাদি করে শিব ও হনুমানের পূজা করে। সেখান থেকে হটং-টং-টং অর্থাৎ এক পায়ে দৌড়ে গাজন পর্যন্ত আসে। তারপর মন্দিরে গিয়ে সেখানে দুটি লোহার দণ্ডে দুই পা ঝুলিয়ে অধোমুখে শিবপূজা করে। রাত্রি দুটার সময় উঠে একটি বাঁশে হাত দিয়ে জাগিয়ে আসে। সেই বাঁশে একটি টোকা তৈরী করে পূজার দিন ভোর রাত্রে ধর্মরাজকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর নাম 'মুকতোলা'। চতুর্দশীতে পূজা ও হোম হয়। ভক্ত্যারা কেউ হোলাবাণ, দণ্ডী ইত্যাদি দেয়। পূর্ণিমায় পূজা ও বারি আনা, কাঁটায় গড়াগড়ি। তৃতীয় দিনে চড়ক, চতুর্থ দিনে ভক্ত্যা ভোজন।

১৫। **শিরা** (থানা ঐ) : গ্রামে (পোঃ নবসন) টিনের ঘরে ধর্মরাজ। সাতটি শিলাখণ্ড। তাদের ছয়টির নাম—বুড়ো রায়, কালা রায়, চাঁদ রায়, বাথান রায়, ধর্ম রায়, বাঁকাশ্যাম। দেয়াশী সদ্‌গোপ, পূজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী শুক্লপক্ষের নৃসিংহ চতুর্দশীতে পূজা হয়। পূজানুষ্ঠান হিজল গড়া ও রসা গ্রামের অনুরূপ।

১৬। **হজরৎপুর** (খয়রাশোল) : গ্রামে ধর্মরাজ বুড়ো রায় বাঁধানো দালান বাড়ীতে বাস করেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা হয়। আষাঢ় পূর্ণিমায় মূল পূজা হয়। গ্রামের লোকের বিবাহাদি উৎসবে খরচ আদায় করে পূজার ব্যয় নির্বাহ হয়। ভাঁড়াল আনা, ফুলখেলা, দণ্ডী দেওয়া, পুরকলসী ইত্যাদি আছে। ভক্ত্যারা সকল সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে। স্ত্রীলোক ভক্ত্যা হয় না। ধর্মরাজের সঙ্গে শিব আছেন। ধর্মরাজের সামনে ছাগ বলি হয়। গ্রামের নিম-তলায় 'দেলো বুড়ি' নামে এক দেবী আছেন। বটতলায় আছেন 'গোঁসাই'।

১৭। **কড্ডাং** (দুবরাজপুর থানা) : গ্রামের এই থানার বর্তমান নাম কল্যাণপুর। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সিজে। তাই একত্রে বলা হয় সিজেকড্ডাং। সিউড়ী থেকে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে। এখানকার ধর্মরাজ হাঁপানির ঔষধের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত। ধর্মরাজের নাম 'আদিরাক্ষ ধর্মরাজ'। এঁর সঙ্গে যুক্তভাবে আরও সাতজন ধর্মরাজ আছেন। খয়রাশোল থানার লাউবেড়ে থেকে একজন ধর্মরাজ আনীত হন, অপরজন ইলামবাজার থানার হাঁসড়া থেকে। আদিতে একজন ঐখানেই ছিলেন। দেয়াশীর বাড়ীতে একজন ধর্মরাজ আছেন। এঁরই ওষুধ দেওয়া হয়। এই ধর্মরাজের পূজা হয় বিজয়া দশমীর দিন। দেড়শো বছর আগে একটা বকুলগাছ ও তালগাছ জড়াজড়ি করে বর্তমান ছিল। তার কাছে একজন মুসলমান লাঙ্গল দিতে গিয়ে

লাঙ্গলের ফলায় সিঁদুর মূর্তি ধর্মরাজকে পান। প্রবাদ আছে, প্রায় পাঁচপুরুষ আগে শ্যাম ঘোষকে স্বপ্ন হয়। তিনি ঠাকুরকে তুলে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈশাখী পুর্ণিমায় মূল পুজো। পুজার আগের দিন রাত্রে মুক্তিস্নানকে বলে 'বাণামো' করানো। ঐ ঘাটকে বাণামো ঘাটও বলে। কড্ডাং গ্রামে ধর্মরাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দেবতার নিকট বলি হয় না। ধর্মমন্দিরের পাশে একটা নিমগাছের গোড়ায় একটি শিবলিঙ্গ-তুল্য শিলাখণ্ড দাঁড় করান আছে। সেটির সামনে অনেকগুলি ত্রিশূল মাটিতে পোঁতা, মাটির ঘোড়া, দু-চারটে ভাঙ্গা "টেরাকোটা"। ইনি হলেন বটুকভৈরব। এঁর নিকট বলি হয়। ভৈরবেরও পুজা হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়।

ধর্মরাজের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র আছে। কড্ডাং গ্রামের নিকটস্থ বটতলায় আর একজন ধর্মরাজ আছেন। তাঁর নাম চাঁদ রায়। এঁরও পূজা হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়। ছোট একটি ডোবার ধারে একটা কুঁড়ে ঘরে ধর্মরাজের নিবাস। "রাতকাণা" রোগ নিরাময়ের জন্য একটা অঞ্জন এখান থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। দেয়াশী সদ্‌গোপ।

১৮। **গোয়ালিআড়া** (থানা ঐ): গ্রামে বৈশাখী পুর্ণিমায় ধর্মরাজের পুজা হয়। মাটির চালাঘরে ধর্মরাজ থাকেন। বেদীতে ৫টি শিলাখণ্ড এবং একটি অতি প্রাচীন ক্ষয় পাওয়া ইঞ্চি পাঁচেক আকারের গণেশমূর্তি ও একটি অজানা দেবীমূর্তি, আবরণ দেবতা স্বরূপ আছেন। দেয়াশী বাগ্দী, পূজারী ব্রাহ্মণ। উত্তরীয়, স্নান, ফুলখেলা ইত্যাদি মামুলি অনুষ্ঠান হয়। পুজার দিন বাণেশ্বরকে নিয়ে ভক্ত্যারা উল্লাসভরে নৃত্য করে। ডোম, বাগ্দী ও বাউরী সম্প্রদায়ের ২৫।৩০ জন ভক্ত্যা হয়ে থাকে। গ্রামের আখবাড়ীতে আছেন মশান কালী। আখবাড়ীর পাহারাদার ১লা মাঘ পুজা করে।

১৯। **ছিনপাই** (থানা ঐ): গ্রামের মধ্যস্থলে সিউড়ী দুবরাজপুর রাস্তার পশ্চিম ধারে ধর্মরাজ মন্দির ও নাটশালা অবস্থিত। ধর্মরাজের নাম সুন্দর রায়। পুজারী ব্রাহ্মণ। দেবাংশীর উপাধি পাল (কুম্ভকার)। ভক্ত্যারা হয় রাজপুত, বাগ্দী, কুমার, মুচি, নাপিত ইত্যাদি। প্রতি বৎসর বুদ্ধপুণিমায় মূল পুজা হয়ে থাকে। বৈশাখী পুর্ণিমার ৮ দিন পূর্ব হতে সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ঢাক, বাদ্য, সন্ধ্যা, ধূপ ইত্যাদি বিশেষভাবে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। পূজার দুই দিন পূর্বে সমস্ত ভক্ত্যা বাদ্যাদিসহ মহাসমারোহে ধর্মরাজের নামগান উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামের পাঁচ স্থানে ধর্মরাজের যে আটন আছে সেগুলি প্রদক্ষিণ করে। সন্ধ্যায় বের হয়ে প্রায় রাত্রি এগারোটায় প্রত্যাবর্তন করে। ভক্ত্যা এবং দর্শকসহ প্রায় ৫।৬ শত লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। পুজার পূর্বদিন সন্ধ্যায় মহাসমারোহে ভক্ত্যারা বাণেশ্বর এবং মাথায় টোকা দিয়ে মুক্তস্নান করবার জন্য গ্রামের উত্তর প্রান্তে কামারপুকুর ঘাটে বাদ্যাদিসহ যাত্রা করে। এই যাত্রাকালে মূল দেবাংশীর মাথায় টোকা থাকে। তিনি আবিষ্ট অবস্থায় থাকেন এবং তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়। যাবার সময় ভক্ত্যারা উচ্চৈঃস্বরে ধর্মরাজের নাম-কীর্তন করতে করতে ঘাট অভিমুখে যাত্রা করেন। ঘাটে পৌছানোর পর তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়।

বাণেশ্বরের স্নানের পর প্রত্যেক ভক্ত্যা মুক্তিস্নান করে। স্নানের পর পুরোহিত মূল দেবাংশীকে মন্ত্রপাঠ করিয়ে বাণেশ্বরের পুজাদি সমাপন করেন। পূজার পর ভক্ত্যারা উত্তরীয় ধারণ করে। পূজা সমাপনান্তে একজন দেবাংশী ধর্মরাজের (দুগ্ধ মিশ্রিত) স্নানজল কলসীতে পুরে মাথায় নেয় এবং মূল দেবাংশী পুনরায় মাথায় টোকা নিয়ে এবং অন্যান্য ভক্ত্যারা কাঁধে বাণেশ্বর নিয়ে ঘাট থেকে অনতিদূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। ঐ সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু লোকের সমাগম হয়। পুনরায় গীত, বাদ্য, ধূপ সহকারে মূল দেবাংশীর আবেশ ঘটানো হয়। এরপর শোভাযাত্রাসহ মন্দির অভিমুখে যাত্রা করে। মন্দিরে পৌঁছানোর পর মূল দেবাংশীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা হয় এবং প্রত্যেক ভক্ত্যা ধর্মরাজের স্নানজল পান করে ফলাদি আহার করে। সমস্ত ভক্ত্যাই সেদিনের মত ধর্মরাজ-মন্দিরে রাত্রিযাপন করে। রাত্রি সাড়ে তিনটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আগুন খেলা, কাঁটায় ঝাঁপ, বাবুই খেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় গীতবাদ্যের ব্যবস্থা আছে। অনুষ্ঠান শেষে ভক্ত্যারা বাদ্যসহ ফল আহরণে যায়। সকাল ৮টার মধ্যে মন্দিরে ফিরে এসে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে এবং কলাগাছ ফুলপল্লবাদি দিয়ে মন্দির সুসজ্জিত করে। বেলা সাড়ে নয়টা থেকে ১০টার মধ্যে। যে পুরোহিতের বাড়ীতে ধর্মরাজ বারোমাস থাকেন, তাঁকে সকল ভক্ত্যা, পুরোহিত ও সেবাইত সমভিব্যাহারে বাদ্যসহ মন্দিরে আনা হয়। ধর্মরাজকে মন্দিরে স্থাপন করে ভক্ত্যারা মদের ভাঁড়াল আনবার জন্য যায়। ওদিকে পুরোহিত যথারীতি পুজা হোমাদি সমাপন করেন। এখানকার ভাঁড়ালের বিশেষত্ব এই যে, দুইজন ভক্ত্যা বাঁশের বাঁকের মাঝখানে প্রচুর মদের বড় কলসী বেঁধে দুই প্রান্তে কাঁধে নিয়ে আবিষ্ট হয় এবং মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে বাদ্য, ধূপ সহযোগে গ্রামস্থ এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু লোকজনসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বেলা ৩টার সময় মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। এই উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে থাকে। ভাঁড়াল মন্দিরে পৌঁছানোর পর সেটিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়। পরে ভক্ত্যারা, স্থাপিত ভাঁড়ালটিকে বাদ্য, ধূপ, দীপ দিয়ে ধর্মরাজের নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকে এবং ঠাকুরের কৃপায় নাকি কিছুক্ষণের মধ্যেই কলসী থেকে আপনা-আপনিই মদ্য উথলিয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এরপর ঐ বাদ্য, ধূপ নিয়ে ধর্মরাজের মাথায় একটি পদ্মফুল চড়ানো হয়। তারপর ধর্মরাজকে ডাক দিতে দিতে একসময় ফুলটি নিজে থেকেই নীচে পড়ে যায়। ফুল পড়ার পর চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী ছাগবলি দেওয়া হয়। বলির পর ছিন্নশীর্ষ ছাগদেহগুলি ধর্মমন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত ভৈরব শিলার উপর রাখা হয়। বলির পর হোম ও পূর্ণাহুতি। পুজাসমাপনান্তে যজ্ঞতিলক, আশীর্বাদ, স্নানজল ও প্রসাদ বিতরণ। পুজার দিন রাত্রি আটটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ভক্ত্যারা বাদ্যাদিসহ 'বাণামো নৃত্য' করতে করতে সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করে। ঐ সময় নানাজনে বিভিন্ন বেশভূষা ধারণ করে নানারকম হাস্যকৌতুক ও সঙ্‌ প্রদর্শন করে থাকে। পূজার দিন রাত্রে রামায়ণ গান হয় এবং সপ্তাহব্যাপী চলে। ভৈরব ও শিব ছাড়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালী আছেন।

২০। **জামথলি** (থানা ঐ): গ্রাম সিউড়ী রাজনগর রাস্তায় পাতাডাং গ্রামের তিন মাইল দক্ষিণে। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ধর্মরাজের পাকা ঘর। সংলগ্ন পশ্চিমে শিবমন্দির।

ধর্মরাজের কোনো নাম নেই। সিংহাসনটি একটি ছোট রথ। শিলামূর্তি দেখা যায় না—রথের ভিতরে আছেন। পাশে দুইটি মনসা। তাছাড়া আছেন পাতালস্থ মা। ইনিও মনসা। কথিত হয় এঁর ঘটে বারি সব সময়ই স্বতঃই পরিপূর্ণ থাকে। পূর্বে এখানে বড় বড় গোক্ষুরা সাপ এসে বসে থাকত। মনসার পুজা ধর্মরাজের সঙ্গেই হয়। তাছাড়া আশেপাশের কয়েকটি গ্রামে (যেমন হাজরাপুর, পারুলিয়া ইত্যাদি) এই মনসা নিয়ে গিয়ে তার পুজা হয়ে থাকে। ধর্মরাজের নিকটে একটি ধাতব সিংহবাহিনী আছেন। স্ফটিকেশ্বর এবং নীলকণ্ঠ শিবও আছেন ওখানে। ধর্মরাজের সঙ্গেই এদের পূজা হয়। মন্দিরের বাইরে সংলগ্ন পুর্বে একটি আঁকড় গাছের নীচে ছোট একটি বাঁধানো জায়গা। সেখানে ত্রিশূল ও কয়েকটি বড় বড় মৃন্ময় ঘোটকের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এখানে একই সঙ্গে পুজা করে ধর্মরাজের। এখানে মুরগী বলি হয়। পুজা করে মূল দেয়াশী (মাল)। ফুল দেয়াশী (সহকারী) ডোম।

জামথলি গ্রামে মূল ধর্মরাজের পুজা বৈশাখী পুর্ণিমায়। দেয়াশীর উপাধি সাহানা, পূজারী ব্রাহ্মণ। আসলে ধর্মরাজ হলেন এক মাইল পশ্চিমে হাজরাপুর গ্রামের। দেয়াশী জানালেন যে, বহুকাল আগে হটু সাহানার বাড়ীতে (জাতি তন্তুবায়) খুদের ভাঁড়ে ধর্মরাজ আবির্ভূত হন এবং তিনি স্বপ্নাদেশে জামথলিতে নাকি অবস্থান করতে চান। ধর্মরাজের পুজা করে সাহানাদের অবস্থার নাকি খুব উন্নতি হয়। তখন তারাই সেবাপুজা করত। দেবতা ভোগ প্রার্থনা করায় পায়সের ভোগ দেওয়া হত। কালে ব্রাহ্মণ দ্বারা পুজা করবার ব্যবস্থা হয়।

জামথলির ধর্মরাজ বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। এঁর পূজা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয় ও মেলা বসে। অগণিত লোক আসে মেলা দেখতে। পূর্ণিমার আগের দিন খয়রাশোল থানার মুথাবেড়িয়া গ্রাম থেকে ঢাক আসে। সেদিন স্নান ও উপবাস। ধর্মরাজকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে স্নান করানোর বিধি নেই। বেদীর সন্নিকটে ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়। রাত্রে ফুলখেলা, ফলভাঙ্গা, সারারাত্রি জাগরণ। পরের দিন পুজা। বেলা ১০।১১টার সময় ভাঁড়াল আনা হয়। ভক্ত্যারা গ্রাম ঘুরে নাচতে নাচতে এসে হাজির হয়। তারা ধূপের ধোঁয়া ও বাদ্যের শব্দে ক্রমে ক্রমে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। দেয়াশী তাদের মুখে মদ ছিটিয়ে এবং চাপড় দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনে। এরপর হোম ও বলিদান : মেষ ও ছাগ। পুজা শেষ হওয়ার পর বাণেশ্বরকে নিয়ে হাজরাপুর যাওয়া হয়। ওখানে স্নান করানো হয় পুকুরে। তারপর গ্রামের ভিতরে গিয়ে কোঁখবাণ ফোঁড়া হয়। মশাল জ্বলে বাণের মাথায়। ভক্ত্যারা নাচে, ধূপদীপ জ্বলে। তেল পোড়ানো হয়। বাণেশ্বরের স্নানের সময় চারিদিকের ধর্মরাজদের নাম ধরে ডাকা এবং শ্লোক আওড়ানো হয়।

পূর্বে পর পর সাতটি হাঁড়ি একই উনুনে চড়িয়ে ভোগ রান্না হত। দেবতার মাহাত্ম্যে উনুন সংলগ্ন প্রথম যে হাঁড়িটি থাকত তার অন্ন নাকি সবার শেষে সিদ্ধ হত। জামথলির ধর্মরাজের পুজায় সিঁদুর বা রক্তচন্দনের ব্যবহার চলে না। শালগ্রাম পুজার মত সাদা চন্দন দিয়ে পুজা হয়। পুজার পরদিন সকালে বাণগোঁসাইকে নিয়ে বাড়ী বাড়ী চাল আদায় করা হয়। সেইদিন দেয়াশীর বাড়ীতে উপবাসী ভক্ত্যারা প্রথম লবণমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে নিয়ম

ভঙ্গ করে। তারপর তারা মদের দোকানে এসে মদ্যপান করে। হাজরাপুরে কোঁড়া পাড়ার ধরণ আছেন মাঠের মাঝে গাছতলায়। নিত্য পুজা হয়। বিশেষ দিনে হয় না। অন্য বৈশিষ্ট্য নেই। 'হাজরাপুরে' আখের শালে ধর্মরাজের মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে পুজা হয়।

হাজরাপুরে আছেন কালভৈরব, রক্ষাকালী, গ্রামদৈত্য (১লা মাঘ, ব্রাহ্মণের পূজা) ও ভাজইকুমারী। ভাজইকুমারী আছেন একডাঙ্গায়। ডোমরা ভাদ্র মাসে বরাহদ্বাদশীতে মুরগী পাঁঠা বলি সহ পূজা করে। তাছাড়া ধানমাঠে ডাক সংক্রান্তির দিন গাড়সে ষষ্ঠী পূজা হয়।

২১। **দুবরাজপুর** : সাঁওতালি ভাষায় দুবরাজ শব্দের অর্থ—বিশেষ একপ্রকার ধান।

দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত দুবরাজপুর গ্রামে ধর্মরাজের নাম এলো রায়। প্রাচীন মন্দিরে কাঠের চৌকিতে পুর্বমুখে অবস্থান। পূজারী ব্রাহ্মণ। মুচি, বাগদী, বাউরী ও বর্ণহিন্দুরা ভক্ত্যা হন। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পূজা। ভক্ত্যার সংখ্যা অসংখ্য। স্ত্রী ভক্ত্যাও থাকে। বৈশাখী-পূর্ণিমায় একদিনের জন্য মেলা বসে। সামনে পাঁঠা বলি হয়। পার্শ্ববর্তী পাড়ায় কালা রায় এবং খোঁড়া রায় ধর্মরাজ আছেন। যজ্ঞে আহুতি দেওয়া কলা বন্ধ্যা রমণীরা সন্তান লাভের মানসে ভক্ষণ করে থাকেন।

২২। **নারায়ণপুর** : এইটি ছিনপাই সংলগ্ন গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণভাগের চাষাপাড়া ও ছুতোরপাড়ায় বুড়ো রায় ধর্মরাজ অবস্থান করছেন। মূল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। পাশে একটি মাটির ঘরে ধর্মরাজকে রাখা হয়েছে। পূজারী ব্রাহ্মণ। দেবাংশী ঘোষ। বৈশাখী-পূর্ণিমায় পুজা। সদ্‌গোপ, সূত্রধর, নাপিত, ময়রা, বাগদী, মুচিরা ভক্ত্যা হয়। এই ধর্মরাজের পুজানুষ্ঠান ও গাজন ইত্যাদি সবই ছিনপাইয়ের সুন্দর রায়ের অনুরূপ এবং একই সঙ্গে হয়ে থাকে। শুধু রামায়ণ গানের পরিবর্তে মনসামঙ্গল গান হয়। ধর্মঘরের ঈষৎ বামে ষষ্ঠীতলা। দক্ষিণ পার্শ্বে ১৫।১৬টি শিবমন্দির। গ্রামের মধ্যভাগে দুর্গামন্দির আছে। চাটুয্যে, মুখুজ্যে, চক্রবর্তী ও মজুমদার এই চার বাড়ীর পূজা।

২৩। **বাঁধের শোল** : দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রামে ধর্মরাজের কোনো নাম নেই। গ্রামের মধ্যখানে মাটির ঘর। সামনে চারচালা। মন্দিরের ভিতর পরিচ্ছন্ন বেদী। একটি সিংহাসনে কূর্মাকৃতি শিলা ও অজস্র উত্তরীয় জড়ানো বাণেশ্বর। মন্দির দক্ষিণমুখী। দেয়াশী কুম্ভকার। পুজারী ব্রাহ্মণ। মূল পুজা হয় বৈশাখী-পুর্ণিমায়। পূর্ণিমার আগের দিন টোকাভাঙ্গা উৎসব। একটি বাঁশের তৈরী নতুন টোকা বাজার থেকে কিনে এনে তার ভিতর মিষ্টান্ন, আতপ, আসন, অঙ্গুরীয় ও মধুপর্ক ইত্যাদি রেখে গায়ে সিঁদুরের মঙ্গল চিহ্ন এঁকে একজন ভক্ত্যা মাথায় নিয়ে আবিষ্ট হয়। তাকে অপর একজন ধরে রাখে, সে মাথা দোলাতে দোলাতে পুকুরের ঘাটে গিয়ে টোকাটিকে পুকুরে চুবিয়ে স্নান করিয়ে অনুরূপভাবে ফিরে আসে। সঙ্গে বাণেশ্বর থাকেন। ঘাটে উত্তরীয় ধারণ। পুর্ণিমার দিন দুপুরে ভাঁড়াল আনা। পুজার রাত্রে জিহ্বাবাণ, সকালে ফুলখেলা, কাঁটা খেলা। পরদিন রাত্রে চড়ক। ঐদিন পৃষ্ঠবাণ ফোঁড়া হয়। সামনে ছাগবলি হয়ে থাকে। গ্রামে আছেন—কালী ও মঙ্গলচণ্ডী। বাউরী পাড়ায় আছেন বনকুমারী ও বাঘরায় চণ্ডী।

২৪। **কৃষ্ণপুর** (খয়রাশোল থানা) : এই গ্রামের ধর্মঠাকুরের মূর্তি শিবলিঙ্গের মত। নাম বুড়ো রায়। গ্রামের মধ্যস্থলে মাটির ঘর, টিনের ছাউনি। সামনে নাট মন্দির আছে। ধীবর সম্প্রদায় মূল দেয়াশী। পাট-দেয়াশী সদ্গোপ। পুরোহিত আচার্য ব্রাহ্মণ। আনুমানিক ৫০০ বছর পূর্বে এই ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিংবদন্তী আছে যে বহু বৎসর আগে ধীবরদের উপর স্বপ্নাদেশ হওয়ায় নিকটস্থ অজয় নদীর গর্ভ থেকে দেবতা নীত হন। মূল পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। নিত্য পূজাও আছে।

বুড়ো রায়

স্বপ্নাদেশ

বীজমন্ত্র : "ধূং ধর্মরাজায় নমঃ"

ধ্যান : "যস্যান্তং……শূন্য মূর্তিং" (ধর্মপূজা বিধানের ধ্যান মন্ত্র অনুযায়ী)

মন্ত্র

বৈশাখ মাসে মূল পূজার আটদিন আগে ঘট স্থাপন করে বিশেষ পূজা সুরু হয়। বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন ভক্ত্যাবৃন্দ ক্ষৌরকর্ম সাধন করে ব্রতী হয়। ভক্ত্যাবৃন্দ উপবাস করে চতুর্দশীর দিন অপরাহ্ণে কাষ্ঠ নির্মিত বাণেশ্বরকে পূজান্তে ডুরি উৎসর্গ করে, উক্ত ডুরি পুরোহিতের নিকট গ্রহণ করে গলায় ধারণ করে। তারপর বাণেশ্বরকে মহাসমারোহে ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্য বাদন সহ নিকটস্থ অজয় নদে স্নান করাতে নিয়ে যায়। স্নানের পর পাট-দেয়াশীদ্বয় দুটি পূর্ণ কলস (পুরকলসী) নদীর ঘাট থেকে দেবমন্দিরে নিয়ে যায়। আসার সময় ভক্ত্যারা "চলো বাবা বুড়ো রায় হে" ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে বাণেশ্বরকে পুরোহিতের কোলে বসিয়ে পুরোহিতকে কাঁধে তুলে নাচতে নাচতে দেবমন্দিরে প্রত্যাগমন করে। নদী থেকে ফেরার সময় ছড়া ও পাঁচালী গাওয়া হয়। মন্দিরে আসার পর মূল ধর্মঠাকুরের মূর্তিটি নিয়ে গ্রামের বাইরে বড়পুকুর নামক পুকুর থেকে অনুরূপভাবে স্নান করিয়ে আনে। রাত্রিবেলা ধর্মঠাকুরকে মন্দিরের বাইরে স্থাপন করে ভক্তবৃন্দ চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে "চলো বাবা বুড়ো রায় হে", "চলো বাবা ধর্মরাজ হে" ইত্যাদি ধ্বনি তুলে সারারাত নাম ডাক করে। অন্যদিকে ভক্ত্যারা পালা করে কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি দেয় ও আগুন নিয়ে খেলা করে। শেষরাত্রে ভক্ত্যারা ছোলাভিজা ও ফল ভক্ষণ করে। পূর্ণিমার দিন অনুরূপভাবে ধর্মঠাকুরকে স্থানীয় বড়পুকুর নামক পুকুরে স্নান করিয়ে মন্দিরে আনা হয়। দুপুরবেলায় ষোড়শোপচারে বিহিত পূজার পর ছাগবলি দেওয়া হয়। রাত্রে ভক্ত্যারা **গাড়ী বাণামো** সম্পন্ন করে। দুই জোড়া গোগাড়ীর কাঠামো দিয়ে মধ্যস্থলে দুটি খুঁটি পোঁতা হয়। খুঁটি দুইটির মাঝের কাঠটিতে দুটি দড়ির ফাঁস তৈয়ারী থাকে। গাড়ীটিতে চারটি চাকা লাগানো হয়। ঐ দড়ির ফাঁসে পাট-দেয়াশী পা গলিয়ে হেঁটমুণ্ডে ঝোলে। খুঁটির পাশে দুজন ভক্ত্যা পাট-দেয়াশীকে ঝুলতে সাহায্য করে। নদী থেকে এই ক্রিয়া সুরু হয়। পাট-দেয়াশীর মাথা নদীর দিকে থাকে। সেই দিকের গাড়ীর প্রান্তে পুরোহিত ফুল, বেলপাতা নিয়ে বসে থাকেন। অপর প্রান্তে থাকে অগ্নিকুণ্ড। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে ঝুলন্ত পাট-দেয়াশীর হাতে ফুল, বেলপাতা ধরিয়ে দেন।

ঘট স্থাপন

উত্তরীয় ধারণ

পুরকলসী

নিশাজাগরণ

কাঁটা ও আগুন খেলা

গাড়ী বাণামো

ঝুলন্ত দেয়াশী মন্ত্র উচ্চারণ করে সেগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। গাড়ীকে ঠেলা দিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। এই হল গাড়ী বাণানো। রাত্রে ভক্ত্যারা ফলাহার করে।

প্রতিপদের দিন ভক্ত্যারা স্নানান্তে ডুরিগুলি খুলে বাণেশ্বরের লৌহশলাকায় আটকিয়ে পুর্ণ কলসের **নিয়মজল** নিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করে। দুপুরে ভক্ত্যা ভোজন হয়। আগে গাজনে চড়ক খুঁটির সাহায্যে ভক্ত্যারা পাক খেতো। এখন আর এ অনুষ্ঠান হয় না। তবে চড়কতলায় ভক্ত্যারা আগুন নিয়ে চারিদিক পাক খায়। গাজনের দিন অগ্নিকুণ্ড করা হয়। তারপর সেই আগুন হাতে তুলে আগে ছোড়াছুড়ি করে। বানফোঁড়া হত। এখন হয় না।

বাণেশ্বরকে উত্তরীয় প্রদান

চড়ক

গাজন বন্ধন

চতুর্দশীর দিন বাণেশ্বরকে স্নান করাবার আগে প্রথমেই এই গীত গেয়ে গাজন বাঁধা হয়—

দেববন্দ দেয়াশী বন্দ
ঘাট পাট লাঠি বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান।
ডাইনে ডাকুর বন্দ
বামে বীর হনুমান।
পশ্চিমে গদাধর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
উত্তরে কামাখ্যা দেবী
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
পুবে ভানু ভাস্কর
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
দক্ষিণে জগন্নাথ দেব, পাতালে বাসুকি নাগ
স্বর্গে নারায়ণ
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।"

এইভাবে চারিদিকের দেবতাদের বন্দনা করা হয়। বাণেশ্বরকে স্নান করানোর পর মূল দেয়াশী অন্যান্য দেয়াশীসহ চামর ঢুলিয়ে এই চালান পাঁচালীটি গাইতে গাইতে খোল করতাল বাজিয়ে স্নানের ঘাট থেকে পুজা মণ্ডপে নিয়ে আসেন—

"আদ্যি নামে ছিলেন ধর্ম পুরুষের জনম,
তাঁর পুত্র হলেন গোঁসাই অনাদি ধরম।
অনাদির অধিপতি হরিষ জগত
হস্তপদ নাই প্রভু ভ্রমিয়ে আকাশ।
না ছিল জলস্থল এ মহী মণ্ডল
এ তিন ভুবন ছিল সব শূন্যময়।

চালান গান

শূন্যতে আসন প্রভুর শূন্যতে বসন।
শূন্যভরে ভ্রমণ করেন ধর্মনিরঞ্জন।
শূন্যতে থাকিয়ে প্রভু পাতিলেন মায়া,
আপনি সৃষ্টি করিলেন আপনার কায়া।
শূন্যতে থাকিয়ে প্রভু নিঃশ্বাস ছাড়িল।
শূন্যের নিঃশ্বাসে প্রভু উল্লুক জন্মিল।
জন্মিয়া উল্লুক প্রভু হয়ে গেল বক্তা
উল্লুকের পৃষ্ঠে প্রভু দিয়ে দুই পা।
কহ বলি উল্লুক কত যুগ গেল রয়ে।
চার চৌদ্দ যুগ গেল এ ব্রহ্মা ধেয়ানে।
অনি (?) সত্যযুগ সৃষ্টি করেন ধর্মনিরঞ্জন
বিঙ্গ (?) হইল প্রভু কাঁপে থরথর।
জলদান দাও যদি ধর্ম যোগেশ্বর।
পৃষ্ঠে করি বইতে পারি দ্বাদশ বৎসর।
সে কথা শুনিয়ে মুখে অমৃত ভাসিল,
কিছু না খাইল কিছু নিঃশ্ছিয়ে ফেলিল।
শূন্যকার ছিল পৃথিবী জলময় হইল,
হাতের তুড়িতে জলে বাধিল বিমুখ
তাহে ভয় করে দেখ অনাদির উল্লুক।
ছিঁটিয়ে ফেলিল ধর্ম কাঁধের কনক পৈতা,
জন্মিল অনন্ত নাগ সহস্র তার মাথা
শুন বলি অনন্ত নাগ তোমায় দিলাম বর
আজ হৈতে হইলে তুমি অক্ষয় অমর
ইহাই পণ্ডিত বলি তিন ডাক দিল
তিন ডাক লয় প্রভু, তিন অবতার
শ্রীধর্ম পুজিলাম আজি জয় জয়কার।

আবরণ দেবতা

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন মনসা ও পঞ্চানন। বাবা গোঁসাই নামে একজন ব্রহ্মচারীও আছেন।

গ্রামের অন্যান্য দেব দেবী

রাঙামেটের গোঁসাই—বাউরীদের পুজা। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে। গ্রামের বাইরে সজ্জী মাঠের পাশে একটি ঝোঁপে শিরিষ ও বেলগাছের নীচে এঁর আটন। কথিত হয়, রাত্রে ঐদিকে কেউ গেলে গোঁসাই নানারূপ মূর্তি ধারণ করে দেখা দেন। এঁর সঙ্গে কালীরও আটন আছে। কার্তিক অমাবস্যায় এই ক

পুজা হয়।

ঘুরঘুরে কানালীর মাঠের গোঁসাই—১লা মাঘ বেদীতে এই গোঁসাইএর পূজা হয়। কথিত হয় ভক্তির অভাব ঘটলে চাষীদের ইনি নানাভাবে বিব্রত করেন।

মোল (মহুয়া) তলার গোঁসাই—গ্রামের বাইরে কৎবেলের গাছে এঁর আশ্রয়। ১লা মাঘ পুজা হয়। কেউ মানত করলে মঙ্গল বা শনিবার পুজা ও ভোগ হয়। এ পুজাও বাউরীদের। ধীবর সম্প্রদায়ও নিকটস্থ বিলে মাছ ধরার আগে পুজা ও ভোগ দেয় এবং মানত করে।

নিমতলার গোঁসাই—ডোমদের পুজা। তারা বিশ্বাস করে এই গোঁসাই তাদের ইষ্টদেবতা। তাঁর কৃপায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। কারও অসুখ বিসুখ হলে ঐ গোঁসাই-এর নিকট মানত করলেই সেরে যায়। শনি ও মঙ্গলবার পুজা। ছাগল ও মুরগী বলি হয়।

বেলতলার ব্রহ্মচারী—ধীবরদের পুজা। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পুজাদি দিলে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন। কথিত আছে ইনি কারও অনিষ্ট করেন না। তবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে বিভিন্ন মূর্তিতে রাত্রে লোককে ভয় দেখান।

তালতলার গোঁসাই—ধীবরদের পুজা। মঙ্গল ও শনিবার পুজা হয়।

নিমপালের গোঁসাই—ব্রাহ্মণের পুজা। শনি ও মঙ্গলবার পুজা হয়। অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে লোকবিশ্বাস। মাঠে ইনি থাকার জন্য কেউ ধান চুরি করতে সাহস করে না। প্রতি শনি ও মঙ্গলে কেউ না কেউ পুজা দেনই।

২৫। **মামুদপুর** (খয়রাশোল থানা): এখানকার ধর্মঠাকুরের শিলাগুলি স্তূপাকৃতি, থাক্ থাক্ ভাবে সাজানো। ধর্মঠাকুরের দুটি নাম, বুড়ো রায় এবং কানা রায়। পাথরের দেবীর উপর সাজানো। মাটির ঘর, টিনের ছাউনি। সামনে বৃহৎ তমাল গাছ। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত।

বুড়ো এবং কানা রায়

ধীবর দেয়াশী

দেয়াশী ধীবর সম্প্রদায়ের। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমায় মূল পুজা হয়।

ধ্যানমন্ত্র

"নমঃ নমঃ পুষ্পায় নমঃ।" "ধাং ধুং ধর্মরাজায় নমঃ"॥

পুজার প্রথমদিন বারো মুঠ ছোলা ভিজিয়ে দেবতার শীতল হয়। দ্বিতীয় দিন বাণামো। ভক্ত্যারা বাণেশ্বরকে ঘোষপুকুরে স্নান করান। ভক্ত্যারা বাউরী, ধীবর ও সদ্গোপ। সংখ্যায় ২০।২৫ জন। স্ত্রীলোকও থাকে। রাত্রিতে গাজনের ঢাকবাদ্য বাজানো হয়। ভক্ত্যারা দেবতার সামনে গড়াগড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। তারপর ধূপ নিয়ে ধূপঘ্রাণ ভক্ত্যাদের দেওয়া হয়।

বারোমুঠি ছোলার শীতল

ধূপঘ্রাণ

গাজনের শ্লোক

শ্লোক

"দেববন্দন, দেয়াশী বন্দন
খাট পা লাঠি বন্ধন
আর বন্ধন সরস্বতী গান
ডাইনে ডাকুর বন্ধন
বামে বীর হনুমান।
গাজনে যে বাবা আছেন, তাঁর চরণে প্রণাম।"

চালান গান

ভাঁড়াল আনবার জন্য শুঁড়িবাড়ী যাওয়া হয়। শুঁড়ি ধর্মঠাকুরের জন্য পচাই মদ তৈরী করে রাখে। ভাঁড়ে মদ নিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরে আসা হয়—

"ও শুঁড়ি ভাইয়ারে তোমার সফল জীবন
তোর ঘরে খেলা করে বাবা ধর্মনিরঞ্জন।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা কটুকে করিবে
পুজা পুত্র কেটে দিয়ো বলিদান হে।
আস্তি নামে ছিলেন গোঁসাঞী বাবা পুরুষের জনম।
ভাল তার পুত্র হন অনাদি ধরম
তোমার ধবল মাথা ধবল ছাতা ধবল মাথার কেশ
কাঞ্চনরূপে বাবা নবীন বয়েস।
এসো হনু বসো খাটে, তুমি বাটার তাম্বুল খাও
দেশের খবর এনে তুমি ধর্মকে জোগাও।"

তারপর মদ্যভাণ্ড ধর্মঠাকুরের গৃহের বাইরে স্থাপন করে বলতে থাকে—

"একেত ধর্মের ঘর দেখে লাগে বড় ভয়
কটুকে যোগাও ভাণ্ডার হে"

সন্ধ্যার সময় বাণামো, আগুনের ফুল খেলা, কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি, এ সমস্ত অনুষ্ঠান হয়। কোনো কোনো ভক্ত্যা জিহ্বা ফুঁড়ে মাথায় প্রদীপ নিয়ে বাবার ধামে হাজির হয় ও নাম ডাকে।

মাথায় প্রদীপ

ধর্মের গাজনে নিম্নলিখিত পাঁচালী গাওয়া হয়—

পাঁচালী

"চারিদিকে ভেলে দেখ বাবা, তোমার পূজার আয়োজন
পুষ্পের ভিতরে খেলা করে বাবা দেব নিরঞ্জন।
অনাথের অধিপতি জগতে হরিষে বাবা
হস্তপদ নাইরে বাবা নিরাকার প্রাণী
এসেছো কি-না এসেছো বাবা করি ভালাভালি।
ভর না আসিলে বাবা খাবে গালাগালি।
ব্রহ্মা বলেন মধু খেয়ে বাবা শিব ক্ষেপা হল
ছত্র কোলে করে বাবা নাচিতে লাগিল।"

এই ধর্মঠাকুরের কোন বলি বর্তমানে নাই। জয়দেব কেন্দুবিল্বের একজন মোহান্তের অধীনে থাকায় বলিদান বন্ধ হয়ে গেছে।

মনসা

ধর্মঠাকুরের দক্ষিণে মনসা আছেন।

গোঁসাই ও মা জানা-বুড়ি

গ্রামের নিমতলায় আছেন গোঁসাই। শনি মঙ্গলবার মালসা ভোগ দেওয়া হয়। মা জানা-বুড়ির একটি স্থান আছে। মাঘের ১লা একদিনের জন্য মেলা বসে এবং অনেক পাঁঠা বলি হয়। জানা-বুড়ির বেদীর কাছে মাটির ঘোড়া মানত করা হয়।

২৬। **মালাবেড়িয়া** (সাঁইথিয়া থানা): এই গ্রামের ধর্মঠাকুর দুই স্থানে অবস্থিত। একটি দেবাংশীদের বাড়ীর সন্নিকটে নিমগাছ তলায়। এঁর পূজা দেবাংশীরা নিজেরাই করে। অপরটি গ্রামের উত্তর দিকে হাড়িদের বাড়ীর নিকট ধর্মপুকুর নামক পুকুরের পাড়ে পাকা ঘরে অবস্থিত। এঁর পুজা করেন রায় উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ। উভয় স্থানে ঠাকুরের মালিক ঐ দেবাংশীরা। দুই স্থানে শিলাখণ্ড ও কাঠের ঘোড়ায় পুজা হয়। পাকা ঘরের বেদীতে পাঁচটি শিলাখণ্ড আছে। তিনটি গোলাকৃতি, একটি কূর্মাকৃতি, একটি বাঁশীর মত। নাম—**বুড়োরাজ, পৈঠদেব, মৎস্যরাজ, বেণুদেব ও কূর্মদেব**। ধর্মবেদীর কাছে একটি প্রস্তর স্তূপ আছে। দেয়াশীদের উপাধি দে (মণ্ডল) এবং দেবাংশী (রাজপুত)।

ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন নাম

মূল পুজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। রাজপুত, হাড়ি, মুচি প্রভৃতি জাতির লোক ভক্ত্যা হয়। সংখ্যা অনির্দিষ্ট। ফলভাঙা অনুষ্ঠান আছে। আগুন খেলা হয়। বাণ ফোঁড়া নেই। পুর্ণিমার দুদিন আগে থেকে ফলমূলাহারী থেকে ভক্ত্যারা স্নান না করে পুর্ণিমার আগের দিন বিকালবেলা ক্ষৌরকর্ম শেষ করে দলবদ্ধ ভাবে হাতে একটি করে পাটকাঠি নেয়। তারপর ছড়া গাইতে গাইতে ঢাক ঢোলের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে পুকুরঘাটে এসে উপস্থিত হয়—

ছড়া

"বেতো ধরমের পূজো রে ভাই, বেতো ধরমের পূজো
বাত সারিয়ে মোদের ধরম হয়ে গেল কুঁজো।
কত লোকের বাত সারালেন নিজের বেলা ছাই।
হয়ত নিজের ওষুধ রে ভাই খুঁজে পায় নাই।
মোদের কথায় বুড়ো ধরম রাগ কোর না,
বুড়ো বয়সে রেগে যেন চলে যেয়ো না।
বিশ্বাস নেই তোমায় ওগো স্ত্রীহীন ধর্মরাজ
স্ত্রীহীনদের অসাধ্য যে নাই কো এমন কাজ।"

রোগ আরোগ্য

(আষাঢ় মাসের প্রথম রবিবার এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের কাছে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বাতরোগীর সমাবেশ হয়। অন্যান্য রবিবারেও আসে। লোকসঙ্গীতটিতে এই বিষয়েরই প্রতিফলন।)

তালের গুঁড়ি জাগানো

এরপর দশ হাত লম্বা একটি তালগাছের গুঁড়িকে ধর্মঠাকুরের আরোহণের রথ মনে করে পুকুরের মধ্যে লক্ষ্য রেখে সকলে চীৎকার করতে থাকে, 'ঐ আসছেন, ঐ আসছেন' বলে। গুঁড়িটি কিন্তু যেখানকার সেখানেই থাকে। ভক্ত্যারা ঐ গুঁড়ির উপর বসে সমানে চীৎকার করে চলে। তারপর যখন 'এই এসেছে' বলে উঠে পড়ে গুঁড়িটি সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে। এরপর দোলাতে করে ধর্মঠাকুরকে মন্দিরে আনা হয়। পুজার দিন সকাল থেকে গাঁজার আসর বসে। দশটা, সাড়ে দশটা নাগাদ পুজা শেষ হয়।

মাঠ নাচানো

তারপর বলিদান এবং ভাঁড়াল আনা। অপরাহ্নে মদ্যমাংস সহযোগে ভুরিভোজন হয়। বিকালে ভক্ত্যারা মাথায় বারি নিয়ে নাচতে থাকে। একে বলে মাঠ

নাচানো। তৃতীয় দিনে বাণগোঁসাই-এর উপর শুয়ে একজন ভক্ত্যা অপর চার পাঁচজন কর্তৃক বাহিত হয়ে পুকুর ঘাটে আসে। আরোহীকে জলে নামিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর সকলে ফিরে এলে পুনরায় পূজা আরম্ভ হয়। পূর্বদিনের অনুষ্ঠানগুলিরই পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় শলাকাযুক্ত বাণগোঁসাই-এর উপর দুজন ভক্ত্যা শুয়ে পড়ে এবং বাহকেরা ধর্মঠাকুরের ঘট নিয়ে বিসর্জন দিতে চলে। **পুকুরের জলে আরোহীরা আধঘণ্টা ডুবে থাকে**। তারপর উপরে উঠে আসে এবং অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বাড়ী ফেরে।

আখ পেষণের শালে ঘোড়া

আখের শালে আখপেষণের সময় ধর্মের ঘোড়া নিয়ে পূজা হয়। যতদিন আখপেষণ চলে ততদিন ঐ ঘোড়াটিকে শালে রাখা হয়।

প্রবাদ

ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠার একটি প্রবাদ আছে—বর্ষণমুখর এক পরিশ্রান্ত দিবা-বসানে জনৈক শ্রান্ত কৃষক নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখে, চারিদিকে শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হচ্ছে। তারপর সে দেখে একজন জটাজুটধারী সৌম্যকান্তি সাধক গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তার শিয়রে এসে জলদগম্ভীর স্বরে বলছেন, "শুনতে পাচ্ছিস। আমি তোদের গ্রামের উত্তর সীমান্তে অপরিষ্কৃত পুকুরে ঈশান কোণে আছি। তুই আমাকে তুলে নিয়ে এসে সেবা কর। আমি তোর হাতে পূজা পেতে চাই।" এই বলেই তিনি অদৃশ্য হলেন। কৃষক পরের দিন এই কথা সকলকে জানিয়ে ধর্মঠাকুরকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করে।

অন্যান্য

ধর্মের কাছাকাছি ষষ্ঠী আছেন। কিছু দূরে বেলতলায় আছেন এক ব্রহ্মচারী। প্রবাদ, অনেকে রাত্রে তাঁকে দেখতে পান। এঁর নিকট পূজা ও মানসিক দিলে মৃগীরোগ আরোগ্য লাভ করে বলে লোকবিশ্বাস। গ্রামে তাছাড়া আছে ব্রাহ্মণদের পূজিত মনসা (ভাদ্রে পূজা)। মণ্ডলদের শিব (ফাল্গুন), ডোমদের ক্ষেত্রপাল (১লা মাঘ), সাধারণের গ্রামদৈত্য (১লা মাঘ)। এখানে শূকর বলি হয়।

২৭। **মল্লিকপুর** : চন্দ্রভাগা নদীর পূর্বপাড়ে সিউড়ী থানায় এই গ্রাম। নদীর তীরেই বটবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন ধর্মঠাকুর। শিব এবং কালীমন্দির। কালীমাতার নাম ঝলকরাণী। কার্তিক অমাবস্যায় পূজা হয়। কালীর সামনে বটগাছের শিকড় ও ঝুরি ঢাকা ছোট ভাঙ্গা শিবালয়ে শিব ও ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তি সিংহাসনের উপর স্থাপিত। ধর্মশিলা দুটি। কোন নাম পাওয়া যায় না। দেয়াশী ভাণ্ডারী। পুজারী মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। দেয়াশী ভাণ্ডারী বংশকে গ্রামের সিংহ বংশীয়দের প্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব থেকে এই ধর্মরাজ পুজার ব্যয়ভার বহন করতে হয়। তাঁহাদের সম্মানার্থে আজিও ভক্তবৃন্দের উপবাসভঙ্গ হয় সিংহ বংশীয়দের আয়োজিত অনাড়ম্বর ফলমূলাদি পরিবেশনে সিংহ বাড়ীর দুর্গামন্দির প্রাঙ্গনে। ইহা 'ভক্তভোজন' নামে প্রসিদ্ধ। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা। সামনে ছাগ বলি হয়। ভর নামাও আছে। প্রথম দিন, ঠাকুরকে বের করে স্নান করানো হয়। একে মুক্তিস্নান বলে। তারপর গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়। একে বলে গ্রামবেড়া। সকল সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা হয়ে থাকে। ঐদিন তাদের উত্তরীয় নেওয়ারও দিন।

দ্বিতীয় দিন হোম, পূজা এবং বলিদান। এই দিনকে বাণামো বলে। একটি মাটির

ঘোড়া ও ভাঁড়াল নিয়ে ভক্ত্যারা গোটা গ্রাম ঘোরে। রাত্রে মন্দিরে আতপ, কলা, মণ্ডা বাতাসা, আম ইত্যাদি সহযোগে ভোগ দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিন, ভক্ত্যারা ঘোড়া নিয়ে স্নান করে আসে। একেও বাণামো বলে। পূর্বে জিহ্বাবাণ, ধূপবাণ, অগ্নিবাণ ইত্যাদি দেখান হত। এখন নেই। আগে নিকটবর্তী গ্রাম গজালপুর থেকে চড়ক ও ভাঁড়ালের দিন ধর্মঠাকুর আসতেন। আজকাল আসেন না।

চতুর্থ দিন, গ্রামের বাড়ী বাড়ী বাণেশ্বর নিয়ে ঘোরানোর রীতি। গৃহস্থরা ভক্ত্যাদের পায়ে জল ও হাতে পয়সা দেয়।

ধর্মঠাকুর সন্নিকটবর্তী শিবঠাকুরের পূজা ও চড়ক হয় শিবচতুর্দশীর দিন। গ্রামের উত্তরে মাঠের মধ্যে ঝোঁপের মধ্যে আছেন বনকুমারী। বাউরীরা ১লা মাঘ পূজা করে মুরগী বলি দেয়। ডোমদের পুজিত গোঁসাইও আছে। ওখানেও ১লা মাঘ পূজা ও মোরগ বলি হয়। গ্রামের দক্ষিণে মাঠের মধ্যে ব্রহ্মচারী আছেন পুরাতন পুষ্করিণীর পাড়ে। সদ্‌গোপ (মণ্ডল উপাধিধারী) গণ এঁর সেবাইত। ১লা মাঘ পূজা হয়ে থাকে এঁর। বলি হয় না। সর্বজাতির প্রায় হাজার লোক ইঁহার প্রসাদ লাভে ধন্য হয়।

২৮। **মুড়োমাঠ** : সিউড়ী থানায় দুবরাজপুর রাস্তার প্রায় পঞ্চম মাইলে এই গ্রাম। গোটা গ্রামটিই জঙ্গলাকীর্ণ। প্রধানতঃ তপশীল সম্প্রদায়েরই বাস। ধর্মঠাকুর আছেন জরাজীর্ণ যুগল শিবমন্দিরের একটিতে। পাশাপাশি আছে তিনটি শিবলিঙ্গ, একটি লিঙ্গসদৃশ শিলাখণ্ড, গোপাল শালগ্রাম এবং ক্ষুদ্রাকৃতি স্ফটিকের শিবলিঙ্গ। নাম স্ফটিকেশ্বর শিব। সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীও আছেন। মনসাদেবীর অস্পষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট একটি সিংহাসন এবং পৃথক সিংহাসনে ধর্মরাজ। আকৃতি কূর্মসদৃশ। নূতনত্বের মধ্যে এই যে কূর্মের মাথায় হাতির দাঁত জাতীয় বস্তু দিয়ে নির্মিত একটি ক্ষুদ্র শ্বেত শৃঙ্গ। এই মন্দির যুগলের একটু দক্ষিণে ঘন গাছপালার মধ্যে দুটি ভগ্নপ্রায় শিবালয়। সেখানে ৬টি শিবলিঙ্গ আছে। ধর্মপূজার সময় ধর্মরাজকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মন্দিরের উত্তরে ধর্মরাজের সাবেক আটন ও একটি নাটশালার মত আছে। নিকটেই তেঁতুলতলায় আছেন ভৈরব। ঐ ভৈরবকেও ধর্মপূজার তিন দিন ঐ আটনে নিয়ে যাওয়া হয়। ধর্মের সঙ্গেই তিনি পুজা পান এবং একই সঙ্গে বলি হয়। উত্তরীয় মোচনের দিন ভৈরবকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ধর্মরাজের দেয়াশী বাগদী। পুরোহিত চক্রবর্তী। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে তিনি নিত্য সেবা করেন, "ধুং ধাং ধর্মরাজায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে। মূল পূজা হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়। উত্তরীয় নেওয়ার পর স্ফটিকেশ্বর শিবের নিকট থেকে দক্ষিণে ভগ্ন শিবালয়গুলির নিকট ধর্মঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভক্ত্যাদের ভর হয়। সিংহাসন মাথায় নিয়ে দেয়াশী ধর্মরাজের সাবেক আটনে আসেন। ঐদিন ফলভাঙ্গা, আগুনের ফুলখেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাণেশ্বরকে স্নান করানোকে বলে দাহুরীঘাটা। পরদিন পূজা ও হোম হয়। বলি হয় সামনে। তারপর ভাঁড়াল ভরা হয়। কিছু দূরে একটা ভাঁড়াল ঘর আছে। নিকটবর্তী গ্রাম মল্লিকপুর থেকে মদ আনা হয়। দুপুরবেলা ভাঁড়াল নড়ানো উৎসব হয়। তারা শ্লোক বলে। শ্লোকটি

সিঙ্গুর গ্রামের অনুরূপ। দিগ্‌বন্দনা করা হয় নানাদিকের ধর্মরাজদের ডাক দিয়ে। সন্ধ্যাবেলা আবার বাণেশ্বরকে অন্য একটি পুকুরে স্নান করানো হয়। একে বলে বাণামো। দু-ঘণ্টা ধরে নাচ ও নানা উৎসব হয় এবং সং হয়। ফিরে আসার পর দোলনসেবা হয়। পরের দিন চড়ক। ধর্মঠাকুরকে নিকটস্থ পানুড়ে গ্রামের ডাঙ্গায় নিয়ে যেতে হয়। সেখানকার ধর্মরাজ এসে মিলিত হন। নানারকম নৃত্যগীত ও উৎসব হয়। চড়কের পরদিন বাণেশ্বরকে নিয়ে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঘোরা হয়। বিকালবেলা সকল ভক্ত্যা ও গ্রামের ছেলেদের হাতে ভিজা চাল ও গুড় দেওয়া হয়। তারপর হয় উত্তরীয় খোলা।

গ্রামে অরণ্য ও চাপড়া ষষ্ঠী আছেন। বনের ধারে বনকুমারীর পূজা করে বাউরী ও বাগদীরা ১লা মাঘ। মনসা পূজা হয় চৈত্র মাসে।

গ্রামে আখের শালে ধর্মরাজের লিঙ্গসদৃশ মূর্তি তৈরী করে পূজা ও গুড় ঢালা হয়।

২৯। **কোমা**: কোমা গ্রাম সিউড়ী থানায় অবস্থিত। এখানকার ধর্মঠাকুর বেশ বিখ্যাত। দেয়াশীদের ধারণা শঙ্করাচার্য এই পূজার প্রতিষ্ঠা করে যান। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গ্রামের উত্তর-পূর্বদিকে একটি মাটির ঘরে (টিনের ছাদন) ধর্মরাজ আছেন। সামনে একটি চারচালা। বেদীর উপর অনেকগুলি শিলাখণ্ড। দু'পাশে দুটি কাঠের ঘোড়া। বেদীর দুপাশে আরও অনেক ছোট বড় কাঠের ঘোড়া। মাটির ঘোড়াও প্রচুর। বাঁ পাশে দেড় ফুট উঁচু একটি পাথরের হনুমান মূর্তি। নীচের দিকে কিছুটা ভেঙ্গে গেলেও গোটা মূর্তিটাই স্পষ্ট আছে। হনুমানটি যেন কিছু খাচ্ছে। মূর্তিটি প্রাচীন বলেই মনে হয়।

দেয়াশী বাগদী। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। জমিদারী বিলোপ হওয়ায় এ পূজা শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে।

ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যাবেলা মন্দির থেকে ছোট বড় নানারকম কাঠের ও মাটির ঘোড়া নিয়ে নিকটবর্তী (উঃ) চন্দ্রভাগা নদীগর্ভে যায় ভক্ত্যারা। এইখানেই দেবতার সাবেক আটন ছিল। নিকটে একটি জামের গাছ আছে। সেখানে ভক্ত্যারা শুয়ে পড়ে "বাবা ধর্মনিরঞ্জন, রাজরাজেশ্বর" বলে ডাক দিতে থাকে। তারপর ঘোড়াগুলিকে কাঁধে নিয়ে নাচে। মন্দিরে ফিরে এসে বাণেশ্বরকে মাথায় নিয়ে দেয়াশী দুর্গাতলার সন্নিকটে একটি ঢিবির উপর বাঁধানো স্থান আছে সেখানে যান। ভক্ত্যারা ঘোড়া কাঁধে নাচতে থাকে। এইটিই চড়ক। এরপর সবাই মন্দিরে ফিরে আসে।

চতুর্দশীর দিন বাণেশ্বর ও ধর্মরাজকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা তেঁতুলবনা পুকুরে বাণেশ্বরের পূজা ও স্নান করানো হয়। মশাল জ্বালানো হয়। পেটের দুপাশে বাণ ফুঁড়ে গলার উত্তরীয় দিয়ে বাণজোড়া বাঁধা হয়। তারপর ভক্ত্যারা আসে জলেশ্বর শিবমন্দিরে। পর্যাপ্ত পরিমাণে তীক্ষ্ণধার শলাকা খচিত বাণেশ্বরের উপর দেয়াশী শুয়ে শিবের নিকটে আসেন। এর পর বাণবিদ্ধ দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বাণগুলি থেকে উত্তরীয়ের বাঁধন খুলে ফেলে এবং বাণের আগায় সরষের তেল ভিজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। একজন কর্মকার মালসাতে ধূপ-

ধুনা নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে ছিটিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানের পর বাণেশ্বরকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। ঐদিন রাত্রি বারোটার পর ধর্মরাজকে কাঁধে নিয়ে ভক্ত্যারা ঢাক ঢোল সহকারে গাংটে গ্রামে যান। সেখানকার ঢাকের সঙ্গে কোমার ঢাকের বাদ্য প্রতিযোগিতা হয়। তারপর কোমার ধর্মরাজের সঙ্গে গাংটের ধর্মরাজের বিবাহ হয়। যেভাবে কন্যা সম্প্রদান করা হয় ঠিক সেই ভাবেই। কোমা পক্ষই বর। (এটি নিছক স্থানীয় কাণ্ড। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে নীলাবতীর বিবাহ হওয়ারই রীতি।) নিকটবর্তী গ্রামসমূহ ধইটা, খন্যা, গাংটে, জামুড়ি, কুড়মিঠা ও কোমা এই কয়খানা গ্রামের ভক্ত্যারা ফল ভাঙ্গতে যায়।

ঐদিন শেষরাত্রে ধর্মরাজকে তেঁতুলবনা ঘাটে নিয়ে গিয়ে পূর্বপ্রথা অনুসারে কাঁচা দুধে স্নান করানো হয়। ঐ দুধ মুক্ত ভাঁড়ালে পড়ে। ঐ স্থানে ধর্মরাজের গন্ধাধিবাস হয়। তারপর ফিরে আসে ভক্ত্যারা।

পূর্ণিমার দিন কোমার মদের দোকানে গাংটে, খন্না, ধইটে ও কোমার ভক্ত্যারা দুপুরবেলা ভাঁড়াল ভরে। ওদিকে ধর্ম মন্দিরের পূজা চলতে থাকে। পাঁঠা উৎসর্গ হয় (তখনও বলি হয় না)। অন্য গ্রামের ভক্ত্যারা ভাঁড়াল নিয়ে ফিরে যায়। কোমার ভক্ত্যারা ভাঁড়াল নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ও এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ধূপের ধোঁয়া ও ঢাকের শব্দে তাদের আবেশ হতে থাকে। ওরা ধর্মতলায় ফিরে এলে বলিদান হয়। বলি সামনে হয় না একটু পাশে হয়। এরপর হোম ও তিলক ধারণ। সন্ধ্যায় আগুনের ফুলখেলা হয়।

পূর্ণিমার পরদিন ছোট পুকুরে গিয়ে ভক্ত্যারা উত্তরীয় খুলে ফেলে। তারপর তেল হলুদ মেখে স্নানান্তে মদ খেতে সুরু করে।

এই ধর্মঠাকুরের কাছে আমাশয় ও নানা রোগের ঔষধাদি পাওয়া যায়।

বাঁশতলায় ষষ্ঠী আছেন। মন দুই ওজনের একটি লম্বা শিলাখণ্ডে হস্তিনী ও ঘোটকের মিথুন দৃশ্য খোদাই করা আছে। নীচে হস্তিনী, উপরে মিথুনরত ঘোটক। খোদাইকার্য অর্বাচীন। এইটিই ষষ্ঠী।

ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশীতে নদীর পাড়ে বারোয়ারী ইন্দ্রপূজা হয়ে থাকে।

মনসা দেবীর পূজা হয় চৈত্র ও আষাঢ়ে। শ্মশানে আছেন রক্ষাকালী। একটি বেদীর উপর মাঘী অমাবস্যায় পূজা হয়। আদিড়া পুকুরের পাড়ে আছেন ব্রহ্মচারী। পূজা রহিত।

৩০। **তাঁতিপাড়া** : রাজনগর থানায় এই গ্রামের দক্ষিণে হাটতলায় উত্তরমুখী ধর্মরাজের মন্দির। কাঠের সিংহাসনে তিনটি সিঁন্দুরলিপ্ত শিলাখণ্ড। ডান পাশে সপ্তপুরের মৃত্তিকা নির্মিত একাধিক সর্পবেষ্টিত মনসা। বাম পাশে আর একটি প্রস্তরখণ্ড। নাম গোয়ালবুড়ী। ইনিও একজন মনসা। ধর্মঠাকুরের সঙ্গেই এঁদের পূজা হয়। মন্দিরের ভিতর আর একপাশে অন্য একটি কাঠের সিংহাসনে অনুরূপ নাগফণীবেষ্টিত মনসা রয়েছেন। ধর্মরাজের শিলা মূর্তিগুলির মাঝখানে একটি কৌটা আছে। সেই কৌটাটি, ধর্মশিলার গায়ে যে সোনার চিক বসানো ছিল, সেগুলি গলিয়ে তৈরী করা হয়েছে। কৌটার ভিতর ছোট মারবেলের আকৃতির স্ফটিক বা হীরক জাতীয় স্বচ্ছ একটি বস্তু আছে। যে রকম ফুল বা পাতা দেওয়া

হোক না কেন, সেই রঙে মিশে এক হয়ে যায়। অনেক সময় নির্মাল্যের সঙ্গে সেটি চলে যায়। পরে আবার স্বপ্নাদেশ হলে ফিরিয়ে আনা হয়। কথিত হয়, এই বস্তুটিই আসল ধর্মঠাকুর, বাকীগুলি অনুচর। (অনুরূপ বস্তু আরও কয়েকটি গ্রামের ধর্মবেদীতে আছে) ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রবল লোকবিশ্বাস এই যে, সন্ধ্যাবেলা একবার মাত্র পলতে ভিজিয়ে জ্বালিয়ে দিলে সারারাত সে প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলতে থাকে।

দেয়াশী নির্দিষ্ট নাই। বাগদী, মাল, কৈবর্ত এরাই ভক্ত্যা হয়, আবার ব্রাহ্মণেও হয়। পূজা বারোয়ারী। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পূজা। পূর্ণিমার আগে অষ্টমীর দিন ঘটস্থাপনা দুবেলা ঢাক বাজতে থাকে। ত্রয়োদশীর দিন বাণেশ্বরসহ স্নানের শোভাযাত্রা। একে বাণামো বলে। এই দিনটির নাম মুদভাঙ্গা। (অর্থ আশ্বিন সংক্রান্তিতে গাড়সে ষষ্ঠীর দিন সাপ-ব্যাঙরা শীতে ঘুমের জন্য গর্তে ঢুকে পড়ে। এই মুদভাঙ্গা দিনে তারা বেরিয়ে পড়ে বলে জনশ্রুতি)।

চতুর্দশীর দিন আবার বাণামো হয়। ভক্ত্যারা ঢাক, ঢোলসহ নৃত্য করতে করতে বাণেশ্বরকে স্নান করিয়ে আনে। ঐদিন থেকে 'লপেটি সঙ্' সুরু হয়। রাত্রে মনসাদেবী গোয়ালবুড়ীর পুর্ব আটন সোনারপাড়ায় যান। কৈবর্তপাড়ায় আর একজন মনসা আছেন, তাঁকেও আনা হয়। এক মাইল দক্ষিণে লোকপুরে একটি পুকুরের পাড়ে শ্যাওড়া ও খেজুর গাছের গোড়া থেকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে একটি মাটির ঘোড়া কুড়িয়ে আনা হয়। মাঠের মাঝখানে অপর একজন আদিড়ে ধর্মরাজ আছেন। তাঁকেও আমন্ত্রণ দিতে হয়। এইভাবে রাত্রি ১২টা ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানাদি চলতে থাকে। গ্রামের দঃ পশ্চিম প্রান্তে গিরিধরম বলে একটি ধর্মস্থান আছে। অনেক অলৌকিক ঘটনা ও অদৃশ্য ঘোড়ার খুরের শব্দ সেখানে শোনা যায় বলে লোকবিশ্বাস বর্তমান।

পুজার দিন বেলা নয়টার সময় বাণেশ্বরসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ। একে গ্রামবেড়া বলে। তারপর বড় কালীর আস্তানায় গিয়ে বিভিন্ন গ্রামের ধর্মঠাকুরকে নাম ধরে ডাকা সুরু হয়। একে বলে গাজন বন্দন (বন্ধন)। তারপর কালীর থান থেকে একটি টাকা পাওয়া যায়। পরিবর্তে ধর্মরাজের স্থান থেকে কালীকে ঝাঁটা, তালাই (তালপাতার পাটি), কলা ইত্যাদি পাঠাতে হয়। পরে এক মালসা পায়েসও পাঠাতে হয়। দুপুরে পুজা সুরু হয়। বহু ছাগ ও মেষ বলি পড়ে। বলির পরে ভাঁড়াল আনতে যায়। রাত্রে দোলনসেবা, ফুলখেলা ও জিহ্বাবাণ হয়। তারপর আবার বাণেশ্বরকে নিয়ে বের করা হয়। এ সময় দা-বাণ চলতে থাকে। ঘাটে পৌছে ঘাট বাণামো হয়ে থাকে। এ সময় প্রচুর সঙ্ বের হয়।

পুজার পরের দিন সকালে সাধারণভাবে পূজা হয়। সঙ্ চলে ভয়ানকভাবে। বৈকালে চড়ক। আগে প্রচণ্ড ধূমধাম হত। এখন পৃষ্ঠবাণ উঠে গিয়ে বাবুই খেলা হয়। অর্থাৎ বাবুই-এর গুচ্ছ মোটা করে পাকিয়ে ভক্ত্যাদের চাবুক মারা হয়। সারারাত্রি সঙ্ চলতে থাকে। পরের দিন আবার পুজা হয়। দেবাংশী ও ভক্ত্যারা দুপুরবেলা পুনরায় বাণেশ্বরসহ বের হন। ভক্ত্যাদের তেল-হলুদ মেখে উত্তরীয়গুলি খুলে বাণেশ্বরের শলাকায় পরিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে হয়।

ধর্মমন্দির সংলগ্ন একটি মন্দিরে বটুকভৈরব আছেন। ধর্মরাজের সঙ্গেই পূজা। গ্রামে তাছাড়া আছেন রক্ষাকালী, গোঁসাই, ব্রহ্মচারী। চৈত্রমাসে রক্ষাকালী পূজার আগে দিনের ব্রহ্মাপূজা এবং মহাবীরপূজা হয়ে থাকে। ধানমাঠে গাড়সে ষষ্ঠী আছেন।

৩১। **ভবানীপুর :** রাজনগর থানার এই গ্রামে বটবৃক্ষতলে ধর্মঠাকুর অবস্থান করছেন। স্বাভাবিক নুড়ি পথের তিন চারটি। নাম, বুড়োরাজ, সেঙ্গুরাজ ও বিধায়করাজ। ধর্মরাজের সঙ্গেই আছেন শীতলা, কালী, মনসা, শিব ও ভৈরব। দেয়াশী পণ্ডিত উপাধিধারী ডোম। পুরোহিত ব্রাহ্মণ।

মূল পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। পূর্ণিমার আগের দিন ভক্ত্যারা ক্ষৌরকর্মের পর স্নানান্তে নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। রাত্রি বাদ্যভাণ্ডসহ নাচতে নাচতে ধর্মরাজকে ডাক দিয়ে গ্রামান্তরে পচাই মদের দোকানে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি মদের জালার মধ্যে পূজা করে ফিরে আসে। সে রাত্রে ফলজল আহার করে শুদ্ধভাবে নিশাযাপন করে। প্রাতে পুরোহিত স্নানান্তে শিলাখণ্ড কয়টিকে সিংহাসনে বিশেষ পূজা বেদীতে স্থাপন করে বিধিমত উপচার দ্বারা পূজা করেন। পূজা সমাপনান্তে সাধারণ কুশণ্ডিকা সহকারে হোম এবং নারায়ণ, শিব, দুর্গা ও ধর্মরাজদের নামে ঘৃতযুক্ত করবী, বিল্বপত্র প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হয়। ওদিকে ভক্ত্যারা বাণেশ্বরকে নিয়ে পুকুরে স্নান করাতে যায়। স্নানের পর ঐখানেই পূজা করে গান গাইতে গাইতে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মন্দিরে এসে সকলে মন্দিরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়। ভক্ত্যাদের জয়গানের সঙ্গে সঙ্গে ছাগ বলিদান সমাধা হয়। তারপর ভক্ত্যারা নিকটস্থ ভৈরবের কাছে গিয়ে সেখানে গতকালের পূজা করা মদের জালাটি নিয়ে এসে পুনরায় পূজা ও ছোট ছোট ভাঁড়ের মধ্যে ঐ মদ ভাগ করে প্রত্যেক ভক্ত্যাকে দেওয়া হয়। ভক্ত্যারা ঐ ভাঁড় মাথায় নিয়ে ধর্মরাজের জয়গান করতে করতে মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ঐ মদ্য ধর্মরাজকে নিবেদন করে। এর পর পূর্ণাহুতি, যজ্ঞ, তিলক ও শান্তির জল। চিঁড়ের নৈবেদ্য ভোগ দিয়ে বিতরণ করা হয়। রাত্রে ভক্ত্যারা আগুনের ফুল খেলে।

পূজার তৃতীয় দিনে, গ্রাম থেকে কিছুদূরে একটি শুকনা লম্বা শালের গাছ পোঁতা আছে (চড়ক গাছ), সেখানে বিধায়ক রাজকে নিয়ে যায় ভক্ত্যারা। দেবতাকে সেই চড়ক গাছের নীচে স্থাপন করে পূজা দেয়। ভক্ত্যারা সেই চড়ক গাছকে প্রদক্ষিণ করে "বিধায়ক রাজ হে" বলে তারস্বরে ডাকতে থাকে। পূর্বদিনে বাণেশ্বরকে স্নান করাতে নিয়ে যাবার সময় মূল দেয়াশী ভক্ত্যাদের প্রত্যেকের গলায় একটি করে উত্তরীয় পরিয়ে দেয়—এইগুলি এই সময় খুলে নেওয়া হয়। তারপর স্নানান্তে সকলে একত্র হয়ে নাচতে নাচতে গ্রাম পরিভ্রমণান্তে মন্দিরে ফিরে আসে এবং প্রণাম করে বাড়ী ফেরে। এই উপলক্ষে একটি মেলাও বসে।

চতুর্থ দিনে বাণেশ্বরকে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী নিয়ে গিয়ে চাল, ডাল, পয়সা আদায় করা হয় এবং রাত্রে ধরমযজ্ঞ করা হয় (অর্থাৎ সকলে খিঁচুড়ী ভোজন করে)। ধর্মরাজের গাজনে এই শ্লোকটি বলা হয়—"বল শিবৈঃ বল শিবৈঃ, বল শিবৈঃ হে, ও বাবা ধর্মরাজ হে।"

ধর্মরাজের সন্নিকটে শীতলা, মনসা ও কালী আছেন। চৈত্রমাসে "নুনপালা" দিবসে

(এদিন নুন খাওয়া বারণ) পুজা হয়। শিবের পুজা হয় শিবরাত্রিতে। তাছাড়া চৈত্রমাসে মড়কচণ্ডীরও পুজা হয়ে থাকে। বাগ্দীরা ১লা মাঘ মুরগী বলিসহ চোর-দানার পুজা দেয়। ধরম পণ্ডিতরাও ঐদিন ছাগ-মুরগী বলিদানসহ কুদরো বুড়ীর পুজা করে।

৩২। **সিঙ্গুর** : সিউড়ি থানায় এই গ্রামের অবস্থান। একটি বটবৃক্ষের নীচে পাকা মঞ্চে ধর্মঠাকুর আছেন। দেয়াশী ছিলেন কর্মকার সম্প্রদায়ের। এখন নেই। বর্তমান দেয়াশী মণ্ডল। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। মূল পুজা হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়।

পুজা আরম্ভের প্রথম দিন দেয়াশী এবং ভক্ত্যারা হবিষ্যান্ন ও ক্ষৌরকর্ম করেন। দ্বিতীয় দিন দেয়াশী ও ভক্ত্যারা গলায় উত্তরীয় ধারণ করেন। তারপর দেয়াশী নূতন টোকায় ধর্মরাজের শিলামূর্তি (শিলাখণ্ড) গুলিকে মাথায় নিয়ে ভক্ত্যাদের সঙ্গে নিকটস্থ দীঘির ঘাটে উপস্থিত হন। মূর্তিগুলিকে স্নান করানো হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম মাণিকধোয়া। দেয়াশী ও ভক্ত্যারাও স্নান করে। ঘাটে পুরোহিত ধর্মরাজের ধ্যান করে পঞ্চোপচারে পুজা করেন। পরে দেয়াশী ধর্মরাজের দোহাই দিতে থকেন। দেয়াশী একটি শ্লোক আওড়ায়—

"ধবল ঘাট, ধবলপাট, ধবল সিংহাসন
তাতে বসি বিরাজ করেন বাবা ধর্মনিরঞ্জন
হাট, ঘাট, লাঠি বন্দন,
ডাইনে দামোদর বন্দন,
বামে বীর হনুমান,
দক্ষিণে যে সিজেকডডাং-এ বাবা
ধর্ম নিরঞ্জন আছেন তাঁর চরণে প্রণাম।"

তখন ভক্ত্যারা বলেন, বল বাবা ধর্মনিরঞ্জন। দেয়াশী এইভাবে পাঁচালী বলে গ্রামের উত্তরে, দক্ষিণে, পুর্বে, পশ্চিমে চতুর্দিকে যেখানে যেখানে ধর্মরাজ আছেন তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম বলতে থাকেন। এরপর ধর্মরাজ যে পাত্রে থাকেন, সেই পাত্রটি দেয়াশী মাথায় নিয়ে শোভাযাত্রা সহ ধর্মরাজের ধামে উপস্থিত হন এবং ধর্মরাজকে রক্ষা করেন। ঐদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বাদ্যভাণ্ড সহ ফল ভাঙ্গতে যান।

পরদিন মূল পুজা ৯।১০ টার সময় সুরু হয়। ঘটস্থাপন, গণেশবন্দনা, বিষ্ণু পুজা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, গণেশাদি পঞ্চদেবতার পুজা হয়। তারপর ধর্মঠাকুরের ধ্যান করে দশোপচারে পুজা, ভোগ, হোম, ছাগ, মেষ ইত্যাদি বলি হয়। এরপর দেয়াশী ও ভক্ত্যারা "ভাঁড়াল ভরা" এবং "ভাঁড়াল নড়ানো" অনুষ্ঠানে ব্রতী হন। সংলগ্ন অমৃতপুর গ্রামে "পাথুরের বুড়ো ধর্মরাজ" আছেন। ঐ ধামের নিকট ভাঁড়াল ভর্তি করবার এবং ভাঁড়াল নড়াবার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানে সিঙ্গুরের দীঘি মুড়োর ধর্মরাজ, অমৃতপুরের পাথুরের বুড়ো ধর্মরাজ এবং অমৃতপুরের অপর এক শ্যাম রায় নামে ধর্মরাজের দেয়াশী ও ভক্ত্যাবৃন্দ হাজির হন। এই জায়গাটি পরিস্কার করে আলপনা দেওয়া হয়। আলপনার উপর পিটুলী গোলা মাখানো ছোট বড় মাটির নূতন ভাঁড়গুলি রাখা হয়। পরে ভাঁড়গুলি দুধ, মদ, জল ইত্যাদি দ্বারা পুর্ণ করা

হয়। তারপর পরিপূর্ণ ভাণ্ডগুলিকে মাঝখানে রেখে দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বৃত্তাকারে বেড় করে দাঁড়ায়। তখন দেয়াশী পূর্বোক্ত শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করে পশ্চিমদিকে জামথলির ধর্মরাজ, দক্ষিণে সিজেকড্ডাং-এর ধর্মরাজ, উত্তরের মৌলপুরের শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে থাকেন। পরে তারা একপায়ে ভর দিয়ে গানবাদ্য দিয়ে বৃত্তাকারে নাচতে থাকে, তারপর নিজ নিজ ভাঁড়াল মাথায় তুলে দাঁড়ায়। তাদের নাকের সামনে পর্যাপ্ত ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয়। তুমুল ঢাক বাজে। প্রত্যেকের আবেশ না হওয়া পর্যন্ত বাজনা ও ধূপ দেওয়া চলতে থাকে। সকলের আবেশ হয়ে গেলে ধর্মরাজের নিকট ভাঁড়াল রেখে আসে।

ঐদিন সন্ধ্যাবেলা বাণগোঁসাইকে কাঁধে নিয়ে দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বাদ্যভাণ্ড ও ধূপধুনা সহযোগে দীঘির ঘাটে উপস্থিত হয়ে বাণগোঁসাইকে স্নান করিয়ে পূজা দেয়। একে বাণামো বলা হয়। পূর্বোক্ত পাঁচালী পুনরায় আবৃত্তি করা হয়। পরে বাণগোঁসাইকে কাঁধে নিয়ে ধর্ম-রাজের ধামে ফিরে আসে। তারপর দেয়াশীর মাথার উপর ভোগ রান্না করা হয়। ভোগের পর ভক্ত্যারা জলগ্রহণ করে।

পূজার চতুর্থ দিন সকাল থেকে দেয়াশী বাণেশ্বরকে কাঁধে নিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহকারে ভক্ত্যাদের সঙ্গে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী যান। এই সময় ভক্ত্যাদের হাতে বেতের ছড়ি থাকে। গৃহস্থরা বাণেশ্বরকে তেল সিঁদুর দিয়ে ভক্ত্যাদের ভোজন করান বা পয়সা দেন। ঐ দিন সন্ধ্যা-বেলায় ধর্মরাজ ও তাঁর বাহন দুই চারিটি মাটির ঘোড়া একটি দোলায় করে নিয়ে দেয়াশী ও ভক্ত্যারা প্রচণ্ড উল্লাসের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রামের পশ্চিমাংশে চড়ক দেওয়ার জন্য যে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। যাওয়ার সময় তারা গালবাদ্য বাজাতে থাকে। চড়ক দেওয়ার জায়গার নিকটেই আছেন ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুর। চড়কের জায়গাটিকে বেষ্টন করে দেয়াশী ও ভক্ত্যারা ধর্মরাজকে নিয়ে এক পায়ে ভর দিয়ে গালবাদ্য বাজিয়ে নাচতে থাকে। এসময় অনেকে সুরা পান করে। অনেকেই সং দেখায়। চড়ক দেওয়ার পর দেয়াশী ও ভক্ত্যারা ধর্মরাজকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে অন্নাহার করে।

পঞ্চম দিন বেলা ৯।১০ টার সময় দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বাদ্যভাণ্ডসহ বাণেশ্বরকে কাঁধে নিয়ে আবার পুকুরঘাটে যায়। তারা সেদিন তেল, হলুদ মেখে স্নান করে। গলার উত্তরীয়-গুলি খুলে বাণেশ্বরকে দুটি লৌহশলাকায় জড়িয়ে রাখে। পরে দেয়াশী ও ভক্ত্যারা বাণ-গোঁসাইকে এক বৎসরের মত একটি শিবালয়ে রেখে দেয়। এরপর দেয়াশী ও ভক্ত্যারা সেবাইতের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করে।

এই ধর্মপূজায় যে কোন সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা হতে পারে। স্ত্রীলোকও থাকে তবে তারা পূজার পূর্বদিন বার বা হবিষ্যান্ন করে। পূজার দিন সন্ধ্যায় ভোগ রান্না না হওয়া পর্যন্ত উপবাস করে থাকে। ধর্মতলায় ছাগ ও মেষ বলি হয়।

ধানমাঠে আছেন গাড়সে ষষ্ঠী। আশ্বিন সংক্রান্তি (ডাক সংক্রান্তি)-তে পূজা হয়। ঐদিন ভোরে অনেকেই ধানে ডাক দেন।

৬৩। **শুক্রাক্ষিপুর** (সাঁওতাল পরগণা): কুণ্ডহিত থানায় এই গ্রাম প্রাচীন বীর-

ভূমির অন্তর্গত ছিল। গ্রামের মধ্যে পাকা ঘরে ধর্মঠাকুরের ৫টি শিলাখণ্ড। আকৃতি নানা-রকম। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। দেয়াশী গোপ সম্প্রদায়ের। ধর্মঠাকুরের উদ্ভব সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে—একটি গড়িয়া খনন করবার সময় একজন মজুর দেখতে পায় ঐ পাঁচটি সিঁদুর রঞ্জিত শিলাখণ্ডকে। গ্রামের পাঁচজন এসে হাজির হয়। সেই গড়িয়ার পাড়ে একটি মরা কদম গাছ ছিল। সকলেই বলে যে গাছটি যদি জীবিত হয়ে ওঠে তাহলে আমরা ঐ শিলাগুলিকে ধর্মরাজ বলে প্রতিষ্ঠা করব। পরদিন সকালে নাকি গাছটি জীবিত হয়ে ওঠে। ফলে ধর্মরাজ পুজার প্রবর্তন হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় মূল পূজা হয়। পূজার তিনদিন আগে পুকুর থেকে বারি আনা হয়। প্রথম দিন একজন ভক্ত্যা হয়, পরদিন দুইজন, তৃতীয় দিন প্রায় ৩৫।৩৬ জন ভক্ত্যা হয় সকল সম্প্রদায়ের। সেদিন ভক্ত্যারা ঠাকুরের স্নানজল গ্রহণান্তে ফলাহার করে কাটায়।

পূর্ণিমার আগের দিন ভক্ত্যারা উপবাস দিয়ে বিকাল বেলা বিজারী নামে পুকুরে গিয়ে বাণেশ্বরের পুজা এবং সূর্যার্ঘ্য দেয়। পরে ভক্ত্যারা পিঠের উপর পিঠ দিয়ে বসে। পুরোহিত তাদের উপর হেঁটে দেবতাকে মন্দিরে নিয়ে আসে।

পূর্ণিমার দিন পূজা, হোম, যজ্ঞ। ৩০।৩২টি পাঁঠা বলিদানের পর দুটি বড় ভাঁড় মদ্য পূর্ণ করে দেওয়া হয়। গ্রামের উত্তর সীমায় একটি বটগাছের নীচে ভাঁড়গুলিকে নিয়ে গেলেই ঐ মদ্য উথলিয়ে উঠতে থাকে নাকি। দুজন ভক্ত্যা ভাঁড় দুটি মাথায় নিয়ে ধর্মরাজের মন্দিরে যায়। এই সময় বহু লোক সমাগম হয়। এরপর বামুন পুকুরে গিয়ে পুজা এবং পরে ভক্ত্যারা গড়াগড়ি এবং দণ্ডী দিয়ে বাবার মন্দিরে আসে। সন্ধ্যার সময় লম্বা শিক দিয়ে ভক্ত্যারা জিহ্বাবাণ ফোঁড়ে। তারপর গোরুর গাড়ীর উপর শিবদোল হয়ে থাকে। এই সময় ধর্মরাজের নিকট একটি থালা রাখা হয়। এসময় ধর্মশিলাগুলি নাকি দারুণ ঘামতে থাকে। থালায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরতে থাকে। দু'জন ভক্ত্যা প্রাণপণ শক্তিতে শিলাখণ্ডগুলিকে পাখা করতে থাকে। (দুবরাজপুর থানায় মেটেল্যা গ্রামেও অনুরূপ অলৌকিক ব্যাপার নাকি পরিদৃষ্ট হয়)। রাত্রি দশটার সময় মন্দিরের নাটশালায় কাঁটার উপর গড়াগড়ি এবং ফুলখেলা।

পুজার পরদিন সকালে পুনরায় পুজা হয়ে থাকে এবং গ্রামের দক্ষিণসীমায় বটগাছের নীচে চণ্ডীমাতার বলি সহ পুজা দেওয়া হয়। চণ্ডীপুজার পর ধর্মঠাকুরের মন্দিরে এসে ধর্ম-ঠাকুরের মাথায় একটি পদ্মফুল চড়ানো হয়। সেই ফুলটি নাকি আপনিই গড়িয়ে চৌকির উপর পড়ে। এর নাম চড়ক ফুল। বিকাল বেলায় চড়ক। দেয়াশীরা গলায় উত্তরীয় ধারণ করে চড়কখানে গিয়ে দেবতার নাম ডেকে সেই জায়গাটি প্রদক্ষিণ করে। তারপর সারা গ্রাম ঘুরে এসে ঠাকুরকে মালা দিয়ে জলযোগ করে।

চতুর্থ দিন সকালে পুনরায় পূজা এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়।

গোপজাতি কার্তিক সংক্রান্তি ও জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় গ্রামদেবতার পুজা দেয়। ব্রাহ্মণদের গোঁসাই নিত্য পুজা পান। তাছাড়া সাধারণ দেবদেবী প্রায় সব রকমই আছেন।

৩৪। **রায় রামচন্দ্রপুর** (বর্ধমান): ভাতার থানার এই গ্রামে পুকুর পাড়ে দক্ষিণ

দুয়ারী ঘরে ধর্মঠাকুর থাকেন। চারটি কূর্মাকৃতি শিলা বর্তমান। নাম কটা রায়, ময়না রায়, মেঘ রায় এবং পোড়া রায়। দেয়াশী মুচি জাতীয়। পুজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পুর্ণিমায় তিনদিন ধরে গাজনের উৎসব হয়। আবার পৌষ সংক্রান্তির দিন বিগ্রহ আবির্ভূত হন বলে ঐদিন মুচিরা পুজা করে আর একবার। গাজনের পুজা অক্ষয় তৃতীয়া থেকে সুরু হয়। ধর্মরাজের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে—

বহুকাল পুর্বে মুচিপাড়ায় এক বেলতলায় ছেলেরা মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রবালের মত একখণ্ড শিলা পায়। ছেলেরা একটি মিষ্টান্ন দোকানে ঐ পাথরটির পরিবর্তে মিষ্টান্ন প্রার্থনা করে। দোকানী ঐ পাথরের ওজন মত মিষ্টি দিবার জন্য দাঁড়িপাল্লায় পাথরটি চড়ায়। দাঁড়িতে ঐ পাথরের ওজন এত বেশী হল যে প্রচুর মিষ্টান্ন চড়িয়েও দোকানী তার সমান করতে সক্ষম হল না। অবশেষে সে ভীত হয়ে গ্রামের প্রধানদের ঘটনাটি ব্যক্ত করে। তাঁরা সকলে এসে ঐ অভিনব পাথরটির শক্তি দর্শন করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন এবং ঐ স্থানেই ধর্ণা দেন। ভোররাত্রে সকলে স্বপ্ন দেখেন যে বিগ্রহের মধ্য থেকে অশ্বারূঢ় এক দেবমূর্তি বহির্গত হয়ে তাঁদের বলছেন, অভিনব বলিদানে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। সেই থেকে নাকি এখানে অভিনব বলিদানের প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। একটি লম্বা খুঁটায় পর পর ৯টি পাঁঠা রেখে এককোপে বলি দেওয়া হয় তারপর একসঙ্গে ৫টি, ৩টি, ২টি ও ১টি এইভাবে বলি চলে।

পুর্ণিমার আগের দিন রাত্রি প্রায় আটটায় বড় একটি কাঠের ঘোড়ার পিঠে দু'জন ব্রাহ্মণ রূপার সিংহাসনে বিগ্রহ নিয়ে বসেন। গ্রামবাসী সেই ঘোড়া টেনে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে রাত্রি তিনটার সময় বড় পুকুরে মুক্তস্নান করিয়ে মন্দিরে ফিরে আসে। পুর্ণিমার দিন সকাল থেকে ভাঁড়ার নাচ হয়। বেলা দুটোর সময় পুর্বোল্লিখিত প্রথায় বলিদান। দেশ দেশান্তর থেকে বহু লোক এই বলিদান দর্শন করতে আসেন।

পুজার পরদিন গ্রামের বাইরে চড়ক হয়। তার আগে নবখণ্ড হয়ে থাকে। এখানেও পাঁচালী গাওয়া হয় ধর্মমঙ্গল কাব্যের নবখণ্ড থেকে—

"ধর্ম জয় জয় পুর্বের ভানু পশ্চিম উদয় বল ভাই জয়, জয়, জয়"

দক্ষিণ অংশের মাংস কাটি রাজা যজ্ঞকুণ্ডে দিল ইত্যাদি।

জ্যৈষ্ঠমাসে ষষ্ঠী পুজা হয়। ১লা বৈশাখ গ্রামে বটবৃক্ষমূলে মহাকাল ভৈরবের পুজায় রক্তপান, তাণ্ডব নৃত্য ও তাণ্ডব প্রহার হয়। দুর্গানবমীর দিন বটবৃক্ষতলে ভদ্রকালী পুজা হয়ে থাকে।

৩৫। **খড়্গ্রাম** (মুর্শিদাবাদ): খড়গ্রাম থানায় এই গ্রামে ধর্মঠাকুর আছেন মণ্ডপতলায় মাটির ঘরে। পনেরোটি বিভিন্ন নামের শিলা আছে। দেখতে গোল, লম্বা, চ্যাপটা ও বিভিন্ন আকারের। নাম ফটিক রায়। অপরগুলির নাম জানা যায় না। দেয়াশী নাই। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। ধর্মরাজের সঙ্গেই আছেন শিব, দুর্গা, কালী ও বাসন্তী। বৈশাখী পুর্ণিমায় মূল পুজা হয়। শিবের পুজা চৈত্র সংক্রান্তিতে।

পুর্ণিমার পুর্বদিনকে জাগরণ বলা হয়। ঐ দিনে তিন দিনের জন্য যারা ব্রতী হয় তারা

সংযম পালন করে ব্রতের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং উত্তরীয় নিয়ে ব্রত পালনে রত হন। ঐ রাতে ব্রতীরা সারারাত্রি জেগে থাকেন এবং ধর্মীয় গান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করেন। বোলান গান, বাণফোঁড়া এবং ধূপবাণ এই সমস্ত অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমান ছাড়া সকল সম্প্রদায়ের লোক এই ব্রতে যোগদান করতে পারেন। ঐদিন বৈকালে মুক্তস্নানের জন্য ধর্মরাজকে নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভক্ত্যারা শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। কেউ কেউ চামুণ্ডার মুখোশ পরে নাচে। পুর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে ধর্মরাজকে নিয়ে প্রথমে নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মুক্তস্নান সমাপনান্তে ভক্ত্যারা শোভাযাত্রীরা সহ গ্রামের বিভিন্ন দেবদেবী মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে ভক্ত্যাদের ভর হয়। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঐ অনুষ্ঠান চলতে থাকে। তারপর গ্রাম পরিক্রমা শেষ করে আবার ধর্মরাজকে পুষ্করিণীতে স্নান সম্পন্ন করিয়ে মন্দিরে আনা হয়। ঐ সময় আবার ভর হয় ভক্ত্যাদের। তারপর ঠাকুরের অভিষেক আরম্ভ হয়। অভিষেক শেষে ছাগ বলিদান। ব্রতের তৃতীয় দিনকে চুড়া-জাগরণ বলে। ঐ দিনে মাত্র একজন ব্রতের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং উত্তরীয় নিয়ে স্বগোত্র ত্যাগ করে দেবগোত্র গ্রহণ করেন। ঐদিনও রাত্রে বোলান গান হয়।

চতুর্থ দিনকে বলে জাগরণ। পূর্ণিমার পুর্বদিনের মত অনুষ্ঠান। বোলান গানের শেষে পাঁচালী গাওয়া হয়।

গ্রামের বিভিন্ন দেবতার নাম খড়গেশ্বর শিব, দক্ষিণা কালী (শ্রাবণ) নাককাটি শিব (বৈশাখ) ষষ্ঠী (জ্যৈষ্ঠ) ইত্যাদি।

৩৬। **ঘাসিয়াড়া** (মুর্শিদাবাদ) : বড়ঞা থানার এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের বেদীর উপর ৬টি গোল ও লম্বা আকারের শিলাখণ্ড আছে। নাম নেই। সঙ্গে আছেন শিব, কালী ও দুর্গা। দেয়াশী সদ্গোপ। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমায় মূল পুজা।

পুর্ণিমার আগের দিন রাত্রে জাগরণ গান। বোলান। দেবতার স্নান, ভক্ত্যাদের স্নান, উপবাস ইত্যাদি। পুর্ণিমার দিন পুজা, ক্রীড়া, বাদ্যভাণ্ড, মদ্য ভাঁড়াল, বোলান গান। তৃতীয় দিন ধর্মরাজকে সিংহাসনে বসিয়ে স্নান করিয়ে মাঠের মাঝখানে একটি জায়গা আছে, নাম ধর্মরাজতলা, সেখানে একটি গাছকে প্রদক্ষিণ করিয়ে (গাছমঙ্গলা) ঘোড়া নিয়ে ঢাক ঢোল সহ গ্রাম ঘোরানো হয়। চতুর্থ দিন ধর্মরাজকে ভোগ দেওয়া হয়। পরে পুজা ও চড়ক, নৃত্যগীত। এই উপলক্ষে মেলা বসে।

ধর্মপুজায় যে পাঁচালী গাওয়া হয় তার নমুনা এইরকম—

(ক) "রাবণ রামকে জান না
পুর্ণ ব্রহ্ম রাম করলে যাঁহার নাম ভব ভয় রবে না
রামেরও মহিষী সেই পুর্ণ শশী জনক নন্দিনী সীতা
করলি তাঁরে চুরি করিয়ে বড় চাতুরী বাহাদুরী
খাটবে না। ইত্যাদি"

(খ) "আসিতে বলিয়ে বাঁশীতে ভুলাইয়ে
দেখেছি পাখাইয়ে
মনে কি পড়ে না?
শোন হে প্রাণকান্ত মদনে কর শান্ত
বিরহ যাতনা দিও না দিও না
শোন হে প্রাণকান্ত নিশি যায় শুধু শুধু মরমে
বেদনা, দিয়ো না দিয়ো না।"

বলাবাহুল্য এই পাঁচালী গানগুলির সঙ্গে ধর্মপূজার কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রামে তাছাড়া আছেন গ্রাম্য দেবী (মাসিক পূজা), কালী, ষষ্ঠী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি।

৩৭। **সেকমপুর** (সিউড়ী): সেকমপুর গ্রামটি সাঁওতাল পল্লী। "সাকম" বা "সেকম" শব্দ সাঁওতালি অর্থে পাতা। মনে হয় এই "সাকম" থেকেই সেকমপুর নাম হয়েছে। এখানে একটি ধর্মঠাকুরের পীঠ আছে। বাঁধানো চাতালের মত জায়গাটি। মাঝখানে ছোট্ট একটি শিলাখণ্ড। সাঁওতালদেরই পূজা। সাঁওতালি সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্মঠাকুরের পুজা তাদের সংস্কৃতিতে নেই। এখান থেকে চমকপ্রদ তথ্য যা পেয়েছি তা নৃতত্বের ছাত্রদের বিশেষ খোরাক যোগাতে পারবে। তথ্যটি হল এই—ধর্মঠাকুরের পূজারী বা দেয়াশীকে এরা বলে "মাঝি দড়ম"। এই 'দড়ম' শব্দটি গভীর অর্থবহ। ধর্মঠাকুরের 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বহু জল ঘোলা করা হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক আচার্য্য সুনীতি কুমার অনুমান করেছেন, যে অজ্ঞাত কোন অষ্ট্রিক শব্দ "দড়ম", যার অর্থ কূর্ম, তার থেকে 'ধর্ম' নামটি নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। একমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকেই "মাঝি দড়ম" খুবই মূল্যবান। পূর্বে অনুমান করেছিলাম যে সাঁওতালি শব্দ "দরম ডাক" যার অর্থ বিবাহের বরযাত্রীদের নিয়ে আসা, তা থেকে 'ধরম' শব্দ এসেছে। এরও প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

সাঁওতালরা এই ধর্মঠাকুরের পুজা করে দোলের সময় এবং বাঁধনা পর্বে। এই তুটি পরব যে আদিম সমাজের শস্যোৎসব তা পৃথক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছি। এবং ধর্মঠাকুর শস্যেরও দেবতা। সাঁওতালদের "দরম ডাক" অর্থাৎ বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার রীতিও এই ধর্মতলায় প্রতিপালিত হয়ে থাকে। বিয়ের সময় জামাই মেয়েকে এইখানে এনে গুড় জল খাওয়াবার নিয়ম। বরযাত্রীর দলও এখানে গুড় জল খায়। গ্রামের সাঁওতাল অধিবাসীদের বিশ্বাস এইটিই তাদের আদি দেব দেবী, বুড়ো বুড়ীর থান ছিল।

ধর্মপূজার সময় মুরগী, পাঁঠা ইত্যাদি বলি পড়ে। মামুলি মদ্য-ভাঁড়াল, ভরনামা সবই আছে।

শীতলা ষষ্ঠীর দিন এরা মাঠে মুরগী বলি দেয়। গ্রামের বাইরে "জাহের এরা" এবং "গোঁসাই এরা" দেবস্থান আছে (জাহের থান অবশ্য প্রতি সাঁওতাল পল্লীর নিকটেই পরিদৃষ্ট হয়)। বাঁধনার সময় ধর্মঠাকুরের পুজা করার আগে এরা মাঠে মুরগী বলি দিয়ে আসে।

৫৮। **পতণ্ডা** (সিউড়ী থানা) : সিউড়ীর ৫½ মাইল পূর্বে। গ্রামে আছেন আষিড়ে ধর্মরাজ। কারণ আষাঢ়ে এর পুজা হয়। আগে বাণফোঁড়া, আগুন খেলা প্রভৃতি সব অনুষ্ঠানই হত। এখন মাত্র একদিন পুজা, হোম ও বলিদান হয়। ব্রাহ্মণদের পুজা। যার ইচ্ছা উপবাস করতে পারে। অন্যান্য অনুষ্ঠান নেই।

অন্যান্য—বিশাল এক প্রাচীন ও সুদৃশ্য তেঁতুল গাছের গোড়ায় আছেন 'ব্রাহ্মণী চণ্ডী'। বর্গীর হাঙ্গামার সময় একজন ব্রাহ্মণ বধূ পাল্কীতে যাচ্ছিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তাহার বাহকরা জলপান করতে যায়। এমন সময় বর্গীরা চড়াও হয় পাল্কীর উপর। বধূটি প্রাণের ভয়ে ছুটে গিয়ে তেঁতুল গাছটিকে বৃক্ষদেবতা বলে শরণ নেয়। তেঁতুল গাছটি নাকি দু-ফাঁক হয়ে বধূটিকে ভিতরে আশ্রয় দেয়। দেখা যায় শুধু তার সাড়ীর একটুখানি অংশ। সেই থেকে ব্রাহ্মণী চণ্ডীর পুজা হয়ে আসছে। গাছটি অত্যন্ত প্রাচীন ও অতি সুশোভিত। কয়েকটি টেরাকোটা ধাপে ধাপে বসানো আছে এবং পাল যুগীয় পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমাণ একটি কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত বিচিত্র এক খোদাই করা মূর্তি রয়েছে। সিঁদুর লেগে থাকার জন্য মূর্তিটি কিসের তা বোঝা গেল না। এই দেবীর পুজা হয় বিজয়া দশমীর রাত্রে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের পর। বৃষ্টি না হলেও এই দেবীর আরাধনা করা হয়। (চিত্র ৪৯)।

পুকুরের পাড়ে নিমতলায় একজন ব্রহ্মচারী আছেন। পতণ্ডার সরকার (ব্রাহ্মণ) মশাইরা সেবাইৎ ও পুরোহিত। দোলগোবিন্দ সরকার কর্তৃক দুশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। ১লা মাঘ মহাসমারোহে পূজা ও মেলা হয়। পাঁড়ুই গ্রামে ব্রহ্মদৈত্যের মেলায় জমিদার ও সরকার মশাই প্রমত্ত অবস্থায় গিয়ে অপমানিত হন। তারই ফলে এই ব্রহ্মচারী পুজার উদ্ভব। ব্রহ্মচারীর সামনে পাঁঠা বলি হয়। একটু আড়ালে হয় হাঁস মুরগী। পূর্বে এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল। এই ব্রহ্মচারীকে হাঁটু পালোয়ানও বলা হয়। কারণ কারও হাঁটুতে বেদনা হলে ব্রহ্মচারী স্থানে একটা নাকি ঢিল বেঁধে দিলে আরোগ্য হয়ে থাকে। শিবের ধ্যানে ব্রহ্মদৈত্যের পুজা হয়।

ব্রাহ্মণী চণ্ডীর সামনে বৃদ্ধেশ্বর নামে এক শিব আছেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামের সরকাররা পুজা করেন। বৃদ্ধেশ্বরের পুজা রামায়ণ গান হয়। শিবতলায় আছেন বটুকভৈরব। এঁর সামনে পাঁঠা বলি হয়। শিবমন্দির ৪টি। ব্রাহ্মণী চণ্ডী ও শিবমন্দিরগুলি একই স্থানে বর্তমান।

ব্রাহ্মণী চণ্ডীর স্বরূপ নির্ণয় করা শক্ত। তবে কিংবদন্তীর ভিত্তিতে ইনি দেবী দুর্গা ছাড়া আর কিছু নন। কিংবদন্তীটি এই—

অষ্টাদশ শতাব্দী। চারিদিকে অরাজক অবস্থা। দেশে বর্গী এসেছে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। লুঠপাট করে গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিচ্ছে তারা। বাংলার নবাব তাদের সামলাতে পারছেন না। ভাল পথঘাট নেই। বাধাহীন বনজঙ্গল মাথা তুলেছে চারিদিকে। সেই বনের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে দস্যুরা অবাধে কুকীর্তি করে বেড়াতে লাগল।

গভীর জঙ্গলের ভিতর সুঁড়ি পথ। সেই পথ দিয়ে অতি কষ্টে ঝোপঝাড় এড়িয়ে একদল

বাহক পাল্কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে আছে দু'চারজন পাইক। পাল্কীর ভিতর অল্প বয়সী এক ব্রাহ্মণ বধূ। বেলা দ্বিপ্রহর, গ্রাম আর বেশী দূর নয়। গৃহপালিত ছাগল গরু চরতে দেখা যাচ্ছে পাইক পেয়াদা বাহকরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। এতক্ষণ তেষ্টায় তাদের ছাতি ফাটছিল। চুরি ডাকাতির ভয়ে তারা পাল্কী নামাতে সাহস পায়নি। এবার একটা জায়গায় তারা পাল্কী নামিয়ে সামনের পুকুরে এগিয়ে গেল। হঠাৎ যেন বিপর্যয় ঘটে গেল। বনজঙ্গল ফুঁড়ে হৈ হৈ করে একপাল ডাকাত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাল্কীর উপর। বধূটি দরজা ফাঁক করে বাইরের পানে চোখ রেখে ছিল। ভয়ে তারও অন্তরাত্মা শুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। শ্বশুরবাড়ীর কাছাকাছি এসে সে-ও একটু স্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু হঠাৎ ডাকাতেরা আসতে দেখে সে পাল্কী ছেড়ে ছুটতে চেষ্টা করল। কিন্তু দুর্বৃত্তের সঙ্গে ছুটে এঁটে উঠবে কেন? তার একগা গয়নার উপরই যে তাদের লোভ! একজন যমদূতের মত চেহারা নিয়ে ছুটে এসে ধরল তার অবলুণ্ঠিত শাড়ীর আঁচ। আর উপায় নেই। এক্ষুনি মান ইজ্জত সব যাবে। বধূটি সামনেই পেল এক বিশাল তেঁতুল গাছ। তার গোড়ায় নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বললে, "হে বৃক্ষদেবতা! তুমি আমাকে রক্ষা কর।" বৃক্ষদেবতা তার আকুল প্রার্থনা শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তেঁতুল গাছের কাণ্ড দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বধূটি তার ভিতর প্রবেশ করল। গাছটি আবার জুড়ে গিয়ে যেমনকার তেমনি হয়ে গেল। বাইরে রইল শুধু দস্যুটির হস্তধৃত শাড়ীর পাড়ের একটা টুকরা। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে বর্গীর দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরস্পরের পানে হতবাক হয়ে তাকাতে লাগল। এ মানুষ না দেবী! বর্গীরা দেবী দুর্গার ভক্ত। তারা বুঝলে মাকে অসম্মান করেছে। আর কালবিলম্ব না করে তারা লুটিয়ে পড়ল সেই তেঁতুল গাছের গোড়ায়। তারস্বরে বন্দনা সুরু করলে। দেখতে দেখতে সেই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মণী চণ্ডীর পুজা।

আজ এই ব্রাহ্মণী চণ্ডীতলা আপন মহিমায় সুপ্রকাশিতা। বিশাল তিন্তিড়ি বৃক্ষটি আজও বর্তমান। জঙ্গলের বন্য পরিবেশ আজও আছে। বনবীথিকার রম্য শ্রী সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

ব্রাহ্মণী চণ্ডীর পাশে দুটি শিব মন্দির। সামনে কালভৈরবের বেদী। তেঁতুল গাছের গোড়ায় ব্রাহ্মণী চণ্ডীর বেদী মাটি দিয়ে প্রায় দশ ফুট উঁচু করা হয়েছে। কোটরে রক্ষিত একটি পাল যুগের ইঞ্চিপাঁচেক কষ্টিপাথরের মূর্তি। তেল-সিঁদূরে চেনা যায় না। সম্ভবতঃ মহিষমর্দিনীর মূর্তি। সেখানে নিত্য পুজা হয় এবং বিজয়া দশমীর রাত্রে বিশেষভাবে। সিউড়ী শহর থেকে পাঁচ মাইল পুর্বে এই ব্রাহ্মণী চণ্ডীর স্থান অবস্থিত, পতণ্ডা গ্রামে।

ব্রাহ্মণী চণ্ডী আরও অনেক জায়গায় বর্তমান। এমন কি সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে পর্যন্ত এই সংস্কৃতি বিদ্যমান। Rev. Henry White Head তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক "The Village Gods of South India"-তে কয়ম্বাটুর জেলায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'কামাচ্ছি মা' নামে অনুরূপ একজন দেবীর কথা এবং কিংবদন্তী আলোচনা করে বলেছেন, "She is reported to have been born a Brahmin girl and then to have become the avatar

of one of the Asta Śakti." (Page 31).

এই সকল কিংবদন্তীর সত্যাসত্য নিরূপণের কোনো উপায় নেই, তবে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, অব্রাহ্মণ্য সমাজের নিকট ব্রাহ্মণ্য-মহিমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সত্যমিথ্যা মিলিয়ে এই ধরণের উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল।

৩৯। **হিজলগড়া** (জামুড়িয়া থানা, বর্ধমান): অজয়ের দক্ষিণ তীরবর্তী। অজয়ের পশ্চিম তীরে খয়রাশোল থানার শিরা, রসা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে অনুষ্ঠানাদি একই প্রকার।

গ্রামের মধ্যে ধর্মরাজের পাকা মন্দির। ছয়টি শিলাখণ্ড। নাম অনাদিনাথ, বুড়ো শিব, আবালেশ্বর শিব, ধর্ম রায়, বুড়ো রায়, বাণেশ্বর শিব। বেদীর সন্নিকটে সিংহাসন, পাল্কী, ঘোড়া ও পাদুকা। দেয়াশী শেঠ (ধীবর), পূজারী ঘোষাল। এই ধর্মরাজের সেবাপূজাদির জন্য বর্ধমান মহারাজ উদয়চাঁদ সম্পত্তি প্রদান করেন।

বৈশাখে নৃসিংহ চতুর্দশীতে পূজা সুরু হয়। ত্রয়োদশী বারের দিন। ভক্ত্যারা কালাপুকুরে স্নানাদি করে নিকটস্থ শিব ও হনুমানজীর পূজা করেন। সেখান থেকে হট-টং-টং অর্থাৎ একপায়ে দৌড়ে গাজন পর্যন্ত আসে এবং শিবমন্দিরে গিয়ে দুটি লোহার দণ্ডে পা ঝুলিয়ে অধোমুখে শিবপূজা করে। পরে বাড়ী গিয়ে জলযোগ করে ফিরে আসে এবং স্থানীয় দেব-দেবীর নাম গান করে ভক্ত্যারা পাঁচালী গেয়ে থাকে। পরে রাত্রি ২ ঘটিকার সময় একটি বাঁশের ঝাড়ের বাঁশে হাত দিয়ে জাগিয়ে আসে। সেই বাঁশের একটি টোকা তৈরী করে পূজার দিন ভোররাত্রে ধর্মরাজকে স্নান করায়। এর নাম মুকতোলা। চতুর্দশীর দিন পূজা ও হোম। এইদিন বহু ভক্ত নানা গ্রাম থেকে উপবাস করে সেখানে আসে এবং মানসিক অনুযায়ী কেউ হোলাবাণ, কেউ দণ্ডী দেয়, কেউ শিবকুড়ি নামক জায়গা থেকে গড়াগড়ি দিয়ে ধর্মস্থান পর্যন্ত আসে। কেউ শক্তিশেল নিয়েও আসে। ভোরবেলা মুকতোলা হয়। সেখানে ভক্ত্যারা শ্মশান থেকে নীত অঙ্গার, আগুন ধরিয়ে ছোঁড়াছুড়ি করে খেলা করে। ঐদিন সগড় বাণ নামে বাণ আসে। তাতে একটি ভক্ত্যা শিবকুড়ি নামক জায়গা থেকে উপর দিকে পা বেঁধে অধো-মুখে আগুনে আহুতি দিতে দিতে মন্দিরে আসে। পূর্ণিমার দিনে কোনো পূজা হয় না। ঐ দিন কাষ্ঠনির্মিত দোলায় ধর্মরাজকে চড়িয়ে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্নান শেষে ঠাকুরকে রাধাচক্রবাণ বা বাণেশ্বরে চড়িয়ে আনা হয়। এর উপর একজন ভক্ত্যা চড়ে থাকে। পরদিন বলির পর দেবতাকে যথাস্থানে রক্ষা করা হয়।

৪০। **পালিগ্রাম** (মঙ্গলকোট, বর্ধমান): গ্রামের মধ্যস্থলে ধর্মরাজ আছেন। ছয়টি শিলাখণ্ড। নাম জানা যায় না। দুইটি চৌকা, দুইটি গোল ও দুইটি লম্বা আকৃতির। চারটি কূর্ম একটি নারায়ণ ও একটি শ্রীমতী শিলা।

দেয়াশী সদ্‌গোপ। পূজারী ঘোষাল। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা। পূর্ণিমার আগের দিন ভোরে ঠাকুর বের করা হয়। একে বলে নাবরা ভাঙ্গা। ঐদিন পূর্বাহ্নে বাণেশ্বরের পূজা ও ঘোড়ার পূজা প্রত্যেক বাড়ীতে করা হয়। বৈকালে রথে চড়িয়ে নদীতে মুক্তস্নানে যাওয়া হয়

এবং ফিরে এসে সন্ধ্যা বেলা কিরীটেশ্বরী দেবীর সামনে বাণ (রগে বা কপালে) ফোঁড়া হয়। এবং সেই অবস্থায় গ্রামের পথে পথে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে ধর্মরাজ সহ ভক্ত্যারা ধূনো পুড়িয়ে নেচে বেড়ায়। রাত্রি ১/১২ টার সময় ঐ বাণ খুলে ঠাকুরকে আপন স্থানে পৌছিয়ে দেয়। পুরোহিত ও ভক্ত্যারা ঐদিন রাত্রি বেলায় ফলজল খায়।

পুজার দিন সকাল বেলায় মন্দির থেকে ঠাকুরকে বাহিরে আটচালায় বের করা হয় এবং গ্রামস্থ সকল লোকে এঁর পুজা করায় এবং ভক্ত্যারা আট-ন'টা পুকুরে স্নান করে আসে ও ঠাকুরের মাথায় ভক্তি সহকারে পদ্ম ও নানারকম ফুল চাপায়। ঐ সময় ধর্মমঙ্গলের গান হয়। লাউসেনের দেহ নবখণ্ডে বিভক্ত করে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দেবার পালাগান। ভক্ত্যারা কপালে বাণ ফুঁড়ে ধূনো পোড়ায়। এরপর একটি চৌকা এক মানুষ পরিমাণ গর্তে একটি ভক্ত্যার জিভে ৭/৮ হাত পরিমাণ লম্বা বাণ ফুঁড়ে বসানো হয়। তার মাথায় ঘিয়ের প্রদীপ ও বাণের মুখে পদ্মফুল দেয়। এই সময় ধর্মমঙ্গলের গান শেষ হয়। তারপর ভক্ত্যাটিকে গর্ত থেকে উঠিয়ে বাণ খোলা হয়। একে বলে নবখণ্ড।

তারপর দুটি ভক্ত্যা বাণ ফুঁড়ে গ্রামের বাইরে পশ্চিম পাড়ায় আদিরাক্ষ নামে এক ধর্মরাজ আছেন সেখানে সাক্ষাৎ করে সমস্ত গ্রাম ঘুরে আন্দাজ বেলা ৩ টার সময় ঐ বাণ খোলে। তারপর ভাঁড়াল ভরা ছাগ বলিদান ও হোম হয়। পুজার শেষে পূর্ণাহুতি দিয়ে অগ্নি বিসর্জন হয়।

তৃতীয় দিনে ঠাকুরের নিত্য পুজা। বিকালে বাণেশ্বর নিয়ে গ্রামের দক্ষিণে দত্তপুকুরে ভক্ত্যারা স্নান করে। তারপর আনন্দ করতে করতে ধর্মরাজ তলায় উপস্থিত হয়। ধর্মরাজের ছয়টি শিলাকে বের করা হয়। ভক্ত্যারা দুটি মই পুঁতে তার উপর হেঁটমুণ্ড হয়ে ঝুলে, নীচে আগুনের গড় তৈরী করে ধূনো ছিটিয়ে ভক্তি সহকারে ঠাকুরকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। একে ধূনো-সেবা, মইঝোলা বলে। পুজার পর তারা প্রত্যেকে বাটাপুজা করিয়ে সারাদিন উপবাস থেকে পুরোহিত ও ভক্ত্যারা মিলে রাত্রে ফলজল খায়।

চতুর্থ দিনে দিনের বেলা নিত্য পূজা হয় এবং বাণেশ্বর নিয়ে গ্রামের উত্তরে ব্রাহ্মণ পুকুরে সকল ভক্ত্যা একত্র উত্তরীয় ধারণ করে ও ঠাকুরকে উত্তরীয় দেয়। পরে ভক্ত্যারা ফিরে এসে বাটাপুজা করিয়ে সারাদিন উপবাস করে রাত্রে কানে তুলো গুঁজে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আতপ চালের অন্ন এবং দুধ-মিষ্টি খায়।

অন্যান্য—গ্রামে ব্রাহ্মণদের পুজিত কিরীটেশ্বরী (আশ্বিন) ও খাঁদা কালী (ভাদ্র) আছেন। তাছাড়া আষাঢ়ের মঙ্গলবারে ষষ্ঠী ও আশ্বিন মাসে বাবা পঞ্চাননের পুজা হয়।

৪১। **চিঁচুড়িয়া** (জামুড়িয়া থানা, বর্ধমান) : এই গ্রামের ধর্মরাজদের নাম কালারায় ও বুড়োরায়। ধর্মরাজ পাকা মন্দিরে পাতালস্থ অবস্থায় আছেন। প্রবাদ ঐখান থেকে কিছু দূরে পালের পুকুরে একটি সুড়ঙ্গ আছে। ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে ধর্মরাজ যাওয়া আসা করেন। ধর্মরাজদের শিলামূর্তি তিনটি। একটি চ্যাপ্টা আর দুটি গোলাকার। দেয়াশী ও পুজারী ধীবর ও শুঁড়ি সম্প্রদায়ের।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। পূর্ণিমার চারদিন আগে বাণেশ্বরকে বের করে পরপর দুইদিন বাণেশ্বরের ও কিছু ভক্ত্যার স্নান করানো হয়। পরে ধর্মস্থানে এসে ভক্ত্যাদের শিবদোল হয় এবং তারা বাড়ী ফিরে গিয়ে ফলজল খায়। এই অবস্থায় পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত থাকে। পূজার দুইদিন আগে পাদুকা বের হয়। সন্ধ্যায় পুকুরে ঐ পাদুকা জোড়ার স্নান হয়ে থাকে। পূজার পূর্বদিনকে কলসী দেওয়ার দিন বলে। ঐদিন ধর্মরাজদের (কালারায় ও বুড়ো রায়) দোলায় এবং বাকী ঠাকুর দেয়াশীর মাথায় বাঁশের টোকার মধ্যে নিয়ে গিয়ে পুকুরে স্নান করানো হয়। তখন অনেক ঢাক ঢোল নিয়ে বহু স্ত্রীপুরুষ মাটির বা পিতলের কলসী নিয়ে ঐ পুকুরে স্নান করে কলসীপূর্ণ জলসহ মন্দিরে আসে। ধর্মরাজ দোলায় আসেন। বাকী ঠাকুর গাড়ীর উপর মাটির ঘোড়ায় চড়ে গাজনে আসেন। ঐ রাত্রে প্রায় দশটার সময় কাঁটা খেলা, ফুল খেলা ও নানাপ্রকার খেলা হয়। পাতাভরা উৎসবে ছড়াকাটা হয়। রাত্রে হয় যাত্রা। আগে চড়ক হত। এখন হয় না। পূর্ণিমার দিন পূজা। অনেক পাঁঠা বলি হয়। বিকালে মেলা বসে। ভক্ত্যারা আগুনে ঝাঁপ দেয়, বাণেশ্বরের উপর গড়াগড়ি দেয়। ধর্মরাজকে যেদিন স্নান করানো হয় সেদিন যারা মহারোগে আক্রান্ত হয় তারা ঠাকুরের কাছে মানত করে দণ্ডী দিয়ে পুকুর থেকে ঠাকুর বাড়ী পর্যন্ত যায়। ঐ সময় দেয়াশী বা পূজারী ছড়া কাটেন। যাদের বাত হয় তারাও মানত করলে নিষ্কৃতি পায় বলে লোকবিশ্বাস বর্তমান।

চড়কে এখন কিছু হয় না। কেবল ভক্ত্যারা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকে। (ধর্মরাজের গাজনে গাওয়া শ্লোক বা পাঁচালী যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)।

ধর্মরাজের সন্নিকটে একটি তেঁতুলতলায় মনসা আছেন। পূজা শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। আখবাড়ীর মাঝে একটা উঁচু জায়গায় তেঁতুলতলায় আছেন কালারায় ঠাকুর। বাউরীদের পুজা। ফুলদোল পুর্ণিমায়। ছাগল ভেড়া বলি হয়। একটা নিমগাছের নীচে জেলেরা বুড়ো রায়ের পূজা করে ঐ ফুলদোল পুর্ণিমায় বলি হয়।

দিগম্বরী মায়ের পুজা হয় আষাঢ়ের প্রথমেই। আম ব'গানের মাঝখানে দলে দলে পুকুরের ধারে একটি বিরাট কালীপুজা হয় ফাল্গুন মাসে।

৪২। **সিউড়ী*** (সিউড়ী থানা) : সিউড়ীতে পাঁচ জায়গায় ধর্মরাজ পুজা আছে। (ক) বারুই পাড়ায়, (খ) মালি পাড়ায়, (গ) শেহাড়া পাড়ায়, (ঘ) আনন্দপুর, (ঙ) সোনাতোড় পাড়ায়। পূর্বে এই স্থানগুলি বিভিন্ন গ্রাম ছিল। বর্তমানে সবই সিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত।

(ক) বারুই পাড়ায় ধর্মরাজের পাঁচফুট উঁচু ছোট্ট একটি মন্দিরাকৃতি ঘর। ভিতরে কয়েকটি শিলাখণ্ড। পুজা একেবারে লুপ্তপ্রায়। এই স্থানে দলাদলি ও বিবাদের ফলে মালি পাড়ার ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় শতাধিক বৎসর পুর্বে। বারুই পাড়ার ধর্মরাজের সামনে ষষ্ঠী আছেন।

(খ) মালিপাড়ার ধর্মরাজ—দেয়াশী মালাকার। পুজারী ভট্টাচার্য। ধর্মঘরে একটি শিলা

* মদীয় এই সংগ্রহটি শ্রীবিনয় ঘোষ "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"তে প্রকাশ করেছেন

ও বাণেশ্বর। শ্রাবণ মাসের পুর্ণিমায় পুজা হয়। ধর্মরাজের কোনো নাম নেই। ধর্মের পাকা ঘর আছে। ধর্মরাজের সঙ্গে আছেন লোটন ষষ্ঠী।

পুজার ১৫।২০ দিন আগে মাটির ভাঁড় আর ফুলের মালা দিয়ে ধর্মতলা পূর্বে সাজানো হত। পরে একটি ভাঁড় বাজিয়ে "কয়েলী"র টাকা সংগ্রহ করা হয়। পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় মশাল নিয়ে বাজনা বাজিয়ে সহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণান্তে ভক্ত্যারা দত্তপুকুরের ঘাটে স্নান করে গলায় উত্তরীয় ধারণ করে। পূর্বে শতাধিক ভক্ত্যা হত। স্ত্রীলোক বালকও ভক্ত্যা সাজত। পরদিন ভোররাত্রে ধর্মতলায় প্রচুর কাঠ জড়ো করে পুড়িয়ে আগুনের ফুল খেলা হয়। তার আগে অঞ্জলি ভরে জ্বলন্ত আঙ্গার নিয়ে গিয়ে ধর্মরাজের মাথায় কলাপাতা রেখে চড়ানো হয়। ফুল খেলার পর ভক্ত্যারা কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করে। খেলা শেষে ভক্ত্যারা ব্যোম ব্যোম ধ্বনি দিতে দিতে সমবেত নৃত্য স্বরু করে। ধর্মরাজকে ঘাটে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয় না। ভৃঙ্গারের জলে ধর্মবেদীর সন্নিকটেই স্নান করানো হয়। দেয়াশীরাই এ কাজ করে থাকেন। বেলা এক প্রহরের সময় পুজা, হোম, যজ্ঞ হয়। আগে বলিদান হত। এখন হয় না। দ্বিপ্রহরে ধর্মরাজের মাথায় ফুল চড়ানো হয় এবং ভক্ত্যারা মাথায় ভাঁড়াল নিয়ে দাঁড়ায়। ভাঁড়ের গলায় থাকে ফুলের মালা, ভিতরে গঙ্গাজল আর পিটুলী গোলা। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করতে থাকেন। প্রচণ্ড জোরে বহু ঢাক বাজতে থাকে। সাজানো পদ্মের রাশি থেকে একটি পদ্মফুল নাকি গড়িয়ে পড়ে। মূল দেয়াশীর ভাঁড়ে সেই ফুলটিকে দেওয়া হয়। তারপর বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে ভক্ত্যারা দত্তপুকুরের ঘাটে এসে উপস্থিত হন। এই সময় নানাপ্রকার নৃত্য, সঙ্, ঘোড়ানৃত্য ইত্যাদি চলতে থাকে। এরপর দত্তপুকুরের ঘাট থেকে ভাঁড়াল মাথায় ভক্ত্যারা ধর্মরাজতলার দিকে যাত্রা করেন। পথে ভক্ত্যাদের নাকে ধূপের ধোঁয়া ও কানের কাছে ঢাক বাজিয়ে আবিষ্ট করা হয়। ক্রিয়াকাণ্ডাদি আর বিশেষ কিছু হয় না। তবে সাতদিন ধরে নানাপ্রকার উৎসব, সঙ্, যাত্রা, আলকাঠার কাপ ইত্যাদি চলতে থাকে। অর্থের টানাটানিতে বর্তমানে এই পূজার জাঁকজমক এখন ক্রমাবনতির দিকে।

অন্যান্য—বাউরী পাড়ায় শাঁওডালি পুজা আছে। নিমগাছতলায় খড়ো চালা। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন পুজা হয়। মদ্য মাংস ও ভর নামা। এটি মনসা পুজা মাত্র। বসন্তকুমারী, মা কমলা, বুড়িমা, চিন্তামনি ইত্যাদি এঁর ৭ বোন বলে কথিত। ঝেঁটেনি বুড়ি ও বাঁদরী ভূত নামে দুজন অপদেবীও আছেন।

সোনাতোড় পাড়ায় রক্ষাকালী আছেন। পূর্ব খোট্টাবাজারে মড়কচণ্ডী পুজিতা হন শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। এখানে বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল গাওয়া হয়।

বারুই পাড়ার উত্তরে মাঠের মাঝখানে উথয়ো নামে পুকুর পাড়ে একজন ধর্মরাজ আছেন। পুজা বৈশাখী পুর্ণিমায়।

সিউড়ীর ১ মাইল পশ্চিমে মুড়াই গ্রামের প্রবেশ পথে একটি ছোট মাটির ঘরে কয়েকটি শিলাখণ্ড পড়ে আছে। এঁরা একত্রে মনসা (শাঁওডালি) ও ধর্মরাজ। বৈশাখী পুর্ণিমায় বিধিবদ্ধভাবে পুজানুষ্ঠানাদি সবই হত। এখন ধর্মরাজ লোপ পেয়েছেন। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে

মনসা পূজা হয়। এই গ্রামে আর একটি জায়গায় অবহেলিত ধর্মরাজ আছেন পূজা বর্তমানে লোপ পেয়েছে।

এই গ্রামের ধাঙড় পাড়ায় কালী, মনসা ও ব্রহ্মচারী এবং দানা ১লা মাঘ ও বৈশাখে মুরগী বলিসহ পুজিত হন। পুরানো পুকুরের পশ্চিম পাড়ে দানা ও মনসা ১লা মাঘ এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পুজিত হন। এখান থেকে ১½ মাইল ঈশানে জামুগঙ্গা নামে একটি বড় পুকুর আছে। তার পাশ দিয়ে গেছে ক্যানেল। এই ক্যানেলের পাড়ে বেলতলায় আছেন গ্রাম-দৈত্য। একদা শূকর বলিসহ পুজা হত। এখন হয় না।

৪৩। **সিহুলি** (সিউড়ী থানা) : ধর্মরাজের নাম নেই। ইনি শ্বেতকুষ্ঠ নিরাময় করেন বলে লোকশ্রুতি ফুলখেলার পর সেই ছাই প্রয়োগ করতে হয়। সিহুলী গ্রামে চড়ক হয় না। পার্শ্ববর্তী গ্রাম লাঙ্গুলিয়া।

৪৪। **লাঙ্গুলিয়া** (সিউড়ী থানা) : সিউড়ীর পশ্চিমে ৭ মাইল। ময়ূরাক্ষী তীরে এই গ্রামে দুটি ধর্মরাজ। একটি নামোপাড়ায় খোঁড়া ধর্মরাজ আর একটি উপরপাড়ায়। নাম জানা যায় না এটির। নামোপাড়ায় ধর্মরাজের স্থানে তিনটি শিলা, মনসা, অনেকগুলি ঘোড়া ও একগাছা বেত। উপরপাড়ায়ও তাই। উপরপাড়ার ধর্মমন্দিরের পুর্বার্ধ দুর্গা মন্দির। ধর্মের সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডী আছেন। প্রত্যেকের নিত্যসেবা হয়। মনসা পুজা হয় চৈত্রে। নামোপাড়ায় ধর্মরাজের মন্দির সংলগ্ন অনুরূপ দুর্গা আছেন। দুটিরই মাটির ঘরে অবস্থান। সামনে নাটশালা। উপর-পাড়ায় ধর্মমন্দিরের বাইরে একটি আঁকড় গাছের নীচে দেবতার গাদি। বৈশাখী পুর্ণিমায় দেবতাকে সেই গাদিতে বের করে পুজাদি করা হয়। নামোপাড়ার ধর্মরাজকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের দক্ষিণে চড়কডাঙ্গার বেদীতে। সেখানে মাথার উপর ছাদন তৈরী করে পুজার কয়দিন ধর্মরাজকে রাখা হয়। ধর্মরাজের দেয়াশী বাগ্দী, পুজারী চক্রবর্তী। পুর্ণিমার দুদিন আগে বার। হবিষ্যান্ন গ্রহণ, রাত্রে ফুল খেলা, কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি প্রদান। ভক্ত্যাদের মুক্তস্নান ও উত্তরীয় গ্রহণ। পুর্ণিমার দিন ভাঁড়াল আনা। মদের দোকানে মদ দিয়ে ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়। তারপর মাথায় ভাঁড়াল ও ধর্মরাজ নিয়ে গ্রাম ঘোরে। শেষে ধর্মরাজকে গাদিতে রেখে মন্দির প্রদক্ষিণান্তে ভাঁড়াল নামিয়ে রাখার পর পাঁঠা বলিদান হয়।

রাত্রে ধর্মরাজের নাম ও আশপাশের গাঁয়ের ধর্মরাজদের নাম ধরে ডাকা এবং গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। ভক্ত্যারা নাচতে থাকে। একে ভক্ত্যা নাচ বলে। সঙ্গে বাণগোঁসাই ও বেতের ছড়ি থাকে। বাণগোঁসাই-এর স্নান হয় বেলা ১১টায়। বাণগোঁসাই-এ নানারকম ফল বিদ্ধ করা হয়। গ্রাম ঘোরানোর সময় গৃহস্থ মেয়েরা সিঁদুর, পয়সা চাল ইত্যাদি প্রদান করে। পরদিন ঐ ভিক্ষালব্ধ অর্থ এবং চাউলে ধরম যজ্ঞ হয়। পুর্ণিমার দিন রাত্রে জিহ্বাবাণ ফোঁড়া হয়। বর্তমানে চড়ক হয় না পুর্বে হত।

খোঁড়া ধর্মরাজের বাইরের একটা চত্বরে একটা গাছের নীচে গ্রামদৈত্য আছেন। তাছাড়া গ্রামে আছেন মহাদানা। পাখী বাগ্দী নামে একজন নপুংসক ১লা মাঘ পুজা করে। খোঁড়া ধরমের কাছে আয়না মানত করলে চোখ ভাল হয় বলে প্রবাদ আছে।

৪৫। **লম্বোদরপুর** (সিউড়ী থানা): (ক) গ্রামের পশ্চিমে পাকা ঘরে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত। ৬টি শিলাখণ্ড আছে। নাম চাঁদ রায়, সিঁদুর রায়, বাঘ রায়, খেলা রায়, ভুলো রায় ও কাঁটা রায়। দেয়াশী মণ্ডল, পুজারী চক্রবর্তী। বৈশাখী পুর্ণিমায় পুজা। প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অজ্ঞাত। সিন্দুর রায় মাঠে ছিলেন। এক কৃষক লাঙ্গল দিতে গিয়ে তাঁকে পায়। বর্তমানে সেই স্থান ময়ূরাক্ষী বাঁধের জলে মগ্ন। (ঐ স্থান থেকে শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্ম হস্তধৃত কষ্টি পাথরের সুন্দর একটি নারায়ণ মূর্তি পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেটি চুরি গেছে।)

ভক্ত্যা সকল সম্প্রদায়ের লোক হয়। পুর্ণিমার পুর্বের পূর্বদিন হবিষ্যান্ন, পরদিন উত্তরীয় ধারণ ও উপবাস। এইদিন দ্বাদশখাটা হয়। অর্থাৎ সকল দেবতাকে স্মরণপুর্বক প্রণাম করতে হয়। মন্ত্র নিম্নরূপ—

আড়িবন্দন, বারিবন্দন, সরস্বতী বাণ
ডাইনে দামোদর বাঁয়ে বীর হনুমান······

তারপর উত্তরে শিব বন্দনা (সম্ভবত মৌলপুরের বিখ্যাত শিবের উদ্দেশ্যে) পূর্বে গঙ্গাবন্দনা, পঃ বৈদ্যনাথ বন্দনা, দঃ জগন্নাথ বন্দনা পরে সকল দেবতার বন্দনা করা হয়। দোলনসেবা হয়। ভক্তের বুকে পা রেখে ধর্মশিলা বাহিত হন।

তৃতীয় দিন বাণামো। অর্থাৎ বাণেশ্বর নিয়ে পুজা ও স্নান। তারপর ভাঁড়াল আনা। আবার দ্বাদশখাটা হয়। ভাঁড়াল আসে পার্শ্ববর্তী গ্রাম রণপুরের মদের দোকান থেকে। এর পুর্বদিন ফুল খেলার পর রাত্রিতে ভাঁড়াল জাগানো হয়। ৯ পোয়া চাল, একটি পয়সা, একটি সুপারি, একটি হাড়িতে পুরে মদের দোকানে সেটিকে রেখে ফুল, মালা ও দীপ দিয়ে জাগানো হয়। ভাঁড়াল আনার পুর্বদিন "লাগড়া ভাঙ্গা" হয়। গ্রামের সীমানার বাইরে যেতে পারে না কেউ। সীমিত চৌহদ্দীর মধ্যে যে যা ফল পায় তাই ভেঙ্গে আনে। কেউ কোনো আপত্তি করতে পারে না।

(খ) পূজার পর হোম হয় এবং নিকটস্থ কালভৈরবের সামনে ছাগ ও মেষ বলি হয়। ধর্মের নিকটে কোনো বলি হয় না।

চতুর্থ দিন চড়ক। ধর্মরাজকে মাথায় নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। চড়ক ঢিবির চারিপাশে সমবেত ভক্ত্যারা উল্লাসভরে বাদ্যসহ নৃত্য করে। ঘোড়া নৃত্য হয়। আগে বাণ ফোঁড়া হত এখন হয় না।

পঞ্চম দিন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও উত্তরীয় মোচন। গ্রামের তেঁতুলতলায় আছেন মহাদানা ও শিব। মহাদানা সাপের রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ান বলে লোকশ্রুতি! কেউ এঁকে মারতে পারে না। দেবতা খুব জাগ্রত। বেরেলা ও শ্যাওড়া গাছের নীচে অবস্থান। ১লা মাঘ পুজা। পশুবলি দেওয়া চলে না। কারও মানত থাকলে আড়ালে বলি হয়।

গ্রামের উত্তরে লাকুড়তলায় ষষ্ঠী, বেলতলায় ব্রহ্মদৈত্য ও কালী আছেন। গাঁজা দুধ ভোগ এবং চণ্ডীর ধ্যানে ব্রহ্মদৈত্যের পুজা হয়। সকল দেবতারই পুজা করেন ধর্মরাজের পুজারী।

৪৬। **লখীন্দরপুর** (সিউড়ী থানা) : কূর্মসদৃশ একটি শিলা গ্রামের দক্ষিণে কয়েকটি তেঁতুল গাছের মাঝখানে বর্তমান। পূর্বে মন্দির ছিল। এখন ধ্বংসাবশেষ আছে। দেয়াশী সদ্‌গোপ। পূজারী, ছোড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ। প্রতিষ্ঠাতা নগরীর রায় বংশ। পূর্বে এঁদের এখানে বাড়ী ও জমি ছিল। ধর্মরাজের সঙ্গে একটি তেঁতুল গাছের গোড়ায় আছেন ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্ম-দৈত্য। বৈশাখী পুর্ণিমায় ধর্মরাজের মূল পুজার সঙ্গে এঁর পুজা হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমা ও বিজয়া দশমীর দিন ধর্মরাজের বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। পুর্ণিমার আগের দিন, বার। সন্ধ্যাবেলা ভক্ত্যারা ধর্মতলায় সমবেত হয়ে ধর্মরাজকে স্মরণ করে। তারপর তাদের নৃত্য ও ফুলখেলা হয়। পুর্ণিমার দিন সকাল বেলা ভক্ত্যারা ধর্মতলায় সমবেত হয়ে ধর্মরাজকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর তারা ঢাকসহ গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে পয়সা চাল ইত্যাদি আদায় করে। বেলা বারোটা নাগাদ ধর্মতলায় তারা ফিরে আসে এবং স্নানান্তে পুজার স্থানে বসে থাকে। দেয়াশী একটি ঘট নিজে আনেন। পুজারীর ঘটের পাশে দেয়াশীর আনীত ঘট থাকে। পুজারীর ঘটে পুজা হয়। ধর্ম-রাজকে অন্যত্র স্নান করানো হয় না। পুজারী ঘটির জলে স্নান করান। তারপর যথাবিধি পুজা হয়। হোমান্তে প্রসাদ বিতরণ। মূল সেবাইত সকলকে চিঁড়ে ফলার করান। বেলা সাড়ে তিনটের সময় ভক্ত্যারা মদের দোকান থেকে মাথায় এক একটি মদের ভাঁড় নিয়ে ছুটে আশে ও ধর্মরাজ তলায় পড়ে। কারও কারও ভর হয়। দেয়াশীও ভাঁড়াল আনে। ভক্ত্যারা ধর্ম-রাজের স্নানজল পান করে উপবাস ভঙ্গ করে। ঐদিন নিকটস্থ অনেক বর্ণহিন্দুদের বাড়ী থেকে ধর্মরাজের পূজার উপচার যায়। রাত্রে ভক্ত্যারা সমবেত হয়ে আগুন প্রভৃতি নিয়ে ধর্মতলায় খেলা দেখায়। ঐদিন মেলাও বসে। তৃতীয় দিন সকাল বেলা ভক্ত্যারা পুনরায় ধর্মতলায় সমবেত হয় ও নৃত্য করতে করতে ধর্মরাজকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ঘুরে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে ঢাকও থাকে। সংগৃহীত দ্রব্যাদি তারা ভাগ করে নেয়। সন্ধ্যার পর চড়ক। বাণফোঁড়া আগে ছিল এখন নেই। চড়কে আগুন খেলা ও নানারকম খেলা দেখানো হয়। লখীন্দরপুর সংলগ্ন বড়মহুলা গ্রাম। সেখানে ভুঁইফোঁড়নাথ শিব ও ডাকাতে কালী আছেন। শিবমন্দিরে ভৈরব আছেন। সেখানে ভক্ত্যারা গিয়ে ব্যোম ব্যোম শব্দে নৃত্য করে এবং কিছু ফলমূল দেবতার উদ্দেশ্যে রেখে আসে। কালীবাড়ীতেও ভক্ত্যারা এসে নৃত্য করে। চতুর্থ দিনও ভক্ত্যারা নৃত্য করে এবং পুজা দেয় ধর্মরাজকে।

অন্যান্য—ক্ষীরবৃক্ষতলায় সাতটি ঢিবি তৈরী করে ডোম সম্প্রদায় মুরগী বলিসহ সাতভাই বলে পুজা দেয় ১লা মাঘ। বেলগাছতলায় লোহার জাতি ছাগবলি সহ ১লা মাঘ ব্রহ্মদৈত্যের পুজা করত। এখন লুপ্ত হয়েছে।

৪৭। **রাইপুর** : (ক) সিউড়ীর ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। চন্দ্রভাগা নামক ক্ষুদ্র নদীর দক্ষিণ পাড়ে এই গ্রাম।

এই গ্রামে ধর্মরাজ তিনটি। একটির পুজা দে উপাধিধারীর অপর দুটি রুজের (ময়রা)। পুজা করেন ব্রাহ্মণে।

বটতলায় বুড়ো ধর্মরাজ। মূর্তি কূর্ম। প্রস্তরের পাদপীঠের উপর পৃষ্ঠদেশে পাদুকাচিহ্ন

সমন্বিত (কৃষ্ণ প্রস্তরের) কূর্ম। পাশে একটি ইঞ্চি আটেক মনসার শিলামূর্তি। দুই হস্ত দুই সর্পবিশিষ্ট। চমৎকার ভাস্কর্য। দুই মূর্তিতেই প্রাচীনত্বের চিহ্ন আছে। মনসার পুজা করেন একজন চক্রবর্তী। ধর্মরাজের সঙ্গেই বার্ষিক পুজা হয়। বুড়ো ধর্মরাজ পূর্বে জমিদারদের পুজা ছিল। সমগ্র রাইপুর গ্রামটি অতীত জমিদারদের কীর্তির মহান ধ্বংসাবশেষ মাত্র। অসংখ্য অট্টালিকা ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। ধর্মরাজের নামে এখনও তিন বিঘা জমি আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় পুজা হয়। পুজা করেন গজালপুরের ভট্টাচার্য। চারদিন উৎসবাদি হয়। ফলভাঙ্গা, ফুলছোড়া, আগুন খেলা, ভাঁড়াল আনা, দাতুরীঘাটা, বাণামো, চড়ক সবই আছে। চড়কের সময় মুড়োমাঠ ও পাহুড়ে গ্রামের ধর্মরাজরাও আসেন। (এখানে কালু রায় নামে ধর্মরাজ ছিলেন। একজন দেয়াশী বললেন, তিনি শুনেছেন বহুকাল পূর্বে পুরোহিত চুরি করে পুরন্দরপুরে বিক্রী করে দেন)। এরপর নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় বুড়ো ধর্মরাজকে।

বুড়ো ধর্মরাজের স্থানের নিকটেই পূর্বদিকে 'রামঘুঘু' নামে আর একজন ধর্মরাজ জীয়েতি গাছের গোড়ায় আছেন। একটা প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডকে ধর্মরাজ বলে পুজা করা হয়। বুড়ো ধর্মরাজের পুজার পরের পূর্ণিমায় এঁর পুজা হয়। লোকবিশ্বাস এই রামঘুঘুর কাছে মানত করে সিন্নি দিলে হারানো জিনিষ খুঁজে পাওয়া যায়। রামঘুঘুর সঙ্গে যুক্ত আছেন অরণ্য ষষ্ঠী। এখানে বাগ্দী ও ময়রাদের (২ ঘরে দুটি) পুজিত আলাদা আলাদা ষষ্ঠী-শিলা আছে। মোট তিনটি।

তাছাড়া গ্রামে আছেন বামাকালী। আমজোড়ার জমিদারদের ছিল। কার্তিক অমাবস্যায় মূর্তি গড়ে পুজা হয়। শ্যামাকালী ও ব্রহ্মচারী কালীও আছেন। কার্তিকে পুজা। গ্রামের পূর্বে বাগ্দীদের আছে কালী ও গোঁসাই যুক্তভাবে। পুজা অগ্রহায়ণ অমাবস্যায়।

বাগ্দী পাড়ায় আছে মুরগী ঠাকরুণ ও দানা। ১লা মাঘ পুজা।

চন্দ্রভাগার উত্তর পাড়ে পলসারা গ্রামে আছেন গ্রামদৈত্য। ঐ গ্রামে কালী ও শিব আছেন। কালী মন্দিরের কুলুঙ্গীতে আছেন মনসা। পূর্বে ধর্মরাজের পূজা হত। এখন লুপ্ত হয়েছে।

(খ) গ্রাম ঐ(ভাণ্ডীর বনের সন্নিহিত খটঙ্গা অঞ্চল)। ধর্মরাজের নাম ছেলেধরম। এখানকার বৈশিষ্ট্য হল ভক্ত্যারা ভরপেট খেয়ে ভাঁড়াল আনে এবং সেই ভাঁড়াল মদের নয়, দুধের।

৪৮। **ভগবানবাটি** (থানা সিউড়ী) : সিউড়ীর ৫ মাইল পূর্বে। নিমগাছতলায় ৫।৬ ফুট উঁচু ত্রিকোণাকৃতি পাকা ঘর। তার ভিতরে অসংখ্য শিলাখণ্ড। ধর্মরাজ মূল দেবতা। নাম রঘুনাথ। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পুজা। সঙ্গে যুক্ত আছেন কালীন্দর শিব। পুজা চৈত্র মাসে। ভৈরবনাথের পুজাও ঐ সঙ্গে হয়। চাঁদ রায় ধর্মরাজের নিত্য পুজা হয়। সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণও আছেন। বিজয়া দশমী এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পুজা এবং বলি হয়। ধর্মরাজকে এখানে যমরাজার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়ে থাকে। পুজারী মন্ত্র যা আউড়ালেন তা যমরাজার প্রণাম মন্ত্র। ভর-নামা, আগুন খেলা, বাণামো, দাহুড়িঘাটা সবই আছে।

৪৯। **ভাণ্ডীরবন** (সিউড়ী থানা) : পূর্বনাম ভাণ্ডীবন। লোকে বলে এখানে বিভাণ্ডক

মুনির আশ্রম ছিল এবং তাঁর নামানুসারে ভাণ্ডেশ্বর শিব বর্তমান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রামনাথ ভাতুড়ী এই মন্দির পুনর্নির্মাণ করে দেন। শিবমন্দির প্রাঙ্গণে বটুকভৈরব ও মঙ্গলচণ্ডীর পীঠ। গ্রামের পূর্বদিকে একটি বটগাছের গোড়ায় ধর্মরাজের গাদি। এইখানেই প্রাচীন মন্দির ছিল। বর্তমানে ভিত্তিটুকু পড়ে আছে। ধর্মরাজের নাম চাঁদ রায় ও বালক রায়। বর্তমানে ধর্মরাজকে নিয়ে রাখা হয়েছে, আধ মাইল দক্ষিণে বীরসিংহপুরের কালীর নিকটে। এই কালীমূর্তি প্রস্তর নির্মিত। মহাকালের উপর কালী উপবিষ্টা। বিপরীত রতাতুরা। কালী মন্দিরের পুর্ব কোণে দুটি মনসা, একটি শীতলা ও বাণেশ্বর সহ ধর্মশিলা। ধর্মশিলা দুটি শালগ্রাম শিলার মত গোলাকার। বৈশাখী পুর্ণিমায় মূল পূজা। ঐ সময় গাদিতে ধর্মরাজদের বের করা হয়। পূজার ধ্যান বা অনুষ্ঠানাদি গতানুগতিক আগুন খেলা, বাণ ফোঁড়া বর্তমানে লোপ পেয়েছে। বলি আছে।

গ্রামের দক্ষিণে বেলতলায় মহাদানা আছেন। গ্রামের অগ্নিকোণে কুচ্‌লে তলায় মড়ক চণ্ডীর পুজা হয় ১লা মাঘ। তপশীল সম্প্রদায়ের পুজা।

দ্রষ্টব্য—পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোপালপুরে ধর্মরাজ আছেন। ধর্ম মন্দিরের বাইরে গাছতলায় ষষ্ঠীতলা। সেখানে একটি অজানা ভগ্নমূর্তি বিদ্যমান। তাছাড়া নিকটবর্তী কুস্তোর ও সিদুলী গ্রামেও ধর্মরাজ আছেন।

৫০। **পুরন্দরপুর** (থানা সিউড়ী): সিউড়ী থেকে ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব। বিশিষ্ট গণ্ড গ্রাম। গ্রামে ধর্মরাজের পাকা মন্দির। ধর্মরাজের নাম পুরন্দরনাথ। সঙ্গে আছেন ভৈরবনাথ শিব, চামুণ্ডা, কালী, কেলে রায়, চাঁদ রায় এবং লাগ-লাগিনী (নাগ-নাগিনী)। এই নাগ-নাগিনীদের কখনও কখনও গর্ত থেকে মুখ বের করতে দেখা যায়। তাছাড়া ধবলধারী কন্যা নামে একজন অপদেবীও আছেন। লোকশ্রুতি এই যে, তাঁর বাতাস গায়ে লাগলে ধবল বা শ্বেতি হয়।

বর্তমান দেয়াশীর উপাধি দাস-সাহা। চৌদ্দ পুরুষ ধরে এঁরাই দেয়াশীর কর্মে রত আছেন। (ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠার কাহিনী, প্রবাদ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। সাতদিন আগে থেকে ব্রত করতে হয়। সাহা, বাগদী, বেণে, হাড়ি, ডোম (সংখ্যা অনির্দিষ্ট) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা সাজে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অথবা তার আগে যেদিন হাট বসে, দেবতাকে সেই হাটে মহাধূমধাম সহকারে ভ্রমণ করানো হয়। ঢাক ঢোল বাজে। সাতটি গ্রামের ধর্মরাজের ঢাক এসে হাজির হয়। একে হাটবেড়া বলে। তারপরও যদি পূর্ণিমার দেরী থাকে তাহলে পূজা বন্ধ থাকে। সেদিন বনবেড়া হয়। এখন বন নেই। কালিয়ার ডাঙ্গায়একটি মঞ্চ আছে। সেখানে ৭।৮টি গ্রামের (উষগ্রাম, হাটইকড়া, ধোবাগ্রাম, কুষ্টিকুড়ি, ভ্রমরকোল, গলগাঁ, জামথলি, হাজরাপুর ও কোঁদাইপুর) ধর্মঠাকুর এসে হাজির হন। চতুর্দশীর দিন পূজা সুরু হয়। ধর্মরাজ ফিরে এলে দেয়াশীদের শীতল হয়। সেটা শেষ হলে আগুনের ফুলখেলা হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে প্যাকাটি দিয়ে অথবা খেজুরপাতা দিয়ে একটি ঘর তৈরী করা হত। তার ভিতর দেয়াশী ঢুকতেন।

ঘরটিকে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো হত। তারপর দেয়াশী বেরিয়ে আসতেন অক্ষত দেহে। ফুল খেলার পর ধর্মতলায় অবস্থিত বাণেশ্বরকে ভক্ত্যারা কাঁধে তুলে নিয়ে যায় বড় পুকুরের ঘাটে। একে বলা হয় দাতুরীঘাটা। এই সময় একটি শ্লোক বলা হয়। (যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)।

এখানে বাণেশ্বরের স্নান ও পুজা হয়। সেইদিন উত্তরীয় তৈরী করে বাণেশ্বরকে দেওয়া হয় এবং ভক্ত্যাদেরও। ভক্ত্যারা পুকুরঘাট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত দণ্ডী কাটে। রাত্রি ৮।৯ টার সময় গোরখেলা হয়। তারপর ভক্ত্যারা লাখরাজ ভাঙতে যায়। পূর্বে একজন হাড়ি জাতীয় ভক্ত্যা চামুণ্ডার একটি মুখোশ পরে ধর্মরাজের সামনে আড়াই পা গিয়ে ফিরে আসত। বর্তমানে তার বংশ লোপ পাওয়ায় এ প্রথা রহিত হয়ে গেছে।

পূর্ণিমায় পুরন্দরপুর গ্রামের রায়দের ও সাহা মোড়লদের পুজা মানসিক ও বলি হয়। উল্লেখ্য ধর্মরাজের সামনে বলি হয় না। একটু আড়ালে হয়। ভক্ত্যারা মদের ভাঁড়াল ভরে নিয়ে এসে ভর নামে। পরদিন চড়ক। পূর্বে বাণ ফোঁড়া হত। এখন ধূপবাণ হয়। দেবতার বাহন একটি কাঠের ঘোড়াকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নৃত্য, গীত, প্রদক্ষিণ প্রভৃতির দ্বারা চড়ক দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে মেলাও বসে।

৫১। **জীবধরপুর** (থানা সিউড়ী) : কাঠের সিংহাসনে একটি শিলাখণ্ড ধর্মরাজ বলে পুজিত। মাল, ডুলে, বাগদী সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা হয়। সংখ্যা অনির্দিষ্ট। পুজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় পুজা হয়।

পুজার আগের দিন বাণগোঁসাইকে নিয়ে স্নান করাতে যায়। স্নান করিয়ে ফিরে এসে অগ্নিকুণ্ড রচনা করে ভক্ত্যারা প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের সময় একটি শ্লোক আবৃত্তি করে—"ধরম পাট……চরণে প্রণাম" (শ্লোক-পাঁচালী অধ্যায় দ্রঃ) এইভাবে শ্লোক আউড়ে চারিদিকের ধর্মরাজদের বন্দনা করা হয়। আবৃত্তির শেষে অগ্নিকুণ্ডকে পায়ে করে সকলে দলে দেয়। গভীর রাত্রে সেদিন বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ফল ভেঙ্গে আনে।

পূর্ণিমার দিন সকালে পুজা। সামনে ছাগ ও মেষ বলিদান। পুজা অন্তে ঢাক ঢোল বাজিয়ে ধর্মের মাথায় পদ্মফুল চাপিয়ে দেওয়া হয়। একটি ফুল নাকি গড়িয়ে পড়ে। সমবেত ভক্ত্যারা ধর্মরাজের নামকীর্তন করতে থাকে। এরপর ভাঁড়াল নড়ানো। শুঁড়ি বাড়ীতে ভক্ত্যারা যায়। পাঁচসিকা দক্ষিণা দিলে সকলের ভাঁড়ে পচুই মদ পূর্ণ করে দেয়। তারপর গ্রামে আসে এবং গ্রামের রাস্তায় প্রধান প্রধান জায়গায় সেগুলি নিয়ে আবেশ হয়। যারা চারদিনের জন্য উপবাসী থাকবে তারাই এ খেলা করে। স্ত্রীপুরুষ সবাই থাকে। চতুর্দশীর দিন পুরুষরা উত্তরীয় নেয়। পূর্ণিমার দিনের জন্য যারা উপবাস করে তারা দুধ ভাঁড়াল নেয়। খেলা শেষ হয়ে গেলে অবশিষ্ট মদ্যটুকু বাণেশ্বর যেখানে থাকেন, সেখানে গিয়ে ঢেলে দেয়। এদিনও তারা ভাত খায় না। সন্ধ্যায় ছোলা, গুড়, শশা ও মদ্য গ্রহণ করে।

পুজার দিন বাণগোঁসাইকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে গ্রামবেড়া উৎসব হয়। গৃহস্থ বাড়ী থেকে চাল ও পয়সা দেয়। সন্ধ্যায় ফিরে এসে আবার বাণগোঁসাইকে স্নান করায়। তারপর হয় চড়ক। চড়কের পর পুনরায় আগুন খেলা হয়।

পরের দিন দুপুরে বাণগোঁসাইকে ধর্মরাজের স্বত্বাধিকারী বাড়ী নিয়ে যায় এবং তেল সিঁদূর মাখিয়ে গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘোরে। তারপর পুকুরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে উত্তরীয়-গুলি খুলে, হয় বাণগোঁসাইকে প্রদান করে, নয় জলে বিসর্জন দেয়।

ধর্মরাজের সঙ্গে শিব আছেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজা। ধানমাঠে গাড়সে ষষ্ঠীর পূজা হয় (ডাক ষষ্ঠী)। গ্রামের শেষপ্রান্তে গ্রামদৈত্য আছেন। ব্রাহ্মণের পূজা। ১লা মাঘ। পালোয়ান নামে একজন ব্রহ্মচারী আছেন আঁকড় গাছের তলায় গ্রামের প্রান্তে। (তুঃ হাঁটু পালোয়ান, গ্রাম পতণ্ডা) বাউরীরা ১লা মাঘ পুজা করে থাকে। তাছাড়া ব্রাহ্মণরা রাধাষ্টমীর দিন মনসার পুজা করেন।

নিকটস্থ নহোদরী গ্রামে দাঁতিনতলায় আছেন দন্তেশ্বরী দেবী। এটি একটি উপপীঠ। কথিত হয় সতীর দন্ত এখানে পতিত হয়েছিল। (চণ্ডীকবচ উল্লেখ্য—দন্তং রক্ষতু কৌমারী।)

৫২। **গজালপুর** (সিউড়ী থানা, পোঃ পাম্বুড়িয়া) : এই গ্রামে ধর্মরাজ আছেন গ্রামের উত্তরদিকে এক পুকুরের পাড়ে। ছোট বড় সাতটি শিলাখণ্ড আছে। দুটি বড় কাঠের ঘোড়া আছে। ডোমের প্রতিষ্ঠা। পূজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পুজা। ত্রয়োদশীর দিন ভক্ত্যারা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। পরদিন উত্তরীয় ধারণ ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করে দেবগোত্র ধারণ। ভক্ত্যারা হাতে বেতের ছড়ি নিয়ে অবিরত ধর্মরাজের নাম করতে থাকে। একজন ভক্ত্যা ধর্মরাজকে মাথায় করে গ্রামে নিয়ে আসে। দুই তিন জায়গায় আবেশ হয়। গ্রামের পুর্বে মণ্ডল পুকুরে ধর্মরাজের স্নান ও পুজা হয়। তারপর ধর্মরাজের নাম উচ্চারণ করতে করতে দেবতাকে প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ করা হয় ৭।৯ বার। সঙ্গে জোড়া ঢাক থাকে। তৃতীয় দিন অর্থাৎ পুজার দিন ধর্মরাজের পূজা, বলি ও হোম হয়। একজন ভক্ত্যার মাথার উপর ভোগ রান্না করা হয় (তুলনীয় সিঙ্গুর)। পুজার আগের দিন ভক্ত্যারা ফল সংগ্রহ করে। প্রতিপদে চড়ক হয় ও ভক্ত্যাদের খাওয়ানো হয়। চতুর্থ দিনে বাণেশ্বরকে নিয়ে প্রতি গৃহে পুজা ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। এর পর ভক্ত্যারা জলক্রীড়া করে। পুজার দিনে হোমের পর সম্মুখে পাঁঠা বলি হয়। তারপর ভাঁড়াল দেওয়া। ভাঁড়ালের পর ধর্মরাজের মাথায় ফুল চড়ানো হয়। ভক্ত্যারা একপায়ে দাঁড়িয়ে দেবতার নাম স্মরণ করতে থাকে। সন্ধ্যাবেলা বাণামো হয়। একে মাণিকধোয়াও বলে।

অন্যান্য—ধর্মতলার অতি সন্নিকটে জলেশ্বর শিবের পুজা হয় (তুলনীয় "কোমা")। ধর্মতলার কিছু দূরে ষষ্ঠীতলা আছে। পুজা হয় জ্যৈষ্ঠে। তাছাড়া গ্রামে মনসা, শীতলা ও কালী আছেন।

৫৩। **কালীপুর** (সিউড়ী থানা): সিউড়ীর ১½ মাইল পশ্চিমে। টিনের ঘরে দুটি গোলাকার শিলাখণ্ড, চাঁদ রায় ও তুলো রায় নামে পূজিত হন জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমায়। নিকটে তিনটি মনসা শিলা। নাম, বড়-মা, মধ্যম-মা এবং ছোট-মা। এই মনসার পুজা হয় দশহরার দিন এবং বৈশাখে কোনো শুভ দিনে। মণসা পুজায় বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল গাওয়া হয়। এই ধর্মরাজের নিকট দুটি কাঠের ঘোড়া আছে। বাণেশ্বর নেই। দেয়াশী ধীবর, পূজারী ব্রাহ্মণ। পুর্বে ধীবররাই পুরোহিতের কর্ম করত।

পূর্ণিমার আগের দিন ধর্মরাজকে একটি হাতির পিঠে চড়িয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে এনে গ্রামের বারোয়ারী পূজামণ্ডপে আনা হয়। করিধ্যার মালপাড়ার ধর্মরাজ ও বাণগোঁসাইকেও আনা হয়। সন্ধ্যাবেল ঐ বাণগোঁসাইকে নিয়ে গিয়ে মুক্তস্নান করানো হয়। ভক্ত্যারা গলায় উত্তরীয় ধারণ করে এসে ধর্মতলায় আগুনের ফুলখেলা করে। পুর্ণিমার দিন বেলা দশটার সময় পূজা ও বলিদান। বলিদানের পর ধর্মরাজ ও মনসার মাথায় একত্রে পদ্মফুল চড়ানো হয়। তারপর মাণিকভাঁড়াল নামে মস্ত একটি ভাঁড়ালকে আনা হয়, দেয়াশীর বাড়ী থেকে। ঐ ভাঁড়ালে এলাচ, লবঙ্গ, বাখর, পাকা কলা, আতপ, পান, সুপারি ইত্যাদি দিয়ে মাঠ তৈরী করতে দেওয়া থাকে। ঐ ভাঁড়ালটিকে ভক্ত্যারা ঢাক বাজিয়ে নিয়ে আসে। ধর্মতলায় একটি জায়গায় আলপনা দেওয়া হয়। ভাঁড়ালটিকে সেখানে নামানো হয়। ভক্ত্যারা ধর্মের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এবং ঢাক বাজাতে বাজাতে মন্ত নাকি উথলে উঠতে থাকে। এরপর ভক্ত্যারা পুকুরে গিয়ে ভাঁড়াল পূর্ণ করে। আগে মদের দোকানে গিয়ে মদ দিয়ে পূর্ণ করত। ভাঁড়াল মাথায় নিয়ে ভক্ত্যারা ভর হতে হতে আসতে থাকে। সন্ধ্যাবেলা একটি হাতির পিঠে চড়ে ধর্মরাজ স্নান করতে যান। সঙ্গে এক কলসী বারি নিয়ে যাওয়া হয়। স্নানের পর ধর্মরাজ এক পথে যান এবং বারিবাহক ভিন্ন পথে যায়। সে কাঁখে বারি নিয়ে আবিষ্ট হতে হতে আসে। পরদিন চড়ক। সকালবেলা ভক্ত্যারা হাতে বেত ও সঙ্গে বাণগোঁসাই নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। সন্ধ্যায় ধর্মরাজকে নিয়ে চড়কগাছ প্রদক্ষিণ। পূর্বে 'পচাধরম' নামে আর একজন ধর্মরাজ গ্রামের পাঠশালা পাড়ায় ছিলেন। এখন তাঁর সব কিছুই লোপ পেয়েছে।

৫৪। **কচুজোড়** (সিউড়ী থানা) : সিউড়ীর ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখানে তিনটি ধর্মপূজার স্থান আছে। যেটি ভালরকম চালু আছে সেই ধর্মবেদীতে অনেকগুলি শিলাখণ্ড। এঁদের প্রত্যেকেরই নাম আছে কিন্তু আজ আর কারও সে নাম মনে নেই। সেবাইত বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলায় অনেকগুলি কাঠ ও মাটির ঘোড়া, বাইরে একটি চারচালা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পূজা হয়। ধর্মরাজের নাম বুড়ো রায়। পূর্বে আগুনখেলা, বাণফোঁড়া ইত্যাদি হত, এখন হয় না। চতুর্দশীর দিন, বার। ভক্ত্যারা একবেলা আহার করে। স্নান, ক্ষৌরকর্ম ও উত্তরীয় ধারণ, পরদিন উপবাস। পূজার দিনে শুঁড়ির দোকানে ভাঁড়াল আনতে যায়। ভাঁড়াল নিয়ে এসে একটি গোবর নিকানো ও আলপনা দেওয়া জায়গায় একটি খড়ের বিড়ের উপর ভাঁড়টিকে রেখে সিঁদুর ও মাল্য প্রদান করে। তারপর সমস্বরে সকলে ধর্মরাজকে আহ্বান জানাতে থাকে। ঢাক বাজে। এইভাবে ডাকতে ডাকতে ভাঁড়ালের মদ নাকি উথলে উঠে মাটিতে পড়ে। তখন তারা মনে করে যে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। তারপর মূল ভক্ত্যা বা দেয়াশীর ভাঁড়ে খানিকটা মন্ত দিয়ে অপরের ভাঁড়েও দেওয়া হয়। আমের শাখা তার উপর দিয়ে প্রত্যেকে ভাঁড় মাথায় তুলে নেয়। তারপর ধূপধূনা দিয়ে এক একজনকে হতচেতন করা হয়। চৈতন্য ফিরে এলে তারা মন্দিরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এরপর তারা ভাঁড় নামিয়ে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন হোম, বলিদান প্রভৃতি হয়। বলি হয় দু জায়গায়। ধর্মতলার পিছনে গ্রাম্যদেবী দক্ষিণাকালীর মন্দির আছে। ধর্মরাজের পর বলি ঐ

কালীর সম্মুখেও হয়। ঐ কালীর নিকটেও একজন ধর্মরাজ ও ভৈরব আছেন। বুড়ো রায়ের পুজার সময় এই ভৈরব ও ধর্মরাজ ঐখানে কয়দিনের জন্য যান। (ঐ কালী বহুকালের। মূর্তি ধাতব। ওঁর আদেশে ঐ গ্রামে কোনো দেবদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়া নিষেধ। গ্রামে মনসা নেই এবং বাইরের কোনো মনসারও ঐ কালীর আদেশে আসা চলে না। ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

সন্ধ্যাবেলা ধর্মশিলাখণ্ডগুলি কাঠের সিংহাসনে বসিয়ে ও বাণেশ্বরকে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। একে বাণামো বলে। তারপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে (বড় ডাঙ্গালে) ধর্মরাজকে রেখে লাঠিখেলা, সং ইত্যাদি হয়ে থাকে। ধর্মরাজকে মাথায় রেখে যে মূল ভক্ত্যা দাঁড়িয়ে থাকে তার আবেশ হয়। সে নানারকম কথা বলতে থাকে। (এ সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনা নির্দিষ্ট অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

গ্রামে একটি শিবমন্দির। পাশে শিবপুকুর। সেখানে একটি বটবৃক্ষের নিম্নে আর একজন ধর্মরাজ ও ভৈরব আছেন। এখানে বলি হয় না। শিবচতুর্দশীতে শিবের উদ্দেশ্যে যখন তেল পোড়ানো হয় তখন ধর্মরাজ ও ভৈরব পুজা পান। এঁকে নড়ানো হয় না বা বৈশাখী পূর্ণিমায় পুজা করা হয় না। কচুজোড়ের মূল ধর্মরাজ জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমায় তাঁর ভ্রমণের সময় এঁর সঙ্গে দেখা করে যান। নিকটবর্তী আড়াডাঙ্গালির ধর্মরাজও এসে সাক্ষাৎ করেন, বারের দিন সন্ধ্যাবেলায়।

কচুজোড়ের উত্তর সীমানায় একটি আঁকড় গাছতলায় কতকগুলি শিলাখণ্ড পড়ে আছে। মাটির ঘোড়াও বর্তমান। এখানেও একজন অপ্রকাশিত ধর্মরাজ আছেন। এখানেও ধর্মরাজকে নিয়ে যাওয়া হয়। জায়গাটির নাম লটাতলা। (তুঃ—গোবর লোটনতলা, কামারহাটি)। এখানে লটাবুড়ি নামে একজন অপদেবী থাকেন। বর্তমানে এঁর পুজা হয় না। এখানে একটি শিবলিঙ্গও ছিল। সেটি উত্তরবর্তী সংগ্রামপুরের এক ব্রাহ্মণ নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাউরী পাড়ায় আছেন মা-চণ্ডী। আ-ক্ষেণ দিবসে বাউরীরাই পুজা দেয়। কচুজোড়ের পূর্বে মহুবোনা গ্রাম যাবার পথে একটি শাল, বাঁদর লাঠি, একটি বট ও নানাপ্রকার বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন স্থানে আছেন দ্বারবাসিনী দেবী। কয়েকটি শিলাখণ্ড ও ঘোড়া। আ-ক্ষেণ দিবসে এঁর পুজা হয়। কচুজোড়ের পশ্চিমে শাল জঙ্গলে আছেন বাঘরায় চণ্ডী। আগে সংগ্রামপুরের জমিদার চৌধুরীরা পুজা করতেন। এখন পুজা বন্ধ। তাছাড়া রাজা রুদ্রচরণ রায়ের (১৮-শ শতাব্দী) ভিটেতে কচ্চিকাদেবীর আটন আছে। মূর্তি অপহৃত। শ্লেট জাতীয় পাললিক শিলা নির্মিত সুন্দর খাঁজকাটা শিলাসনটি বর্তমান। অনাবৃষ্টির কালে এই দেবীপীঠে জল ঢাললে নিকটবর্তী দীঘি দে-বাঁধে সেই জল পৌছানোর পরই বৃষ্টি নামে বলে প্রবল লোকবিশ্বাস বর্তমান।

৫৫। **ইন্দ্রগাছা** (থানা সিউড়ী): সিউড়ী থেকে ৪ মাইল পূর্বে। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে মাল এবং সাহাশ্রেণীর বস্তির নিকটস্থ উন্মুক্ত স্থানে মাটির ঘরে ধর্মরাজ আছেন। প্রতিষ্ঠাকাল অজ্ঞাত। জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমায় ধর্মরাজের পুজা হয়। বর্তমান পুজারী যমের ধ্যানেই পুজা করেন এবং শেষকালে "ধাং ধীং ধর্মরাজায় নমঃ" বলে থাকেন। পূর্ব পার্শ্ববর্তী গ্রাম পুরন্দরপুরের ধর্মপুজার উপর এই ধর্মরাজের পুজা নির্ভর করে। পুরন্দরপুরের পুজার পরের পূর্ণিমায় হয়। পুরন্দরপুর থেকে চতুর্দশী তিথিতে কয়েকজন ভক্ত্যা ও একজন ঢাকী ধর্মঠাকুরের একটি কাঠের

ঘোড়া নিয়ে আসে। এই ঘোড়া আনার জন্য পুরন্দরপুরের সেবাইত ইন্দ্রগাছার ভক্ত্যাকে দুই আনা পয়সা ও ধূপধূনো দিয়ে থাকে। এই ঘোড়াই ইন্দ্রগাছায় ধর্মরাজ রূপে পুজিত হন। পৃথক কোনো বিগ্রহ নেই।

জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন সদ্‌গোপ, সাহা, মাল, হাড়ি, ডোম, প্রভৃতি শ্রেণীর ভক্ত্যারা ধর্মরাজ পুজার জন্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। চতুর্দশীর দিন ফল, জল। পুর্ণিমার দিন থেকে তারপরের দিন বেলা ১০-১১টা পর্যন্ত কিছু খায় না।।

চতুর্দশীর দিন বাণামো উপলক্ষ্যে ধর্মরাজমন্দির মধ্যে অবস্থিত বাণেশ্বরকে পুর্বপ্রান্তে অবস্থিত ৪০০ গজ দূরে খড়মা দীঘিতে স্নান করিয়ে নিয়ে আসে। তারপর রাত্রি গভীর হলে পরে ভক্ত্যারা "ফুলখেলা" ও "ফলভাঙ্গা" অনুষ্ঠান করে।

পুজার দিন বেলা বারোটার সময় "ভাঁড়াল লাড়া" (নাড়া) হয়। অর্থাৎ ভক্ত্যারা একটি করে মাটির কলসী নিয়ে ঢাকের সঙ্গে ধর্মরাজমন্দিরের বায়ুকোণে প্রায় ৫০০ গজ দূরে বড় দীঘিতে যায় এবং প্রত্যেকে ঐ কলসী মধ্যে মদ্যমিশ্রিত জল মাথায় নিয়ে ঢাকের তালে তালে মন্দিরে ফিরে যায়। এই সময় প্রচুর ধূপের ধোঁয়া ভক্ত্যাদের নাকের কাছে দেওয়া হয়। ফলে তারা আবিষ্ট হয়ে পড়ে। ভর নামা ব্যক্তি যদি মন্দিরের দিকে অগ্রসর না হয়ে পিছনে হাঁটতে শুরু করে তাহলে তাকে অমঙ্গলের দ্যোতনা বলে গণ্য করা হয়।

(খ) এর মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুজা সমাপ্ত করেন। ভাঁড়াল নাড়ার দল ফিরে এলে ঐ কলসীগুলি বাইরে রাখা হয় এবং সেই সময় ছাগ বলি ও হোম হয়। ঐদিন সন্ধ্যাবেলা ভক্ত্যারা তেলপোড়া অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়। তারপর সকল ভক্ত্যা ঢাকীসহ বড় দীঘিতে যায় এবং তাদের সঙ্গে থাকে পুর্বকথিত ঘোড়াটি, একটি লোহার ত্রিশূল, কিছু ন্যাকড়া, সরিষার তেল ও ধূনা। কিছুক্ষণ পর তারা ঐ জায়গা থেকে গ্রামের মধ্যপথ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। একজন ভক্ত্যা মাথায় ভিজা কাপড় জড়িয়ে তার মধ্যে লোহার ত্রিশূলটি ধরে থাকে। ত্রিশূলের মুখে ন্যাকড়া জড়িয়ে তৈলসিক্ত করা হয়। ঐ ত্রিশূলের মুখে আগুন দেওয়া হয়। ঐ ভক্ত্যাটি জলন্ত ত্রিশূল মাথায় নটরাজের ভঙ্গীতে অগ্রসর হয় আর মাঝে মাঝে ঐ অগ্নিতে ধূনার গুঁড়ি নিক্ষেপ করে অগ্নির ভয়াবহ রূপ দেখানো হয়। ঢাকীরা ঢাক বাজায়। অন্য ভক্ত্যারা "জয় বাবা রাজরাজেশ্বর—ব্যোম···ব্যোম" বলে চলে যায়। সারা পথ এইভাবে হেঁটে এসে মন্দিরে পৌছে জলন্ত ত্রিশূল মন্দিরের বাইরে রেখে ধর্মরাজ মন্দিরের চৌকাঠ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম শিওরে ভক্ত্যারা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। প্রথম ভক্ত্যা শুলে পর তার নাভিকুণ্ডের পার্শ্বে মাথা রেখে পর পর ভক্ত্যারা চিৎ হয় শুয়ে পড়ে। যে ভক্ত্যার কাঁধে ঘোড়া ছিল সেই ভক্ত্যাটি সর্বশেষ শায়িত ভক্ত্যা থেকে সুরু করে প্রত্যেকের বুকে পা রেখে মন্দির পর্যন্ত গিয়ে ঘোড়াটি বেদীর উপর রক্ষা করে।

পরদিন বেলা ১০টার সময় স্নান করে ভক্ত্যারা ধর্মরাজকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ব্রত ভঙ্গ করে। সন্ধ্যাবেলায় ঐ ভক্ত্যারা পুনরায় ধর্মরাজ মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে বাঁধাপুকুরে ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়। একে বলে চড়ক দেওয়া। ঘোড়াটিকে ঐ জায়গায় রেখে হাত জোড়

করে নতভাবে বৃত্তাকারে ৫ বার প্রদক্ষিণ করে। তারপর ফিরে এসে ঘোড়াটিকে মন্দিরে রেখে সেই বছরের মত পুজা সমাপ্ত করে।

পুরন্দরপুর থেকে আনীত ধর্মঘোড়াটি সারা বছর ঐ মন্দিরেই থাকে। পরের বছর ত্রয়োদশীর দিন ঐ ঘোড়াটিকে ষষ্ঠীতলায় নিক্ষেপ করে আবার নতুন ঘোড়া আনা হয়। এই রীতি প্রাচীন। গ্রামে তাছাড়া আছেন বাঘরায় চণ্ডী।

(গ) গ্রামে আখের শাল যখন বসে তখন একটা আলাদা গুড়ের হাঁড়ি ধর্মরাজের নামে টাঙ্গানো হয়। সেই গুড় ধর্মরাজের পুজারী পান। নবান্নের দিন গ্রামবাসীরা শিব, কালী ও ধর্মরাজের পুজা দিয়ে থাকেন।

৫৬। **(বড়)সাংড়া** (থানা সাঁইথিয়া) : সিউড়ী-আহমদপুর রাস্তায় সিউড়ী থেকে দশ মাইল ...

ধর্মরাজের নাম পুরন্দর (পুরন্দরপুর স্মর্তব্য) পূজা বৈশাখী পুর্ণিমায়। ব্রাহ্মণ পুজা করেন। প্রথম দিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় পরম ভক্ত্যার ভর হয়। ভর অবস্থায় পুজার অনুষ্ঠানে দেবতার কি বস্তু প্রয়োজন তা বলে থাকেন। দ্বিতীয় দিন সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় সাতজন ভক্ত্যা বাণেশ্বরকে পুকুর ঘাটে ধরাধরি করে নিয়ে যায়। বাণেশ্বরের সঙ্গে তারা পর পর নয়বার স্নান করে। পূজার পর বাণেশ্বরের উপর পাটভক্ত্যা শুয়ে পড়ে। অন্যান্য ভক্ত্যাবাহিত হয়ে সে মন্দিরে নীত হয়। কিছু ভক্ত্যা মুক্তস্নানের পর পাঁজর বাণ, জিহ্বাবাণ ইত্যাদি ফোঁড়ে। ঐ বাণগুলির আগায় আগুন জ্বালিয়ে ধূপ ছিটানো হয়। ঢাক ঢোল বাজতে থাকে। মন্দিরের নিকট এসে বাণগুলি খুলে ফেলা হয়। পুরন্দরপুরের মত বনবেড়া উৎসবও আছে। রাত প্রায় দেড়টা-দুটোর সময় ধর্মরাজকে কাঠের ঘোড়ার উপর বসিয়ে কয়েকজন ভক্ত্যা সেই ঘোড়া কাঁধে করে পার্শ্ববর্তী গ্রাম মালিগ্রামে যায়। দুই গ্রামের ধর্মরাজদের মুখোমুখি দেখা হয়। এই অনুষ্ঠানটির নাম ধর্মসম্মেলন। এরপর ফিরে এসে ভক্ত্যারা জল গ্রহণ করে। তৃতীয় দিনেও ভক্ত্যারা উপবাসী থাকে। সকালে পুকুরঘাটে গিয়ে তারা এক একটি ভাঁড়ালে জল ভর্তি করে সারি সারি দাঁড়ায়। প্রথামত ধূপের ধোঁয়া দিয়ে ও ঢাক পিটিয়ে ভক্ত্যাদের অচৈতন্য করে ফেলা হয়। অচৈতন্য দেহগুলি ধরাধরি করে ধর্মতলায় আনা হয় এবং তাদের চেতনা সম্পাদনা করা হয়। এরপর ধর্মরাজের পুজা আরম্ভ হয়। পুজার পর বলিদান এবং তারপর বাইরে গিয়ে ভক্ত্যারা চড়ক অনুষ্ঠান করে।

৫৭। **বেলিয়া বা বেলে** (থানা সাঁইথিয়া) : আহম্মদপুর রেল ষ্টেশানের দুই মাইল ঈশানে। ধর্মরাজের নিজস্ব কোনো নাম নেই। দুটি পুকুরের পাড়ে একটি উঁচু ঢিবির উপর ধর্মরাজের পাকা মন্দির। পাশে ভগ্নপ্রায় মৃত্তিকাপ্রোথিত একটি শিবলিঙ্গ। তার পাশে কালী মন্দির। এই কালীর মূর্তি গড়ে অগ্রহায়ণে এবং কার্তিকে পুজা হয়।

ধর্মশিলা দুটি। একটি আদি। পুরোহিত জানালেন আদি শিলার নীচের অংশ মুণ্ডহীন হেলানো একটা মনুষ্য দেহের উপর স্থাপিত। সিঁদুরাদি পরিষ্কার করলে দৃষ্ট হয়। পার্শ্ববর্তী পুকুরের নাম গদাপুকুর। এই পুকুরে স্নানাদি করে আষাঢ় মাসের রবিবারে এবং প্রতি

রবিবারে ধর্মরাজের স্বপ্নাচ্ছ তৈল এবং কবচাদি ধারণ করলে বাতব্যাধি আরোগ্য লাভ করে বলে বিশ্বাস। এই উপলক্ষ্যে বেলে গ্রামের ধর্মরাজ অতি প্রসিদ্ধ। অজস্র বাতব্যাধিগ্রস্ত লোকের সমাগম প্রতি রবিবারে হয়ে থাকে। এই ঔষধ স্বপ্নাচ্ছ। ধর্মরাজের মূল পুজা বৈশাখী পুর্ণিমায়। ব্রাহ্মণ পুজা করেন। দেবাংশীরা সদ্‌গোপ। তারাই পূর্বে পুজা করত কিন্তু বর্তমানে নানাপ্রকার বৈষয়িক মামলা মকর্দমায় তারা আর ধর্মরাজকে স্পর্শ করবার অধিকার পায় না। তারা নিজের ঘরে প্রতিকৃতি গড়ে পুজা করে এবং বাত রোগাক্রান্তদের ঔষধ দেয়। সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা এই তিন সময়ে নিত্য পুজা হয়।

বৈশাখী পুর্ণিমায় ৩০।৪০ জন সব সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা হয়। মেয়েরাও থাকে। পুরুষদের একজনকে পাঁচদিন আগে থেকে উপবাস করতে হয়। বাদবাকী ৪ দিন আগে থেকে করে। পুজার আগের দিন সন্ধ্যায় ল্যাগড়া ভাঙ্গা হয়। অর্থাৎ বাবলার ডাল বিনা অস্ত্রে ভেঙ্গে আনতে হয়। এদিন বাণেশ্বরকে পুকুরে নিয়ে স্নান করানো হয়। এর নাম দাতুড়ী ঘাটা। ৫ দিন ভক্তের উত্তরীয় এইদিন হয়। ২য় দিন ধর্মরাজ গ্রামের বাইরে আসেন। এদিনও দাতুড়ীঘাটা হয়। বাণগোঁসাই, ধর্মরাজ ও চারজন ভক্তের সেদিন উত্তরীয় হয়। পুকুরঘাটে ৪র্থ দিনে যেদিন উত্তরীয় হয় সেদিন বাণেশ্বর জলে যান। ঘট ভাঁড়টিকে একটি লোক মাথায় নিয়ে জলে বসে। তারপর বাণেশ্বরের মাথায় জল দিয়ে সেই ঘটটিকে পুর্ণ করা হয়। (দুধ-গঙ্গাজল দিয়ে পুর্ণ করার বিধি)। তারপর বাণেশ্বরের উপর একটি লোক চড়ে আসে। এ সময় তার কোনো চেতনা বা জ্ঞান থাকে না। পুর্ণিমার পরদিন বাণেশ্বর ঘরে ঘরে বের হন। ভক্ত্যারা ঢাক ঢোল সহ সঙ্গে যায়। প্রতি বাড়ী থেকে তেল সিঁদুর ও ভক্ত্যারা পায়ে জল ও পয়সা পায়। ঐদিন সন্ধ্যার সময় ধর্মরাজকে একটি কাঠের ঘোড়ার উপর চড়িয়ে নাচানো হয়। পরদিন সন্ধ্যাবেলা ভাঁড়াল বিসর্জন হয়। পুর্ণিমার দিন বাণ ফোঁড়া হয়। একে বাণামো বলে। জিহ্বাবাণ, ধূপবাণ, হাতবাণও আছে।

ধর্মরাজের সঙ্গেই লোটন ষষ্ঠী আছেন। আশ্বিনে জিতু ষষ্ঠীর দিন গ্রামের মায়েরা পুজা দেন। গ্রামের তেঁতুলতলায় আদিড়া কালী (আদাড় অর্থে জঙ্গল) আছেন। কার্তিক অমাবস্যায় পূজা হয়।

৫৮। **জোল্ল** (সাঁইথিয়া থানা): এই গ্রামের উত্তর দিকে ডোম পাড়ায় অবস্থিত। দেয়াশী জাতিতে বাগ্দী, পুজারী ব্রাহ্মণ। ধর্মরাজের নাম পুরন্দর। ডোম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখী পুর্ণিমায় ধর্মরাজের পুজা হয়। বীজমন্ত্র—"ধাং ধর্মরাজায় নমঃ"। ধ্যানমন্ত্র—নির্দিষ্ট অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। পূজার পূর্বদিন ভক্ত্যারা উপবাস করে সন্ধ্যাবেলায় ধর্মরাজকে নিয়ে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বাঁধা পুকুরে স্নান করায়। একে বলে মুক্তস্নান। তারপর সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মন্দিরে আসে এবং ভোররাত্রে আগুন নিয়ে খেলা করে ও সেই আগুন ধর্মরাজের মাথায় চড়ায়। তার পরদিন পুজা ও হোম। এই সময় ভক্ত্যারা প্রত্যেকেই একটি মত্তসহ জলপুর্ণ কলস মাথায় নিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহ নৃত্য করে। এইভাবে নৃত্য করে ধর্মমন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করে সেই মত্তভাণ্ডকে ধর্মরাজের জয় দিয়ে নামায়। পরে ধর্মরাজের সামনে ছাগ বলি-

দানের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্ত্যারা প্রসাদ নিয়ে জল খায়। সেদিন তারা অন্ন গ্রহণ করে না। পরদিন গলার উত্তরীয় খুলে ব্রত ভঙ্গ করে এবং মত্স্যমাংস ভক্ষণ করে। ভক্ত্যারা সদ্‌গোপ, হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগ্দী সম্প্রদায়ের হয়। ধর্মরাজতলায় ভোরবেলায় কতকগুলি শুক্‌না কাঠ জোগাড় করে সেইগুলি ঘোরায় ও খেলা করে। মুক্তস্নান হতে আসার সময় দু'বগলে দুখানি লোহার বাণ ফুঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে ধূপ ছোঁড়ে।

অন্যান্য—বটতলায় কাঞ্চন কালী আছেন। ব্রাহ্মণের পূজা। বেলতলায় আছেন অন্নপূর্ণা ও ধরম। অন্নপূর্ণার নিত্য পুজা হয়। ধরমের পুজা করে বাগ্দীরা। (তুলনীয়, লায়েকপুরের "ধরম")।

দ্রষ্টব্য—নিকটবর্তী গ্রাম হাথোড়া, অমরপুর, দেরপুর, দেওয়াস, শালগড়িয়া, নিরিশা প্রভৃতি গ্রামে ধর্মপুজা আছে।

৫৯। **ঈশ্বরপুর** (সাঁইথিয়া থানা): ধর্মরাজের নাম সুন্দর রায়। আগে পুজারী ছিলেন গন্ধবণিক। এখন ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। মুক্তস্নান, দাদুড়িঘাটা, উত্তরীয় ধারণ, ফুলখেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান গতানুগতিক। পুজা উপলক্ষ্যে চারদিন ধরে মনসার গান হয়। কারণ ধর্মরাজের কামিন্যারূপে মনসা একত্রে অধিষ্ঠান করছেন। মনসার পুজা জ্যৈষ্ঠে। দেয়াশীর উপাধি দত্ত। ধর্মপুজার তৃতীয় দিনে ভক্ত্যারা মাঠ নিয়ে মারামারি করে। চতুর্থ দিনে গাছমঙ্গলা হয়। অর্থাৎ একটি গাছকে নাটাই-এর সুতো দিয়ে ৭ অথবা ৯ বার বেষ্টন করে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহ গাছটির চতুর্দিকে ধর্মরাজ মাথায় নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হয়। (মনসা পুজাতেও গাছমঙ্গলা হয় জ্যৈষ্ঠে)। তারপর দেবতার চড়ক হয়ে থাকে।

৬০। **লায়েকপুর** (লাবপুর থানা): এই গ্রামে ৮/১০টি ধর্মশালা আছে। সেগুলি একটি পিতলের গামলায় সারা বছর গ্রামের বড়ীদীঘি পুষ্করিণীর জলে ডোবানো থাকে। পুর্ণিমার পুর্বদিন বৈকালে ঢাক ঢোল সহকারে ভক্ত্যাদের উত্তরীয় দেওয়া হয়। (ধর্মরাজের আগে কোনো ঘর ছিল না। এখন টিনের ঘর করা হয়েছে। একটি দেড় হাত উঁচু কাঠের ঘোড়া ধর্মস্থানে বর্তমান।) উত্তরীয় নেওয়ার পর শোভাযাত্রা করে ভক্ত্যারা মন্দিরে আসে। সেখানে সন্ধ্যা ৮টা থেকে সমস্ত রাত্রি ধরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত দলের মধ্যে বোলান গান চলতে থাকে। এই রাত্রিকে জাগরণের রাত বলে। রাত্রে ভক্ত্যারা কাঁঠাল চুরি করে আনে। ভোরবেলা বাবলার ডাল পুড়িয়ে ফুলখেলা হয়। বৈশাখী পুর্ণিমায় মূল পুজা। দেয়াশী বাগ্দী। পুরোহিত ঘোষাল (ব্রাহ্মণ)। পুজার দ্বিতীয় দিন হয় যাদুরঘাটা। পুষ্করিণী থেকে সেই নিমজ্জিত পিতলের গামলা উদ্ধার করে পুজা-নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। বেলা ১০টার সময় ২০/২৫ জন ভক্ত্যা গামছা দিয়ে ভাঁড় বেঁধে নিকটস্থ যে কোনো পুকুর থেকে জল ভরে মাথায় নেয়। তারপর ঢাক ঢোল সহ নড়াতে নড়াতে গোটা গ্রাম ঘোরে। ধূপ দিয়ে ভর নামানো হয়। এই শোভা-যাত্রা বেলা ৩টা পর্যন্ত চলে। এর সঙ্গে বাণেশ্বরও যান। সিংহাসনের উপর ধর্মশিলাগুলিকে স্থাপন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। সেই সিংহাসনের বাহক ধীবর সম্প্রদায় কিন্তু দেয়াশী বাগ্দী। শোভাযাত্রা মন্দিরে পৌঁছাবার আগেই ধীবর বাহকগণ সিংহাসনটিকে মন্দিরে নিয়ে

যায় এবং পুজা আরম্ভ হয়। তখন বেলা ৩।৪টে। হোমের সময় মাটিতে একটি গর্ত করা হয়। সেই গর্তে বৈদিক পদ্ধতিতে হোম-কার্য সম্পাদনা হয়। পুর্বোল্লিখিত শোভাযাত্রা মন্দিরে পৌছে মন্দিরটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ভক্ত্যাদের হাতে থাকে বেতের ছড়ি। এরপর দেবতার সামনে ছাগবলি হয়। ছোট মেলাও বসে এইদিন।

পুজার পরদিন, দুইদিন আগের রাত্রে চুরি করে আনা কাঁঠালগুলি বিতরণ করা হয়। কতকগুলি ভক্ত্যা ঢাক বাজিয়ে দরজায় দরজায় চাল ভিক্ষা করে। সর্বশেষে ভক্ত্যারা দীঘির ঘাটে গিয়ে উত্তরীয় খুলে ফেলে দেয়। সন্ধ্যাবেলা বিভিন্নভাবে সঙ্ বের হয়। একে "কাপ" বলে।

দীঘির পাড়ে বেলতলায় কতকগুলি সিঁদুর মাখানো শিলাখণ্ড উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। পাথরগুলিকে "ধরম" বলা হয় এবং সংলগ্ন পুষ্করিণীও ধরমপুকুর নামে অভিহিত হয়। সম্ভবতঃ এদের কোনো পুরাতন ইতিহাস ছিল যা আজ লোপ পেয়েছে।

গ্রামের উত্তরে নিম, বেল ও শ্যাওড়া গাছের তলায় ব্রহ্মচারী আছেন। ১লা মাঘ ব্রাহ্মণে পূজা করেন। মেলা হয় ২রা। এদিন মহোৎসবও হয়।

গ্রামের উত্তরে বটতলায় সাহেব নামে একজন পীর আছেন। হিন্দু মুসলমানে বৃহস্পতি-বার পুজা দেয়। জিনিষপত্র হারালে সিন্নি দিলে তা পাওয়া যায় বলে লোকবিশ্বাস। মুসলমানের ছোঁয়া সিন্নি সকলেই শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে।

দক্ষিণা কালী আছেন দীঘির ঘাটে শিলাখণ্ডরূপে ইনি গ্রাম্য দেবী। বিজয়া দশমীর দিন পুজা হয়। শোনা যায় অনেক সময় রাত্রে ওখানে একটি অলৌকিক শ্বেত আলো পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া গ্রামে মনসা ও শিবের মন্দির এবং কার্তিক ও কালীর বেদী আছে। গোপালেরও একটি মন্দির আছে।

৬১। **দাঁড়কা** (লাবপুর থানা): এই গ্রামে তিন জায়গায় ধর্মরাজ আছেন। বাবুপাড়ায় পাকা ঘরে, রথতলায় টিনের ঘরে, পোদ্দার পাড়ায় খড়ের ঘরে। পোদ্দার পাড়ার দেয়াশীর উপাধি ভট্ট। অপর দুই স্থানের দেয়াশী বাগদী। পূজারী ব্রাহ্মণ।

(ক) পোদ্দার পাড়ায় ধর্মরাজের ৪টি শিলাখণ্ড। গোলাকার। নাম চাঁদ রায়, ফটিক রায়, লালা রায় ইত্যাদি। দেয়াশীর নাম মুক্তিপদ বাগদী। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পুজা। ধর্ম-রাজের সঙ্গে নারায়ণ শিলা আছে। পূজার পূর্বদিনে ভক্ত্যাদের মুক্তস্নান, উত্তরীয় ধারণ। পুর্ণিমার দিনে ধর্মশিলাদের স্নান, পুজা, বলি। তৃতীয় দিনে নীল পুজা এবং বৈকালে পুনরায় মুক্তস্নান। মুক্তস্নানের পর আবার পুজা হয় বলি হয় না। ধর্মরাজের অনুষ্ঠানে বোলান গান হয়।

(খ) বাবুপাড়ার ধর্মরাজদের নাম লালা রায়, কালা রায়, কটা রায়। দেবাংশীর পুর্বপুরুষ বুদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করে বুদ্ধ মূর্তি অপসারণ করে বর্তমানের এই পুজা প্রতিষ্ঠা করেন বলে শ্রুত হয়। বৈশাখী পুর্ণিমায় পুজা। সকল সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা হয়। উত্তরীয় ধারণ, উপবাস, মুক্তস্নান প্রভৃতি মামুলি অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। নিশা জাগরণ, আগুন খেলা, শেষরাত্রে দক্ষিণা কালীর চামুণ্ডা মূর্তি ধারণ করে নৃত্য করে। বাণফোঁড়া আগে হত, এখন হয় না। ধর্মরাজের সঙ্গে মনসা আছেন পোদ্দার পাড়ায়। বৈশাখী পুর্ণিমায় মনসার পুজা। অবশিষ্ট স্থানে কেবলই

ধর্মরাজ আছেন। পোদ্দার পাড়ার ধর্মরাজের স্নান ময়ূরাক্ষী নদীতে বিল্ববানের ঘাটে। রথতলার ভাগল পুকুরে এবং বাবুপাড়ার বড় নতুন পুকুরে স্নান হয়। বলি হয়। ধর্মপূজায় বোলান গীত হয়ে থাকে সারারাত্রি ধরে। দাঁড়কা গ্রামের মধ্যস্থলে বটবৃক্ষমূলে ব্রহ্মদৈত্য, অশ্বত্থতলে ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, দণ্ডকেশ্বর শিব, বিশেষ ভৈরব, রটন্তী কালী, সন্ন্যাসী গোঁসাই ইত্যাদির নিত্য পূজা হয়। দণ্ডেশ্বর শিবঠাকুর প্রাঙ্গণে তুই জায়গায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন, বহু মহাপুরুষের সমাধি আছে। দণ্ডকেশ্বরের স্বপ্নাদ্য ঔষধে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য লাভ করে বলে লোকশ্রুতি আছে। ১লা মাঘ ব্রহ্মদৈত্য পূজা ও মেলা হয়।

দ্রষ্টব্য—পার্শ্ববর্তী শাঁখপুর ও শ্যামপুরে ধর্মপূজা আছে।

৬২, ৬৩। **কালুহা, জগদীশপুর** (রামপুরহাট থানা, পোঃ কালুহা): একটি নিমগাছের নীচের বেদীতে ধর্মরাজ আছেন। ৩০।৪০টি শিলাখণ্ড। আলাদা কোনো নাম পাওয়া যায় না। কতকগুলি মূর্তির মুখ, চোখ, নাক আছে। ধর্মের সঙ্গে আছেন শিব ও কালী। দেয়াশী সাহা (শুঁড়ি)। ধর্মের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে (যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)।

পূর্ণিমার আগের দিন ভক্ত্যারা পাঁচালী গেয়ে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে। সন্ধ্যাবেলা স্নান করে গ্রামের সব ঠাকুরকে জল দিয়ে বেড়ায়। মোট ২১ জায়গায় জল দিতে হয়। ঐ জলদানকে ৺কাচমাড়া বলা হয়। জলদান শেষ করে ভক্ত্যারা ফল জল খায়। পূর্ণিমার সকালে প্রায় বেলা ১০টা পর্যন্ত পূর্বদিনের বাকী বাড়ীগুলি ঘুরে পাঁচালী গান গেয়ে ভিক্ষা করে। তারপর উপবাসী ভক্ত্যারা স্নান সেরে ধর্মরাজের সম্মুখে উপবেশন করে। ব্রাহ্মণ পূজা ও হোম করেন। স্নানের সময় একটি পুকুর থেকে চড়ক গাছ তুলে নিয়ে আসে। সেই চড়ক গাছের পূজাও ঐ সঙ্গে হয়। হোমের পর ছাগ বলি হয়। তারপর ভক্ত্যারা প্রসাদ গ্রহণ করে, পুকুরে গিয়ে জলে নেমে ঐ প্রসাদ খেয়ে জল খায়। বেলা ২ টার সময় থেকে ঢাক বাদ্য সহকারে ঐ শিলাখণ্ডগুলি (ওজন প্রায় ৩ মন) নিয়ে পুকুরের জলে স্নান করিয়ে আনে। ঐ পুকুরের কাছেই মূর্তিগুলোর পূজা হয়। ঐ মূর্তিগুলিকে পূর্বোল্লিখিত শুঁড়িবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পূজা করে। তারপর শুঁড়ি ঐ ঠাকুরকে ধরে দেয়াশীর মাথায় তুলে দেয় এবং প্রতিটি ভক্ত্যার মাথায় এক ভাঁড় করে মদ দেয়। তখন উপবাসী ভক্ত্যারা ঠাকুর ও মাথায় মদ নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। প্রতিটি ভক্তের আবেশ হয়। দেবাংশীর আবেশ আপনা থেকেই আসে। শেষে ঠাকুরদের ঐ গাছতলায় এনে রাখা হয়। তারপর ভক্ত্যারা জল খায়। তৃতীয় দিনে সন্ধ্যা বেলা ভক্ত্যারা নানারকম সাজ পোষাক পরে আমোদ প্রমোদ করে এবং পাঁচালী গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। ঐ দিন ঐ সময় গ্রামের দেবতাগণকে আবার জল দেওয়া হয় (৺কাচমাড়া)। চতুর্থ দিন সকালবেলা ভক্ত্যারা ধর্মতলায় সমবেত হয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুন হাতে করে নিয়ে গিয়ে ধুনুচীতে নিক্ষেপ করে, ধূপ দেয়। তারপর নাপিত ডেকে কামিয়ে ধর্মরাজের ৪টি কাঠের ঘোড়াকে পূজা করে। ধর্মরাজের নিকট একটি শিবালয় আছে। সেই ঘরে ঘোড়াগুলিকে রেখে দেওয়া হয়। গ্রামে আছেন—বৃদ্ধাকালী, শ্মশানকালী, ক্ষেত্রপাল, ষষ্ঠী, বাসন্তী কালী ইত্যাদি।

৬৪। **নাকাশ** (রাজনগর থানা) : গ্রামের প্রবেশপথে মাটির ঘরে ধর্মরাজ আছেন। দেয়াশী তন্তুবায়, পুজারী ব্রাহ্মণ। আনুমানিক পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমায় পুজা।

পুর্ণিমার আগের দিন ৩০।৪০ জন ভক্ত্যা (মাল, বাগদী, বাউরী) ব্রতী হয়। তাঁতি পুকুরে বাণামো কুলুঘাটে বাণেশ্বরকে মুক্তস্নান করানো হয় এবং ভক্ত্যারা উত্তরীয় ধারণ করে। পরদিন যজ্ঞ না হওয়া পর্যন্ত উপবাসী থাকতে হয়। সামান্য আগুন খেলা হয়। ভক্ত্যারা সর্বাঙ্গে আগুন মাখে। পুজার দিন বাণেশ্বরকে গ্রামের প্রতিটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধর্মরাজের সামনে ছাগ বলি হয়ে থাকে। চড়ক উপলক্ষে মেলা বসে। নাকাশ গ্রামের ধর্মপুজা একদা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। পুর্বে আড়ম্বর হত। বর্তমানে মেলা ছাড়া আর সবই অবলুপ্তির পথে।

অন্যান্য—গ্রামে তাছাড়া আছেন, গোঁসাই, ব্রহ্মচারী চণ্ডী, মোহনগিরি, মহাদানা।

দ্রঃ—নিকটবর্তী খাসবাজার ও ছোটবাজারে ধর্মপুজা হয়।

৬৫। **পাতাডাং** (রাজনগর থানা) : গ্রামের বাইরে পশ্চিম দিকে ধান মাঠের মধ্যখানে একটি কুঞ্জ। তার নীচে বেদীর উপর পশ্চিমমুখী ধর্মরাজের ঘর। কয়েকটি কাঠের ঘোড়া ও একটি শিলাখণ্ড। পাশে গোঁসাই ব্রহ্মচারী, মড়কচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, মহাকাল ভৈরব, মহাদানা ইত্যাদির আটন আছে। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বেদী। ব্রহ্মচারীর নাম বালক ব্রহ্মচারী। ধর্মরাজের নাম খোঁড়া ধর্মরাজ। দেয়াশী ও পুজারী ব্রাহ্মণ। পুর্বে এই স্থানে গ্রামটির অবস্থান ছিল বলে কথিত হয়। ধর্মরাজ প্রায় হাজার বছরের পুরাতন বলে লোকশ্রুতি বর্তমান। মূল পুজা বৈশাখী পুর্ণিমায়। দ্বিতীয়বার বলিসহ পুজা হয় ১লা মাঘ আ-ক্ষেণ দিনে।

পুর্ণিমার আগের দিন একবার পুজা হয়। গলায় উত্তরীয় ধারণ, ধর্মরাজের মুক্তি স্নান, বাণেশ্বরের স্নান হয়ে থাকে। মদের দোকানে ভাঁড়ালকে পুজা করে জাগানো হয়। ফুলখেলা, ফলখেলা কাঁটাঝাঁপ হয়। কাঁটায় গড়াগড়ি দেওয়াকে ল্যাগড়া খেলা বলে। সকালে পুজা ও পাঁঠা বলি। পাশে মুরগী বলি হয়। ভাঁড়াল এনে রাখার পর দেবমাহাত্ম্যে মদ নাকি উথলে পড়তে থাকে। তৃতীয় দিনে পুজা ও গ্রাম প্রদক্ষিণ।

৬৬। **সুগুণপুর** (থানা মহম্মদবাজার) : গ্রামের বাইরে ময়ূরাক্ষী নদী তীরে ধর্মরাজ আছেন। নাম বুড়ো ধর্মরাজ এবং খেলারাম। শিলাখণ্ডের সামান্য অংশ বেরিয়ে আছে অবশিষ্টাংশ বহু নিম্নে। দেয়াশী ডোম, পুরোহিত ভট্টাচার্য ও আচার্য।

বৈশাখের শুক্লপক্ষে এই পুজা হয়। ১ম দিনে ভক্ত্যারা এসে বাবার থান ছেঁটে যায়। পুর্ণিমায় পুর্বদিনে ভক্ত্যারা ক্ষৌরকর্ম করে ব্রহ্মচর্য পালন করে। এই দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভক্ত্যারা ধর্মের ঘোড়া ও ঢাকসহ নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে নানারকম ফল সংগ্রহ করে আনে এবং গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নাচে। গ্রামবাসীরা পয়সা ও চাল দেয়। বিকাল বেলা উত্তরীয় গ্রহণ করে ভক্ত্যারা একটু সরবৎ খায়। রাত্রিতে ধর্মঠাকুরের মাথায় ফল চাপানো হয়। এই ক্রিয়ায় নিকটবর্তী গ্রাম কাটুনিয়া, আঙ্গারগড়িয়া, পুরুষোত্তমপুর ও গৌরনগর গ্রামের ধর্মরাজের ঢাক ও ভক্ত্যারা যোগদান করে। ঐসব গ্রামেও ধর্মরাজ আছেন। তারা নিজদের গ্রামের ক্রিয়া শেষ করে এখানে যোগদান করে। তাছাড়া নিকটবর্তী অন্য

গ্রাম সালমতপুর, ঘাকলা, মামুদপুর ও বড়াম গ্রামের ঢাক ও ভক্ত্যারা এসে যোগদান করে। এইসব গ্রামে কোনো ধর্মরাজ নেই। এরা সুগুণপুর ধর্মরাজেরই ভক্ত।

ফল চাপানোর পর ভক্ত্যারা আঙ্গিনায় সারিবদ্ধ হয়ে বেতকাঠি ধরে দাঁড়ায়। তখন তাদের ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয়। ঢাক বাজে। ভক্ত্যারা মাথা নীচু করে বেতকাঠিসহ হাত নাড়তে থাকে এবং মুখে "কাশী বিশ্বেশ্বর" ইত্যাদি নানাপ্রকার ধ্বনি করতে থাকে। কিছু-ক্ষণের মধ্যে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে নাচতে থাকে এবং এই ক্রিয়া শেষ করে। একে দ্বাদশ দেওয়া বলে। এর পর আগুন জ্বালানো হয় এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর নাচতে থাকে। ফুল খেলার পর এদিনের ক্রিয়া শেষ হয়। পূর্ণিমার দিন অন্যান্য জায়গায় ভাঁড়াল আনার পদ্ধতি আছে কিন্তু এখানে ঐরূপ কোনো ক্রিয়া হয় না। তবে নিকটবর্তী গ্রামের পচাই মদের ভেণ্ডার প্রচলিত নিয়মানুসারে এক ভাঁড় পচাই মদ চৌকিদার মারফৎ এখানে পাঠিয়ে দেয়। ঐ ভাঁড়ের গলায় ফুলের মালা দিয়ে ভাঁড়টি নিকটস্থ বটগাছের গোড়ায় রাখা হয়। দুপুরে পূজা ও বলিদান হয় (ছাগ ও মেষ)। ডোমরা পাশে শূকর বলি দেয় পদ্মকাঁটা, খূর্শালাগা, ধবল প্রভৃতি রোগের ঔষধ তৈরী করার জন্য। শূকরের রক্ত থেকে ঐ তৈল তৈয়ারী হয়।

সন্ধ্যার পর বিভিন্ন গ্রামের ভক্ত্যারা একত্রিত হলে বাণ ফোঁড়া হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক ভক্ত্যার জিভের তলায় একটি লম্বা লোহার শিক দেওয়া হয়। (আজকাল চামড়া ফোঁড়া হয় না)। ভক্ত্যা শিকটি দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে। হাতে জ্বলন্ত মশাল দেওয়া হয়। চৌকিদার ঐ ভক্ত্যাকে কাঁধে নিয়ে বেদী প্রদক্ষিণ করে। এই ক্রিয়ার পর আজকের অনুষ্ঠান শেষ হয়। তৃতীয় দিনে ভক্ত্যারা গ্রামে গ্রামে নাচে ও পয়সা চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে। সন্ধ্যার পর বিভিন্ন গ্রামের ভক্ত্যারা একত্রিত হয়ে ঢাকের বাজনার তালে তালে অনেক রাত্রি পর্যন্ত মেলার মাঝে নাচে। বর্তমানে চড়ক হয় না। বহু পূর্বে গ্রামের উত্তর দিকে একটি ডাঙ্গায় (লোকে এখনও চড়কডাঙ্গা বলে) চড়ক গাছ পোঁতা হত। এইদিন ভক্ত্যারা যথারীতি খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেয়াশী বাদে আর সবাই উত্তরীয় খুলে ফেলে। চতুর্থ দিনে কোনো প্রকার ক্রিয়া নেই। শুধু মাত্র দেয়াশী তার উত্তরীয় খুলে ফেলে। এখানকার ধর্মরাজকে স্নান করানো হয় না।

অন্যান্য—গ্রামে ডোমদের পুজিত বসন্ত বুড়ি আছেন। ভাদ্র মাসের গোপপঞ্চমীতে ছাগল, ভেড়া, মুরগী, বলিসহ পুজা হয়। ইনি মনসা ছাড়া আর কিছুই নন।

৬৭। **গৌরনগর** (থানা মহম্মদবাজার, পোঃ কবিলপুর): গ্রামের দক্ষিণে বাঁধানো বেদীর উপর একটি ছোট চারিদিক খোলা জায়গায় ধর্মরাজ আছেন। দুইটি ডিম্বাকৃতি শিলা-খণ্ড। নাম খেলারাম। দেয়াশীর জাতি সদ্‌গোপ। পুজারী ভট্টাচার্য। ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার কোনো ইতিহাস জানা যায় না। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পুজা হয়।

পূর্ণিমার আগের দিন সকাল থেকে ভক্ত্যারা ঢাক ও মাটির ঘোড়া নিয়ে বাড়ী বাড়ী নাচ করে এবং চাউল পয়সা ইত্যাদি পায়। ফেরার সময় আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা, বেল, কুমড়ো, খেঁড়ো ইত্যাদি ফল ভেঙ্গে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার আগে পুরোহিত ভক্ত্যাদের গলায়

উত্তরীয় পরিয়ে দেন। রাত্রিবেলা ভক্ত্যারা সংগৃহীত ফল হাতে নিয়ে মন্দিরের চারিদিকে বসে এবং পুরোহিত ধর্মরাজের উপরে তিনটি পদ্মফুল পর পর সাজিয়ে দেন। এরপর ঢাক বাজতে থাকে। ভক্ত্যারা "কাশী-বিশ্বেশ্বর" "জয় ধর্মরাজ" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ সাজানো ফুল পড়ে গেলে ভক্ত্যারা হাতে রক্ষিত ফলগুলি ধর্মরাজের উপর চাপিয়ে দেয়। পরে বাকি ফল একটি একটি করে এনে বেদীর চারিদিকে ঘুরিয়ে চাপিয়ে দেয়। একে ফল চাপানো বলে। এরপর বেদীর সামনে আগুন জ্বালানো হয়। পরে অঙ্গারের উপর ভক্ত্যারা নাচতে থাকে। এখানকার এই কাজ শেষ করে রাত্রিতেই ঢাকী ও ভক্ত্যারা সুগুণপুরের ধর্মতলায় যায় এবং অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ করে।

পূর্ণিমার দিন সকাল বেলায় ভক্ত্যারা নিকটবর্তী আঙ্গারগড়িয়ার মদের দোকান থেকে পাঁচটি মাটির ছোট ভাঁড়ে মদ নিয়ে ঐ হাঁড়ি মাথায় তুলে নাচতে থাকে। হাঁড়ির উপর ও ভক্ত্যাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় ভক্ত্যারা কথা বলে না। ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত্যারা নাচতে নাচতে নিকটতম গ্রাম আসেঙ্গায় আসে এবং সেখান থেকে ফিরে নিজ গ্রামে আসে এবং একটি নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে ধর্মতলায় পৌছায়। রাস্তায় এক একটি স্থানে ভাঁড়াল মাথায় ভক্ত্যারা স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মুখের সামনে প্রচুর পরিমাণে ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয় এবং ভয়ানকভাবে ঢাক বাজানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একে একে মাথা নেড়ে চলতে থাকে। কখনও কখনও "ভর" হয়। এরপর ভাঁড়ালগুলি ধর্মবেদীর নীচে নামিয়ে রেখে ভক্ত্যারা স্নান করে। পরে পুরোহিত পূজা ও হোম করেন এবং ছাগবলি হয়। পূজার পর ভক্ত্যারা ফল জল গ্রহণ করে। সন্ধ্যার আগে ভক্ত্যারা পুনরায় বেদীমূলে সমবেত হয়। মশাল জ্বালায় এবং একটি একহাত দীর্ঘ সরু লোহার শিক দিয়ে পর পর একজন করে তিনজন ভক্ত্যার জিহ্বায় প্রবেশ করানো হয়। ঐ ভক্ত্যাদের বাণফোঁড়া অবস্থায় গ্রামের চৌকিদার কাঁধে নিয়ে বেদীর চারিদিক ঘোরায়। একে বলে বাণামো। এই কাজ শেষ করার পর ভক্ত্যারা সুগুণপুর ধর্মরাজতলায় যায় এবং ঐ ক্রিয়াটি ঐ স্থানে পুনরায় করে। ভক্ত্যারা এই সময় নাচে। বাড়ীর লোকজন পূজার পয়সা, চাউল এবং ঘোড়ার জন্য সিন্দুর দেয়। এইদিন সকাল থেকে ভক্ত্যারা গ্রামে বাড়ী বাড়ী ধর্মরাজের মাটির ঘোড়া নিয়ে যায়। সঙ্গে ঢাকী থাকে। চতুর্থ দিন ভক্ত্যারা গলার উত্তরীয় খুলে ফেলে দেয় এবং নিয়ম ভঙ্গ করে।

অন্যান্য—গ্রামে আছেন ব্রাহ্মণদের পূজিতা সিদ্ধেশ্বরী দেবী। বিজয়া দশমীতে ছাগ বলিসহ বিশেষ পূজা এবং নিত্য পূজা হয়। মাঠের মধ্যে "লীলা ধর্মরাজ" নামে একটি ধর্মস্থান আছে। ব্রাহ্মণরা নিত্য পূজা করেন। বিশেষ পূজা নেই।

৬৮। **খয়রাকুঁড়ি** (থানা মহম্মদবাজার): সিউড়ীর চার মাইল উত্তরে, ময়ূরাক্ষীর তীরে। মাটির ঘরে ধর্মরাজ স্থাপিত। মধ্যে সিংহাসন, তার উপর ধর্মশিলা। ডাইনে শিব, বামে শ্বেতচাঁদ নামে অপর একটি ধর্মরাজ। দেয়াশী বলেন ইনি ধর্মরাজের চেলা। ঘরের এককোণে উৎপাটিত হাড়িকাঠ, অপর কোণে বাণেশ্বর। বাইরে অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় উত্তর ও দক্ষিণে দুটি শিলা, ত্রিশূল ও মাটির ঘোড়া। এঁরা হলেন কাল ও বটুকভৈরব। ধর্মরাজের

সঙ্গে একই সময় অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। ধর্মরাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন ষষ্ঠীঠাকরুণ। আশ্বিন বা ভাদ্রের জিতাষ্টমীতে এঁর কাছে গ্রামের মেয়েরা পূজা দেয়। দেয়াশীর উপাধি পাল (সদ্‌গোপ)। পূজারী মৌলপুর গ্রামের চক্রবর্তী। সকল জাতের লোকই ব্রত করে। মদের ভাঁড়াল আনে। দাতুরিঘাটা আর দ্বাদশঘাটা, দেয়াশীর মতে একই বস্তু। দ্বাদশঘাটায় ভক্ত্যারা একপায়ে ভর দিয়ে দ্বাদশ দেবতার বন্দনা করতে করতে এগিয়ে যায় এবং পুনরায় একপায়ে পিছিয়ে আসে। বলি এবং হোম হয়। চড়ক হয় সন্ধ্যাবেলা। কুলের কাঁটা বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে ভক্ত্যারা চলে যায়। আগুনের ফুল খেলা হয়। আগুনের ফুল নিয়ে ব্রাহ্মণ পূজা করেন এবং তারপর কলাপাতা ধর্মরাজের মাথায় রেখে সেই আগুন চাপায়। লাগরাভাঙ্গা আছে। বাণামো আছে (এখানে অর্থ—বাণগোঁসাইকে ঘাটে নিয়ে গিয়ে পূজা এবং ভক্ত্যাদের উত্তরীয় প্রদান)।

গ্রামের দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর তীরে আছেন বাঘরায় চণ্ডী। বাঘরায়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বাণেশ্বরী নামে এক দেবী। সদ্‌গোপ সম্প্রদায় পূজা করে। পাঁঠা বলি দেয়। পূর্বে ষাট ঘর সদ্‌গোপ ষাটটি পাঁঠা দিত। (“বাণেশ্বরী” সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)।

গ্রামে একটি মনসা আছেন। বারোয়ারী পূজা। বাগদী পাড়ায় আর গ্রামের ডাঙ্গাতে দুটি কালী আছেন। তাঁদের সঙ্গে আছেন গোঁসাই। কালীর মূর্তি নাই। শিলাখণ্ড। বাগদীরা ভাদ্র মাসে পূজা করে। ডাঙ্গার কালীকে ভুঁইয়ারা অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় পূজা দেয়। তাছাড়া হাড়িপাড়ায় কালী ও গোঁসাই আ-ক্ষেণ দিবসে পুজিত হন।

৬৯। **রাতমা** (থানা ময়ূরেশ্বর, পোঃ দক্ষিণগ্রাম) : গ্রামের পশ্চিমে অশ্বত্থ ও বোল-বৃক্ষমণ্ডিত একটি মনোরম স্থানে ধর্মরাজের কুটীর। ১৫টি শিলাখণ্ড। নির্দিষ্ট আকার নেই। আলাদা কোনো নাম নেই। সঙ্গে কোনো আবরণ দেবতাও নেই। দেয়াশী জাতিতে রাজপুত। পূজারী ব্রাহ্মণ।

বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পূজা। পূর্ণিমার আগের দিন ভক্ত্যারা দেয়াশীসহ বাণগোঁসাই নিয়ে বাদ্যভাণ্ড ও শোভাযাত্রা সহকারে পালিত-পুষ্করিণীতে স্নানের জন্য গমন করে। তারপর ঐ শোভাযাত্রা গ্রামের প্রথম তে-রাস্তায় উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ ঢাকের বিভিন্ন রকম বাজনা বাজানোর পর “ধর্মনিরঞ্জন” ধ্বনি তোলে। একে ঘাঁক বা জাঁক বলা হয়। এর পর শোভাযাত্রা গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত ত্রিপুরেশ্বর শিবের মন্দিরে উপনীত হয়। ওখানে পূর্ববৎ “জাঁক” দিয়ে শোভাযাত্রা ধর্মরাজস্থানে আসে। এখন ধর্মরাজের পট্ট আঙ্গিনায় মদ্যভাঁড়াল সহ ভর হয়। সেই সময় আবিষ্ট ভক্ত্যারা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নানা প্রশ্নের উত্তর প্রদান অথবা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে। এরপর ভক্ত্যারা ফলজল গ্রহণের জন্য বাড়ী যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ধর্মতলায় ফিরে আসে এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণে অতিবাহন করে। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে কাঁটা খেলা ও চামুণ্ডার মুখোশ পরে খেলা হয়।

পূর্ণিমার দিন বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হবার পর গ্রামস্থ প্রতি গৃহস্থের বাড়ী ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য ও ফুলফলাদি প্রেরিত হয়। এই সমস্ত

ভোগ্যাদি নিবেদন হতে হতে অপরাহ্ন হয়ে যায়। অপরাহ্নে ধর্মরাজের সব কয়টি শিলাখণ্ড দেবাংশী দ্বারা নীত হয়ে পূর্বদিনের মত শোভাযাত্রা ও অসংখ্য কাঠের ঘোড়া ভক্ত্যাবৃন্দের স্কন্ধারূঢ় হয়ে অপর একটি পুষ্করিণীতে মুক্তস্নানের জন্য গমন করে। সেখানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে সহস্র সহস্র নরনারী এই উৎসব দর্শনের জন্য উপস্থিত হয়। মুক্তস্নানের পর কয়েকজন ভক্ত্যা লৌহশলাকা দ্বারা জিহ্বা ভেদ করে মুখের ভিতর সেই বাণ গ্রহণ করে এবং ঐ অবস্থায় নৃত্য করতে করতে ধর্মরাজদেবের অনুসরণ করে ধর্মরাজতলায় উপস্থিত হয়। একজন ভক্ত্যা দা-বাণারোহী হয়। শোভাযাত্রা ধর্মরাজের কুটীরে নীত হবার পর সংজ্ঞাহীন ভক্ত্যাদের জিহ্বা থেকে বাণগুলি উৎপাটন করে নেওয়া হয়। দা-বাণারোহীকেও মুক্ত করা হয়। পরে ধর্মরাজের চরণামৃত নিক্ষেপ করে তাদের সুস্থ করা হয়ে থাকে। এরপর ধর্মশিলাগুলিকে কুটীরে স্থাপন করা হয় এবং হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। পূজা, হোম ও বলিদান শেষে দোলনসেবা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পূর্ণিমার পরের দিন সমস্ত ভক্ত্যা দেবাংশীসহ গ্রামের বহির্দেশে অবস্থিত চড়কতলা নামক ময়দানে সমবেত হয়ে পূজার প্রথম দিনে স্নানের পর তারা যে উত্তরীয় গ্রহণ করেছিল সেগুলিকে উপবীত আকার থেকে পরিবর্তন করে গলদেশে মাল্যবৎ ধারণ করে। ঐ উত্তরীয় পঞ্চম দিনে মোচন করা হয়।

অন্যান্য—গ্রামে ইন্দ্রপুকুর নামে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রদেবের বলিসহ পূজা হয়। কালীতলা নামক একটি পুষ্করিণীর পাহাড়ে কালীর শিলা আছে। নিত্য পূজা হয়। তাছাড়া গ্রামের বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, কালীমাতার পূজা আছে।

ধর্মা নামক একটি পুষ্করিণীর উত্তর পাহাড়ে ক্ষেত্রপালদেব ও ভৈরবদেবের পূজা হয়ে থাকে।

১০। **শেখপুর** (ময়ূরেশ্বর থানা): গদাধরপুর স্টেশনে নামতে হয়। এই গ্রামের ধর্মরাজের কোনো মন্দির নেই। এক বটবৃক্ষ ঝুরি নামিয়ে মন্দিরাকৃতি করে রেখেছে। এখানে দুটি স্বাভাবিক শিলাখণ্ডকে ধর্মরাজ বলে পূজা করা হয়। বর্তমান দেয়াশী মুখোপাধ্যায় বংশ। পূর্বে সিউর নামে একটা গ্রামে মড়ক লাগায় ধর্মশালা অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছেন দেখে একজন ক্ষৌরকার ধর্মরাজকে এই গ্রামে নিয়ে আসে। বর্ধমানের মহারাজা ধর্মরাজের নামে চার বিঘা জমি দান করেন। পূজাপদ্ধতি গতানুগতিক। এই গ্রামে ভুবনেশ্বরী ও শিব একত্রে আছেন। জয়দুর্গার মন্ত্রে ভুবনেশ্বরীর পূজা হয়। শিবের চৈত্র সংক্রান্তির পূজায় খুব ধূম হয়। ধর্মরাজের মতই ভক্ত্যা হয়। বাণেশ্বরকে স্নান করায়। তাকে বলে যাদুরঘাটা। উত্তরীয় নেয়। ধূপবাণ, জিহ্বাবাণ প্রভৃতি সবই হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা হয়ে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গম কুটে বাড়ী বাড়ী ছাতু তৈরী করে। শিবের ভক্ত্যাদের ঐ ছাতু ও ঘুগনি খেতে দিতে হয়।

তাছাড়া গ্রামে আছেন ঘাড়মোচড়া নামে একজন অপদেবতা। কোন্ একজন লোকের ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিলেন। বর্ণহিন্দুদের পূজা বৈশাখে হয়। সে সময় শীতলা দেবী এখানে আসেন।

দ্বারকা নদীর তীরে গঙ্গাপুত্রিকা আছেন। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে গঙ্গার ধ্যানে পূজা হয়। এখানে মার্বেল পাথরের একটি সীতামূর্তি আছে। কাছেই শ্মশান। নিকটস্থ মুরুলিডাঙ্গায় খোট্টা জাতীয় এক ধাত্রী কর্তৃক পূজিতা হন বাঘরায় চণ্ডী। ১লা মাঘ পূজা ও মেলা হয়। এখানে মুরগী ও একটি ডিম বলি দেওয়া হয়। এই গ্রামে একজন ব্রহ্মচারীও পূজিত হন।

৭১। **দাদপুর** (ময়ূরেশ্বর থানা, পোঃ ষাটপলসা) : গ্রামের ভিতর একটি অতি প্রাচীন বকুল গাছের নিকট পাকাবাড়ীতে ধর্মরাজ আছেন। বেদীতে ১৫টি শিলাখণ্ড আছে। দেবাংশীর উপাধি কর (রাজপুত)। পুজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পুজা।

পূর্ণিমার আগের দিন ভক্ত্যাদের বার ও সংযম। রাত্রে নিশাজাগরণ ও বোলান গান। ঐদিন একটি ছাগবলি হয়। পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে বোলান গান হয় বেলা ১১টা পর্যন্ত। বেলা ১২।১টার সময় শুঁড়ি ঘরে ভাঁড়াল ভরা হয় ও বাদ্য সহযোগে দেবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পূজা, হোম। সন্ধ্যায় ধর্মশিলাদের স্নান করানো হয় পুকুরঘাটে। তৃতীয় দিন ভক্ত্যারা বাণগোঁসাই ও ঘোড়া নিয়ে গ্রামের বাড়ী বাড়ী যায়। তেল সিঁদুর নেয় ও লোককে দেয়। ১০।১১ টার সময় ভক্ত্যাদের স্নান ও দেবাংশীর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন। গ্রামে ষষ্ঠী ও কালী আছেন। ষষ্ঠীর পূজা জ্যৈষ্ঠ মাসে। কালীর পূজা চৈত্রের কোন মঙ্গলবারে। এই সঙ্গে ধর্মরাজেরও পুজা হয়। কালীপুজা জনসাধারণের।

৭২। **ন-বেলেড়া** (ময়ূরেশ্বর থানা) : ধর্মরাজের চারটি শিলা। নাম, ফটিক রায়, নীল রায়, কণ্ঠ রায় ও চাঁদ রায়। পাকুড় গাছতলায় পাকা ঘর আছে। দেবাংশী মণ্ডল। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পুজা হয়। ব্রাহ্মণ ছাড়া সকল জাতিই ভক্ত্যা হতে পারে। পুজার পাঁচদিন আগে উপবাস সুরু হয়। পূর্ণিমার আগের দিন জাগরণ ও ভাঁড়াল আনা। একটি নতুন ভাঁড়ে পচাই মদ গোয়ালশাহী গ্রামের গ্রামদেবতা, দক্ষিণেশ্বরের কালীর কাছ থেকে আনা হয়। ফুলখেলা ও চামুণ্ডার মুখোশ পরে নৃত্য আছে। ধর্মপূজা উপলক্ষে নানাবিধ গীত ও পাঁচালী হয়। বোলান গানও হয়ে থাকে, সারারাত্রি ধরে। নানাবিধ ছড়া শোনা যায়। পুজার দিন নিকটবর্তী কুলিয়াড়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করা হয়। তাঁরা উপস্থিত হলে তাঁদের ফলজল খাওয়ানো হয়।

ধর্মরাজের পার্শ্বে আছেন ষষ্ঠী, বিল্ববাসিনী কালী ও শিবঠাকুর।

দ্রষ্টব্য—পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোয়ালশাহী, গিধিলা ও কোঁয়ারপুরে ধর্মপূজা আছে।

৭৩। **কুমারপুর** (ময়ূরেশ্বর থানা, পোঃ বাসুদেবপুর) : গ্রামের মধ্যে পাকা ঘরে ধর্মরাজ আছেন। ৪টি বড় ও অনেক ছোট শিলা আছে। লম্বা, গোলাকার প্রভৃতি নানা আকারের। নাম লালচাঁদ রায়, দামোদর রায়, পঞ্চা রায়, মনোহর রায় ও ফটিক রায়। ৪টি কাঠের ঘোড়া ও বাণেশ্বর আছে। দেয়াশী জাতিতে ধীবর। ১২৪০ সালের কাগজপত্র এখনও আছে। বহু পূর্বের ধর্মরাজ। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পূজা। ধর্মরাজের সঙ্গে অন্য কোনো দেবদেবী নেই।

পূর্ণিমার আগের দিন ভক্ত্যারা গলায় উত্তরীয় এবং দ্বাদশকাঠি ধারণ করে। এখানে

রাজা রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত রামসায়র পুষ্করিণী থেকে বৈকাল থেকে সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত উত্তরীয় গ্রহণ করার পর ঢাক ঢোল বাজিয়ে ধূপ পোড়াতে পোড়াতে ভক্ত্যারা নাচতে নাচতে ধর্মতলায় উপস্থিত হয়। রাত্রিতে জাগরণ হয়। ঐ সময় বোলান গীত চলতে থাকে। (কালিকা পাতার) মড়ার মাথা নিয়ে ভক্ত্যারা নাচে। লাগড়া ভেঙ্গে এনে তারপর ভক্ত্যারা গড়াগড়ি দেয়। ভোররাত্রে ফুলখেলা। পূজার দিন ধর্মরাজের ঘোড়া বাণেশ্বর ইত্যাদি নিয়ে দেবাংশী ও ভক্ত্যারা ঐ রামসায়র পুকুরে ঠাকুরের মুক্তস্নানে যায়। মুক্তস্নানের পর রামকৃষ্ণপুর, শোলাহাট, কেউহাট ও কুমারপুর গ্রাম পরিভ্রমণান্তে ঘোড়ার ভরণ করে নাচতে নাচতে ঠাকুরের স্থানে আসে। ঠাকুরের স্থানে আসার পর ঠাকুরের পুজা হয় এবং পরে ছাগ বলি হয়। রাত্রে বোলান গান হয়। তৃতীয় দিনেও পুজা ও ছাগবলি হয়ে থাকে। এই পুজাকে নীলপুজা বলে। ঐ দিনেও ঠাকুরকে নিয়ে রামসায়র পুষ্করিণীতে মুক্তস্নানে যায়। মুক্তস্নান থেকে ফিরে আসার পর পুজা ও বলি হয়। পুর্বে ঐ রামসায়রের পাড়ে বৈকালে চড়ক হত। এখন ঠাকুরের স্থানেই চড়ক ও বাণফোঁড়া হয়। পরে ভক্ত্যারা প্রসাদ পায়।

অন্যান্য—গ্রামে বৃদ্ধাকালী (বিজয়ায় পূজা), কালী, দুর্গা, গন্ধেশ্বরী, নারায়ণ ও শিব আছেন।

৭৪। **কামারহাটি** (ময়ূরেশ্বর থানা) : গ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কয়েকটি তেঁতুল ও কয়েৎ বেল গাছের নীচে ধর্মরাজের শিলামূর্তি। নোড়ার মত শিলা, ভূপ্রোথিত। কেউ বলেন বড় বুদ্ধমূর্তির শীর্ষদেশ আবার কেউ বলেন অনাদিলিঙ্গ। ঐ শিলাখণ্ড কিছুটা খুঁড়িয়ে দেখেছি, চারিপাশে চারিটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি ক্ষোদাই করা আছে। ক্ষোদাইকার্য অত্যন্ত প্রাচীন। ক্ষয়ে এসেছে।

দেয়াশী বাগদী, পুরোহিত ব্রাহ্মণ। নিত্যপুজার ব্যবস্থা আছে। ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কেউ বলতে পারে না আজ। বহু পুরাতন দিনের কথা। বৈশাখী পুর্ণিমায় মূল পুজা হয়।

পুর্ণিমার ৫ দিন আগে দেয়াশী ক্ষৌরকর্ম করে। অন্য ভক্ত্যারা তিনদিন আগে। পুর্ণিমার আগের দিন বৈকালে দেবাংশী ও ভক্ত্যারা উত্তরীয় গ্রহণ করে। উত্তরীয় গ্রহণের পর গ্রাম প্রদক্ষিণান্তে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে নাচতে নাচতে ধর্মতলায় সবাই আসে। গভীর রাত্রে শোভাযাত্রা সহকারে মদ্য আনা হয়। একে মাঠ আনা বলে। ভক্ত্যারা আশপাশের গ্রাম লুঠে ফলমূল সংগ্রহ করে। বাণগোঁসাই দুটি। একটিতে আনারস, অপরটিতে আম বিদ্ধ করা হয়।

অপরাহ্নে স্নানান্তে ভক্ত্যাদের মধ্যে মদ্য বিতরণ। একে মাঠ ভাঙ্গা বলে। তারপর ভক্ত্যাদের একে একে ভর নামিয়ে গ্রাম ঘোরানো হয়।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুজাকৃত্য, হোম যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। তারপর বলিদান। বাটা পুজা। সন্ধ্যাবেলা বাণ আনা, দাবাণ, চরকিবাণ, জিহ্বাবাণ, কোঁকবাণ, মুখোশ নৃত্য। শেষরাত্রে আগুনের ফুলখেলা হয়। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের লোকই ভক্ত্যা হতে পারে। ধর্মরাজকে কোনো পুকুরে স্নান করানো হয় না। ধর্মঠাকুরের সম্মুখে বলি হয় না। একটু পাশে ছাগ, মেষ ইত্যাদি বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন মঙ্গলচণ্ডী ও ষষ্ঠী। নিম্ন ও বর্ণহিন্দুদের পৃথক পৃথক। একটি ষষ্ঠী মূর্তি আর একটি পাল আমলের বাসুদেব মূর্তি।

তেঁতুলতলায় কালী ও নিমতলায় গোবর লোটন আছেন। গ্রামের পূর্বে সন্ন্যাসীতলা। গ্রামের ½ মাইল পশ্চিমে আর একটি সন্ন্যাসীতলা আছে। এঁর পূজা এখন হয় না। সাধারণতঃ বিজয়ার পর একাদশীর দিন অন্যান্য গ্রাম দেবতার সঙ্গে এবং বুদ্ধপূর্ণিমার সময় ধর্মরাজের সঙ্গে পুজিত হন। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি কামনায়ও পুজা করার রীতি আছে। পুজারী ব্রাহ্মণ।

পার্শ্ববর্তী রাতিরা ও রাউতাড়া গ্রামেও ধর্মপুজা আছে। সেখানেও চামুণ্ডার মুখোশ পরে নাচ হয়।

৭৫। **সুপুর** (বোলপুর থানা): বোলপুর ইলামবাজার রাস্তায় তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। পূর্বনাম স্বপুর।

রাজা সুরথের রাজধানী ছিল বলে কথিত। গ্রামের এক মাইল উত্তরে সুরথেশ্বর শিব মন্দির বর্তমান। মন্দিরগুলি আধুনিক। কিন্তু প্রকাণ্ড। এক টিবির উপর অবস্থান দেখে সহজেই অনুমিত হয় ঐ স্থানের ভূগর্ভ প্রত্নতত্ত্বগতভাবে সুনিশ্চিত সমৃদ্ধ। গ্রামের ভিতর রাজার পূজিতা সুভিক্ষা দেবীর মন্দিরও আধুনিক। সেটিও পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষুদ্রকায় ইঁটের ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মিত। সুভিক্ষা দেবীর মন্দিরে কতকগুলি প্রাচীনকালের মূর্তির ভগ্নাংশ রক্ষিত। তন্মধ্যে একটি বৃহৎ মূর্তির হস্ত। মণিবন্ধে বলয়ের অবস্থিতি দ্বারা নারী মূর্তির অংশ বলে সহজেই অনুমান করা যায়।

সুপুর গ্রামটি অজয়ের উত্তর তীরবর্তী। গ্রামের বর্তমান দৃশ্য প্রাচীনকালের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জঙ্গল আর ভিটামাটির স্তূপ প্রায় দুই বর্গমাইল স্থান জুড়ে ছড়িয়ে আছে। শতবর্ষ পূর্বে অজয়-নদীপথে নৌকাযোগে বাণিজ্য চলত; কাটোয়া এবং সেখান থেকে কোলকাতা পর্যন্ত। আজ সবই শ্মশানে পরিণত। কেবল অসংখ্য দেবালয় নীরব সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান।

গ্রামে ধর্মরাজ আছেন। নাম স্কন্ধ রায়। লোকমুখে দাঁড়িয়েছে শম্ভু রায়। সামান্য টিনের চালা এবং ভিতরে কাঠের সিংহাসনে গোলাকৃতি একটি প্রস্তরখণ্ড। বেদীর বাঁ পাশের কোণে একটি বাণেশ্বর। বেদীতে আর কিছু নেই। একটা ঘোড়া পর্যন্ত না। পূর্বে পুজার ধুম ছিল। আজকাল আর নেই। কোনোক্রমে চাঁদা তুলে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়াশী ময়রা, পূজারী ব্রাহ্মণ। এখানে পূজার তারিখের কোনো স্থিরতা নেই। বৈশাখী থেকে আষাঢ়ী যে কোনো পুর্ণিমায় পুজা করা হয়। এই গাজনকে বলে আপাল গাজন। (বিপরীত কথা হল বাঁধা গাজন)। সাধারণতঃ চাঁদা তুলে পুজা সুরু করতে সেই আষাঢ় পুর্ণিমাই হয়। এই অঞ্চলের সকল ধর্মরাজদের যমরাজ বলে পূজা করা হয়। পূর্ণিমার আগের দিন মুক্তস্নান। চারটি ঘাটে দেবতাকে স্নান করাতে হয়। ময়রাপুকুর, বুড়ীপুকুর, অজয়ের ঘাট এবং দীঘির ঘাট।

ন্যূনপক্ষে ৯টি এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ১৩টি ভক্ত্যা হবার বিধি। মুক্তস্নানের দিন ধর্মতলায় যজ্ঞ হয়। সেই যজ্ঞাগ্নির উপরে ভক্ত্যারা পর্যায়ক্রমে দোলনসেবা করে। মুক্তস্নানের শোভাযাত্রা

বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথমে একজন ভক্ত্যা মুখে বাণ পরে হাতে চামর ঢুলাতে ঢুলাতে যায়, তারপর দা-বাণে শুয়ে একজন, তারপর রামচন্দ্রপুরের বুড়োরাজ, তারপর মীর্জাপুরের ধর্মরাজ, তারপর রায়পুরের ধর্মরাজ, রজতপুরের ধর্মরাজ। সর্বশেষে সুন্দ রায় থাকেন।

মুক্তস্নানের পর ভক্ত্যারা গাজনে রাত্রিবাস করেন। পরদিন পূজা, ভাঁড়াল আনা, আবেশ, বলিদান, ভক্ত্যাদের ফলাহার।

অন্যান্য—গ্রামে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। অনেকগুলির গায়ে পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন চিত্র বিদ্যমান। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন হয়।

পূর্বোল্লিখিত সুভিক্ষা দেবীর নিকট মহানবমীতে বিশেষ পূজা হয়। ছাগবলি হয়। ভাদ্র মাসে মনসা ও নিত্যপূজিতা রক্ষাকালী আছেন। তাছাড়া গ্রামে সুক্ষেশ্বরী দেবীর প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন মূর্তি ছিল। সে মূর্তি বর্তমানে ইলামবাজার থানার দেবীপুর-পায়ের গ্রামে বর্তমান।

দ্রষ্টব্য—নিকটবর্তী রায়পুর, মীর্জাপুর, রামচন্দ্রপুর ও রজতপুরে ধর্মপূজা হয়।

৭৬। **মোহনপুর** (নানুর থানা) : গ্রামের মধ্যস্থলে পূর্বদুয়ারী মাটির ঘরে ধর্মরাজের পূজা হয়। দেবতার অন্য নাম নাই। দেয়াশী উগ্রক্ষত্রিয়। পূজারী ব্রাহ্মণ।

আন্দাজ চারশো বছরেরও আগে দেয়াশীর পূর্বপুরুষের একজন মহিলাকে স্বপ্নাদেশ হয়। মহিলাটির নাম "রেয়ে দেয়াশিনী"। সেই মহিলা সেই রাত্রেই বাড়ী থেকে কাটোয়ার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে ধর্মরাজকে মহাসমারোহে মোহনপুরে নিয়ে আসেন। মূল পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। ধ্যানমন্ত্র—স্বতন্ত্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ধর্মরাজের নিত্য পূজা হয় আতপ ও মিষ্টান্ন সহযোগে। সন্ধ্যাবেলা দুধ দিয়ে শীতল হয়।

মূল পূজার সময় ডোম, হাড়ি, মাল, বাগদী, শুঁড়ি, গোয়ালা, উগ্রক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণপ্রভৃতি সম্প্রদায়ের ২৫।৩০ জন ভক্ত্যা সাজেন। স্ত্রীলোকেরাও অংশগ্রহণ করে। একে বলে মহামিলা ব্রত। পূর্ণিমায় গাজন হয়। এই সময় খুব সমারোহের সঙ্গে পূজা হয়। চারদিন ধরে পূজার নানাপ্রকার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ত্রয়োদশীর দিন উত্তরীয় ধারণ, ল্যাগরাভাঙ্গা খেলা ও শ্মশান খেলা। চতুর্দশীর দিন বাণেশ্বর পূজা হয় গ্রামের প্রতি ঘরে। রাত্রে মুক্তস্নান ও অধিবাস তারপর দা-বাণ খেলা হয়। পূর্ণিমার সকালে আগুনের ফুলখেলা, দুপুরে ভাঁড়ার খেলা পরে পূজা এবং ধূপবাণ খেলাও হয়।

যে পুকুরে ধর্মরাজ স্নান করেন সেটির নাম ছোট পুকুরের ঘাট। ধর্মরাজের সামনে পাঁঠা বলি হয়। পূজার পর দেয়াশীর বাড়ীতে ভক্ত্যাভোজন। ঐদিন শুধু দুধের পায়স ভোগ দেওয়া হয়। ভোগের পর ঐ প্রসাদ গ্রামের প্রতি ঘরে বিতরণ করা হয়। ঐদিন পুনরায় বলিদান হয়ে থাকে।

অন্যান্য—গ্রামের ধানমাঠে শুটুনি নামে একজন কালী আছেন। গ্রামের মধ্যস্থলে নিমতলায় ক্ষেত্রপাল নামে একজন ভৈরব আছেন। ক্ষেত্রপালের নিত্যপূজা হয়। এছাড়াও আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে ও আশ্বিন মাসের মহানবমীতে বিশেষ পূজা ও বলিদান হয়ে থাকে।

দ্রষ্টব্য—নিকটবর্তী ফজুলাপুর ও মুরারীপুরে ধর্মপূজা হয়।

৭৭। **বড়া** (নানুর থানা): গ্রামের মধ্যস্থলে ধর্মরাজ। নাম খুজুটেশ্বর। দেবাংশী গন্ধবণিক। খুজুটিপাড়া গ্রামে বাস করেন। বৎসরে দুবার ধর্মরাজকে নিয়ে বড়ায় আসেন। ধর্মরাজ সারা বছরই খুজুটিপাড়া গ্রামে থাকেন। কেবল বাৎসরিক পূজার সময় এবং গ্রামের নবান্নের সময় বড়ায় আসেন। দেবাংশীরাই পূজা করেন কিন্তু বড়া আসার পর গ্রামের চট্টোপাধ্যায়রা পায়সের ভোগ দেন। ধর্মরাজ কূর্মাকৃতি।

মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে বড়া গ্রামে এই ধর্মরাজ নিজেই তাঁর খুজুটিপাড়াস্থ পাট ছেড়ে এসে উপস্থিত হন এবং এক সদ্গোপের বাড়ীতে খুদের হাঁড়িতে প্রবেশ করে সেইখানে অবস্থান করেন। দু'একদিনের মধ্যে গৃহস্বামী দেবতাকে আবিষ্কার করেন এবং চাটুয্যেদের বাড়ীতে সংবাদ দেন। চাটুয্যেরা এসে পায়সের ভোগ দেন। তারপর খুজুটিপাড়ার দেবাংশীরা সংবাদ পেয়ে তাঁদের ঠাকুর নিয়ে যান। স্থির হয় (ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী) যে মূল পূজা ও নবান্নের সময় ধর্মরাজ বড়ায় আসবেন এবং চারদিন অবস্থান করবেন। মূল পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। বড়ায় যে কয়দিন থাকেন সে কয়দিনই পূজা হয়। এবং পরমান্নের ভোগ হয়। বড়ায় পূজার সময় বিল্বপত্রের সঙ্গে তুলসী পত্রও ব্যবহার করা হয়।

তপশীল জাতিভুক্ত, বাগদী, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি সম্প্রদায় ভক্ত্যা সাজে। কিন্তু পূজার পূর্বদিন ধর্মরাজ যখন সাড়ম্বরে গ্রাম পরিক্রমা করেন এবং মুক্তস্নানে যান তখন চাটুয্যেরাই মাথায় দেবতাকে বহন করেন এবং পুকুরঘাটে সন্ধ্যার পর যে পূজা হয় তাতেও অংশগ্রহণ করেন। ধর্মরাজকে নতুন টোকায় খুদভর্তি করে তার মধ্যে বসিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করানো হয়। ব্রাহ্মণ মাথায় করে বহন করেন।

আগুনের ফুলখেলা হয়। পূজার দিন সকালে ভক্ত্যারা বাবলার ডাল ভেঙ্গে আনে। ঐ ডাল পুড়িয়ে আগুন খেলা হয়। যে পুকুরে ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়, তার নাম মুক্তধোয়া। একটু আড়ালে মেষ বলি হয়। এই ধর্মরাজ সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য—বড়া গ্রামে শ্মশানের ধারে এক বিরাট উঁচু ঢিবি। তার উপর মহাকায় ২।৩টি প্রাচীন তেঁতুল গাছ। ওর মধ্যে গ্রাম্যদেবী মা-কালী। তিনি অতি জাগ্রতা। তাঁরই নামানুসারে বড়া গ্রামের নাম বড়া কালিকাপুর। মা-কালীর কোনো মূর্তি নেই। পাষাণময়ী, নিত্য পূজা আছে। বহু গ্রামান্তর থেকে ভক্তেরা পূজা এবং মানসিক দিতে আসে। নানাবিধ রোগমুক্তি, মানস সিদ্ধি, বিপদ উদ্ধার প্রভৃতির জন্য। ১৫০।২০০ বৎসর পূর্বে বনওয়ারীবাদের (মুর্শিদাবাদ) স্বর্গত এক রাজার অম্লশূল এই স্থানে ভাল হয়। সেই অবধি কার্তিক মাসে শ্যামাপূজার সময় বনওয়ারীবাদের রাজবাড়ী থেকে পূজার সামগ্রী ও কিছু বাদ্যাদি আসে। প্রবাদ প্রতি বৎসর ১৬ই কার্তিক একটি বাঘ বা সিংহ রাত্রিবেলা দেবীকে প্রণাম করতে আসে। এই কালী সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। একটা আশ্চর্য জিনিষ বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা যায়। গাছ থেকে পতিত ভগ্ন ও শুষ্ক তেঁতুলের ডাল থেকে পুনরায় প্রশাখা বের হয়ে

বৃদ্ধিলাভ করে। এই মা-কালীর সেবাইৎ উক্ত চাটুয্যে বংশ। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ডোংরা, চণ্ডীপুর, দাথিনা, বেলগ্রামে ধর্মপুজা হয়।

৭৮। **খুজুটিপাড়া** (নান্নুর থানা) : ধর্মঠাকুরের নাম "খুজুটেশ্বর।" পাকা ঘর আছে। বারোমাস নিত্য পুজা হয়। হাটতলায় মন্দিরটি অবস্থিত। দেয়াশী গন্ধবণিক পুজারী ব্রাহ্মণ। ধর্মরাজের মূর্তি দুটি। একটি কূর্ম মূর্তি। অপরটি গোলাকার। ধর্মরাজের আবির্ভাব প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ আছে তা যথানির্দিষ্ট অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এই ধর্মরাজের পূজা হয় জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়। পূজার ৪।৫ দিন আগে মূল আবির্ভাবক্ষেত্রে ধর্মরাজকে এনে গাজন ইত্যাদি সমাধা হয়। বাকী সময় দেবাংশীর বাড়ীতে থাকেন। তুলসী-চন্দনে নিত্য সেবা হয়। পূর্ণিমার ভোররাত্রে কয়েকখানি গ্রাম ঘোরানোর পর ধর্মরাজকে স্নান করানো হয়। দেয়াশী সেদিন উলঙ্গ অবস্থায় আংট কলার পাতা পরেন (আংট অর্থ অক্ষত শীর্ষ)। "ওঁ ধ্যেয় সদা সাবিত্রী মণ্ডল" ইত্যাদি নারায়ণের বা শালগ্রামের ধ্যানে তুলসীপাতায় পুজা হয়। পুর্ণিমার দিনে পচুই মদের ভাঁড়াল নিয়ে গিয়ে নিত্যপুজার ঘরে রাখা হয়। তারপর ধর্মরাজকে বের করে পুর্বকাল থেকে চলিত নিয়ম অনুযায়ী সারারাত্রি গ্রামের প্রতি বাড়ীতে পুজা হয়। তারপর ভোরে স্নান হয় শা-পুকুরে দুধ গঙ্গাজল দিয়ে। সেই জল ভক্ত্যারা পান করে থাকেন। কিন্তু ভাঁড়াল তোলা হয় হাটতলার মন্দিরের পাশের ঘরে—পূজার ৫ দিন আগে থেকে। বৈকালে ভাঁড়াল পুজা হয় হিন্দু বিবাহ প্রথায়। ধর্মরাজ হাটতলার মন্দিরে প্রবেশ করলে ভাঁড়ালটিকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসে ধর্মরাজের নিকট রাখা হয়। তারপর মূল পূজা হয়। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দুরা স্ত্রীপুরুষ ৩০ থেকে ৫০ জন ভক্ত্যা হন। পূর্ণিমার দিনে ৮।১০ টার সময় ভাঁড়ালটিকে ভাসিয়ে দিতে হয় অপর একটি পুকুরে। এর নাম "ভাঁড়াল ভাসা"। ভাঁড়াল ভাসিয়ে মন্দিরে ফিরে এসে পুনরায় বাদ্যসহ সেই ভাঁড়াল ভাসা পুকুরটি দেখে আসতে হয়। এ প্রথাও প্রাচীন। (মনে হয় কোনো সময়ে ভাঁড়ালটি ভেসে উঠেছিল)। তারপর বাটা পুজা ও বলিদান। প্রথমে সামনে, তারপর দুপাশে বহু ছাগ ও মেষ বলি হয়। এই ধর্মরাজ নওয়ানগর, বাইতারা, ছাতিনগ্রাম, গড়পাড়া গ্রামে যান ঐ রাত্রিতে। মানসিক যারা করে তারা শ্বেতবর্ণের ছাগ সংগ্রহ করে আনে (শ্বেত ছাগ সম্পর্কে তত্ত্ব, "প্রবাদ প্রসঙ্গে" দ্রষ্টব্য)। ধর্মপূজায় রামায়ণের গান হয়। এর আগে ধর্মপুরাণের গান হয়। ধর্মবীর লাউসেনের কাহিনীই প্রধানত বর্ণনীয় বিষয়। ইতঃপুর্বে দশহরার দিন থেকে গান শুরু হত। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল গীত হয়।

এই ধর্মরাজের বৈশাখী পুর্ণিমায় পুজা হয় বড়া গ্রাম এবং জ্যৈষ্ঠ পুর্নিমায় এখানে ("বড়া" গ্রাম এবং প্রবাদ দ্রষ্টব্য)।

গ্রামে জটাধারী আছেন। শনিমঙ্গলবারে চিঁড়া, গাঁজার ভোগ দেওয়া ও হরির লুঠ হয়ে থাকে। দশহরা তিথিতে নমঃশূদ্রদের গরব পুজা (মনসা) হত। এখন অবলুপ্ত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য—নিকটবর্তী গ্রাম গাঁধপুর, নওয়ানগর, বাইতারা, পাতিসারা, কুমড়া, ছাতিন-গ্রাম, গড়পাড়ায় ধর্মপুজা আছে।

৭৯। **উচকরণ** (নান্নুর থানা): ধর্মমঙ্গলের কবি হৃদয়রাম সৌ-এর নিবাসভূমি। গ্রামের উত্তরে মন্দিরে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত। দেয়াশী বাগদী সম্প্রদায়ের। পূজারী ব্রাহ্মণ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় মূল পূজা। ধর্মরাজদের নাম—কটা রায়, চাঁদ রায়, বুড়ো রাজ, কোদালে কাটা, কেন্সে রায়, সোঁদল রাজ, দুধকমল, রাজ্যেশ্বর।

অনুষ্ঠানাদি ও পূজাপদ্ধতি গতানুগতিক। কেবল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এইটুকু যে ভক্ত্যারা মদ্যের পরিবর্তে দুধ গঙ্গাজলের ভাঁড়াল বহন করে এবং আগুনের ফুলখেলার পর ঐ ছাই সকল ভক্ত্যারা মিলে ধর্মমন্দিরের ঈশাণ কোণে রক্ষা করে।

গ্রামের চৌধুরীরা (ব্রাহ্মণ) বিজয়ার দিন গ্রাম্যদেবতার পূজা করেন।

৮০। **ভবানীপুর** (দুবরাজপুর থানা, পোঃ হেতমপুর): গ্রামের মধ্যস্থলে ধর্মরাজ। একটি শিলাখণ্ড মাত্র। দেয়াশী জাতিতে বাগদী। পূজারী চক্রবর্তী। মূল পূজা হয় জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়। ধর্মরাজের কামিন্যা স্বরূপ সঙ্গে আছেন দুর্গা।

পূর্ণিমার আগের দিন ধর্মরাজকে গ্রামের বাইরে একটি বটতলায় বাদ্য সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। রাত্রিতে হয় টোকাভাঙ্গা। ধর্মতলা থেকে একজনকে ভর নামিয়ে মাথায় নতুন টোকা দেওয়া হয়। গ্রামের বাইরে তার ভর ছড়ানো হয়। তারপর তাকে গ্রামের বাইরে বনের ধারে মাহাতো পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে বাণেশ্বর থাকেন। সেখানে বাণেশ্বরের স্নান হয়। অন্যান্য সকলে স্নানান্তে তিনবার বাণেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে। সকালে আবার গ্রামের বাইরে এসে জড হয় এবংপুনরায় সেই ভক্ত্যাদের মাথায় টোকা দিয়ে তাদের ভর নামানো হয় এবং ধর্মতলায় ফিরিয়ে এনে ভর ছাড়ানো হয়। পূর্ণিমার দিন বেলা দশটার সময় কাঁটায় ডিগবাজী ও বাবুই খেলা হয়। বেলা ১-টার পর গ্রামের বাইরের ডাঙ্গাল থেকে ভাঁড়াল আনা হয় রাত্রিতে হয় বাণামো। প্রায় রাত্রি দশটার সময় গ্রামের বাইরে পুর্বোক্ত পুকুরে সমস্ত ভক্ত্যা গিয়ে জড়ো হয়। সেখানে তাঁরা জিহ্বাবাণ ফোঁড়ে (স্নানান্তে) তারপর তারা দু'দলে ভাগ হয়ে ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে ধর্মরাজতলায় ফিরে আসে। সেখানে তাদের জিভ থেকে বাণ খোলা হয়। তৃতীয় দিন রাত্রিবেলা চড়ক। পুকুর থেকে একটি শাল গাছের গুঁড়িকে বাজনা বাজিয়ে তুলে আনা হয় গ্রামের বাইরে। তারপর চড়ক গাছ বসানো হয়। রাত্রে ভক্ত্যাদের পিঠে বাণ ফুঁড়ে চড়ক ঘোরানো হয়। চতুর্থ দিনে বাণেশ্বরকে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। সকলে তেল সিঁদুর দেন। তারপর বিকালে রাণেশ্বরকে আবার স্নান করানো হয়।

অন্যান্য—গ্রামে আছেন বাউরীদের পূজিতা বনকুমারী। ১লা মাঘ মুরগী বলি সহ পূজা হয়। তারা ঐদিন শূকর বলিসহ চোরদানারও পূজা করে থাকে।

৮১। **মেটেল্যা** (দুবরাজপুর থানা) : এই গ্রামে ধর্মরাজের পূজানুষ্ঠানে অত্যন্ত ধুমধাম হয়। বক্রেশ্বরের তিন মাইল দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ধর্মরাজের মাটির বাড়ী। সামনে একটি চারচালা। মন্দির বা ঘর দক্ষিণমুখী। মন্দিরের (পূর্ব ঘেঁষে) সামনে কালভৈরবের বাঁধানো বেদীতে তিনটি শিলাখণ্ড

ও ত্রিশূল। সামনে জাম ও বটগাছ। ধর্মমন্দিরে বেদীর উপর তিনটি শিলাখণ্ড। অজস্র কাঠের ও মাটির ঘোড়া। ধর্মরাজদের নাম সুন্দর রায়, কালা রায় ও বুড়ো রায়। দেয়াশী বাগদী। পূজারী ব্রাহ্মণ।

মূল পূজা হয় বৈশাখী পুর্ণিমায়। নিত্যপূজাও হয়। কালভৈরবের পূজাও ধর্মরাজের সঙ্গেই হয়।

পুর্ণিমার পুর্বদিন সকল সম্প্রদায়ের লোক ভক্ত্যা হয়। তারা সন্ধ্যাবেলায় ধর্মমন্দিরের সামনে উত্তরীয় ধারণ করে। তারপর গ্রামের বাইরে (পুর্বে) একটি তেঁতুল গাছের নীচে অন্য একটি ধর্মরাজের আটন আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে কালা রায়কে নিয়ে আসা হয়। ভৈরবের স্থানে কালা রায়কে রেখে নয়াবাঁধ পুকুরে যায়। সেখানে একটি চড়ক খুঁটি ডোবানো থাকে। সেই খুঁটির উদ্দেশ্যে চড়ককে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। বাণেশ্বর সঙ্গে থাকেন। জলের ধারে বাণেশ্বরকে রেখে পান সুপারি দিয়ে বরণ করা হয়। ভক্ত্যারা হাত-পা ধুয়ে গলায় কাপড় দিয়ে ধর্মরাজের জয়ধ্বনি তুলে চারিদিকের ধর্মরাজদের আহ্বান জানায়। এর একটি শ্লোক আছে। (নির্দিষ্ট অধ্যায়ে দ্রঃ)

এদিন ফলভাঙ্গা অনুষ্ঠানও পালন করা হয়। তারপর সকল ভক্ত্যা মন্দিরে ফিরে আসে। পুর্ণিমার দিন পূজা ও হোম। তারপর পাঁঠা উৎসর্গ এবং বলি। এরপর চড়ক গাছটিকে তুলে ডাঙ্গায় রাখা হয়। তারপর একগাদা ফুল ধর্মরাজের মাথায় চড়িয়ে ঢাকবাদ্য সহ দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে একটি ফুল নাকি গড়িয়ে পড়ে। সেই ফুল মূল দেয়াশীর ভাঁড়ালে দেওয়া হয়। মূল দেয়াশী সেই ভাঁড়াল নিয়ে গ্রামের উত্তরে (আর একটি ধর্মরাজের আটন আছে সেখানে) যায়। পুর্বে শুঁড়ি দোকান থেকে মদ এনে রাখা থাকে ঐখানে। ঐ মদ মূল দেয়াশী ও অন্যান্য ভক্ত্যাদের ভাঁড়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদের ঢাক ঢোল বাজিয়ে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে ধর্মতলায় ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর দেবতার সামনে পাঁঠা বলিদানের পর পুর্ণাহুতি হয়।

রাত্রিবেলা বাণেশ্বরকে নিয়ে পশ্চিমে রঘুর পুকুরে ভক্ত্যারা যায়। সেখানে কাঁচা জিভ এবং কোমরের দু'পাশে কাঁচা চামড়া ফুঁড়ে আঙ্গুলের মত মোটা মোটা ৪½ ফুট লম্বা লম্বা বাণ ফোঁড়া হয়। বাণগুলিকে পদ্মফুল দ্বারা শোভিত করা হয়। কোকবাণকে নবরত্নবাণও বলে। এই কোকবাণগুলির দুই মুখ একত্র করে বেঁধে আগুন জ্বালানো হয়। মাথার উপরও আগুন জ্বালানো হয়। রক্তক্ষরণ হয় না বলে লোকশ্রুতি আছে। ঢাক, ঢোল সহ ভক্ত্যারা এই দৃশ্য সারা গ্রামকে দেখিয়ে ফিরে আসে। এরপর নীচে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে উপরে পা বেঁধে দোল খেতে খেতে ফুল ছুঁড়ে দোলনসেবা হয়। তারপর কাঁটায় ঝাঁপ দেওয়া ও কাঁটায় গড়াগড়ির পর আগুনের ফুলখেলা হয়। এই সময় ভক্ত্যারা সবাই সারি সারি বসে পড়ে। তাদের বাঁ কাঁধে পা দিয়ে ব্রাহ্মণ পূজারী পর পর পার হয়ে যান। তাঁকে দু'জনে দু'পাশ থেকে (ভারসাম্য রক্ষার জন্য) সাহায্য করে। তারপর বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে পার হয়ে যান। একে বলে জাঙ্গাল দেওয়া।

পরদিন চড়ক। ভক্ত্যারা ফুল তুলে নিয়ে আসে। তারপর পূজা। পূজার পর মানসিকের

ফুল চড়ানো হয়। এরপর চড়কের ফুল চড়ানো হয়। চড়কের ফুল পড়লে ভক্ত্যারা আশীর্বাদ নিয়ে সন্ধ্যার সময় চড়কতলায় এসে নাচতে থাকে এবং পিঠের কাঁচা চামড়া ফুঁড়ে চড়কগাছে চড়িয়ে ঘোরানো হয়। চড়কের সময় ধর্মরাজের গা দিয়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরতে থাকে। তিনজন লোক সমানে পাখা করেও সে ঘাম নিবারণ করতে পারে না। (গ্রামের সমবেত জনতার সকলেই এ অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে থাকেন বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানালেন) বীরভূমে চড়ক দেওয়ার এ নারকীয় দৃশ্য সম্ভবতঃ মেটেল্যা ছাড়া আর কোথাও নেই। পরদিন চড়ক গাছটি উপড়ে পূর্বোল্লিখিত পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। লোকশ্রুতি এই যে, সারাবছর ঐ গাছটির আর কোনো হদিস্ পাওয়া যায় না। ধীবররা মাছ ধরার সময়ও ঐ গাছের নাকি সন্ধান পায় না।

গ্রামে আখের শালের দু'পাশে দুটি মাটির ধর্মরাজ তৈরী করে পূজা করা হয় এবং তার উপর আখের রস ও গুড় ঢালা হয়। ধর্মবেদীর পাশে মনসাও আছেন। পূজা হয় বগাপঞ্চমীতে।

অন্যান্য—তাছাড়া গ্রামে আছেন বাগদীদের পূজিত বাঘরায় চণ্ডী, বাউরীদের চণ্ডী, ব্রাহ্মণদের বক্কেশ্বরী (ধানমাঠে), কদমবুড়ি, কাটাইচণ্ডী, মালদের অপর একটি কাটাই চণ্ডী ও পলাসী নামে এক দেবী। বাউরীদের পূজিত একজন গ্রামদৈত্যও আছেন। ব্রাহ্মণরা বাঁধের কালী ও রটন্তী কালীর পূজাও করেন। এসব ছাড়াও অনেকগুলি ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মদৈত্য আছেন। গাঁজা, চিঁড়ে, দুধ, মিষ্টি ভোগ দিয়ে পূজা হয়। এসকল পূজার বেশীর ভাগই 'আ-ক্ষেণ' দিবস অর্থাৎ ১-লা মাঘ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৮২। **ভাসতর** (থানা বড়ঞা, পোঃ মান্দারা, মুর্শিদাবাদ জেলা) : গ্রামের মধ্যে পাকা দালানে কাঠের সিংহাসনে ১২টি শিলাখণ্ড মনোহর রায় ধর্মরাজ নামে পূজিত হন। দেয়াশী জাতিতে ধীবর। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পূজা হয়। পূজার দিন ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা স্নান করানো হয় ধর্মরাজের। পূজার ১৫ দিন আগে প্রতিপদের দিন ২ জন ভক্ত্যাকে কামাতে হয়। সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যায় ৬ দিন ধরে হবিষ্যান্ন। ৯ দিন সারাদিন উপবাসের পর মাত্র ফলজল গ্রহণ করতে হয়। এরা কেউ ৯ দিনের ভক্ত, ৫ দিনের ভক্ত, ৭ দিনের ভক্ত হয়। ৯ দিনের ভক্তরা ৫ দিন ও ৫ দিনের ভক্তরা ২ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে এবং যারা ৩ দিনের ভক্ত তারা ১ দিন হবিষ্যান্ন করতে পারে। পূর্ণিমার আগের দিন রাত্রিতে ভক্ত্যারা আগুনের ফুল নিয়ে খেলা করে। ফুলখেলার আগে মোহাস (মুখোস) খেলা হয়। পূর্ণিমার আগের রাত্রিতে ভক্ত্যারা একত্রিত হয়ে রাত্রি যাপন করে। একে গাজন বলে। পূর্ণিমার দিন পূজা, হোম, যজ্ঞ হয়। পরে ময়ূরাক্ষী নদীতে ধর্মরাজকে স্নান করাতে সিংহাসন সহ নিয়ে যাওয়া হয়। আগে ১০৮টি ঢাক ও তৎসহ অন্যান্য বাজনা বাজানো হত। এখন পূর্ণিমার ১৫ দিন আগে থেকে ১৬ খানা ঢাক বাজে। পূর্ণিমার পরদিন নীলপূজা। সেইদিন ঢাক ঢোল সহ ময়ূরাক্ষী নদীতে ধর্মরাজকে স্নান করাতে হয়। সেখানে কতকগুলি গাছ আছে। সেই গাছগুলিকে বেষ্টন করে গাছমঙ্গলা হয়। ধর্মরাজ সন্নিকটে ২।৩ দিন ধরে বোলান গান হয়। গ্রামে কালী ও দুর্গা আছেন।

৮৩। **রূপপুর** (মুর্শিদাবাদ জেলা, কান্দি থানা) : এখানে একটি এক ফুট উঁচু কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রচণ্ড আড়ম্বরের সঙ্গে এই মূর্তিকে শিব মনে করে পূজা, গাজন ও চড়কাদি হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানাদি সবই ধর্মরাজের অনুরূপ। পূর্বে গাজনোৎসবে ৬।৭ হাজার জনসমাবেশ হত। "পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বাণ ও মেলা"র (২য় খণ্ডে) এই দেবতার গাজনোৎসবের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে (১৬৯-১৭৩ পৃঃ)।

৮৪। **হেতিয়া** (থানা বড়ঞা, মুর্শিদাবাদ জেলা): মাটির ঘরে কাঠের সিংহাসনে ধর্মরাজ আছেন। দেয়াশী পাল (কুম্ভকার)। ধর্মরাজের আকৃতি ছোট উজ্জ্বল স্ফটিক জাতীয় বস্তু। কৌটায় রক্ষিত। যে পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবতাকে লাভ করেন (১৫ পুরুষ আগে) তাঁর মুণ্ড (খুলি) বেদীতে রক্ষিত। সেই মুণ্ডের পূজা হওয়ার পর ধর্মরাজের পূজা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পূজা। ধর্মরাজের সঙ্গে মদনমোহন, কৃষ্ণবল্লভ, কালী ও মনসা আছেন। পূর্ণিমার আগে মুক্তস্নান। ভক্ত্যারা বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে গ্রামের প্রান্তে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে সন্ধ্যা-বেলায় স্নান করে। সঙ্গে বাণগোঁসাই থাকেন। তারপর ধর্মরাজের নাম করতে করতে মন্দিরের কাছে আসে এবং পুষ্পাঞ্জলি দেয়। এরপর সেদিন তারা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যায়। ঐদিন দুপুরবেলা ধর্মরাজকে ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করানো হয়। রাত্রিতে বোলান গীত হয়। পূজার দিন সর্বপ্রথম পুরোহিত নিত্যপূজা করেন। তারপর গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ পূজা ও যজ্ঞ করেন। এরপর যার পাঁঠা মানসিক আছে সে বলি দেয়। প্রধান পুরোহিতকে একটি পাঁঠা বলিদানের জন্য লাগে। সেদিন গ্রামের ও বিভিন্ন গ্রামের লোক পূজা দিতে আসে। রাত্রে আবার বোলান গান হয় সারারাত ধরে। ঐদিন মেলা বসে। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে পূজা হয় ৫ম দিনে বাণফুঁড়ে চড়ক হয়।

অন্যান্য—গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বসত বুড়ি। সদ্‌গোপের পূজা। শনি ও মঙ্গল-বারে বিশেষ পূজা হয়। যার মানসিক থাকে পাঁঠা বলি দেয়।

৮৫। **মধুনগর** (থানা নলা, পোঃ পাঁড়পুর, সাঁওতাল পরগণা): একটি খড়ের ঘরে ধর্মরাজ আছেন। ২টি শিলা। একটি গোল, অপরটি চ্যাপ্টা। নাম বুড়ো রায় ও কালা রায়। দেয়াশী জাতিতে ধীবর। পূজারী ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় মূল পূজা। পূজার আচার অনুষ্ঠান সবই হিজলগড়া (বর্ধমান জেলা) গ্রামের অনুরূপ।

অন্যান্য—গ্রামে বৈশাখ মাসে জনসাধারণ কর্তৃক পাঁঠা বলিদান সহ গ্রামদেবতার পূজা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

(ক) পূর্ব প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে তুলনা

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে লাবপুরের 'বীরভূম' ধর্মগাজনের একটি বিবরণ দিয়েছেন। তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ[১]—

প্রথমে তিনজন ধর্মরাজের নাম তিনি দিয়েছেন। (ক) দামোদর, (খ) খাজুরাই, (গ) বিশ্বেশ্বর। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে খাজুরাই ভৈরব এবং বিশ্বেশ্বর শিব ছাড়া আর কিছু নন। নান্নুর থানায় নান্নুরের পাঁচ মাইল দঃ পূর্ব কোণে বালীশ্বর গ্রামে খাজুটি ঠাকুর নামে একজন ভৈরব আছেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার দিন বিশেষ পুজা ও ভর হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা ঔষধ নিতে আসে। তাছাড়া ঐ গ্রামে আছেন ভদ্রকালী। ধর্মঘরে শিব ও ভৈরবের অবস্থানের উদাহরণ, শিবসাযুজ্য অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। লাবপুর থানার চারটি গ্রামের গাজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেছি। তার মধ্যে লায়েকপুর গ্রামের বিবরণটি চিত্তাকর্ষক এবং কিছু নতুন তথ্য আছে।

পুর্বোক্ত প্রবন্ধে এরপর বর্ণিত হয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দেবাংশী হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। শেষ চারদিন কেবল দুধ ও ফল খেয়ে থাকে। পুর্ণিমার চারদিন আগে ভক্ত্যারা ব্রতী হয়। উত্তরীয় নেয়। নূতন কাপড় ও গামছা পরে হাতে বেত্র ধারণ করে। প্রথম দিন ব্রতীরা হবিষ্যান্ন করে। দেবাংশী এইদিন বাণেশ্বরকে স্নান করাতে নিয়ে যায়। ধর্মস্থানে রক্ষিত দুটি ঘোড়ার মধ্যে একটি ঘোড়া কাঁধে নিয়ে ভক্ত্যারা সঙ্গে চলতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন ভক্ত্যাদের উপবাস। সন্ধ্যাবেলা পুনরায় বাণেশ্বর সহ স্নান। নাচগান করে ফিরে আসে। রাত্রে ফল ও দুধ খায়।

তৃতীয় দিন বিকালে ধর্মরাজকে দোলায় চড়িয়ে পরিষ্কার জায়গায় মন্দিরের সামনে রাখা হয়। ধর্মঘরের দরজার কাছ থেকে ভক্ত্যারা উপুড় হয়ে পুর্বদিকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। দেবাংশী একটা নতুন গামছার পাগড়ী বেঁধে ধর্মরাজ মাথায় নিয়ে ভক্ত্যাদের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। এই অনুষ্ঠানের পর দোলায় ধর্মরাজদের নিয়ে পুকুরে যাওয়া হয়। ঘাটে একটি ধুচুনীতে ধর্মরাজদের রাখা হয়। একজন ব্রতী সেই ধুচুনী নিয়ে এক বুক জলে যায়। অপরাপর ব্রতীরা দুধ ও জল দেবতার উপর ঢালে। নীচে একটা মাটির পাত্র রেখে জল ধরা হয়। যদি পাত্রটি পুরো ভর্তি না হয় পুকুরের জল দিয়ে ভর্তি করা হয়। পাত্রটির উপরে একটি আম্রপল্লব রাখা হয়। এরপর স্নান করিয়ে দেবতাদের মন্দিরে আনা হয়। আসনশুদ্ধির মন্ত্রাদি পাঠের পর

হিন্দোল, ধূনোবাণ ও হোম। ভক্ত্যারা জল ভর্তি ভাঁড়াল নিয়ে শুঁড়িবাড়ী যায়। শুঁড়ি কয়েক ফোঁটা মদ দেয়। একে ভাঁড়ার ভরা বলে। দেবাংশী এই কলসীগুলি পুজা করে। তারপর ভক্ত্যারা ঐগুলি মাথায় নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করে দেবস্থানে ফিরে আসে। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুজা ও হোম সমাধা করেন। এখন বলিদান হয়। রাত্রে মঙ্গলকাব্যের গান হয়ে থাকে। পরদিন উত্তরীয় মোচন। লাবপুরের কয়েক মাইল দূরবর্তী ভাসতর গ্রামে ব্রতীরা জিহ্বাবাণ ফোঁড়ে। লাবপুর ও আশেপাশে এই অনুষ্ঠান হয় না।

এই বিবরণ বীরভূমে ধর্মগাজনের মামুলি বর্ণনা। এই অনুষ্ঠান সর্বত্রই বজায় আছে তা প্রদত্ত তথ্যে পরিদৃষ্ট হবে।

মেদিনীপুরের বীরসিংহে গামার বা গম্ভীরা বৃক্ষছেদনের একটি বর্ণনা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় প্রদান করেছেন।[২] এটি আংশিকভাবে মোহনপুর গ্রামের বাবলা ডাল ভাঙ্গার অনুষ্ঠানের সঙ্গে মেলে।

গামার বৃক্ষ ছেদনের বর্ণনা : একটি তামার থালায় আতপ, কোশাকুশি, বাঁকানো ছুরি ও একটি কাটারি পুরোহিত গ্রহণ করেন। গামার গাছের কাছে এসে পুরোহিত গাছে ও গাছের ডালে সুতো বাঁধেন। গাছের গোড়ায় একটি মনুষ্যের প্রতিকৃতি আঁকা হয়। ফুল, ধূনো এবং হলুদ দেওয়া হয়। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে তিনবার ছুরিটি স্পর্শ করান। এরপর ধর্মরাজ ও কালীর জয়ধ্বনি করে বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাঁ হাতে একটি ডাল ধরে ডান হাতের কাটারির এক আঘাতে একটি ডাল কেটে ফেলেন। সেটিকে মাটি ছুঁতে দেওয়া হয় না। পাট ভক্ত্যার মাথায় ডালটিকে চড়ানো হয়। তারপর বাদ্য সহকারে নিয়ে এসে ধর্মরাজদের পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপন করা হয়।

বীরভূমের মোহনপুর গ্রামের গাজনের বিবরণে দেখা যাবে পুরোহিত মন্ত্রাদি পাঠ করে ভৃংগারের জল ছিটিয়ে দেবার পর বাবলা ডাল অক্লেশে ভাঙ্গা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামে ডালভাঙ্গা অনুষ্ঠানও দ্রষ্টব্য। এই অনুষ্ঠানে পুরোহিত যান না—ভক্ত্যারা গিয়ে ডাল ভেঙ্গে আনে। কিন্তু কেন আনে তা কেউ বলতে পারে না। এই ডালভাঙ্গা অনুষ্ঠানকে লাখেরাজ ভাঙ্গা, লাফড়া ভাঙ্গা ইত্যাদিও বলা হয় তা বিশ্লেষণ পর্যায়ে দেখানো হয়েছে।

ক্ষিতীশ প্রসাদের বিবরণে মেদিনীপুরের ধর্মগাজনে মেলঘর অঙ্কন, মুক্তাঘর অঙ্কন ও তৎসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা, পশ্চিমোদয়ের রূপকানুষ্ঠান, লুয়ে ছাগল বধ ও জাগ হাঁড়িতে পুরে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের নিশাযাপনের বিবরণ। গৃহভরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এগুলি কোনোটাই এতদঞ্চলে সংগ্রহ করতে পারিনি। আরও ব্যাপক অনুসন্ধানে হদিস পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। শিবসাযুজ্য ও কামিন্যা কালীর সামান্য কিছু উদাহরণও পুর্বোক্ত লেখক প্রদান করেছেন। বীরভূম অঞ্চলে এই প্রভাব কত প্রবল তা যথাস্থানে প্রদর্শন করেছি। এখন অধ্যাপকের প্রদত্ত মুক্তাঘর ও মেলঘরের বিবরণ দুটি প্রবন্ধ পুর্ণাঙ্গ করবার জন্য প্রদান করছি। গৃহভরণ উৎসবের বিবরণ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে পরবর্তী এক অধ্যায়ে পাদটীকায় প্রদান করেছি।

মুক্তাঘর[৩] : পাঁচটি রংয়ের গুঁড়া তৈরী করতে হয়। আতপ গুঁড়ার সঙ্গে হলুদ দিয়ে হলদে রং, সিঁদুর দিয়ে লাল, পাতার রস দিয়ে সবুজ, কাঠকয়লা গুঁড়ি দিয়ে কালো এবং আতপগুঁড়া সাদা। পদ্মের আকৃতি, (ক) একটি চিত্র ঐ গুঁড়াগুলি দিয়ে আঁকা হয়।[৪] মধ্যখানের বিন্দু (খ) কূর্মাকৃতি ধর্ম। রেখাগুলি পর পর সাদা, হলদে, কালো, লাল এবং শেষে সবুজ বর্ণ দিয়ে টানতে হয়। গ, ঘ, ঙ চিত্রগুলি তৈলাক্ত সিঁদুর দিয়ে আঁকা হয়ে থাকে। চ, ছ চিত্রগুলি আবীর দিয়ে আঁকা হয়। এই দুটিকে বল্লুকা ও চাঁপাই নদী বলা হয়। মনুষ্যাকৃতি 'ঘ' চিত্রটি শূণ্য পুরাণোক্ত শ্বেতাই পণ্ডিতের। 'ঙ' চিত্রটি ধর্মচক্র। 'গ' হল গ্রহদের আসন।

ধুচুনীটি 'খ' বিন্দুর উপর স্থাপন করা হয়। 'ঙ' এর উপর একটি তামার থালা রাখা হয়। তার উপর থাকে একখণ্ড চেলি। ধুচুনীর মধ্যে থাকে পঞ্চরত্ন। চার কোণে চারটি বাঁশের কঞ্চি পুঁতে একটি করে তালপাতা বাঁধা হয় এবং লাল সুতো দিয়ে তিনবার কঞ্চিগুলিকে বেড় দেওয়া হয়।

পাঁচ সের আতপ, একটি নারিকেল, কলা হরীতকী প্রভৃতি রেখে একটি পদ্মফুলের মালা ও লাল কাপড় রেখে ডোম পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে।

মেলঘর[৫] : মুক্তাধান্যের ধুচুনীকে ধোয়ার পর ধর্মের পূজা করা হয়, তারপর ডোমপণ্ডিত মেলঘর অঙ্কণ করে থাকে (শূন্য পুরাণের তত্ত্ব) সাদা চাউল চূর্ণ, লাল আবীর, অভ্র, কালো মুগকলাই চূর্ণ এবং খাঁড়ি মুসুরীর হরিদ্রাভ গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। প্রথমে চাউলগুঁড়া দিয়ে ধর্মের চরণ অঙ্কন করা হয়। তারপর গোলাকৃতি কূর্ম। লাল রংয়ে সাতটি পদ্মের পাপড়ি। পদ্মের চারিপাশে বাসুকী নাগ। বাইরের দাগগুলি ঘর। তার চার দরজা। দরজার সম্মুখে চারটি মনুষ্যমূর্তি যথাক্রমে শ্বেতাই, নীলাই, কংশাই এবং রামাই পণ্ডিত। কোণের চারটি মনুষ্যমূর্তি স্ত্রীলোকের। এই ঘর অঙ্কনের পর ষোড়শোপচারে ধর্মের পূজা করে থাকেন। অপরাপর আবরণ দেবতারাও পূজা পান। তারপর একটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বলিদানের পর এই চিত্রটিকে দেখতে দেওয়া হয়।

বাঁশকাটা ও টোকাভাঙ্গা : বীরভূমে টোকার মধ্যে এবং খুদভর্তি টোকার মধ্যে ধর্মরাজকে বসিয়ে স্নান করাতে নিয়ে যাবার পদ্ধতি আছে নানা গ্রামে। (বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)। তাছাড়াও ধুচুনীর মধ্যে পূজার উপচার সাজিয়ে নানা প্রকার অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে বলে টোকাভাঙ্গা অনুষ্ঠান। ক্ষিতীশপ্রসাদ "টোকাভাঙ্গা" অনুষ্ঠানের নাম করেন নি তবে ধুচুনীটির একটি রেখাচিত্র ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ দিয়েছেন।

বাঁশকাটার পদ্ধতি তিনি দেখিয়েছেন যে—দেউল ভক্ত্যা একঝাড় বাঁশের কাছে গিয়ে সেটিকে পূজা করে ধর্মরাজকে ডাক দেয় এবং একটি বাঁশ কেটে আনে। এই বাঁশকে বলে আলম বাঁশ। এই বাঁশের মাথায় লাল কাপড় বেঁধে ধর্মস্থানের নিকট মাটিতে পুঁতে দেয়।[৬]

এই বাঁশ কাটা পর্বটি সংগৃহীত ও প্রদত্ত তথ্যে হটং···টং···টং নামে দেখানো হয়েছে। মধ্যরাত্রে একজন ভক্ত্যা একপায়ে লাফাতে লাফাতে গিয়ে একটি বাঁশকে জাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে সেটিকে ছেদন করা হয়।

ধুচুনীটি বোনে একজন ডোম স্ত্রীলোক। সে অবশ্যই প্রথমবার বিবাহ করেছে এবং স্বামীর সঙ্গে বাস করেছে। ধুচুনীর চিত্র দ্রষ্টব্য। উপর দিকে বিন্দু দিয়ে সিঁদুরের দাগ। পাঁচটি মনুষ্যমূর্তি পাঁচজন কাশ্যপের, সিঁদুর দিয়ে আঁকা। নীচের দিকে ধর্মচক্র। এই ধুচুনীকে ধর্মরাজের সামনে রাখা হয়।

বীরভূমেও বাঁশ দিয়ে টোকা তৈরী করে ডোম সম্প্রদায়। তাতে সিঁদুর লিপ্ত করে মাঙ্গল্য দ্রব্য রেখে মাথায় করে বহন ও পূজাদি করা হয়ে থাকে বাঁধের-শোল অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে।

(খ) ধর্মের নামাবলী

১। **অনাদিনাথ** : গ্রাম হিজলগড়া (বর্ধমান)।

২। **আউলা ধরম** : হাতোড়া।

৩। **আদিড়ে ধর্মরাজ** : তাঁতিপাড়া, বড়রা এবং শ্রীকণ্ঠপুর। আদাড় অর্থে জঙ্গল। তুলনীয় বেলিয়া গ্রাম এবং পুরন্দরপুরের আদিড়া কালী।

৪। **আদিরাক্ষ ধর্মরাজ** : কড্ডাং ও পালিগ্রামের (বর্ধমান) দ্বিতীয় আটন।

৫। **আষিড়ে ধর্মরাজ** : পতণ্ডা।

৬। **এলো রায়** : দুবরাজপুর।

৭। **কটা রায় ও কট রায়** : আদিত্যপুর, উচকরণ, রায়রামচন্দ্রপুর (বর্ধমান) দাঁড়কা।

৮। **কণ্ঠ রায়** : নবেলেড়া।

৯। **কাণা রায়** : মামুদপুর, চিঁচুড়িয়া (বর্ধমান)।

১০। **কামার বুড়ো রায়** : ঘুরিষা।

১১। **কালা রায় ও কেলে রায়** : পুরন্দরপুর, দুবরাজপুর, মেটেল্যা, ঘুরিষা, ভবানীপুর, ভাদুলিয়া, বড়রা, উষগ্রাম, অবিনাশপুর, উচকরণ, অজয়কোপা, চিঁচুড়িয়া (বর্ধমান), পায়ের, করিধ্যা, কুলেড়া, মধুনগর (সাঁওতাল পরগণা), শিরা, নিস্তিয়া, দাঁড়কা, বাতিকার।

১২। **কালু রায়** : রাইপুর, এবং সাঁইথিয়া থানায় কালুরায়পুর।

১৩। **কাঁটা রায়** : লম্বোদরপুর।

১৪। **কেদার রায়** : নিস্তিয়া।

১৫। **কোদালে কাটা** : উচকরণ।

১৬। **কোঁড়াপাড়ার ধরম** : হাজরাপুর।

১৭। **কূর্মদেব** : গ্রাম মালাবেড়িয়া।

১৮। **খঞ্জ রায়** : গ্রাম ঘুরিষা।

১৯। **খোঁড়া রায়** : গ্রাম দুবরাজপুর, লাঙ্গুলিয়া, মনপুর, কুলেড়া, খটঙ্গা, পাতাডাং।

২০। **খুজুটেশ্বর** : বড়া, খুজুটিপাড়া।

২১। **খেলা রায়** : লম্বোদরপুর, আদিত্যপুর।

২২। **খেলারাম** : শালদহ, সুগুণপুর, গৌরনগর।

২৩। **গিরিধরম** : তাঁতিপাড়া।

২৪। **গরীব রায়** : মালিয়ান্দি (মুর্শিদাবাদ)।

২৫। **চাঁদ রায়** : পুরন্দরপুর, কড্ডাং, লম্বোদরপুর, ভগবানবাটি, ভাণ্ডীরবন, গোয়ালপাড়া, শিমুলডি, অবিনাশপুর, ভাদুলিয়া, আদিত্যপুর, ন-বেলেড়া, কুড়মিঠা, উচকরণ, ভগবতী বাজার, করিধ্যা, কুলেড়া, শিরা, খটঙ্গা, নিস্তিয়া, দাঁড়কা, কালিপুর, গোলাপগঞ্জ।

২৬। **চন্দ্রেশ্বর** : পলপাই[১] আদিত্যপুর, ন-বেলেড়া, কুড়মিঠা।

২৭। **চম্পক রায়** : গ্রাম কড়েয়া (মুর্শিদাবাদ)।

২৮। **ছেলেধরম** : করিধ্যা, নির্ভয়পুর, রাইপুর, ভুরকুনা।

২৯। **জুবুটেশ্বর** : প্রবাদে প্রাপ্ত (জুবুটিয়া গ্রামে জপেশ্বর শিব বর্তমান)।

৩০। **তুলো রায়** : অবিনাশপুর, করিধ্যা, কুলেড়া, কালিপুর।

৩১। **দর্পনারায়ণ** : দেবীপুর।

৩২। **দামোদর রায়** : কুমারপুর।

৩৩। **দুধকমল** : উচকরণ।

৩৪। **ধর্মরায়** : ভাদুলিয়া, বড়রা, করিধ্যা, শিরা, হিজলগড়া (বর্ধমান), নিস্তিয়া।

৩৫। **ধরম** : লায়েকপুর, (গাছতলায় উপেক্ষিত সিঁদুর রঞ্জিত শিলা)।

৩৬। **ধরমশিলা** : দরবার ডাঙ্গা (বর্ধমান)।

৩৭। **নীল রায়** : ন'বেলেড়া।

৩৮। **নীলকণ্ঠ** : নিস্তিয়া।

৩৯। **পঞ্চানন** : মহুগ্রাম।

৪০। **পঞ্চা রায়** : কুমারপুর।

৪১। **পাদুকা রায়** : ভাদুলিয়া।

৪২। **পোড়া রায়** : মহুগ্রাম, রায়রামচন্দ্রপুর (বর্ধমান)।

৪৩। **পুরন্দর** : পুরন্দরপুর, বড় সাংড়া, জোল্ল।

৪৪। **পৈঠদেব** : মালাবেড়িয়া।

৪৫। **পচা ধরম** : কালিপুর (বর্তমানে লুপ্ত)।

৪৬। **ফটিক রায়** : ন'বেলেড়া, মারকোলা, অজয়কোপা, খড়গ্রাম (মুর্শিদাবাদ), মহুগ্রাম, বেজুরী, নিস্তিয়া।

৪৭। **ফুলচাঁদ** : উষগ্রাম।

৪৮। **বাঘ রায়** : লম্বোদরপুর।

৪৯। **বাংড়ো রায়** : ঘুরিষা (এটি বাঁকড়ো রায়-এর পরিবর্তিত রূপ হওয়া সম্ভব)।

৫০। **বুড়ো ঠাকুর** : হাটইকড়া।

৫১। **বৃদ্ধ রায়** : ঘুরিষা।

৫২। **বুড়ো রায় ও বুড়ো ধর্মরাজ** : হাসানাবাদ, অমৃতপুর, স্বগণপুর, কচুজোড়, রাইপুর, কুড়মিঠা, কেন্দ্রগড়িয়া, মামুদপুর, কৃষ্ণপুর, মেটেল্যা, ঘুরিষা, ইলামবাজার, গোয়ালপাড়া, ভবানীপুর, বড়রা, বাবুইজোড়, হজরৎপুর, ভাতুলিয়া, উচকরণ, চিঁচুড়িয়া (বর্ধমান), কুলেড়া, হিজলগড়া (বর্ধমান), শিরা, মধুনগর (সাঁওতাল পরগণা), অবজরপুর, মালাবেড়িয়া, নাগড়াকোন্দা, লা-গড়ে, চুড়র, রায়পুর (বোলপুর সন্নিকট)।

৫৩। **বালক রায়** : ভাণ্ডীরবন (রাজারপুকুর ও পাতাভাং-এ বালক ব্রহ্মচারীর পীঠ আছে)।

৫৪। **বিজলী রায়** : ঘুরিষা।

৫৫। **বহড়া ডিহি ধর্মরাজ** : গোয়ালপাড়া।

৫৬। **বিধায়ক রাজ** : ভবানীপুর।

৫৭। **বাঁকড়ো রায়** : বড়রা।

৫৮। **বাথান রায়** : রসা, শিরা।

৫৯। **বাঁকা রায়** : ভাতুলিয়া।

৬০। **বাঁকা শ্যাম** : শিরা।

৬১। **বিনোদ রায়** : পায়ের, খটঙ্গা।

৬২। **বেণুদেব** : মালাবেড়িয়া।

৬৩। **ভুলোরায়** : লম্বোদরপুর।

৬৪। **মনোহর রায়** : কুমারপুর, ভাসতর।

৬৫। **মানিকলাল** : ভ্রমরকোল।

৬৬। **ময়না রায়** : রায়রামচন্দ্রপুর (বর্ধমান)।

৬৭। **মেঘ রায়** : গোয়ালপাড়া, রায়রামচন্দ্রপুর।

৬৮। **মৎস্য রাজ** : মালাবেড়িয়া।

৬৯। **রঘুনাথ** : ভগবানবাটি, কুলেড়া, রসুলপুর, ভগবতীপুর।

৭০। **রাজরাজ্যেশ্বর** : ভাতুলিয়া, উচকরণ (কচুজোড়ের রাজরাজ্যেশ্বরী কালী দ্রষ্টব্য)।

৭১। **রামঘুঘু** : রাইপুর (মল্লিকপুর অঞ্চল)।

৭২। **রসিক রায়** : মারকোলা।

৭৩। **লালা রায়** : দাঁড়কা।

৭৪। **লীলা রায়** : গৌরনগর।

৭৫। **লাল চাঁদ** : কুমারপুর।

৭৬। **হাতি রায়** : গোলাপগঞ্জ।

৭৭। **শিরে ধর্মরাজ** : চৌহাট্টা (শির অর্থ প্রধান)।

৭৮। **শ্বেতচাঁদ** : খয়রাকুঁড়ি।

৭৯। **শ্যাম রায়** : অমৃতপুর, নিস্তিয়া।

৮০। **শ্রীধর রায়** : ভগবতীবাজার।

৮১। **সিঁন্দুর রায়** : লম্বোদরপুর, ভাদুলিয়া।

৮২। **সুন্দর রায়** : ঈশ্বরপুর, মেটেল্যা, বড়রা, সটকী, পার্শণ্ডী, অবিনাশপুর, পায়ের, ভগবতীবাজার, কুলেড়া, ছিনপাই, চন্দ্রপলসা, বাতিকার, গোলাপগঞ্জ।

৮৩। **সিন্ধু রায়** : কুড়মিঠা।

৮৪। **সুগন রায়** : নিস্তিয়া।

৮৫। **সুম্বারায়** : সুপুর (বর্তমানে অশিক্ষিত উচ্চারণে এটি দাঁড়িয়েছে শম্ভু রায়ে)।

৮৬। **সুচাঁদ** : উষগ্রাম।

৮৭। **সেন্দুরাজ** : ভবানীপুর।

৮৮। **সোন্দল রাজ** : উচকরণ (এটি সুন্দর শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। সুন্দর > সোন্দর > সোন্দল)।

৮৯। **সিদ্ধেশ্বর** : বারুইপুর (লাউসেনের সিদ্ধিলাভের স্থান বলে কথিত) গৌর নগরে সিদ্ধেশ্বরী কালী আছেন। বিজয়া দশমীতে পুজা হয়। ছিনপাই গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালী কার্তিকে পুজিতা হন।

৯০। **স্বরূপ নারায়ণ** : পায়ের, শ্রীচন্দ্রপুর।

(গ) দেয়াশী

উগ্রক্ষত্রিয় : মোহনপুর।

কর্মকার : সিঙ্গুর।

কলু : কুড়মিঠা।

কুম্ভকার : সুগুণপুর, ছিনপাই, বাঁধের শোল, হেতিয়া, (মুর্শিদাবাদ)।

কৈবর্ত বা ধীবর : হুড়াই, মামুদপুর, কৃষ্ণপুর, বড়রা, তাঁতিপাড়া, ঘুরিষা, পায়ের, কাঁইজুলি, চিঁচুড়িয়া, মহুগ্রাম, হিজলগড়া, মধুনগর, কুমারপুর, ভাসতর, কালিপুর।

গোহালা : হাসনাবাদ, তুকুটি, শুভ্রাক্ষিপুর।

গন্ধবণিক : বড়া, খুজুটিপাড়া, ঈশ্বরপুর, রাজগঞ্জ।

চাষা : (লায়দার) শিরা।

ডোম পণ্ডিত: শালদহ, সুগুণপুর, ধোবাগ্রাম, গজালপুর, অবিনাশপুর, মনপুর, মারকোলা, ভবানীপুর, জামথলি, খটঙ্গা।

তন্তুবায় : নাকাশ, ভগবতীবাজার।

দুলে : জীবধরপুর।

ভাণ্ডারী : মল্লিকপুর, ব্যাঙ চাতরা, গোয়ালপাড়া, শেখপুর।

বাউড়ী : দুবরাজপুর।

বাগদী : জ্যোল্ল, গাংমুড়ি, মুড়োমাঠ, কোঁদাইপুর, ইকড়া, বাতাসপুর, গাংটে, লাঙ্গুলিয়া, ভ্রমরকোল, জীবধরপুর, কোমা, উচকরণ, গোহালি আড়া, কামারহাটি, বারুইপুর, ভীমগড়, তাঁতিপাড়া, মেটেল্যা, লায়েকপুর, ভাদুলিয়া, চন্দ্র পলসা, ভবানীপুর, দাঁড়কা, শ্রীকণ্ঠপুর।

ব্রাহ্মণ : কেন্দুয়া, পাসুড়ে, ছোড়া, কচুজোড়, ভগবানবাটি, কুসুড়ি, হজরৎপুর, কোটাসুর, জুঁইথিয়া, খড়গ্রাম, তেঁতুলবাঁধ, পার্বতীপুর, পাতাডাং, ভুরকুনা।

মাল : করিধ্যা, সাঁইথিয়া, কেন্দ্রগড়িয়া, তাঁতিপাড়া, জীবধরপুর, জামথলি।

মালাকার : সিউড়ী।

ময়রা : রাইপুর, চৌহাট্টা, সুপুর।

মুচি : রায়রামচন্দ্রপুর।

রজক : অজয়পুর।

রাজপুত: মালাবেড়িয়া, দাদপুর, রাতমা।

লোহার : আদিত্যপুর।

হাড়ি : দুর্গাপুর, গোবরা, কুলেড়া।

শুঁড়ি : পুরন্দরপুর, সিউড়ী, শেহাড়াপাড়া, অজয়কোপা, চিঁচুড়িয়া, কালুহা, জগদীশপুর।

সদগোপ : কুবীরপুর, লম্বোদরপুর, বারুইপুর, নির্ভয়পুর, উষগ্রাম, হাটইকড়া, হাড়াইপুর, কড্ডাং, বেলিয়া, বিষয়পুর, গৌরনগর, খয়রাকুঁড়ি, দেবীপুর, ন'বেলেড়া, মারকোলা, লখীন্দরপুর, চৌহাট্টা, মালাবেড়িয়া, নারায়ণপুর, অমৃতপুর, বেজুরী, কাগাস, নিস্তিয়া, ঘাসিয়াড়া, পালিগ্রাম।

সাহানা : (তন্তুবায়) জামথলি।

গ্রন্থপঞ্জী

১. 'ধর্ম ওয়ারশিপ' জার্নাল অব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি, ৮ম খণ্ড, কে. পি. চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০৭-১১০।

২. ঐ, পৃঃ ১২০।

৩. ঐ চিত্র, পৃঃ ১১৫, বীরসিংহ, মেদিনীপুর।

৪. 'পঞ্চগুণ্ডি', তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজায় ঘট স্থাপন করিতে হয় শ্বেত, নীল, হরিদ্রা, সবুজ ও কৃষ্ণবর্ণের পঞ্চগুঁড়ির যন্ত্র আঁকিয়া। ধর্মপূজায় গৃহভরণ স্থাপন সামগ্রীর মধ্যে পঞ্চগুণ্ডী অন্যতম। উপরন্তু এই রং বিভিন্ন বর্ণের চনা ও আমান্নের রংয়ে এবং সম্ভবতঃ শ্বেতাই, নীলাই প্রভৃতি পঞ্চ পণ্ডিতের পঞ্চ রংয়ে পর্যবসিত হইয়াছে। কায়-যোগেও ষট্‌চক্রের এইরূপ নানা বর্ণের উল্লেখ আছে।" যাদুনাথের ধর্মপুরাণের ভূমিকা, পৃঃ ২৫, ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল 'বিশ্বভারতী'।

৫. ঐ মেলঘর (বীরসিংহ), পৃঃ ১২৩।

৬. মেদিনীপুরের (বীরসিংহ), পৃঃ ১১২।

৭. পলপাই গ্রামে ধর্মরাজের নিকট একটি ষাঁড় আছে বাহন স্বরূপ। পৃথক স্থানে অবশ্য শিবও আছেন

সংযোজন (১)

১। **দোল** (পৃঃ ৯) : "দোল দুর্গোৎসব, পালপার্বন তো সবই অবৈদিক ব্যাপার। তীর্থব্রতও তাই"—ভারতের সংস্কৃতি, পৃঃ ১৯।

২। **বিষ সংক্রান্তি** (পৃঃ ১০-১১) : জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিকে বলা হয়। এইদিন দেহের বিষ-নাশনের জন্য তেতো জিনিষ খাবার নিয়ম। নিম, কেলে কাঁকড়া (ফলবিশেষ), মসুর ডাল ইত্যাদি খেতে হয়। বাড়ীর চারিধারের দেওয়াল ঘিরে গোবরের একটি বেড়া দিয়ে বিষ-বন্ধন করা হয়। এদিনও দশহরার মত মনসার ডাল পুঁতে মনসা পুজা করা হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, এদিন বৃষ্টি হলে সাপের বিষ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

৩। **পণ্ডাসুর** (পৃঃ ১২) : "বেদে ইক্ষু বা গুড় নেই। তাদের মিষ্টি জিনিষ ছিল মধু। ভারতে এসে তাঁরা ইক্ষু পেলেন। পৌণ্ড্র দেশ ও জাতি। ইক্ষুর নামও পৌণ্ড্র" ভারতের সং, ক্ষিতিমোহন, পৃঃ ৫০ আলোচনা—"Paḍasur—Is he a tribol god" by Sankaranda Mukherjee (Page 112), Bulletin of the Cultural Research Institute (Schedule Caste and Tribes Welfare Deptt.), vol. VIII, No. 3 & 4, 1969.

৪। **হোলির আগুন** (পৃঃ ২৫) : "হোলি বা দোলকে শূদ্রোৎসব বলে। হোলির আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের কাছ থেকেই আনতে হয়। বেরারের কুনবীরা এই সময় অস্পৃশ্য মহারের ঘর হতে আগুন আনতে বাধ্য হন।"—ভারতের সং, পৃঃ ২৬।

৫। **আরও দেবদেবী** (পৃঃ ৩২) : কুমড়ো বুড়ী। বারোয়ারী পুজা—ধানমাঠে হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। গ্রাম কুণ্ডিরা, রাজনগর থানা। তা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে পুজিত কয়েকটি অবৈদিক দেবদেবীর নাম : শিরকা মোসনা, বাণসিংহ, নারসিংহ, দোদাল সিংহ।

৬। **নিমিকনাথ** (পৃঃ ৯৫) : ধর্মঠাকুরের এই নাম জৈনপ্রভাবের ফল।

৭। **অশৌচ** (পৃঃ ১০৯) : "অশৌচ শূদ্রদের যে বেশী এবং ব্রাহ্মণদের যে কম তার মধ্যেও হয়ত এইটেই কারণ যে এই জিনিষটি শূদ্রদের মধ্যেই বেশী করে প্রতিষ্ঠিত ছিল"—ভারতের সং, পৃঃ ১৬।

৮। **সহরুল** (পৃঃ ৯) : ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের মধ্যে এপ্রিলের গোড়ায় ধর্ম এবং বুড়ো বুড়ীর পুজা হয়। স্বর্ণবুড়ীর উদ্দেশ্যে বলি পড়ে। তাছাড়া বীর, হোড়, হো, মহালি, ভূমিজ, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই উৎসব হয়। (Tribal Research Bulletin—Vol. 8, No. 3-4, P. 27)।

৯। **সাকরাত** (পৃঃ ৯) : সাঁওতালদের মধ্যে পৌষ সং অথবা মাঘ ফাল্গুনে অনুষ্ঠিত হয়—"Associated with hunting and ancestral worship or for the general welfare of the household"—The Santals, N. Dutta Mazumdar

১০। **ডাকপুজা** (পৃঃ ১০) : কোঁড়াদের মধ্যে মেদিনীপুরে আশ্বিন মাসে হয়। "To have power in Magical rites"—T. Research Bull., Vol. 8, P. 27।

১১। **আখান** (পৃঃ ২১) : মহালি জাতির মধ্যে আখান পূজা হয় ১লা মাঘ। মুণ্ডাদের মধ্যে Akhan Sendra চৈত্র মাসে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে শিকার উৎসব বলে পরিগণিত হয়। Tribal Research Bull., Vol. 8, No. 3-4, P. 27.

১২। **ষষ্ঠী** (পৃঃ ৮৩-৮৬) : জৈনদের মধ্যেও ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে।

১৩। **মাঘসিম** (পৃঃ ২০) : মেদিনীপুরে মহালি জাতির মধ্যে মাঘ মাসে এই উৎসব পালিত হয়। ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য দেবতার উদ্দেশ্যে রোগ নিরাময়ের কামনায় বলি দেওয়া হয়। Tribal Res. Bull., Page 27।

১৪। **অনাবৃষ্টির তুক** (পৃঃ ১৭) : (ক) বিহারে হর-পরাউরি নামে একটি অনুষ্ঠান আছে। পুরুষরা নগ্ন হয়ে গ্রাম পরিক্রমা ও গালাগালি করে। রাত্রে মেয়েরা মাঠে নগ্ন হয়ে পরিক্রমা করে পুকুরের জলে বীজ ছুঁড়ে দেয়।

(খ) কুচবিহারে আদিবাসীরা হুদুম দেওরের পূজায় মাঠে গিয়ে নগ্ন হয় এবং তারপর প্রতি বাড়ী ঘুরে বেড়ায়।

(গ) নগ্ন হয়ে মেয়েরা বৃষ্টি কামনায় পরস্পর মারামারি সুরু করে বেলুচিস্থানে।

সংযোজন (২)

আদিবাসী সমাজের পূজা উৎসবাদির হিসাব—

মুণ্ডা : মাণ্ডা, সহরুল, বা-পরব, বাতে-ইলি, ফাগু, ফাগুয়া সোহেরাই, আখান সেন্দ্রা, করম, জিতিয়া, দেওঠান, জাহুরা, খাড়িপরব, পৌষপরব, মাঘপরব, চৈতপরব।

সাঁওতাল : সাহরে, সাকরাত, বাহা, মাঘসিম, এরোকসিম, মাকমোরে, বাতাউলি, যমননা।

ওঁরাও : সহরুল, গ্রামপূজা, গ্রামবান্দা, গোয়েরা, সোহরাই, করম।

মহালি : করম, গোয়েরা, টুসু, সরুল, মাঘি, মাঘসিম, আখাম, বাহা, সকরাত।

ভূমিজ : সহরুল, দেশশিকার, দলমা পুজা, করম, বাঁধনা, বুরু, মাঘপূজা, টুসু, মকর সংক্রান্তি, পঞ্চবহিনী, বরদেলা, দেওশালি, গ্রামদেবতা, কুদ্রা, বিশাইচণ্ডী।

মালপাহাড়ি : পতি বা আষাড়ি, গরভু, চড়ক, রকম, মাঘি, জিতুয়া, বসুমতী, মহাদেও।

হো : পৌষপরব, মাঘপরব, খারিয়া পুজা, সহরুল, বাহা, গোসাপুণ্য, বাতাউলি, গ্রাম-পরব, বাঁধনা, গোহাল পূজা, জম্মমা।

বীরহোড় : সোসাবংগ, নবজোম, করম, জিতিয়া, দেশাই, সোহরাই, গ্রামঠাকুর।

কোড়া : শিব, ডাক, গোয়েরা, টুসু, মাঘি।

লোধা : বরাম, বাঁধনা, জাথেল, টুসু।

মেচ : বাথাউ, মৈনাও।

রাভা : জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, কামাক্ষা, কালী, সোয়ারি।

মঘ : শিব, দুর্গা।

টোটো : ওমচু, ময়ু, মনকানিউ, সারদে, গ্রামপুজা।

লেপচা : নামবান, মানে, ইনটেন, চুরূপ।

গারো : তাতারারাবুগা, চোরাবুদি, নোস্ত, নোপানতু, সালজোং, গোয়েরা, কালমে, সুসিমি, নোয়াং।

ভুটিয়া : লোসার।

প্রধান কয়টি আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা

সরকারী সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি আদিবাসী গোষ্ঠী। তাদের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠী হল : (১) সাঁওতাল ১২০০,০১৯ ; (২) ওরাওঁ ২৯৭,৩৯৪ ; (৩) মুণ্ডা ১৬০,২৪৫ ; (৪) ভূমিজ ৯১,২৮৯ ; (৫) কোড়া ৬২,০২৯ ; (৬) ভুটিয়া ২৩,৫৯৫ ; (৭) লেপচা ১৫,৩০৯ ; (৮) মেচ্ ১৩,৯১৫ ; (৯) রাভা ৬০৫৩ ; (১০) গারো ২৫৩৫।

স্থান ও গ্রাম নির্দেশ

সঙ্কেত : থানা হিসাবে – সিউড়ী = সি, সাঁইথিয়া = সাঁ, লাবপুর = লা, নানুর = না, রাজনগর = রাজ, খয়রাশোল = খ, দুবরাজপুর = দু, মহম্মদবাজার = ম, বোলপুর = বো, ইলামবাজার = ই, রামপুরহাট = রাম, ময়ূরেশ্বর = ময়ূ, নলহাটি = ন, মুরারই = মু।

গ্রামের নাম, থানা

অজয়কোপা – সাঁ
অজয়পুর – সি
অবজরপুর – খয়
অমরপুর – সাঁ
অমৃতপুর – সি
আদিরায়পুর – সাঁ
আদিত্যপুর – বো
আঙ্গারগড়িয়া – খ
আলারগ্রাম – সি
আলিগ্রাম – না
আলিতোড় – সাঁ
আলুন্দা – সি
আসেঙ্গা – মহ
ইকড়া – সি
ইটাহাট – ময়ূ
ইন্দ্রগাছা – সি
ঈশ্বরপুর – সাঁ
উচকরণ – না
উজ্জ্বলপুর – লা
উষগ্রাম – সি
এরুয়ালি – মুর্শিঃ জেলা

গ্রামের নাম, থানা

কচুজোড় – সি
কটুনী বৈদ্যপুর – ম
কড্ডাং – দু
কদমডাঙ্গা – খ
কনকপুর – মু
কবিলাষপুর – রাজ
করিধ্যা – সি
কাঁইজুলি – ম
কাঁখুটে – সি
কাগাস – সাঁ
কাপাশটিকুরী – বো
কামারহাটি – ময়ূ
কামালপুর – সি
কালিপুর – সি
কালুরায়পুর – বো এবং সাঁ
কালুহা – রাম
কুখুটা – দুব
কুসুড়ি – সাঁ
কুণ্ডলা – ময়ূ
কুণ্ডিরা – রাজ
কুমড়া – না

গ্রামের নাম, থানা

কুমারপুর – ময়ূ
কুমারষণ্ডা – নল
কুমুড্ডাহা – ময়ূ
কুবীরপুর – সি
কুলেড়া – সি
কুষ্টিকুড়ি – ইলাম
কুস্তোড় – সি
কুড়মিঠা (১) – ই
কুড়মিঠা (২) – সি
কৃষ্ণপুর – খ
কেউহাট – ময়ূ
কেন্দুবিল্ব – ই
কেন্দুলি – সি
কেন্দুয়া – সি
কেন্দ্রগড়িয়া – খ
কোটাসুর – ময়ূ
কোদাইপুর – সি
কোমা – সি
কোয়াঁরপুর – ময়ূ
খটঙ্গা – সি
খয়রাকুঁড়ি – মহ

খয়রাশোল — খয়
খড়গ্রাম — মুর্শিঃ জেলা
খাসবাজার — রাজ
খুজুটিপাড়া — না
খোসকদম্বপুর — বো
গজালপুর — সি
গণপুর — মহঃ
গলগাঁ — সি
গড়গড়ে — সাঁ
গড়পাড়া — না
গাঁধপুর — না
গাংটে — সি
গিধিলা — ময়ূ
গুমড়া — ময়ূ
গুলালগাছি — রাজ
গোপদীঘি — লাব
গোপডিহি — না
গোপালপুর — মু
গোপালপুর — সি
গোবরা — সি
গোলাপগঞ্জ — রাজ
গোয়ালপাড়া — বো
গোয়ালিআড়া — দুব
গোয়ালগ্রাম — সি
গোয়ালশাহী — ময়ূ
গৌরনগর — মহঃ
ঘুরিষা — ই
ঘাসিয়াড়া — মুর্শি জেলা,
থানা — বড়ঞা
চণ্ডীনগর — ময়ূ
চণ্ডীপুর — না
চন্দ্রপলসা — ময়ূ
চন্দ্রপুর — রাজ

চিঁচুড়িয়া — বর্ধ জেলা,
থানা — জামুড়িয়া
চুড়র — খ
ছাতিনগ্রাম — না
ছিনপাই — দুব
ছোটবাজার — রাজ
ছোড়া — সি
জগদীশপুর — রাম
জগন্নাথপুর — সাঁ
জামুড়ি — সি
জামথলি — দুব
জীবধরপুর — সি
জুঁইথিয়া — সা
জুবুটিয়া — না
জোল্ল — সাঁ
ডানজনা — মহঃ
ডুমুরিয়া — সাঁ
ডেউচা — মহঃ
ডোংরা — না
ঢেকা — ময়ূ
তারাপুর — রাম
তালতোড় — বো
তাঁতিপাড়া — রাজ
তিলপাড়া — সি
তিলোরা — নল
তুম্বুটি — খ
তেঁতুলবাঁধ — রাজ
দরবারডাঙ্গা — বর্ধঃ জেলা,
থানা — জামুরিয়া
দমদমা — সি
দক্ষিণগ্রাম — ময়ূ
দাথিনা — না
দাদপুর — ময়ূ

দাঁড়কা — লা
দুর্গাপুর — সি
দুরামশাহা — সাঁ
দুবরাজপুর ১ নং — দুব
দুবরাজপুর ২নং — রাজ
দেওলি — বো
দেওয়াস — সাঁ
দেবীপুর — ই
দেরপুর — সাঁ
ধইটা — সি
ধরমপুর — দুব, ই, মহ, নল
ধর্মঘাট — বাঁকুড়া, ওন্দা থানা
ধান্যগ্রাম — সি
ধূলপুর — ই
ধোবাজলা — সাঁ
ধোবাগ্রাম — সি
নওয়ানগর — না
নগরা — নল, ময়ূ
নগুরী — সি
নন্দীপুর — সাঁ
নবেলেড়া — ময়ূ
নহোদরী — সি
নলহাটি — ন
নাকাশ — রাজ
নাগরাকোন্দা — খয়
নান্নুর — না
নান্দড়া — ময়ূ
নারায়ণপুর — দুব
নিমগড়ই — সাঁ
নিস্তিহ্যা — ময়ূ
নির্ভয়পুর — সি
নিরিশা — সাঁ
নিশ্চিন্তপুর — রাম

নুড়াই – সি
পতণ্ডা – সি
পরিহারপুর – সাঁওতাল পঃ
পরোটা – নান্নুর
পলপাই – খয়
পলসারা – সি
পাইকড় – মু
পাটজোড় – সাঁওতাল পঃ
পাতড়া – সি
পাতাবাড়ী – সাঁওতাল পঃ
পাতাডাঙ্গা – রাজ
পাতিসারা – না
পাথাই – ময়ূ
পানসিউড়ী – খয়
পান্নুড়ে – সি
পারিসর – সাঁ
পারুলিয়া – দুব
পার্বতীপুর – সি
পালিগ্রাম – বর্ধমান,
থানা – মঙ্গলকোট
পায়ের – ই
পার্শণ্ডী – খয়
পাঁচথুপী – মুর্শিদাবাদ, কান্দী
পাঁচপাকুড়ে – সি
পাঁড়ুই – সাঁ
পুরুষোত্তমপুর – মহঃ
ফজুল্লাপুর – না
ফুলবেড়িয়া – দুব
ফুল্লরা (অট্টহাস) – লাব
বক্রেশ্বর – দুব
বড়জোল – রাম
বড়জোড় – খয়রা
বড়মহুলা – সি
বড়া – না
বড়রা – খয়
বড়াম – মহঃ
বাইতারা – না
বাগরাকোন্দা – সাঁ
বাজিতপুর – ময়ূ
বাণেশ্বর – নল
বাতাসপুর – সি ও সাঁ
বাতিকার – ই
বাবুইজোড় – খয়
বারুইপুর – সি ও ইলাম
বামুনডিহি – সাঁওতাল পঃ
বারাগ্রাম – নল
বালীশ্বর – না
বাঁধেরশোল – দুব
বাঁশড়া – সি
বিষয়পুর – লা
বীরসিংহপুর – সি
বেজুরী – রাম
বেলগ্রাম – না
বেলিয়া – সাঁ
বেলেড়া – রাজ
ব্যাঙচাতরা – না
ভগবতীপুর – ময়ূ
ভগবতীবাজার – ই
ভগবানবাটি – সি
ভবানীপুর – রাজ ও দুব
ভরাং – ইলাম
ভ্রমরকোল – সাঁ
ভাদুলিয়া – খয়
ভাণ্ডীরবন – সি
ভালিয়ান – ময়ূ
ভাস্তর – মুর্শি, থানা – বড়ঞা
ভীমগড় – খয়
ভুঁইফোড়তলা – সি
ভুরকুনা – সি
ভূতুরা – মহঃ
মইসাদল – সাঁ
মধুনগর – সাঁওতাল পঃ,
থানা – নলা
মনপুর – সি
মল্লারপুর – রাম
মল্লিকপুর – সি
ময়নাডাল – খয়
ময়ূরেশ্বর বা মৌড়েশ্বর – ময়ূ
মহুগ্রাম – লা
মহুবোনা – সি
মহুরাপুর – ময়ূ
মহুলা – ময়ূ
মাজিগ্রাম – সি
মামুদপুর – খয়
মারকোলা – সাঁ
মালাবেড়িয়া – সাঁ
মালিগ্রাম – ময়ূ
মালিয়ান্দি – মুর্শি
মীর্জাপুর – বো
মুথাবেড়িয়া – খয়
মুন্দিরা – খয়
মুরারিপুর – না
মুরুলিডাঙ্গা – ময়ূ
মুড়োমাঠ – সি
মেটেলা – দুব
মোহনপুর – না
মৌলপুর – মহঃ
মৌড়েশ্বর – ময়ূরেশ্বর দ্রঃ
যশপুর – দুব

ষাকলা – মহঃ
রজতপুর – বো
রণপুর – সি
রথতলা – খয়
রসা – খয়
রসুলপুর – ময়ূ
রাইপুর – সি+বোল+সি
রাউতগড়া – ময়ূ
রাউতাড়া – রাজ
রাজগঞ্জ – দুব
রাজচন্দ্রপুর – ময়ূ
রাজারপুকুর – সি
রাণীপাথর – খয়
রাণীশ্বর – সাঁওতাল পঃ
রাণীবহাল – সাঁওতাল পঃ
রাণীপুর – রাজ
রাতমা – ময়ূ
রাতিরা – ময়ূ
রামকৃষ্ণপুর – ময়ূ
রামচন্দ্রপুর – বো
রায়রামচন্দ্রপুর – বর্ধ, থানা – ভাতার
রূপপুর – মুর্শি, কান্দী
লখীন্দরপুর – সি
লম্বোদরপুর – সি
লাউজোড় – রাজ
লাউবেড়িয়া – খয়
লাউসেনতলা – ই
লাগড়ে – খয়
লাবপুর – লা
লাঙ্গুলিয়া – সি
লালদহ – বো
লায়েকপুর – লা
শাঁখপুর – লা
শালগড়িয়া – সাঁ
শালদহ – মহঃ
শালচাপড়া – সাঁ
শাসপুর – নাম্নর
শিমূলডি – সাঁওতাল পঃ
শিরা – খয়
শীর্ষা – ইলাম ও রাজ
শুকজোড়া – সাঁওতাল পঃ
শূদ্রাক্ষিপুর – ঐ, থানা – কুণ্ডহিত
শেখপুর – ময়ূ
শোলাহাট – ময়ূ
শ্রীকণ্ঠপুর – সি
শ্রীরামপুর – না
শ্যামপুর – লা
সটকী – সাঁওতাল পঃ
সর্বানন্দপুর – বো
সংগ্রামপুর – সি
সাঁইথিয়া – সাঁ
সাঙ্গুলডিহা – সাঁ
সারসা – খয়
সালামৎপুর – মহঃ
সাংড়া (বড়) – সাঁ
সিউর – সাঁ, সি
সিউড়ী – সি
সিঙ্গুর – সি
সিতুলী – সি
সিয়ানশুকবাজার – বো
সিয়াস – বাঁকুড়া, থানা – কোতুলপুর
সুগুণপুর – মহঃ
সুন্দীপুর – লা
সুপুর – বো
সুলতানপুর – সি
সেকমপুর – সি
হজরৎপুর – খয়
হাজরাপুর – দুব
হাটইকড়া – সি
হাতোড়া – সাঁ
হাড়াইপুর – সি
হাঁসড়া – ই
হাসনাবাদ – সি
হিজলগড়া – বর্ধমান, থানা – জামুরিয়া
হীরাপুর – লা
হেতিয়া – মুর্শি, থানা – বড়ঞা

নির্ঘণ্ট

খ

ভ

ম

ল

শ

ষ

স

হ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

গ্রন্থপঞ্জী

অর্থশাস্ত্র (কৌটিল্য)—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত।

ঋগ্বেদ—ডঃ মতিলাল দাশের অনুবাদ।

গোর্খবিজয়—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী) ১৩৫৬।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—শ্রীপীযুষ মহাপাত্র সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিন্ময় বঙ্গ—ক্ষিতিমোহন সেন 1961।

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী)।

জাতিভেদ—ক্ষিতিমোহন সেন।

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৩৬।

তন্ত্রকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (বিশ্বভারতী) ১৩৬২।

তন্ত্রপরিচয়—সুখময় ভট্টাচার্য (বিশ্বভারতী)।

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বাদশ মঙ্গল (সাহিত্য প্রকাশিকা ৫ম খণ্ড)—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী) ১৩৭৩।

ধর্মপুজাবিধান—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (সাঃ পরিষৎ)।

পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুজাপার্বণ—ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (বিশ্বভারতী) ১৩৫৮।

পশ্চিমবঙ্গের পুজাপার্বণ ও মেলা (২য় খণ্ড)—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত (1968), অশোক মিত্র, আই-এ-এস সম্পাদিত।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—শ্রীবিনয় ঘোষ ১৩৬৩।

পুঁথি পরিচয় (১ম-৩য় খণ্ড)—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী)।

পুরোহিত দর্পণ—১৩৫৮/১৩৬৪/১৩৬৩।

পাতঞ্জলি দর্শন—কালীচরণ বেদান্তবাগীশ ১৩২৬।

প্রাচীন ভারতে নারী—ক্ষিতিমোহন সেন (বিশ্বভারতী) ১৩৫৭।

প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (বিশ্বভারতী) ১৩৫৬।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

বাঙ্গলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) ১৩৫০।

বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ১৯৬৬।

বাংলার স্ত্রী আচার—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (বিশ্বভারতী) ১৩৬৩।

বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন (বিশ্বভারতী) ১৩৫২ ।
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন ১৩৫৫ ।
বাংলার পাল পার্বণ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (বিশ্বভারতী) ১৩৫৯ ।
বীরভূম বিবরণ—ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।
বীরভূমের ইতিহাস—গৌরীহর মিত্র ১৩৪৫ ।
বৌদ্ধধর্ম—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।
বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সাঃ পরিষৎ) ১৩৬১ ।
বৈদিক দেবতা—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (বিশ্বভারতী) ১৩৫৭ ।
বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (বিশ্বভারতী) ১৩৬২ ।
ভারতের সংস্কৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন (বিশ্বভারতী) ১৩৫০ ।
ভারত সংস্কৃতি—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।
ভারতের জাতি পরিচয়—ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ ।
ভারত শিল্পে মূর্তি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী) ১৩৫৪ ।
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৩৫৭ ।
ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ—বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ।
মেয়েদের ব্রতকথা—শশিভূষণ কবিরত্ন ১৩২৯ ।
যাদুনাথের ধর্মমঙ্গল—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ।
রূপরামের ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন 1957 ।
লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৩৬৩ ।
লৌকিক শব্দকোষ—কামিনীকুমার রায় ।
হরিদেবের রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল (সাহিত্য প্রকাশিকা, ৪র্থ খণ্ডের অন্তর্গত)—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী) ১৩৬৭ ।
হিন্দু সমাজের গড়ন—অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু (বিশ্বভারতী) ।
শূন্যপুরাণ—চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শ্রীদুর্গা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ) ।
সাহিত্য প্রকাশিকা (১ম-৫ম খণ্ড)—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (বিশ্বভারতী) ।
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—

Alpha : Myths of Creation—Long Charles. A. (N. York).
Anthropological approaches to the study of Religion—A. S. A. Monograph (British, American & European) U. S. A.

Anuals of Rural Bengal—W. W. Hunter, 5th ed., 1872 London.
A View of History—Literature & Religion of Hindus-Ward 1815.
Buddhist Iconography—Binoytosh Bhattacharjee.
B. C. Law, vol. I.
Birbhum dist. Gazetteer—O'mally 1910.
Curious Myths of the Middle Ages (Longmans, Green & Co.)—
S. Baring Gould 1902.
District Hand book—A. Mitra, I. C. S., Census 1951.
Elements of Hindu Iconography—G. N. Rao.
Encyclopedia of Religion & ethics—Hastings.
Folk Lore (anthropology)—Writings of Lessa, William, U. S. A.
Golden Bough—Sir James George Frazer (abridged 1963).
(The) History of Religions—Essays in Methodology (University
Chicago Press)
Indo Aryan races—R. P. Chanda 1961.
Indian Architecture—Percy Brown.
(The) Inner Reality—Dr. Paul Brunton.
Inscriptions of Bengal—N. G. Mazumdar.
Journals of Royal Asiatic Society.
Journals of The Anthropological Society.
Lectures in irrigation—William Wilcox (C. U.).
(The) Mother goddess—S. K. Dikshit.
Myth, Ritual & Religion (I+II)—Andrew Lang 1906,
Longmans, Green & Co.
Myth & Cosmos—American Museum of Natural History.
North Indian Notes & Queries—Allahabad 1883.
Obscure Religions Cult—Dr. S. B. Dasgupta.
Oran Religions & Customs—S. C. Roy 1928.
Origin & development of Religions beliefs—S. Baring Gould 1902,
Longmans, Green & Co.
Prehistoric India & Ancient Egypt—S. K. Roy 1956.
Pandu Rajer Dhibi—The excavation of, P. C. Dasgupta (W. B.
Archæology deptt.)

(The) Ravas of W. Bengal by Dr. A. K. Das, Schedule Caste &
Schedule Tribe deptt. Govt. of W. B. 1967.

Rajbanshis of N. Bengal—Dr. Charu Chandra Sannyal.

Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus—Swami Sankarananda.

Religion as a Cultural System (Indonesia)—G. Clifford (Chicago).

Tantric Buddhism—Dr. S. B. Dasgupta.

(The) Santal—N. Dutta Majumdar, Dept. of Anthropology
Govt. of India, 1956.

Santali Dictionary—A. Campbell 1899.

Structural Anthropology—Levi-Thomas C.

Tribal research bulletin—Govt. of W. B., vol. 1 to 8.

(The) Tribes & Castes of Bengal—H. H. Risley 1891.

(The) Village Gods of South India—Rev. Whitehead 1921.

Village Directory of the Presidency of Bengal vol. III, Published by
Post Master Genl. Bengal 1884.